উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

পঞ্চমবর্ষ।

১৩০৯ মাঘ হইতে ১৩১০ পৌষ।

পাক্ষিকপত্র।

াতা, স্যামে জাে ষ্ট্রীট, কম্বু লেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্রমৈ্রে লেনস্থ সাহদাপ্রেস হইতে
চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও উক্তস্থান হইতে শ্রীপির.দ্রলাল বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

অনেকগুলি উদ্বোধনে ৩২৮ পৃষ্ঠার পর ৩২১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি আছে উহার পরিবর্ত্তে ৩২৯ ইত্যাদি ক্রমে হইবে। গীতা শাঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গা... পৃষ্ঠা নিম্নে দেখিতে হইবে।

ভারতে শক্তিপূজা।

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

জড় চেতন সকলের মধ্যে গুপ্ত বা ব্যক্ত ভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

হে পাঠক! উদ্বোধন ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণি শ্রীবিবেকানন্দ হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরকল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাতঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য্য নহে,—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য অসহায় মনুষ্যশরীরেই জড়শক্তিনিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতনশক্তি আবার জাগরিতা। শক্তি-পূজা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার এই উপযুক্ত সময়।

পুরাতন হইলেও শক্তি নিত্য নূতন। গুপ্তভাব হইতে ব্যক্ত হইলেই নূতন বলিয়া প্রতীয়মান। নতুবা "চিকের আড়ালে দেবী সর্ব্বদাই রহিয়াছেন"। হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ ত দূরের কথা। ঘন সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিলেই আমরা কখন হ্রাস কখন বৃদ্ধি কখন বা একেবারে নাই বলিয়া মনে করিতেছি। একশক্তিই কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্তভাব প্রাপ্ত হইল, তাহা কে বলিতে পারে? যতবার ব্যক্ত, ততবার নূতন। যতবার গুপ্ত ততবার লুপ্ত বলিয়া অনুভূত হইল। কালে কালে এই খেলা চলিয়াছে। দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, অখিল জগৎ লইয়া—জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তি লইয়া এইখেলা চলিয়াছে। কত গ্রহ চূর্ণিত

এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, কত দেশ পর্ব্বতায়িত এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, কে নির্ণয়ে সক্ষম? এক গ্রহ বা পৃথিবীস্থ এক দেশের কতবারই বা এই দশা হইল, তাহাই বা কে বলে? তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে সমুদ্রগর্জ্জনের এবং সমুদ্রগর্ভে দেশ জনপদের অস্তিত্বের ইতিহাস বর্ত্তমান। এইরূপ কত জাতি বা সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় উত্থিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? প্রসিদ্ধই আছে, শতবর্ষে জনপদ আবার শতবর্ষে অরণ্য। শৈশব যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য কেই বা না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? পুনর্জ্জন্মে সেই শক্তির পুনর্বিকাশ, ভারতের কোন্ যোগী ঋষিই না অনুভব করিয়াছেন? শ্রীমন্তদৃষ্ট প্রফুল্লকমলোপরি অবস্থিতা লঘুকায়া অপূর্ব্ব সুন্দরী এইরূপে গজগ্রাস এবং গজ উদ্গার করিতেছেন। দেবর্ষিনারদদৃষ্ট ভাগবতী মায়া এইরূপে সূচী ছিদ্রে হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাইতেছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রত্যক্ষীকৃত মহামায়া এইরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসবে এবং লালন পালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকেই গ্রাস করিতেছেন।

আধুনিক দার্শনিকও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হ্রাস নাই। গুপ্ত ও ব্যক্তভাব হয় মাত্র। ভাবরাজ্যেও তাহাই, ভাবরাজ্যে বা সূক্ষ্ম মনোরাজ্যেও শক্তির এই খেলা বর্ত্তমান। এক জাতি বা সমাজ বা ব্যক্তি উপলব্ধ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভাব কালে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পরিণত এবং লুপ্ত হইয়া আবার সেই ভাবতরঙ্গ অপর জাতি বা সমাজ বা ব্যক্তিগত হইয়া নূতন বলিয়া উপলব্ধ হয়। মহাশক্তির বিচিত্র লীলায় দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদৌ অনুভব না করিয়া ভাবে, এ ভাব জগতে আর কখনও উদিত হয় নাই এবং মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া জটিল জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব্ব সরল সমাধান তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে। আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীন ভারত, মিসর, গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতরঙ্গ এখন ঐ সকল দেশে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুত্থিত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশবাসীর মদগর্ব্ব প্রত্যক্ষ। পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্রমবিকাশ, স্ত্রীনির্ব্বাচন, সন্তানানুগত পিতৃগুণবাদ ইত্যাদি লইয়া জীবনশঙ্কার সরল সমাধান আবিষ্কৃত বলিয়া সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু বৃথা গর্ব্ব।

ভারতবঙ্গ আবার স্থানান্তরিত হইবে—আলোকের পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্যু আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। জীবন শক্কার একটা জাতিগত সমাধান দুরপরাহতই থাকিবে। তবে ব্যক্তিগত সমাধান? ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটাই কাটিয়াছে ও কাটিবে। ইউরোপ! তুমি ক্ষত্রশক্তি এবং বৈশ্যশক্তির উপাসনায় হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়াছ, সেই কঠোর তপস্যাই তোমায় উন্নতশির করিয়াছে। আমেরিকা! তুমি ঐ দুই শক্তির সহিত আবার শূদ্রশক্তির আরাধনে তৎপর। তজ্জন্যই তোমার এত শীঘ্র জাতীয় উন্নতি। কিন্তু ঘোর তোমরা মহাশক্তির আরাধনায় অবহেলা করিবে এবং কালে ভুলিয়া যাইবে। আবার সেই "সহস্রপরমা শতমূলা শতাঙ্কুরা" দূর্ব্বাদেবী অন্যের আরাধনায় প্রসন্না হইয়া অন্যত্র উদিতা হইবেন। এই নিয়ম, গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত শক্তির এই দুই ভাবের খেলা জগতে সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্ত ভাবের খেলা হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্দ্ধক্য শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি। আবার বহুকাল গুপ্ত শক্তির বিকাশ যে শরীর মন আশ্রয়ে হয় বা ব্যক্ত শক্তির কার্য্যক্রম যাঁহার দ্বারা যথাযথ গঠিত হয়, শ্রদ্ধাভক্তি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে আমরা কতই না উচ্চাসন প্রদান করিতে বাধ্য হই। জড় রাজ্যে তিনি আবিষ্কারক, মনোরাজ্যে দার্শনিক এবং ধর্ম্মরাজ্যে মুক্তস্বভাব ঋষি এবং শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহধারী অবতার।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা চিন্তা বা কল্পনা দ্বারা অনুমান ও গঠন করিতেছি, সকলি শক্তিসহায়ে, সকলি শক্তি রাজ্যের অধিকারভূত

দেবী বলিতেছেন —

"ময়া যোঽন্নমত্তি যঃ প্রাণিতি
য ঈং শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥
অহং রুদ্রায ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।

অহং জনায় সমদং কৃণোমি।
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥

আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি করিতেছে। আমাকে যে অবহেলা করে, সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এ সকল বলিতেছি, ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমি শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আমিই লোক রক্ষার জন্য যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি। শক্তি-রাজ্যের অদ্ভুত বিস্তৃতি যিনি একবার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি আরাধনা ভিন্ন এখানে অন্য কিছুই হয় নাই বা হইবে না! জড় চেতন আজীবন এই আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়াও পূজা সাঙ্গ করিতে পারিতেছে না। পারিবে কিকোন কালে? যদি পারে, সেও শক্তিসহায়ে —

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কলিতে অন্য দেবতা সব নিদ্রিত, অন্য শাস্ত্রসমূহের নির্ব্বিষ ভুজগের ন্যায় বৃথাস্ফালন। কথা সম্পূর্ণ না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সব শক্তি আরাধনের ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচর, তদারাধনার ফলেই তাহার শরীরবিজ্ঞান, ভূতবিজ্ঞান, রোগশান্তি, মহামারীর প্রতিবিধান, আহার সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি করতলগত। তেমনি মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, তদুপাসনায় মনোবিজ্ঞান, কবিত্ব, সংযম, বিবাহ বিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি এবং পরিশেষে সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার আয়ত্তীভূত! অবশ্য এসকল বহুলোকের বহুকাল শক্তিউপাসনার ফলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সর্ব্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফল হাতে হাতে পাইয়াছে। একালের উপাসকদেরও এ কথা প্রত্যক্ষানুভূত।

তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফল লাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে পূজায় যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে, যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি,সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই। এ কথাটী যেমন বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়া যায় এদেশে আমরা এ কথাটী আজ কাল কতই না ভুলিয়াছি। ফলও তদ্রূপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্ব্বীর্য্য বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন, পরাধীন। দোষ, পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়নবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া, যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন এবং নির্জ্জনে বীজ মন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল প্রত্যাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি উপাসনা অঙ্গহীন। মহামারী প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধান সকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য পানীয়ের বিচার না রাখিয়া কেবল মাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চ-রোলে হরিসংকীর্ত্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাহার ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুর্ভিক্ষের করালবদন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষা-কালীর পূজা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপযোগী উপায় সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বৈ আর কি বলা যাইবে? স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতা দানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগ রূপ রুধিরপাতে সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? কথায় বলে, "যে বিবাহের যে মন্ত্র" তাহার উচ্চারণ চাই। এইরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, পূজার ফল তো পাইলাম না। হায় মানব। তোমার সহজবুদ্ধির কি একান্ত অভাব হইয়াছে?শাস্ত্র তো তোমায় বার বার বলিতেছেন, কোনকার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন?

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবমেবাত্র পঞ্চমম্॥

উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্ত্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম, বার বার উদ্যম এবং দৈব। সহজ জ্ঞানেও তো বার বার উপলব্ধি করিতেছ যে, এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে পুরুষকারকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে

তবে অগ্রসর হওয়া যায়। নতুবা পুরুষকার ও চেষ্টা তোমায় ভগবান কেন দিয়াছেন? একবার সোজা সুজি ভাবিয়া দেখ দেখি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ যে মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি কেবল মন্ত্রজপ প্রভাবে বা চেষ্টারহিত হইয়া কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া? তান্ত্রিক অবধূতেরা যে সকল ধাতুঘটিত ঔষধ এবং বিবিধ বিষপ্রয়োগে বিবিধ রোগ শান্তির উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই না নির্ভীক উদ্যম এবং পরীক্ষার পরিচয় প্রদান করে। কত সাধকের হৃদয়ের শোণিতধারায় শক্তিপূজার ফুলে এক একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন শোণিতবিন্দু দেখিলে তুমি চক্ষু নিমীলন কর। বলিদানের নাম শুনিলে একবারে হতজ্ঞান হও। কিন্তু ঐ শুন, ভারতের ঋষি কার্য্যে দেখাইয়া চিরকাল ঘোষণা করিতেছেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে যথাযথ উপায় অবলম্বন কর, বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিত দিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন ইষ্টলাভোদ্দেশ্যে রুধিরপ্রিয়া দেবীর সম্মুখে বলিদান দাও; দেখিবে, নবজীবনের সহিত নবশক্তি আবির্ভূতা হইবে, কুল, জাতি, দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, আপনি ধন্য হইয়া অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে।

বলিপ্রদান ভিন্ন পূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ মহিষ তো অনুকল্প মাত্র, হৃদয়ের শোণিত দান, যে উদ্দেশ্যে পূজা, সে উদ্দেশ্যে সমগ্র শরীর মন উৎসর্গ না করিলে ফল সিদ্ধি অসম্ভব। বেদ বলেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ, ত্যাগই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমর হইবার এক মাত্র উপায়। কেবল আত্মজ্ঞান কেন, ত্যাগ না করিলে জগতে কোন বিষয় লাভ হয় না এবং ত্যাগই বলি এবং হোমের একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব্বত্যাগে অমরত্ব লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্যালাভ, ধন জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলি মাহাত্ম্য নিত্য প্রত্যক্ষ। ঐ সকল বিষয় উপার্জ্জন করিবার উপায় ত্যাগ এবং রক্ষা করিবার উপায়ও ত্যাগ, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ।

যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্ব্ব শক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া শক্তি অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে, পরে

সম্যক্‌ শ্রদ্ধার সহিত আবাহন, পূজা এবং আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তবেই দেবী বরদা হইয়া সাধকের প্রাণ মনে অভিনব অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার করিয়া ঈপ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে। করিবার যাহা কিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মন প্রাণ নিমিত্তমাত্র হইবে।

বিঘ্নোৎসারণ, ভূতবলি, শুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্যই বাহির এবং ভিতরে বৃথা শক্তি ক্ষয় নিবারণ। এবং যে উপায়েই হউক, বৃথাশক্তিক্ষয় নিবারণ হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে। অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল। পরে পূজা ও স্বার্থত্যাগের নবশক্তি সঞ্চিত হইল এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগে অভীষ্ট ফল করতলগত হইল। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত। শক্তিক্ষয় নিবারণ, আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সর্ব্বশক্তি অন্তর্নিহিত, এ কথা জানুক আর নাই জানুক এবং বিশেষশক্তি আপনাতেও প্রকাশিত করিবার ইহাই ক্রমোপায় একথাও অজ্ঞাত থাকুক, তথাপি একমাত্র অভীষ্ট বিষয়ের তীব্র ধ্যানই সর্ব্বকালে সর্ব্বসাধককে পূর্ব্বোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য দার্শনিক অনেকে শক্তিকে জড়া বলিয়া থাকেন। জড়পরমাণুতে জড়শক্তির খেলা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার চক্ষুগোচর হয় না। বিচিত্র বহির্জগৎ এবং তদপেক্ষা সমধিক বিস্ময়কর মানবের অন্তর্জগৎও এই জড় পিতা মাতার জড়লীলাপ্রসূত জড় সন্তান। মন বল, বুদ্ধি বল, আত্মা বল, সব তাহাই। আর একশ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতন্য ভেদে শক্তি দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শক্তির খেলায় উভয় জগৎ প্রসূত। সূক্ষ্মা চৈতন্যশক্তি স্থূলা জড় ভগিনীকে সর্ব্বদাই আত্মবশে রাখিয়া নিয়মন করিতেছেন।

বিরল দুইচারি ব্যক্তির শক্তিসম্বন্ধিনী জ্ঞান ভারতের ঋষিদের জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তাহাও অনুমান সহায়ে, ঋষিদের ন্যায় অনুভূতির ফলে নহে। নতুবা ইউরোপ ও আমেরিকা অল্পদিন মাত্র চার্ব্বাক মত হইতে

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহে, ধনাগমকৌশলে, বহুব্যক্তির একত্র সংস্থানে ও একোদ্দেশ্যে নিয়মনে, ভৌতিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারে, বৈশ্য এবং অতিঘৃণ্য শূদ্রের অন্তর্নিহিত অভিনব শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে শিক্ষার স্থল হইলেও সূক্ষ্মতর মন এবং ধর্ম্মরাজ্যে উক্ত উভয় দেশের আধিপত্য এখনও প্রায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেখানে ভারতের ঋষির "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী", (বিষয়াসক্ত ব্যক্তির যাহাতে অন্ধকার, সংযমীর তাহাতেই আলোক বোধ) সেই পুরাতন কথা এখনও সত্য —ভারতের ঋষির এখনও পূর্ব্বাধিপত্য! তাই ভারতের বেদ বেদান্তের গম্ভীর ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত, মোহিত, স্তব্ধ।

শক্তি জড়স্বরূপা, এ কথা নূতন নহে। বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে ভারতের কপিলাদি ঋষি একথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জড়বাদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের জড়বাদে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। যে শক্তি, কার্য্যাকার্য্যবিচারক্ষম মানববুদ্ধি প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে তদপেক্ষাও অধম, একথা ঋষিদের স্বপ্নেরও অগোচর। কার্য্য কি কারণাপেক্ষা গুরু হইতে পারে? যাহা কারণে বর্ত্তমান, তাহাই কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে ও প্রকাশ পায়।

ভারতের ঋষি শক্তির স্বাধীন কার্য্যকারিতার অভাব স্বীকার করিলেও চৈতন্যময় পুরুষের সহিত নিত্যসংযোগে তাঁহাকে নিত্যচৈতন্যময়ী দেখিয়াছেন। কল্পনা সহায়ে পৃথক্ করা ভিন্ন শক্তি ও শক্তিমানকে বাস্তব পৃথক্ করা কি সম্ভবে? অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কেহ কখন পৃথক্ করিয়াছে বা দেখিয়াছে কি? বহুর ভিতর একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ঋষি দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত পরম ধামে উপনীত হইয়াছিলেন। বাহির ও অন্তর জগৎ একশক্তিপ্রসূত অনুভব করিয়া পরিশেষে সেই শক্তি ও শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই বলিয়াছিলেন,—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং"

"মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে"—

দেবী নিত্যস্বরূপা, জগতই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যাঁহা হইতে জীব জগৎ সমস্ত নির্গত হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মে উৎপত্তি কারণ স্বরূপিণী আমি (দেবী)। সেই জন্য শক্তির স্তবে বলিয়াছেন,

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম।

চৈতন্যের সহিত শক্তির এইরূপ নিত্য মিলন সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে তাঁহারা শবশিবার আরাধনা করিয়াছিলেন। অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, সাগরবাহিনী নদ নদী, উষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিমিরাগুণ্ঠন সকলই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী দেবীর প্রতীক স্বরূপ হইয়া তাঁহার সৌম্যাৎসৌম্যতরামূর্ত্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুরছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার ছায়া সকলই আবার সেই করালবদনার কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া মোহিত করিত। দেবাসুরের নিত্যসংগ্রামস্থল মনুষ্যমনে আবার দেবীর বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া বিশেষ আরাধনাবিধান করিয়াছিলেন। পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতর, জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির ভিতর, বিদ্যা ক্ষমা শান্তি মোহ নিদ্রা ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত্বিক এবং তামসিক গুণের ভিতর, প্রত্যেক মনুষ্যমনের ভিতর সেই অদ্বিতীয়া বরাভয়করা মুণ্ডমালিনী দেবীর আবির্ভাব দর্শনে এবং শ্রদ্ধা সহিত আরাধনে আপনারা কৃতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে বলিয়াছেন।

কোন্ কোন্ স্থানে সেই শক্তির কি প্রকার বিশেষ প্রকাশ এবং কি ভাবেই বা পূজাবিধান, সে সমস্ত অনেক কথা—আর এক দিন বলিবার ইচ্ছা রহিল। উপসংহারে বক্তব্য, হে পাঠক, ভারতের কুলদেবী দুঃস্বপ্ননাশিনী শিবানীর উপাসনার এবং পূর্ণভাবে আত্মবলিদানের অনন্ত মহিমা যদি অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এস একবার নিমীলিত-নেত্রে ধ্যানসহায়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে কুটীরনিবাসী আত্মহারা প্রেমিক এবং সেই গুরুভক্ত যুবক সন্ন্যাসী, যাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মবলে আজ সুদূর মার্কিনে চিরপদদলিত হিন্দুর ধর্ম্মধ্বজা সগৌরবে উড্ডীন, তাঁহাদের পদপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হই। ওঁ শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ।

স্মৃতি।

ও পারে বেলুড়মঠে কার চিতা জ্বলে রে
কার চিতা জ্বলে ?
কে ওই পুরুষবর
বেষ্টিত অমর নর
ত্যজিল এ ধরাধাম মুখে হাঁসি খেলে রে
মুখে হাঁসি খেলে ?

আজি ভাগীরথী তীরে কে ওই শয়ান রে
কে ওই শয়ান ?
বেলুড়ে আনন্দ গেহে
নিরানন্দ স্রোত বহে
কেন রে চলিল কোন্ পুরুষপ্রধান রে
পুরুষপ্রধান ?

একি গো মা ত্রিপথগে কার স্মৃতি আশে মা
কার স্মৃতি আশে
তনয়ে করিয়া কোলে
এসেছ যাইতে চলে
কারে মা লইয়া যাবে কৈবল্য আবাসে মা
কৈবল্য আবাসে ?

কে গো তুমি মহাজন ছাড়িলে সংসার গো
ছাড়িলে সংসার ?
পশু পক্ষী তরু লতা
গায়িছে তোমার গাথা

কে তুমি আনন্দময় আনন্দ আধার গো
আনন্দ আধার ?

কে তুমি আচার্য্য দেব জ্ঞান গরীয়ান গো
জ্ঞান গরীযান ?
বুদ্ধিরথ আরোহণে
হারায়েছ জগজনে ;
বিরাট সে ধর্ম্মক্ষেত্রে কে ছিল সমান গো
কে ছিল সমান ?

যে গৌরব হইয়া তুমি ভক্তচূড়ামণি গো
ভক্তচূড়ামণি ;
যে দেশে গিয়েছ তুমি,
পবিত্র সে দেশ ভূমি ,
গেয়ে তত্ত্বমসি গান রাখিলে অবনী গো
রাখিলে অবনী ।

শত শত ভ্রান্ত জনে করিলে উদ্ধার গো
করিলে উদ্ধার ,
দিয়া জ্ঞান রত্ন ধনে
শাস্ত্রজ্যোতি বিকীরণে
অপূর্ব্ব ভাষায় তব নাশিলে আঁধার গো
নাশিলে আঁধার ।

শ্রীমুখ নিঃসৃত ভাষা অমৃত সমান গো
পীযূষ সমান ।
জগতের বুধজনে
স্তম্ভিত সে ভাষ শুনে ;

ষট্‌চক্র ভেদ ব্যাখ্যা নাশিল অজ্ঞান গো
নাশিল অজ্ঞান।

ধর্ম্মের তরঙ্গ তব ব্যাপিল ধরণী গো
ব্যাপিল ধরণী।
ভিন্ন জাতি নর নারী
বাজায় ধর্ম্মের ভেরী,
বেদান্ত বেদান্ত রব ছাইল অবনী গো
ছাইল অবনী!

বেদান্ত নিশান লয়ে গিয়েছ যেথানে গো
গিয়েছ যেথানে
চারিদিকে জয় রব
এক মত হইল সব,
ব্রহ্ম সত্য মিথ্যা সব জেনেছে সেথানে গো
জেনেছে সেথানে।

জগৎ শিখেছে দেব তোমার সদনে গো
তোমার সদনে
নর হিত ব্রত ধর্ম্ম
জীবের প্রধান কর্ম্ম
অপূর্ব্ব সে আত্মত্যাগে মুগ্ধ জগজ্জনে গো
মুগ্ধ জগজ্জনে।

"উঠো জাগো" মহাগান গাহিবে কে আর গো
গাহিবে কে আর?
'না পেলে ফিরোনা কভু
যায় যাবে বর বপু'

উদ্বোধন মহামন্ত্র দানিবে কে আর গো
দানিবে কে আর ?

এস দেব দেখ এসে তব 'উদ্বোধনে' গো
তব 'উদ্বোধনে'
'প্রবুদ্ধ ভারত' আজ
দূরে ফেলে সব কায,
"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" গাহিছে সঘনে গো
গাহিছে সঘনে।

নিত্যসিদ্ধ ছিলে তুমি, কহে বুধ জন গো
কহে বুধ জন।
বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ
হয়ে তব প্রেমাকৃষ্ট
দিল মহামন্ত্র যাহে উদ্বুদ্ধ ভুবন গো
উদ্বুদ্ধ ভুবন।

বিবেক বৈরাগ্য তব নিত্য সহচর গো
নিত্য সহচর।
ভবের মোহিনী মায়া
স্পর্শিল না তব কায়া,
অনায়াসে চলে গেলে ব্রহ্মের গোচর গো
ব্রহ্মের গোচর।

ধর্ম্মের যে মহাবীজ, করিলে বপন গো
করিলে বপন,
আজি শোভে ফুলে ফলে
নর নারী কুতূহলে

তাহার আশ্রয়ে দেব করিছে ভ্রমণ গো
করিছে ভ্রমণ।

অকালে সে সব ফেলে কেন তিরোধান গো
কেন তিরোধান?
'ভাব্‌দা অনাথাগারে'
ডাকে শিশু সকাতরে
'কম্খলে' সন্ন্যাসিবৃন্দ গায় তব গান গো
গায় তব গান।

দেশের চৌদিকে যবে হাহাকার রব গো
হাহাকার রব
কে ভাসি নয়ন জলে
পাঠাইবে নিজ দলে
দুর্ভিক্ষ বন্যায় রোগে ভেসে যাবে সব গো
ভেসে যাবে সব।

কি অপূর্ব্ব প্রেম তব জীবের লাগিয়া গো
জীবের লাগিয়া।
মার্কিন ইংলণ্ডবাসী
কোল ভীল সিংহলিনী
হরষিত ছিল সবে তোমারে পাইয়া গো
তোমারে পাইয়া।

অধম বাঙ্গালী জাতি সবে ঘৃণ্য ভাষে গো
সবে ঘৃণ্য ভাষে।
সেই কুল পবিত্রিয়া
উচ্চে বাঁধি তব হিয়া

রাখিলে হিন্দুর মান জগৎ সকাশে গো
জগৎ সকাশে।

হিন্দুর গগনে তুমি রবি দ্যুতিমান গো
রবি দ্যুতিমান।
দ্বিতীয় শঙ্কর তুমি,
কি আর কহিব আমি
যে জেনেছে সে পেয়েছে তাহার সন্ধান গো
তাহার সন্ধান।

তুমি না উদিলে দেব হিন্দুর আকাশে গো
হিন্দুর আকাশে
নিভে যেতো শাস্ত্রজ্যোতি;
হিন্দুর মহিমা ভাতি
জড়বাদী এ জগতে কে আর প্রকাশে গো
কে আর প্রকাশে?

জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ ভারত আঁধারে গো
ভারত আঁধারে
অকালে মোদের ফেলে
গেলে দেব গেলে চলে
কেমনে জ্বলিবে দীপ সেই দীপাধারে গো
সেই দীপাধারে।

তব প্রদর্শিত পথে চলেছে যাহারা গো
চলেছে যাহারা
আশীর্ব্বাদ কর তুমি,
হে বিবেকানন্দ স্বামী!

বীর্য্যবান, শক্তিমান হউক তাহারা গো।
হউক তাহারা।

কিসের ভিখারি মোরা আছে তব জানা গো
আছে তব জানা।
কি আর কহিবে দাস
নাহি অন্য অভিলাষ
অনন্ত জ্ঞানের তব দাও এক কণা গো
দাও জ্ঞান কণা।

শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(এন্নুবিস পত্রিকা হইতে গৃহীত।)

সম্প্রতি কলিকাতায় এক অদ্ভুতশক্তিশালী ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী যত অদ্ভুত লোক প্রসব করিয়াছে, তাহার মধ্যে ইনি অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে, আমেরিকায় এবং তাঁহার জন্মভূমি ভারতে সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কি মহিমাময় ভাব ছিল, লোক জনের সঙ্গে নানাপ্রকার হৃদয়গ্রাহী কথা কহিয়া মুগ্ধ করিবার কি শক্তি ছিল, তাঁহার কি অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার কি অপার্থিব সরলতা ও পবিত্র স্বভাব ছিল। এইরূপ ব্যক্তি যে কোন স্থানেই থাকুন না কেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। তিনি ওকালতী পড়িতেছিলেন; যদি উকিল হইতেন, তবে নিশ্চয়ই খুব উন্নতি করিতে পারিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট ছিলেন।

অতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার প্রবল ধর্ম্মপিপাসা ছিল। সত্য কি, জানিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। জুয়াচুরি ভান প্রভৃতি তিনি অতি সহজেই ধরিতে পারিতেন। সুতরাং ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরীর উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি চাহিতেন দেখিতে, যেন ভাবের ঘরে চুরী না থাকে, সুতরাং চারিদিকে কেবল জুয়াচুরী দেখিয়া সত্যলাভে একরূপ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর আবার কলেজে পড়িবার সময় বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদের কুহকে পড়িলেন, তাহার সহিত তাঁহার নিজের জুয়াচুরীর উপর বিজাতীয় ঘৃণা। এই দুই মিলিয়া তাঁহাকে একরূপ নাস্তিক করিবার উপক্রম করিয়াছিল। এই মহা বিপদের সময় তাঁহার সহিত সেই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ হইল, যিনি নিজে ভগবানকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন এবং অপরকেও যাঁহার জ্ঞানদানের শক্তি ছিল। এই যুবক তাঁহার

নিকট যাইবা মাত্র তাঁহার শক্তির ভিতর পড়িলেন, ক্ষণকালের জন্য নহে, ইঁহার উপর তাঁহার প্রভাব চিরস্থায়ী হইল। যুবা বয়সে সকলেই হামবড়া হয়, তার পর ইনি আবার নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার উপর শক্তিবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, তিনি একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ করিবারও যো ছিল না। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাকে সহজে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম প্রথম তর্ক করিতেন—তাঁহার নিজের একটা গোঁ ছিল—নিজের একটা মত ছিল; তাহা হইতে তাঁহাকে হঠান বড় সহজ কার্য্য ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আবার প্রেম ও সহিষ্ণুতা অপার, তাহাতে আবার তাঁহার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ত্যাগময় জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্য অদ্ভুত—সুতরাং তিনি ইঁহাকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন। এই যুবক সংসারের সমুদয় উচ্চাভিলাষ বিসর্জ্জন দিলেন, যুবা বয়সে যে সকল সুখ, যে সকল প্রলোভন মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাহা একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং শরীর মন একেবারে গুরুর কার্য্যে অর্পণ করিলেন। নিজের বাসস্থান এবং নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইলেন—সংসারের কোন বাসনা আর তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারিল না। আরামের গৃহ, পুত্রকলত্রের বাঞ্ছা, নামযশ ধনের বাসনা সবই ত্যাগ করিলেন। এ সকলকে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ত্যাগ করিলেন—তাহাদের বদলে গৈরিক বসন দণ্ডকমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কখন তিনি আবার নামযশের অধিকারী হইবেন—কখন ভাবেন নাই, সংসারে থাকিয়া তিনি যাহা হইতে পারিতেন, তদপেক্ষা সহস্র গুণে বড় হইবেন।

যাহা কিছু তিনি করিতেন, তাহাতেই তাঁহার প্রবল উৎসাহ দেখা যাইত। এখন যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহারও উদ্‌যাপনে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে সমুদয় ভারতে ভ্রমণ করিয়া—শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তুষারময় হিমালয়ের উপর, বঙ্গদেশের আর্দ্র সমতলে, রাজপুতানার ঘোর মরুতে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখবিপদ্ সহ্য করিয়া— তিনি প্রেমের সহিত, আনন্দের

সহিত লোককে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র অশান্ত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিতে লাগিলেন।

১৮৯৩ সালে যখন চিকাগো সহরে মহামেলা হয়, তখন তাহার সহিত একটী "সর্বধর্ম্ম সভা" খুলিবার প্রস্তাব হয়। সেই সময় তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ও ভক্ত তাঁহাকে ঐ চিকাগো ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইতে পাঠাইবার জন্য কিছু টাকা চাঁদা তুলেন। আর এক জন শিষ্য—এক দিক্ষণবর্ত্তী রাজা বাকি টাকা দিলেন। তখন এই সন্ন্যাসী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কানাডার অন্তর্গত বন্দরে নামিলেন। তথা হইতে ১৮৯৩ এর মে মাসে চিকাগোতে যাইলেন। তিনি দেখিলেন, পার্লিয়ামেন্ট খুলিবার এখনও দেরি আছে। তাঁহার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহাতে এতদিন থাকা সম্ভব নয়। তিনি আসিয়া বিদেশে পড়িয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার সম্পূর্ণ দখল ছিল। এই ধ্যানপরায়ণ হিন্দু আমেরিকার এই মহাকর্ম্ম-স্রোতসমাকুল নগরে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া একটু বিব্রত হইলেন। তাঁহার বয়স তখন সবে ত্রিশ, আর তিনি সংসারের ব্যাপারে একবারে অনভিজ্ঞ। তিনি ভাবিলেন, যদি সত্যই এখানে আমি ভগবানের কার্য্যে আসিয়া থাকি, তবে তিনিই আমার ভার গ্রহণ করিবেন। অপরের পক্ষে এরূপ অবস্থায় পড়া মহা অসমসাহসিকের কার্য্য হইত কিন্তু তিনি আর নিজের সম্বন্ধে কিছুই ভাবিলেন না। বাস্তবিক তাঁহার এই বিশ্বাসের ফল ফলিল যাঁহারা তাঁহাকে একেবারে জানিতেন না, এমন সকল লোক তাঁহার বন্ধু হইলেন, সেই প্রতিভাশালী বৈদেশিকের একেবারে অনুগত হইয়া পড়িলেন। সেই সকল ব্যক্তি আপনাদের বাড়ীতে তাঁহাকে বাড়ীর ছেলের মত রাখিলেন। স্বামীজিও তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই পূর্ব্ব বন্ধুগণকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহাকে জানিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত, আর তাঁহাকে বিশেষরূপ জানিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইত।

চিকাগোর ধর্ম্মসভায় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে তিনি যে এক মুহূর্ত্তে অদ্ভুতরূপে মুগ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানে, সুতরাং তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। সহস্র সহস্র

লোক তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রত্যেক কথা আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিল।

আমেরিকায় অনেক কোম্পানি আছে, তাহারা কোন বক্তাকে যোগাড় করিয়া বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। বক্তৃতায় লভ্যাংশ তাহারা বক্তার সহিত চুক্তিমত ভাগ করিয়া লয়। এইরূপ একটী বক্তৃতা কোম্পানী ধর্মসভা শেষ হইলে তাঁহাকে যোগাড় করিয়া আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বক্তৃতা প্রদান তাঁহার বেশী দিন ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিলেন, এরূপ ভাবে বক্তৃতা প্রদান আমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার জীবন কেবল 'বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ধর্ম্ম' শিক্ষা দিবার জন্য, সুতরাং একজন উচ্চ বক্তার প্রথম নিজশক্তির বিকাশ দর্শনে যে একটু আনন্দ হয়, সেই টুকু সম্ভোগ করিয়া তার পর আর শ্রোতৃবৃন্দের হাততালির তোয়াক্কা রাখিতেন না। লোকে তাঁহার প্রতিভার সুখ্যাতি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যে সত্য দিবার জন্য ব্যাকুল, লোকের তাহার প্রতি আগ্রহ ছিল না। সুতরাং তিনি অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঐ বক্তৃতা কোম্পানির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন ও প্রকৃত সত্যপিপাসুদের জন্য ক্লাস করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যভূমি হইতে বন্ধুগণ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। কয়েকটী বাটীতে বক্তৃতা দিয়া তিনি সামাজিক জীবনের সহিত সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিলেন ও যথার্থভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রুকলিন নৈতিক সমিতিতে তাঁহার উপর্য্যুপরি কয়েকটী বক্তৃতা হয়। তাহাতে অনেক প্রকৃত আগ্রহবান লোকের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৫ সালের প্রথম ভাগে তাঁহার নিউইয়র্কের কার্য্য বাঁধিমত প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে।

তাঁহার ক্লাসে অনেকে আসিত, ইহাদের মধ্যে কয়েকটী তাঁহার শিষ্য হইল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১২ জন তাঁহার সহিত সহস্রদ্বীপোদ্যান নামক নিউইয়র্কের নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বীপে যাইলেন, সেখানে ১॥ মাসের উপর (৭ সপ্তাহ) থাকা হইল। এই সময় তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যহ শিক্ষা দিতেন। বিশেষতঃ তাহারা তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনে মিশিবার ও তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও সরলতা দেখিবার অনুপম সুযোগ পাইয়াছিল।

ইহার পর তিনি লণ্ডনে যাইলেন, সেখানে বেদান্তানুরাগী এক ভদ্রলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ন্যায় এখানেও তিনি বেদান্ত

প্রচারের প্রথম উদ্যমেই সফলকাম হইলেন। এখানেও তিনি অনেক প্রৌঢ় স্ত্রীর সমক্ষে বক্তৃতা ও বিশেষ উপদেশ দিবার জন্ত ক্লাস করিতে লাগিলেন। এই আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমুদয় কার্য্য স্বামীজি পয়সা না লইয়াই করিয়াছিলেন, কেবল নিজের ভরণপোষণোপযোগী কিছু লইতেন। তাঁহার কার্য্যের বিনিময়ে তিনি কোন উপহার লইতেন না। কেবল কয়েকটী মাত্র "ব্যবহারিক" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে পয়সা লইয়াছিলেন। হিন্দু প্রাণে প্রাণে বুঝেন, ধর্ম্ম বিক্রয়ের বস্তু নহে।

১৮৯৫ এর শেষ ভাগে বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও প্রায় প্রত্যহই ক্লাস করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবার বক্তৃতা দিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বন্ধুগণ একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার বক্তৃতাসমূহ প্রকাশিত হইতে পাইয়াছে। বোষ্টন, চিকাগো ও অন্যান্ত সহরে বক্তৃতা করিবার পর ১৮৯৬ এর মার্চ্চে ইংলণ্ডে গিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন ও ঐ সালের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এবার কার্য্য করিলেন। তাঁহার প্রচার উত্তরোত্তর অধিক হইতে লাগিল। তখন তিনি ভারতে প্রত্যাগত হইলেন। সেখানে তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল, বর্ত্তমান কালে ভারতে সেরূপ দেখা যায় না। তিনি দক্ষিণে কলম্বো হইতে উত্তরে আলমোড়া পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বড় সহরে বক্তৃতা দিলেন।

ভারতে কঠিন পরিশ্রম করিয়া স্বামীজির শরীর ভগ্ন হইল। তাঁহার বন্ধুগণ স্বাস্থ্যের জন্ত তাঁহাকে সমুদ্রযাত্রা করিতে পরামর্শ দিল। তিনি লণ্ডন হইয়া দ্বিতীয় বার যুক্তরাজ্যে আসিলেন। শরীর একটু ভাল হইতেই আবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এবার তাঁহার কার্য্য প্রশান্তমহাসাগরোপকূলে (ক্যালিফোর্ণিয়ায়) হইল। সেখানে ১৯০০ সালের জুন পর্য্যন্ত থাকিয়া ফের নিউইয়র্কে আসিলেন। এখানে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়া প্যারিস প্রদর্শনীতে যাইলেন। সেখানকার ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিতে তিনি আহূত হইয়াছিলেন।

১৯০০ সালের শেষভাগে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আবার তথায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি দেশের নানা স্থানে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। সকলের সহিত সামঞ্জস্য ও অবিরোধই শ্রীরামকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ছিল।

তিনি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রাণপণে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি মানুষকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কেবল সেই এক পরমেশ্বরের নিকট যাইবার পৃথক্ পৃথক্ পথমাত্র বাস্তবিক উহারা যেন সেই এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকাশ, উহা কোন বিশেষ জাতির সম্পত্তি নহে, উহা অনাদি অনন্ত। মানুষ যে ঈশ্বরকে কোন না কোন রূপে অনুভব করিয়াছে, এই ধর্ম্মগুলি তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে মাত্র।

অত্যধিক কার্য্যবশতঃ এই বর্ষের প্রথম ভাগে তাঁহার স্বাস্থ্য আবার ভগ্ন হয় ও তাঁহাকে একেবারে সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সকল বন্ধুগণেরই বিশ্বাস ছিল, তিনি নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিবেন, এদিকে হঠাৎ গত ৪ঠা জুলাই তিনি শরীর ত্যাগ করিলেন ও মর্ত্ত্য লোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যু অপূর্ব্ব। যে অপূর্ব্ব জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন, উহা তাহার উপযুক্ত উপসংহার,— আর যে অদ্ভুত বেদান্তদর্শন তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন ও প্রকৃতভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত অপূর্ব্ব রূপে সঙ্গত।

জগতের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের শরীর ত্যাগে এক মহারত্ন হারাইয়াছি মনে করিবেন—ভারতের পক্ষে তাঁহার অভাব কতদূর অধিক, তাহা বলা যায় না। ভারতে তাঁহার কার্য্য কতদূর বিস্তৃত, এখানকার সাধারণে তাহা জানে না এবং হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের বন্ধু ও ভক্তগণ তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবপূর্ণ জীবনের সমাপ্তিতে পরম দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শুধু ভারতে নয়, প্রায় সমগ্রজগতে এমন অনেক নর নারী দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাঁহাদের জীবন, চিন্তা, চরিত্র, সমুদয় এই মহাত্মার উপদেশে উন্নত হইয়াছে। তাঁহারা ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সুতরাং তাঁহার দেহত্যাগে যে ইঁহারা গভীর শোকার্ত্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? জগৎ হইতে এক মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন, সুতরাং জগৎ দরিদ্র হইল। তিনি অতি মহান জীবন যাপন করিয়াছিলেন ও তাঁহার পশ্চাতে অনেক শোকার্ত্ত হৃদয় রাখিয়া গেলেন।

প্যালেষ্টাইন ভ্রমণবৃত্তান্ত।

জাফাবন্দর।

(বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত।)

সুয়েজ ক্যানালের অপর প্রান্তে পোর্টসাইদ নামে সহর অবস্থিত আছে। ইহা সুয়েজ ক্যানাল ও ভূমধ্যসাগরের সঙ্গম স্থান এবং সুয়েজ ক্যানাল হইতে ৯৭ মাইল দূর। ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় এই সহর হইতে জাহাজ আরোহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ভূমধ্যসাগরে চলিতে লাগিলাম। পরদিন ১০ ঘটিকার সময় স্থান নির্ণয় করিতে পারা গেল। দিগ্‌দর্শনে জাহাজের সমস্ত লোক প্রীত হইয়া উঠিল ও উচ্চৈঃ-স্বরে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। অবশেষে অল্পে অল্পে জাহাজ কিনা-রার নিকট চলিয়া প্রায় ২ মাইল দূরে লঙ্গর নিক্ষেপ করিল। যত বন্দর আছে, প্রায় সকলের অপেক্ষা জাফা বন্দর অতি দুর্গম। সমুদ্র কূলের অনতিদূরে জলনিমগ্ন অনেক শৈল থাকায় জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে না। ভূমধ্যসাগর হইতে প্রবলবেগে বাত্যা আসিয়া এই স্থানের সমস্ত জলরাশিকে আলোড়িত করিয়া তোলে। নাবিকদিগের এই স্থানে নিতান্ত শঙ্কার উদয় হয়। আরোহীদিগের কূলে যাইবার নিমিত্ত প্রায় দ্বাদশ ক্ষেপনী সংযুক্ত নৌকা আসিয়া লইয়া যাইয়া থাকে। নাবিকগণ নিতান্ত বলিষ্ঠ ও কর্ম্মদক্ষ, নতুবা অপর পোতবাহক এই স্থানে সম্ভবতঃ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইত না।

জাফা সহর পূর্ব্বকালে জপ্পা নামে অভিহিত ছিল। ইহা পূর্ব্বতন ইহুদীরাজ্যের প্রধান বন্দর। কথিত আছে, জোনা বা ইউনিস্ এই স্থান হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়া অবশেষে নিনিভা নগরে উপনীত হন। জোনা এক জন ইহুদী Prophet. বা নবী (ঈশ্বরমনোনীত প্রচারক)।

নৌকা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে সহরে প্রবেশ করিলাম ও নানাবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বালুকাসংযুক্ত সমুদ্র তটে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অপর্য্যাপ্ত কমলা লেবু হয়। এই লেবু

দুই প্রকার, একের নাম বর্ত্তুগাল, অপরের নাম লিমুনহেলু। বর্ত্তুগাল শব্দ পর্ত্তুগাল শব্দের অপভ্রংশ। সাধারণ আরবেরা প উচ্চারণ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত প স্থানে ব দিয়া থাকে। যথা, (তুর্কী) পাশা (আরবী) বাশা। মুর রাজত্বের সময় পর্ত্তুগাল হইতে এই ফল এই স্থানে আনীত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ইহা বর্ত্তুগাল নামে কথিত হইয়া থাকে।

লিমুন হেলুর ছাল অতিশয় পাতলা, উহার অভ্যন্তর দেশ সাধারণ কমলা লেবুর ন্যায় পরিষ্কার কোষেতে বিভক্ত নহে। এই দুই প্রকার লেবুর মধ্যে বর্ত্তুগাল নাগপুরী সাস্তারা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বড়। কিন্তু সুস্বাদ ও সুগন্ধ বিষয়ে শ্রীহট্টের কমলা লেবুর কোন অংশই সমকক্ষ হইতে পারে না। লিমুন হেলু, (যাহা কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল ও সকলেই নিতান্ত অনিচ্ছায় মুখে দিয়াছিল) মিষ্ট, কিন্তু সুগন্ধি বা সুস্বাদু নহে। হেলু শব্দের অর্থ মিষ্ট, ইহা হইতেই আমাদের হালুয়া কথার উৎপত্তি। এই স্থানে দাড়িম (আরবী—রোমান) হয়, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নহে। প্রাচীনকালে ইহা রুম বা কনষ্টান্টিনোপল হইতে আসিয়াছিল। ইহা ডামাস্কাস ও ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী দাড়িম্বের কোন মতেই তুল্য নহে। জাফা সহর ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তরমুজ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে, উহা সুস্বাদু। আরবী ভাষায় উহাকে বাত্তিক বলিয়া থাকে। পারস্য ভাষায় হিন্দেওয়ানা। গেজা সহরের তরমুজ প্রসিদ্ধ। দ্রাক্ষা (আনব) ও অন্যান্য অনেক প্রকার ফল সহরে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দূর হইতে আসে। খরমুজাও (আরবী ভাষায় শামাম) পাওয়া যায়, কিন্তু ইস্পাহানের গোরগাব গ্রামের খরমুজার ন্যায় সুস্বাদু খরমুজা কুত্রাপি হয় না। পারস্য ভাষায় ইহাকে খরবুজা বলে।

সহর দেখিতে দেখিতে অবশেষে কিঞ্চিৎ শ্রান্তি বোধ করিলাম এবং অবশেষে এক কাওয়েখানা সমুদ্রের নিকট ছিল, তথায় গিয়া বসিলাম এবং কাফি ও চা পান করিতে লাগিলাম। কাফি প্রস্তুত করিবার প্রথা এ দেশে স্বতন্ত্র। ছোট টিন বা পিত্তলের পাত্রে একটী হাতল আছে। ইহাতে তিন ভাগ জল ও এক ভাগ কফিচূর্ণ দিয়া থাকে। অল্প উত্তাপ সংযুক্ত আগুনের উপর ইহাকে বসাইয়া দেয় এবং কিঞ্চিৎ-

মাত্র বুদ্‌বুদ উঠিলেই নামাইয়া লয়। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা হইলে কখন কখন ইহাতে শর্করাও দিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ দেয় না। তাহার পর ছোট ছোট দুটী বাটি যাহাতে দু কাঁচ্চা আন্দাজ ধরে, (Eggshell) তাহাদের প্রথম বাটীতে কিঞ্চিৎ উপরকার তরলাংশ ঢালিয়া দেয়, বাকিটা অপরবাটী পূর্ণ করিয়া ঢালে। শেষে তলানিটা সমস্ত প্রথম বাটিতে ঢালিয়া দিয়া উভয় বাটীর কফির সমান গাঢ়তা সাধন করে। কফি দিবার প্রণালী এইরূপ,—একটী ছোট থালায় এক গ্লাস স্বচ্ছ ও শীতল জল ও এক বাটি কফি। খাইবার নিয়ম, প্রথমে জল কিঞ্চিৎ পান করিয়া পরে কফির উপরকার তরলাংশ পান করা ও কফিটা পরিত্যাগ করা। ফরাসী দেশীয় কোনিযাক সংযুক্ত কফি বা দুগ্ধ সংযুক্ত ইংরাজী কফি এ দেশে প্রচলিত নাই। যদিও ইহারা একবারে অতি অল্প পরিমাণে কফি খাইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত দিনে অন্ততঃ ২৫।৩০ বার খাইয়া থাকে। কফিচূর্ণ করিবার প্রণালী এই,-প্রথমতঃ কফিবীজ,যাহাকে আরবী ভাষায় বুন কহে, এক বড় হাতাতে আগুনের উপর ভাজিয়া লয় ও অবিলম্বে তাহাকে উদুখলে পেষণ করিয়া ফেলে। কফি গুঁড়াইবার মেশিন বেশী চলিত নাই।

চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইহাদের এইরূপ। ধাতু বা চিনেমাটির পাত্রে জল শুদ্ধ চা সিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ কালির মত করিয়া ফেলে। দেবার সময় কাঁচের গ্লাসে অল্প পরিমাণে এই চা দিয়া তাহাতে খানিক গরম জল ঢালিয়া দেয় ও শর্করা একটী পাত্রে করিয়া দেয়। যিনি পান করিবেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত মিলাইয়া লন। দুগ্ধ দেওয়া প্রচলিত নাই। বাটীতে পান করিবার প্রথাও প্রচলিত নাই। এখানে লোকে চা বড় খায় না, চা খাইতে হইলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি চা বা কফি পান না করিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে কাঁচের গ্লাসে তাহাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও ক্ষুদ্র দুই টুকরা বরফির ন্যায় (ইংরাজীতে ইহাকে **Turkish Delight** বলিয়া থাকে) মিষ্টান্ন দিয়া থাকে। তাহার পর প্রত্যেকে আপন আপন জেব হইতে তামাক বাহির করিয়া সিগারেট প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। সংগতিপন্ন লোকেরা হুঁকায় তামাক খাইয়া থাকে। কফিহাউস প্রায়ই সমুদ্রের তীরে হইয়া থাকে। লোকে একটী ছোট টুল বা চেয়ারের উপর বসিয়া চা বা কফি সমুদ্র-

তীরে লইয়া গিয়া পান করিয়া থাকে। আর হুঁকা এদেশে একটু বিশেষ রকমের হইয়া থাকে। ইহা বেলওয়ারী কাচের নির্ম্মিত ও ইহাতে কাষ্ঠের নলের জায়গায় দুইটী পিতলের নল থাকে ও তাহার মুখে একটী সটকা থাকে। ঐ কাচ পাত্রের ভিতর নলের সহিত কতকগুলি ঝিনুক দিয়া থাকে, ধূমপানের সময় যখন ঝিনুক গুলি লাফাইতে থাকে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। কল্‌কে অতিশয় ক্ষুদ্র. শুকনো দোকতা জলে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিয়া তাহার উপর আগুন দিয়া তাহাতে তামাকের কায করে। তামাকও অতি অল্প করিয়া দেওয়ায় একজন লোকের বেশী এক হুঁকায় খাইতে পারে না। হুঁকায় তামাক খাওয়া সচরাচর সাধারণ লোক পারে না। ডেভিড ডি টোব্যাক্‌ নামক ফরাসী কোম্পানীর সমস্ত তামাক ইজারা হওয়ায় এখানে তামাক মহার্ঘ্য। তামাক দেবার সময় প্রত্যেক বার হুঁকা পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া দেয়। পারস্য দেশের ন্যায় মাটির হুঁকা এদেশে প্রচলিত নাই। কাইরো বা কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি বড় বড় সহরে যে প্রকার সুসজ্জিত, সুরম্য কফিহাউস, এখানে সে প্রকার নহে। সামান্য গৃহ, অনেক সময় অপরিষ্কার, তাহাতে কফির দোকান করিয়া থাকে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানকার আহারাদির বিষয় কথিত হইতেছে। এখানে সাধারণ লোকে প্রাতে দুগ্ধ বা ঘোল দিয়া রুটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাইয়া কর্ম্মে বাহির হয় ও দ্বাদশ ঘটিকার পর পুরা আহার করিয়া থাকে। আহারের অনেকগুলি দোকান আছে। দোকানে তরকারি সাধারণতঃ দুই প্রকার থাকে। সিমের বিচি [আরবি-ফাসুলিয়া] সিদ্ধ করিয়া রাখে ও তাহাতে জলপাইএর তেল ও কিঞ্চিৎ লবন মিশ্রিত করিয়া দেয়। ইহা দেখিতে গোল, অনেকটা পয়সার ন্যায়। ইহা সিদ্ধ করিতে অধিক সময় আবশ্যক হয়। ডামস্কস বা শ্যাম প্রদেশে ইহা অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। অপর তরকারী মটরসিদ্ধ। ইহা সবার আকৃতি মৃণ্ময় পাত্রে এক কাষ্ঠের মুষল দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া প্রায় চন্দনাকৃতি করিয়া থাকে। তাহাতে চিনের বাদাম দুই চারিটী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ ও কাল মরিচ দেয়। ইচ্ছানুসারে কোন কোন ব্যক্তি তাহাতে জৈতুন বা জলপাইএর তেল বা ঘৃত গরম করিয়া দিয়া থাকে।

কোন কোন দোকানে মাংসের সিক কাবাব বিক্রয় হয়। অনেক সময় ইহারা সিমের বিচির ন্যায় এক প্রকার ফল জলে ভিজাইয়া খাইয়া থাকে।

ইহা দেখিতে মটর ভিজানর ন্যায়, কিন্তু তাহার আস্বাদন কিঞ্চিৎ তিক্ত।

*সাধারণ লোকের আহার রুটি। সচরাচর তিন প্রকার রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। এক রকমের নাম আরবী ভাষায় খুবুজ, ইহার ব্যাস প্রায় ৬ ইঞ্চি ও ইহার মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ চাপা; ইহা গরিব লোকের ব্যবহার্য্য। ২য় প্রকার রগীভ। ইহা খাইতে সুস্বাদু ও উত্তম। ইহার ব্যাস প্রায় আট ইঞ্চি, ইহা বেলুন দিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে, ফুরুন বা Oven এর ভিতর হইতে বাহির হইলে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু চারিদিকে জোড়া থাকে। ইহার উপরিভাগ অতি মসৃণ। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ময়দায় তৈয়ারি হয়। তৃতীয় প্রকার রুটির নাম শমুন, ইহা এখানকার পাউরুটিমাত্র। তুর্কী ভাষায় রুটিকে একম্যাক কহিয়া থাকে। সিপাইগণ এক প্রকার সরকারী রুটি পাইয়া থাকে। তাহা সর্ব্ব প্রকার শস্যচূর্ণে নির্ম্মিত হয়। পাঁউরুটির ন্যায় ইহার আকৃতি, কিন্তু ইহা অতিশয় শক্ত। সাধারণ লোকের পেটে ইহা সহ্য হয় না।

তণ্ডুল এদেশে নিতান্তই মহার্ঘ্য। পলান্ন খাইতে ইচ্ছা হইলে সাধারণ লোকে বোরগোল খাইয়া থাকে। বোরগোল দুই প্রকার। প্রথম প্রকার এই, আটাতে জল মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট সাগুদানার ন্যায় গুলি করিয়া থাকে। গোধূমকে ভাঙ্গিয়া তিন অংশ করিলে অপর প্রকার বোরগোল হইয়া থাকে। উহা মাংস ও ঘৃত দিয়া পাক করে। নিতান্ত সঙ্গতিপন্ন লোক হইলে তণ্ডুলের পলান্ন করিয়া থাকে। এক সময় শ্যাম বা ড্যামস্কস সহরের কোন ব্যক্তিকে বর্ত্তমান লেখক কহিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সকল লোকেই চাল খাইয়া থাকে এবং দুইবার করিয়া খায়। সে ব্যক্তি কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিল না। দৈবক্রমে সেই সময়ে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, সে এক সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকের অন্ন ভক্ষণ বিষয়ে ইহাকে শপথের সহিত সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইল। তাহাতে অপর ব্যক্তি নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া উপর দিকে মুখ করিয়া বলিল, হে ভগবান! ভারতবাসীকে তুমি এমন স্থান দিয়াছ যে, তাহারা দুইবার তণ্ডুল প্রত্যহ খাইয়া থাকে।

পলান্ন রাঁধিবার নিয়ম এই,— হাঁড়িতে প্রথমে মাংসের কিমা করিয়া দেয় ও তার পর বোরগোল বা তণ্ডুল দেয় ও অল্প পরিমাণে লবণ ও কেশর

(জাফরান) দিয়া থাকে। লঙ্কা (ফিলফিল) বা হরিদ্রা (কোরকোম) সেখানে একেবারে প্রচলিত নাই। ইচ্ছা হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোলমরিচ দিয়া থাকে। তাহার পর অপর্য্যাপ্ত ঘৃত ঢালিয়া দোকানে ফুরুণের ভিতর দিয়া আসে। তাহার পর এক প্রকাণ্ড থালিতে সমস্ত হাঁড়ি উল্‌টাইয়া দেয়। তাহাতে কিমা উপরে থাকে, তণ্ডুল নীচে হইয়া যায়। ছোট ছোট এক প্রকার লাউ হইয়া থাকে, তাহার ভিতর হইতে বীজ বাহির করিয়া তাহার ভিতর তণ্ডুল ও মাংসের কিমা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয় ও দধি সংযুক্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। ইহা তাহাদের এক সুখাদ্য। কুনাফা ও বাকলাওয়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া যায়,কিন্তু সচরাচর নয়। এসম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। সম্প্রতি সঙ্গতিপন্ন লোকের ভিতর তুর্কি খাওয়া ও নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। জাফা ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ঘাস থাকাতে দুম্বা ভেড়া অপর্য্যাপ্ত আছে। ইহাদের মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অপর মাংস বা মৎস্য খাওয়া প্রচলিত নাই। গোমাংস খাওয়া এখানকার প্রথা নহে।

কাপড়।—সাধারণ লোকে পশমের ঢিলা পায়জামা পরে। ইহা নীচে সরু, উপরে মোটা। জামা বক্ষঃস্থলে দুফর্দা (Double-breast) কটিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অবস্থা হিসাবে কেহ কেহ কোমরে শাল বা পশমের কাপড় জড়াইয়া থাকে। মস্তকে ফেজ (তুর্কী) বা তরবুশ (আরবী)—অর্থাৎ টুপী, পায়ে দিশী নাগোরা জুতা পরে। দোকানদার ও মধ্যবিত্ত লোকেরা পায়-জামা ও জবুন পরে। জবুন পুরাতন চাপকানের ন্যায়। মাথায় তরবুশের উপর রেশমের রুমাল পরিলে দোকানদার, সাদা কাপড় বাঁধিলে মোল্লা ও লাল কাপড় বাঁধিলে সৈয়দ (মহম্মদের বংশধর) বুঝায়। ইহারাও কটিদেশে পূর্ব্ববৎ লাল বা রেশমী কাপড় জড়াইয়া থাকে। সঙ্গতিপন্ন ও সরকারী কর্ম্মচারীরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে, কিন্তু মাথায় লাল ফেজ বা তরবুশ পরিয়া থাকে। পরিচ্ছদ বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানের কোন প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিতরে ঘাগরা ও উপরে নীলরঙের ওড়না পরে, ইহা রেশমেরই প্রায় হইয়া থাকে। উহাতে তাহাদের মাথা ঢাকা থাকে, ইহা গলার নিকট বদ্ধ, কিন্তু হাত দুটী খোলা থাকে। কটিদেশে ইহা দড়ি দ্বারা বাঁধা থাকে।

মাল্‌টা দ্বীপের ও গ্রীসদেশীয় স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদও এইরূপ। মুখের উপর একটা বোরকা অর্থাৎ সাদা ঢাকনি থাকে, কথা কহিবার সময় ইহা

মাথায় তুলিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরাও জুতা পরিয়া থাকে। মোল্লারা ডবল জুতা পরিয়া থাকে। ভিতরে গোড়ালিহীন বুট ও বাহিরে গোড়ালিযুক্ত। Grecian Slipper এর ন্যায়। উহার পিছন দিকে একটি লাল পিত্তলের পেরেক থাকে। ইহা দ্বারা বোধ হয় জুতা খুলিবার সুবিধা হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক স্তাম্বুলি (তুর্কী) প্রথা। এখানে সাধারণ লোকে সকলেই দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। বৃদ্ধ বা মোল্লারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দাড়ি রাখিয়া থাকে। হিন্দী (ভারতবর্ষীয়) মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখিবার প্রথা নাই।

কফি খাইতে খাইতে সহসা নেপোলিয়নের কথা মনে উদয় হইল ও বন্দীদিগকে কোথায় হত্যা করিয়াছিল, জানিতে উৎসুক হইলাম। ক্রমে ইংরেজী অভিজ্ঞ লোকের সহিত আলাপ করিলাম ও বোডেগারের গাইডবুকে গাইডবুক অনুসারে স্থান নির্ণয় করিতে লাগিলাম। কফিখানার অনতিদূরে প্রস্তরনির্ম্মিত এক *পুরাতন দুর্গ দেখিলাম, ইহাই আমার দ্রষ্টব্য স্থান। এই স্থান একণে* ভগ্নপ্রায়। সম্প্রতি বন্দীদিগকে এই স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা হয়। নেপোলিয়ান যখন সিরিয়া জয় করিতে গিয়াছিলেন, তখন বন্দীদিগকে এইস্থানে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর সরাই বা আদালত দেখিতে গেলাম। ইহা দ্বিতল অট্টালিকা ও আধুনিক নিয়মে প্রস্তুত। অভ্যন্তরের আসবাব অতি পরিষ্কার। টেবিল, চেয়ার ও একটী করিয়া সোফা বা দিওয়ান আছে। সহরের অপরাপর বাটী অত পরিষ্কার নহে। নূতন কয়খানি বাটী দেখিলাম। প্রায় সকলগুলিই আরব খ্রীষ্টিয়ানের বাসস্থান। এইগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। সহরের পুরাতন অংশ অতি অপরিষ্কার ও ভগ্নপ্রায়। জেরুসালেম বা অন্য সহরের ন্যায় রাস্তার উপর **Arcade** বা খিলান নাই। রাস্তা প্রায় ইষ্টকাকৃতি চতুষ্কোণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ও জল যাইবার নিমিত্ত মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ নিম্ন। উভয় পার্শ্বে বাটী প্রস্তরনির্ম্মিত। সম্মুখে খিলান করা, কিন্তু ইহা একটু নূতন রকমের, **Gothic** (যেমন গির্জাসকলের) **Saracenic** (যেমন তাজমহলের বা মসজিদের) বা **Roman** (যেমন কলিকাতার জেনারল পোষ্টাফিসের) খিলানের ভিতর আসেনা। নিকটবর্ত্তী দেশে কাষ্ঠ থাকায় ইহারা কাষ্ঠের ছাদ করিয়া থাকে। কয়েকটী গৃহ কলিকাতার সাধারণ বাটীর অনুকরণে নির্ম্মিত। কাষ্ঠ গুলি কড়ির আকারে দেয় না। কাষ্ঠের রলা ও তাহার শাখা দিয়া মৃত্তিকা ও খড় বা মৃত্তিকা ও খোয়া লেপিয়া দেয়। পুরাতন

গুটিদুই মসজিদ আছে। তাহার মধ্যে একটী অতিশয় পুরাতন ও ভগ্নপ্রায়,কিন্তু ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য। দোকান গুলি আমাদের দেশের মুদিখানার দোকানের মত।

আসবাব। — সাধারণ লোকে মাটীতে একটা কাপড় চোপড় যা হয় পাতিয়া বসে। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তুর্কী নিয়মে টেবিল চেয়ার ব্যবহার করে।

বাণিজ্য [রপ্তানি] এখান হইতে সাধারণতঃ কমলালেবু, লিমুন হেলু, অল্পপরিমাণে গম, যব, খরমুজা [বা সামাম] তরমুজ [বাত্তিক] আঙ্গুর [আনব] সাবান (চতুষ্কোণ, চুণ ও চর্ব্বিজমান) মিশর দেশে গিয়া থাকে। দ্রব্য জেরুসালেমে বা পোর্ট সাইডে আসিয়া থাকে।

[আমদানি]— কার্পাসবস্ত্র, দিয়াশালাই, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি এবং কলে প্রস্তুত পশমের কাপড় ইউরোপ হইতে আসিয়া থাকে। যদি ভারতবর্ষ হইতে চাউল, তেঁতুল, সিমের বিচি, মসুর ভিন্ন অপর দাল, সুগন্ধি দ্রব্য, গুড় বা চিনি, চা, জুতা প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়, তবে লাভ হইবার খুব সম্ভব।

এখানকার লোক সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০০০০। মুসলমান এ সহরে বেশী, খ্রীষ্টিয়ান কম, ইহুদী অতি অল্প। ইহুদীদিগের বিশেষ কার্য্য পোদ্দারী [সর্‌রাফি] অর্থাৎ টাকা লইয়া পয়সা বদল করা [**Money-Changer**] কারণ, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানের একার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বিদ্যার চর্চ্চা এখানে খুব কম। মুসলমানেরা প্রায় মসজিদে গিয়া মোল্লাদের নিকট সামান্য পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে।

আমীর আবদুর রহমান বিতাড়িত অনেক আফগান জাফা ও জেরুসালেম প্রভৃতি অনেক স্থানে বাস করে। সমগ্র সংখ্যা ন্যূনাধিক ২০০০০ হইবে। কয়েকটী আফগান জাফাতে দোকান করিয়াছে। ইহারা কিঞ্চিৎ সঙ্গতিপন্ন।

জাফা সহর গরম, এখানে বরফ কখন পড়েনা। সহরের কর্ম্মচারী খালদিয়া প্রায় হইয়া থাকে। ইহারা সিরিয়াবিজেতা খালিদবিনওয়ালিদের বংশধর। মহম্মদ এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য আবুবকরের সময় ইনি সেনাপতি ছিলেন ও মুসলমানদের পক্ষে অনেক যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। পারস্যদেশ জয় কালে ইনি অতিশয় নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছিলেন। বোগদাদের নিকট এক খাল ইঁহার নিষ্ঠুরতায় শত্রুশোণিতে পূর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, জাফের বারমাকি (হারুন অল রসিদের প্রধান মন্ত্রী) ইঁহার বংশধর ছিল। ওমর ইবিন

খাত্তাবের [দ্বিতীয় খলিফা] খেলাফৎ [শাসন] কালে খালিদকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া হোম্‌স সহরে[বর্ত্তমান আলিপ্পোর নিকট] প্রাণত্যাগ করেন, তথায় তাঁহার সমাধি আছে। খালিদ যদিও নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও নির্দ্দয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা সম্প্রতি বিদ্যা, অর্থ, মান, সৌজন্য সর্ব্ববিষয়ে প্রধান। তুর্কিদেশে সকলকেই বাধ্য হইয়া সিপাই হইতে হয়, কিন্তু খালিদের বংশ এবিষয়ে মুক্ত। জাফা জেরুসালেম প্রভৃতি সহরে শাসনভার খালিদবংশীয়দের হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহাদের ভিতর অনেকে ফ্রিমেসন হইয়াছে। মিসরের তুর্কিক পাসা ফ্রিমেসনদের **Grand Master** [দলপতি] হওয়ায় ইহারা মুসলমান হইয়াও প্রকাশ্যে ফ্রিমেসন হইয়া থাকে। সম্প্রতি অপর এক সম্প্রদায় উঠিয়াছে। সেক জামালুদ্দীন আফগানি নামক একব্যক্তি কান্দাহারে জন্ম গ্রহণ করেন ও লাহোরে বিদ্যাভ্যাস করেন। ইনি ফরাসী প্রভৃতি নানাভাষাবিৎ ও নানাবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। *জনপ্রবাদ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে সুলতান ইঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া* মারিয়া ফেলেন। এ সম্প্রদায়ের মত অপরাপর মুসলমান সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ইঁহারা বলেন, মহম্মদই যে শেষ নবী [**Prophet**] তাহা নহে, অপরেও হইতে পারেন ও হইবেন। অন্যান্য মতেও অনেক পার্থক্য আছে। ইহারা মসজিদে যাওয়া ও নমাজের সময় নানাঅঙ্গভঙ্গী করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করে না। খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে ইহাদের প্রকাশ্যতঃ খাইতে আপত্তি নাই। সম্প্রতি খালদিরা ও অপরাপর কয়েকটি প্রধানবংশ জামালুদ্দীনের মতাবলম্বী হইয়াছে। জামালুদ্দীন সর্ব্বদা সেথানে বসিতেন, সেথানে একটি টেবিলের উপর কাষ্ঠের হাতী রাখিয়া বসিতেন।

মুদ্রা। প্রচলিত পয়সা মাতালিক [**Metallic**] ; ইহা নিকেলের নির্ম্মিত ও পাতলা, ভারতবর্ষীয় দু-পয়সার হিসাব। নাহাসিন, নাহাস অর্থাৎ তাম্র হইতে প্রস্তুত। ইহা আধ পয়সার ন্যায়, কিন্তু পাতলা। পাঁচ নাহাসিনে এক মাতালিক। কবক [তামার] ডবল পয়সার ন্যায়। পূর্ব্বে ২ মাতালিকে এক কবক হইত, সম্প্রতি ১॥ কবকে ১ মাতালিক। ১০ মাতালিকে এক বেসলিক হয়। ইহা নিকেলনির্ম্মিত ও পাতলা। ইহার ব্যাস ১¼ইঞ্চি। রৌপ্য মুদ্রার নাম ক্রুশ (**piaster**) ইহা দুয়ানি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ৪ মাতালিকে একক্রুশ, ভারতীয় ১০পয়সার হিসাব। ইউরোপীয় ফ্রাঙ্ক মুদ্রাকে এদেশে রুবামজিদি কহিয়া থাকে। ৪ রুবামজিদিতে এক মজিদি হয়। সম্প্রতি মজিদির মূল্য ২॥০ টাকা,

ইহা স্থলতান আবতুল মজিদের নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু দেশে নগদ মুদ্রার অতিশয় অভাব, এইজন্য প্রায় প্রত্যহ দর বদল হইয়া থাকে। স্ত্রী-লোকেরা মাতালিকে একটী ছিদ্র করিয়া অলঙ্কার করিয়া পরিয়া থাকে ও আবশ্যক হইলে বিক্রয় করিয়া থাকে। স্বর্ণমুদ্রাকে ইহারা লিরা কহিয়া থাকে। ইহার মূল্য ইংরাজী পাউণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। মুসলমানধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ বলিয়া এইসকল মুদ্রা ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট ষ্টাম্পের উপর দৌলত আলি ওসমানলি বা মহান ওসমান সাম্রাজ্য লেখা ও স্থলতানের নাম ও সাল থাকে, কোনরূপ মূর্ত্তি থাকে না।

জাফাসহর —ডামস্কসের ভালি বা গবর্ণরের অধীন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত
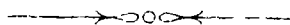
(শ্রীম—কথিত)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত অধর লাল সেনের বাড়ীতে
ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায
ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ ঠাকুর অধরের বাড়ী আসিয়াছেন, ২২শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা ৪র্থী তিথি, শনিবার, ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খৃঃ অঃ। ঠাকুর পুষ্যা-নক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

অধর ভারি ভক্ত, তিনি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্‌। বয়ঃক্রম ২৯।৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন। অধরেরও কি ভক্তি। সমস্ত দিন আফিসের খাটুনির পর, মুখে ও হাতে একটু জল দিয়াই প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ী শোভাবাজার বেণেটোলা। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে ঠাকুরের কাছে গাড়ী করিয়া যাইতেন। এইরূপে প্রত্যহ ২।৩ টাকা গাড়ী ভাড়া দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবেন, এমন সুবিধা প্রায়ই হইত না। পৌঁছি-য়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন, কুশল প্রশ্নাদির পর মেজেতে মাদুর পাতা থাকিত, সেখানে বিশ্রাম করিতেন। ঠাকুর নিজেই তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিতেন। অধরের শরীর পরিশ্রম জন্য এত অবসন্ন থাকিত যে, তিনি অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রি ৯।১০ টার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকু-

---

* প্রথমভাগ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, মূল্য ১২ টাকা। ১৩।২ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর গলিতে প্রাপ্তব্য।

রকে প্রণাম করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিতেন। তৎপরে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন।

অধর, ঠাকুরকে প্রায়ই শোভাবাজারের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর গেলেই উৎসব পড়িয়া যাইত। অধর, ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া খুব আনন্দ করিতেন ও নানারূপে তাঁহাদিগকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছেন, অধর বলিলেন, আপনি অনেক দিন এ বাড়ীতে আসেন নাই, ঘর মলিন হয়েছিল, যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল; আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হয়েছে! আর কেমন একটী সুগন্ধ হয়েছে! আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকেছিলাম। এমন কি, চোক দিয়া জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো!' ও অধরের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভক্তেরাও আনন্দে পরিপূর্ণ। কেন না, যেখানে ঠাকুর উপস্থিত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বই আর কোনও কথা হইবে না। ভক্তেরা আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আজ অনেক গুলি নূতন নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। তিনি তাঁহার কয়েকটী বন্ধু ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কি না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটী বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর। (বঙ্কিমকে দেখাইয়া, ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই টই লিখেছেন। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিম বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে)। বঙ্কিম। তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম। (হাসিতে হাসিতে)। আর মহাশয়। জুতোর চোটে (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

[বঙ্কিম ও রাধাকৃষ্ণ ;—যুগল রূপের ব্যাখ্যা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। প্রেমে বেঁকে গিয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা কেউ২ করে, রাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জান? আর চৌদ্দোপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়, যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, সাদা। সূর্য্য দূরে আছে বলে খুব ছোট দেখায়। কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক্ জান্‌তে পার্‌লে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকেনা। সে অনেক দূরের কথা। সমাধিস্থ না হ'লে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ নাম রূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগলমূর্ত্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হ'লে, থাক্‌তে পারেন না, প্রকৃতিও পুরুষ না হ'লে থাক্‌তে পারেন না। একটী বল্‌লেই আর একটী তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝ্‌তে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিক শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্ত্তিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ, বিদ্যুতের মত। তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বরণ নীল মেঘের, তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরে বাহিরে মিল।

এই কথা গুলি সমস্ত সাঙ্গ হইল, এমন সময় অধরের বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ পরস্পর ইংরাজীতে আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি)। কি গো! আপনারা ইংরাজিতে কি কথা বার্ত্তা কর্‌ছো? (সকলের হাস্য)

অধর। আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল ; কৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি)। একটা কথা মনে পড়ে, আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছে এখ। কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটী (Dam) ড্যাম্ বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বল্লে, এ মানে কি এখন বল। সে লোকটী বল্লে, আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়্‌বার নয়। সে বল্‌তে লাগ্‌ল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম্, আমার বাবা ড্যাম্ আমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম্ (সকলের হাস্য)। আর সুধু ড্যাম্ নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাড্যাম্ ড্যাম্। (সকলের উচ্চ হাস্য।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও প্রচার কার্য্য)

সকলের হাস্য থামিলে পর বঙ্কিম আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) প্রচার! ও গুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই কর্‌বেন। যিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা ? তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন ? আদেশ হয় নি, তুমি বকে যাচ্ছ, ঐ দুদিন লোকে শুন্‌বে। তার পর ভুলে যাবে।

যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বল্‌বে, ততক্ষণ লোকে বল্‌বে, আহা ইনি বেশ বল্‌ছেন। তুমি থাম্‌বে, তার পর কোথায় কিছুই নাই।

"যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে উঠে। জালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি, কমে গেল।"

"আর নিজের শক্তি সাধন করে বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার জায়গা নাই, আবার ডাকে, ওরে শঙ্করা, আয় আমার কাছে শুবি আয়।"

"ওদেশে * হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে করে যেতো, লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। লোকে গালাগালি দেয়, তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত করে কোম্পানিকে জানালে, তাহারা একটা নোটীশ মেরে দিলে,—"এখানে বাহ্যে প্রস্রাব করিও না, তা করিলে শাস্তি হবে।" তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোনও গোলযোগ নাই। কোম্পানীর হুকুম সকলের মান্‌তে হবে।"

"তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়, লোক শিক্ষা হয়; তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?"

এই কথ গুলি সকলে গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

(বঙ্কিম ও পরকাল; life after death . argument from analogy.)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ, আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম। পরকাল! সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্যলোকে যেতে হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়; কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে, ঈশ্বর দর্শন হলে, মুক্তি হয়ে যায় আর আস্‌তে হয় না। সিধোনো † ধান পুত্‌লে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয়, তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার কর্‌তে পারেনা, তার তো

* ওদেশে—ঠাকুরের জন্মস্থান কামার পুকুরে—হুগলি জেলা।

† সিধোনো ধান—যে ধান অগ্নিতে সিদ্ধ করা হইয়াছে।

কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো ধান আর ক্ষেতে পুত্‌লে কি হবে ?

· বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না, ফল হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়ো ফল নয়,তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক কোন জায়গায় তার আস্‌তে হয়না।

"উপমা একদেশী। * তুমি পণ্ডিত, ন্যায় পড়ো নাই ? বাঘের মত ভয়ানক বল্লে যে, বাঘের মত একটা ন্যাজ, কি হাঁড়ী মুখ থাক্‌বে তা নয়। (সকলেব হাস্য)।

"আমি কেশব সেনকে এ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মহাশয়, পবকাল কি আছে ? আমি না এ দিক, না উদিক বল্লাম। বল্লাম, কুমোরবা হাঁড়ী শুকোতে দেয়, তাব ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়ীও আছে। কখনও কখনও গরু টরু এলে হাঁড়ী মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে কুমোব সে গুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেঙ্গে গেলে সে গুলি কুমোব আবাব ঘরে আনে; এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ী করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বল্লুম, যতক্ষণ কাঁচা থাক্‌বে, কুমোব ছাড়্‌বে না। যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বরেব দর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোব আবার চাকে দেবে, ছাড়্‌বে না অর্থাৎ ফিরে ফিবে এ সংসাবে আস্‌তে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ কর্‌লে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেননা তার দ্বাবা মায়ার সৃষ্টির কোন কাজ আসেনা। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আব মায়ার সংসাবে কি কর্‌বে ?

"তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার সংসারে লোক শিক্ষাব জন্য। জ্ঞানী লোক শিক্ষা দিবাব জন্য বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে থাকে। সে তাঁব কাজের জন্য তিনিই বেখে দেন, যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [বঙ্কিমের প্রতি] আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি ?

---

* উপমা একদেশী *Vide* Chapter on Analogy, Inductive Logic.

(বঙ্কিম ও পাণ্ডিত্য)

বঙ্কিম। (হাসিতে হাসিতে) আজ্ঞে, তা যদি বলেন, তাহলে আহার নিদ্রা ও মৈথুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। [বিরক্ত হইয়া] এঃ, তুমিতো বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া! তুমি যা রাত দিন করো, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেঁকুর উঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর উঠে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর রাত দিন রয়েছো; আর ঐ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা কর্‌লে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা কর্‌লে সরল হয়।

[বঙ্কিম, শুধু পাণ্ডিত্য ও কামিনীকাঞ্চন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে, যদি ঈশ্বর চিন্তা না থাকে? যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য কি হবে, যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে?

"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর! পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, কিন্তু শোলোক ঝাড়্‌তে পারে, কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়ে মানুষে আসক্ত, টাকা মান সার বস্তু মনে করেছে; সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকিলে পণ্ডিত কি?

"কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌ছে, পাগলা! এরা বেহেড্‌ হয়েছে! আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখ ভোগ কর্‌ছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ! কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকাল বেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে। কাক দেখোনা, কত উড়্‌র পুড়্‌র করে, ভারি স্যায়না। [সকলে স্তব্ধ]

"যারা কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্য রাত দিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয় রস তেঁতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধে জলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? এক দিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না; তার আর কিছু ভাল

লাগে না। [বঙ্কিমের প্রতি কোমল ভাবে] আপনি কিছু মনে কোরো না।

বঙ্কিম। আজ্ঞা, মিষ্টি শুন্‌তে আসিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখ্‌তে, চিন্তা কর্‌তে দেয় না। দু একটী ছেলে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই ভগিনীর মত থাক্‌তে হয়, আর তার সঙ্গে সর্ব্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তা হ'লে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে, আর স্ত্রী ধর্ম্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বর আনন্দ আস্বাদন কর্‌তে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হয়, যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। যদি আন্তরিক হয়।

"আর 'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর * তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটী' 'টাকা মাটী' 'মাটিই টাকা' 'টাকাই মাটী' বলে জলে ফেলে দিস্‌লুম।

বঙ্কিম। টাকা মাটী! মহাশয়, চারটা পয়সা থাকিলে একটা গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটী, তাহ্‌লে দয়া পরোপকার করা হবে না?

(বঙ্কিম, 'জগতের উপকার' ও কর্ম্মযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে, তুমি পরের উপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহংকার অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

"সন্ন্যাসীর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে হয়। আর গ্রহণ কর্‌তে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আবার খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয়, মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া কর্‌বে? দান টান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাহিরেও ত্যাগ করে। যে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। গুড় থেকে যদি সে বলে, গুড় খেও না, তো লোকে শুন্‌বে না।

* পঞ্চবটী—৺রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটী তলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক সাধন তপস্যা করিয়াছিলেন। অতি নির্জ্জন স্থান—সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়।

• "সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেন না মাগ ছেলে আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার, মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর্ দরবেশ, অর্থাৎ পাখী আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখীর ছানা হলে সে মুখে করে খাবার আনে। তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণ পোষণ করতে হয়।

"যে শুদ্ধ ভক্ত, সেরূপ সংসারী লোক অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করে। কর্ম্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাত দিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়, তবে সন্ন্যাসী বিষয় কর্ম্ম সংসারীদের মতন করে না।

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরি সেবা হলে নিজেরই উপকার হলো, 'পরোপকার' নয়। এই সর্ব্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষে নয়, জীব জন্তুর মধ্যে হরির সেবা—যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উল্‌টে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বর লাভের একটী পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলি যুগের পক্ষে নয়।

"তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম্ম করে, 'দয়া' 'দান' করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল এ ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন। বাপ, মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কায করেন। তাঁর কায আটকে থাকে না।

"তাই জীবের কর্ত্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া; আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

(তিনিই বস্তু, আর সব অবস্তু।)

"শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছে যে, খুব কতকগুলো ডিসপেনসারী, হাঁসপাতাল করে দিই, তাহলে গরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বল্লুম, হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি ও সব করো ত মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না; মনে কর্‌ছি নিষ্কাম ভাবে কর্‌ছি, কিন্তু হয়তো যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার কর্‌বার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশী কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, কর্ম্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরো বল্লুম শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তুমি তাঁকে চাহিবে? না, কতকগুলো ডিসপেনসারী বা হাঁসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে, আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।

"যারা হাঁসপাতাল, ডিসপেনসারী কর্‌বে, আর এতেই আনন্দ কর্‌বে, তারাও ভাল লোক, কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, বেশী কর্ম্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও; তা না হলে, যে মন তোমাতেই নিশি দিন লেগে থাক্‌বে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে; সেই মনে বিষয় চিন্তা কর্‌তে হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তের থাক্ একটী আলাদা থাক্। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুই দিনের জন্য, আর এ সংসারের যিনি কর্ত্তা, তিনিই সত্য, নিত্য, এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না।

ক্রমশঃ

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

চিকাগো ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই জগদ্বিখ্যাত হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা হইবার প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে তাঁহার এক মান্দ্রাজী শিষ্যকে যে দীর্ঘ ইংরাজী পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অনুবাদ,——

ব্রিজি মেডোস্, মেটকাফ, মাসাচুসেট্‌স,
২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩।

প্রিয় আ—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে (১) পঁহুছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন রূপে বঙ্কুবরে পঁহুছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পঁহুছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে এক তামাসা দেখাইবার জন্য, অর্থ সাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এ বৎসর এখানে বড় দুর্ব্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকা-

(১) কানাডার নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একটী দ্বীপ। এখানে বঙ্কুবর নামে এক নগর আছে। তথা হইতে কানাডা প্যাসিফিক রেল আরম্ভ হইয়াছে।

গোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বোষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বোষ্টন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোটে ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানেরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিষের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, অপর জাতি যেন কোন মতে এদেশে ঘেঁসিতে না পারে। সাধারণ কুলিতে গড়ে প্রতিদিন ৯।১০ টাকা করিয়া রোজগার করে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

আমি এক্ষণে বোষ্টনের একগ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেল গাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রুপ, এই গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাযই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজি আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিয়াছেন, প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না।

এই দেশ খ্রীষ্টিয়ানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতের কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয়ও করি না। আমি এখানে মেরিতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটী জিনিষ দেখিতে পাইতেছি, ইহারা আমার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালীলিয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইহারা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। এখন আমার কার্য্য এই টুকু হইয়াছে যে,লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে। এখানে এইরূপেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থ সাহায্য পাইতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইবে। শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব। এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।

কাল রমণী কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার)। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিষ। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমার দেখিলে বিশ্বাস হইবে। ইহা দেখিয়া তার পর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস

সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছু দিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্মের নাশেই সমাজের উন্নতি হইবে। শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরিবের জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে। কিন্তু তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান ভ্রান্তমত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন ইহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও যে কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে,তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ, তোমরা কি জাননা, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিট ওপিট? দুইই এক কথা।

বা—ও জি—র স্মরণ থাকিতে পারে, আমাদের এক পণ্ডিতের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গী চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের

অদ্ভুতহৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ নর নারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চভাবে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' (১) নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কাযের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে। জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে (মান্দ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি, তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি, অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তি বলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, আমার তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা বালক, অতি বালক, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য্য কেবল আহার পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি। এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় নিয়মিত রূপে

(১) পারমার্থিক ও ব্যবহারিক,—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া শাস্ত্রের উপদেশ, অতএব কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক, অতএব এখন আমরা অপরকে ঘৃণা না করিব কেন?

তাহারা করিয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না। বেশী সুখী তারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। তাহারা মানুষের সম্বন্ধে যে সব সুখকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা আর কখন দুঃখ, দরিদ্রতা, পাপের ক্রন্দনে (শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে যাহাতে ভারত-গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে) বিচলিত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমা রূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসী স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতীকার আছে, আর যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার প্রতীকারে প্রস্তুত আছেন। ইঁহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, এই সকল মহাপুরুষের ঐ বিষোদ্গীরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপ বাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?

গণ্য মান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিওনা। ভরসা তোমাদের উপর, পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথা-কথিত অনেক ধনী ও বড় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে উপস্থিত হইয়াছি। আর যদি আমার স্বদেশে লোকে আমায় জুয়াচোর ভাবিয়া থাকে, তবে যখন আমেরিকানরা এক বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিবে, তাহারা কিনা ভাবিবে? কিন্তু ভগবান অনন্ত শক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি,

এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর, বলি—জীবন বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমা-দের সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কায নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগ সঞ্চিত পর্ব্বত প্রমাণ অনন্ত দুঃখ রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়-শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র প্রবন্ধ সমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা,-তুচ্ছ শীত! জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—এক জন পড়িবে, আর এক জন উঠিবে।

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বোষ্টনে যাইতেছি। এখানে একটী রমণী-সভা আছে, তথায় বক্তৃতা করিতে হইবে। এই সভার সভ্যেরা রমাবাইকে (খ্রীষ্টিয়ান) খুব সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বোষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। এখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব্ব পোষাকে চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। আমাকে সুতরাং কাল রঙের লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় আলখাল্লা ও পাগ্‌ড়ি পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী, তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই চিঠি তোমার নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এখানে কিছু কার্য্য করিতে হইলে কিছু দিন এখানে থাকা দরকার। * * আমি চিকাগোর আর যাইব কিনা, তাহা জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন আর বরদাবাও যে ভদ্রলোকটীর সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার এক জন কর্ত্তা। কিন্তু তখন আমি অস্বীকার করি, কারণ, চিকাগোয় এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল সমুদয় ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমুদয় আমেরিকায় রেল গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কারণ, উহা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না। এ গাড়ীতে খুব আরাম, এখানে আহার পান নিদ্রা, এমন কি, স্নানের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাস সমুদ্রে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছু দিন থাকিতে হইবে! এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য

করা আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুককোম্পানিকে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যদি তোমরা আমাকে টাকা পাঠাইয়া ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠ খণ্ড সম্মুখে পাইব, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণ পোষণের কোন উপায় করিতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব, তারপর ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।

এখানে এখনই এত শীত যে, দিন রাত আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানেডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও এরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সালেমে এক বৃহতী রমণী সভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। তাহাতে আমার আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমার পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ্য দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে রূপার দর চড়িয়া যাওয়াতে এখানে লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই মাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম। কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০৲ টাকা বা তাহারও উপর পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কাপড় সম্বন্ধে বড় খুঁৎখুঁতে আর এ দেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। ইহারা রমাবাইকে খুব সাহায্য করি-

তেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠা-ইতে না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার কিছু টাকা পাঠাইও। ইতি-মধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিবধ কেব্‌লে তার করিতে প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা।

তোমাদেরি
বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা।

(আমেরিকা)

——:*০*:——

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার ফলে এক "বেদান্ত সমিতি" অনেক দিন হইল গঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী অভেদানন্দ উক্ত সমিতির সভ্যগণকে নিয়মিত সাধন ভজন ও শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতেছেন। এ সকল কথা সম্ভবতঃ উদ্বো-ধন পাঠকবর্গের জানা আছে। সম্প্রতি ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্নে উক্ত সমিতি গৃহে পূজনীয় স্বামীজির মহাসমাধি উপলক্ষে এক স্মৃতিসভা হয়। এত বিলম্বে এই সভা হইবার কারণ এই যে, অধিকাংশ সভ্যই এই শোক সংবাদ প্রাপ্তির সময় সহরে ছিলেন না। গ্রীষ্মকালে ইউরোপ, আমেরিকার বড় বড় সহরগুলি একরূপ খালি হইয়া যায়। অনেকেই শীতপ্রধান স্থান-সমূহে গমন করিয়া থাকেন। যখন সকলে একত্র হইলেন, তখনই সভার অধিবেশন হইবে, ঘোষিত হইল। নিয়মিত সভ্যগণ ত সকলেই একত্র হইলেন, তদ্ব্যতীত অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে স্বামীজির অনেক শিষ্য আগমন করিয়াছিলেন। সকলেই ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎ স্বামীজির প্রতিকৃতির পদতলে ভক্তিভরে অসংখ্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। গৃহ পুষ্পে আকীর্ণ হইয়া গেল। প্রথমে ভগবৎস্তোত্র পাঠ ও ধ্যান হইল।

পক্ষে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামীজি কিরূপ অদ্ভুতভাবে মহাসমাধিস্থ হইলেন, তৎসম্বন্ধে মঠ হইতে প্রেরিত তাঁহার গুরুভাইগণের পত্রের কিছু কিছু অংশ পাঠ করিলেন। তিনি শোকে একেবারে বিহ্বলচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, স্বামীজি সকল বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করিয়া আমেরিকায় প্রথম বেদান্ত প্রচারের পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কতদূর উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে, বেদান্ত সমিতির সভাপতি পার্কার মহোদয় বলিলেন, স্বামীজীর ন্যায় গভীর চিন্তাশীল ও এত বড় আধ্যাত্মিক নেতা পাইয়া আমরা এবং সমগ্র জগৎ কতদূর উপকৃত হইয়াছিল, তাহা কথায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। যাঁহারা মানবের কিসে যথার্থ উন্নতি হয়,এই সমস্যা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা সকলেই বুঝিবেন, ইঁহার শরীরত্যাগে তাঁহাদের কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। এই সকল কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া তিনি বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করিলেন।

১ম—নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, গুরু ও আচার্য্য পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের অকালে ইহলীলা সম্বরণে, বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ এবং বেদান্তদর্শনশিক্ষার্থিগণ অতিশয় ক্ষতিবোধ করিতেছেন।

২য়—এই "সমিতি" স্বামীজির শরীর ত্যাগে গভীর শোকাকুল হইয়া, বেলুড় মঠ, মান্দ্রাজ, ভারতের অন্যান্য স্থান এবং ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ তাঁহার গুরুভাই, শিষ্য, অনুবর্ত্তী ও সহযোগিগণের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছেন।

৩য়—সমিতি শীঘ্রই কোন সাধারণ স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের সম্মানার্থ স্মৃতি সভা করিতে এবং বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য চাঁদা তুলিতে ইচ্ছা করেন।

৪র্থ—এই প্রস্তাবগুলির একটী নকল বেদান্ত সমিতির বিবরণী পুস্তকে রক্ষিত হউক এবং এখানকার ও ভারতবর্ষের সমুদয় পত্রিকায় প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও স্বামীজির অন্তরঙ্গ ভক্ত গুডইয়ার মহাশয় এবং আর এক শিষ্য (ষ্ট্রীট মহাশয়) ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজির গুণানুবাদ করিলেন। মিস ম্যাক্‌লাউড, যিনি.

স্বামীজির সঙ্গে শুধু আমেরিকায় নয়, ভারতেও অনেক দিন ছিলেন, তিনি বুঝাইলেন, স্বামীজি ভারতকে কত হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, ভারতের হিত তাঁহার কতদূর অন্তরের প্রিয়তম ছিল।

ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের গ্রীনএকার নামক স্থানে মিস সারা ফার্ম্মার অনেক দিন পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্ম আলোচনার জন্য এক শিক্ষালয় স্থাপন করেন। তথায় স্বামী বিবেকানন্দ অনেক দিন বক্তৃতা করেন। তাঁহার পরে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এখানে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজি একটী পাইন বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন। ইঁহারা স্বামীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ সেই বৃক্ষের নাম স্বামীর পাইন বা মহাপুরুষের পাইন রাখিয়াছেন। এই সারা মহোদয়া তাঁহার এক পরমাত্মীয়ের সঙ্কট পীড়ার জন্য সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া এই পত্র খানি প্রেরণ করেন।

"আমি কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য এখানে রহিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক আমার আত্মা আপনাদের নিকট, কারণ, আপনারা সকলে ভগবৎ কৃপায় এই প্রিয় ভ্রাতার নিকট যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা লাভ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য প্রদানে সমবেত হইয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে নবজীবন লাভ হইত। তাঁহাকে নিজের বাড়ী রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ করিতে পারিলে জগতের সমক্ষে বাহির হইয়া সকলকে ঈশ্বরতনয় বলিয়া ঘোষণা করিতে ও তাহা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবার শক্তি আসিত। গ্রীনএকার বিদ্যালয় যে, তাঁহার নিকট কত দূর ঋণী, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। অল্প সংখ্যক কয়েকটী ব্যক্তি ভগবানে একান্ত বিশ্বাস ও প্রেম লইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করিলে তিনি যে তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই এই বিদ্যালয় গঠন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা আমাদের মধ্যে আসিয়া অন্যান্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এই কার্য্যের প্রকৃত সহায়তা করিয়াছেন। কারণ, তিনি যাহা মুখে প্রচার করিতেন, প্রত্যহ জীবনে তাহা দেখাইতেন। যে শক্তি উনবিংশ শতবর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (যীশু), ইনি আমাদের নিকট সেই শক্তির জীবন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ ছিলেন। কারণ, তিনি পূর্ণ আনন্দে বালকবৎ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার পিতার কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়া-

ইতেন, সঙ্গে টাকা কড়ি লইতেন না, আর তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার সমুদয় অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়াছিল ও তাঁহার সকল অভাব মিটিয়াছিল। ক্রমশঃ যেমন তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি বাড়িতে লাগিল, আমাদের ভিতর তাঁহার শক্তি আরও বিস্তৃত হইল আর আজ তাঁহার সংকার্য্যের শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আরও হইতে থাকিবে, যদি আমরা সেই ভগবানের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করি, যিনি আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। যখন ভগবানের এই প্রিয় দাসের শরীর ত্যাগ সংবাদ আমাদের নিকট পঁহুছিল, তখন আমরা তাঁহার দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই 'পাইনের' তলে সমবেত হইয়া তিনি আমাদের কতদূর উপকার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কাল ভগবানের শক্তি আপনাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার সহিত সকলের অভেদত্ব জানাইয়া দেন।

"তাহার শরীর ত্যাগে যেন তাঁহার এখানকার ও প্রাচ্যদেশের কার্য্যে নূতন উদ্যম, নূতন বল আইসে। যখন তিনি নিউইয়র্কে প্রথমে সত্যের মূল্যবান বীজ বপন করেন, তখন আমি যে তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পাইয়াছিলাম, তাহার জন্য আমি ভগবানকে চিরকাল ধন্যবাদ দিব। ভগবান আপনাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

স্বামীজির পরম ভক্ত মিসেস ওলিবুল স্বামীজিকে আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন এবং ভারতেও অনেক দিন তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ইউরোপে গিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় আসিয়া সভায় যোগ দেন। তিনি খুব ওজস্বিনী ভাষায় শ্রোতৃগণকে বলিলেন, ভারত আমাদিগকে ধর্ম্মধন দিতেছেন। তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের এমন কতক গুলি ব্যক্তি ভারতকে দেওয়া প্রয়োজন, যাঁহারা গিয়া ভারতের সমাজ পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে পারেন। ভারতকে কোন নূতন আদর্শ দিতে হইবে না। ভারতের মহাপুরুষেরা, বড় বড় আচার্য্যেরা যে সকল আদর্শ ধরিয়া গিয়াছেন, সেই গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার সহায়তা করিতে হইবে মাত্র।

ইঁহার বক্তৃতা সকলেরই খুব প্রাণে লাগিয়াছিল। শেষে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামীজির লিখিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা পাঠ করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

হিন্দু সন্ন্যাসী।
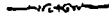
ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অল্পদিন হইল, পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই সংবাদে আমাদের ১৮৯৩ সালের চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ স্বরূপ সেই কিশোর হিন্দু সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠে। ভারত হইতে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ সমুদ্র পার হইয়া আগত হিন্দু আচার্য্যগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। সেই সময়ে হিন্দুগণের অতি পুরাতন ধর্ম্মরূপ বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি লোককে এতদূর মোহিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিকাগোর কার্য্য শেষ হইবার পরে তিনি আমেরিকার অনেক সহরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থানে বেদান্ত সমিতি সকল স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি অনেক পণ্ডিত সমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হারভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি নানাস্থলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অগাধ বিদ্যা ও বক্তৃতা শক্তি গুণে সর্ব্বত্রই লোকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বামীজি এ দেশে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এদেশে আসেন ও নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। অনেকের সাগ্রহ নিমন্ত্রণে তিনি তৃতীয় বার আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মঠে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন ও তথায় ৪ঠা জুলাই শরীর ত্যাগ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম মহাসভার কতকগুলি কর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম গুলিকে সেই সভায় কেবল তামাসার মত দেখান আর খ্রীষ্ট ধর্ম্মকেই সমুদয় সম্মান দেওয়া। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে যখন এই কিশোর প্রাচ্য প্রতিনিধি আসিয়া কেবল বক্তৃতাশক্তি ও প্রবল যুক্তিবলে ভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে প্রবল নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। বিবেকানন্দ যে শুধু চিকাগো ধর্ম্মসভার এক জন মনোমুগ্ধকারী বক্তা ছিলেন,

তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এবং অদ্ভুত বুদ্ধি ও ধর্ম্মবলে তাঁহাকে তাঁহার সময়ের একজন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পদে উন্নীত করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত অদ্ভুত। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি একজন উকিলের পুত্র ছিলেন এবং ঐ পদ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন, কিন্তু কলেজে পড়িতে পড়িতে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় হইল আর ঐ মহাপুরুষ এই কিশোর ছাত্রের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিযা তিনি ইঁহার একজন শিষ্য হইলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হইলে বিবেকানন্দ একেবারে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং গৃহ ও সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগুরুর শিক্ষা ও উপদেশ চিরস্থায়ী করিবার ও নর নারী সেবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। অনেক বৎসর ধরিযা কেবল গৈরিক বস্ত্র পরিধান এবং দণ্ড ও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তথাকার অসংখ্য মন্দির দর্শন ও যাহারা শুনিতে চাহিত, তাহাদের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কখন হয়ত কয়েক দিন ধরিয়া অনশনে থাকিতে হইত। কখন বা প্রবল শীতে, কখন বা প্রবল গ্রীষ্মে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু ইহাই হিন্দুগণের ধর্ম্মশিক্ষার সাধন আর সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারা এইরূপ সাধন করিয়া আসিতেছে। হিন্দুজাতির অদৃষ্টচক্রে নানাবিধ দুঃখ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলেও যে তাহাদের মধ্যে জীবন্ত ধর্ম্মভাব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সেই জাতি যে এখনও অক্ষত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত রূপ তপস্যাকে তাহার অন্যতম কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের একজন উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন, বলিতে হইবে। আপন অদ্ভুত জীবনে নিজ উপদেশ ও শিক্ষার অনেক গুলি যে তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

চিকাগো ধর্ম্মসভায় তাঁহার সফলতা বিশেষ বিস্ময়কর এই জন্য যে, কথিত হইয়া থাকে, এখানেই তিনি প্রথম সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে প্লাটফর্ম্ম হইতে

বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার জন্য তিনি কোন রূপ বিশেষ ভাবে প্রস্তুতও হন নাই, কেবল বক্তব্য বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান তাঁহার ছিল।

স্বামীজি শুধু যে দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা ছিলেন, তাহা নহে, তিনি এক জন রীতিমত পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও তিনি বিদেশে (অর্থাৎ ভারতে) জন্মিয়া বিদেশেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজী গদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একজন ইংরাজ সমালোচকও বলিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত রচনা সকল ইংরাজী ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশ এখানে ও ইংলণ্ডে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা এবং ভারতীয় দর্শন বিষয়ক।

সচিত্র বফালো এক্সপ্রেস।
(আমেরিকা)

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভূতপূর্ব্ব উদ্বোধন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকা যাত্রা। ইনি রেলযোগে পুরী ও মান্দ্রাজ হইয়া ৭ই নবেম্বরে কলম্বোয় পঁহুছিয়াছিলেন। তথা হইতে ১৫ই নবেম্বরে এক জাহাজে উঠেন। উহা পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, নাগাসাকি, এই সকল স্থানে কোথাও কয়েক ঘণ্টা, কোথাও বা এক দিন থাকিয়া জাপানের কোবি বন্দরে ৫ই ডিসেম্বরে উপস্থিত হয়। তথা হইতে রেলযোগে জাপানের রাজধানী টোকিওতে উপস্থিত হন। উহা কোবি হইতে ৪০০ মাইল। তথা হইতে পুনরায় রেলযোগে ইয়াকোহামায় পঁহুছিয়া ১৭ই ডিসেম্বর জাহাজে উঠেন ও ৩রা জানুয়ারি, ১৯০৩ এ- আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ার রাজধানী সানফ্রানসিস্কো সহরে উপনীত হইয়াছেন। কলম্বোয় পঁহুছিবামাত্র

তথাকার সকল গণ্য মান্য হিন্দুই (প্রায় শত জন) ইঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এখানে "বিবেকানন্দ সমিতি" নামে এক সভা আছে। তাহার কয়েক জন সভ্য স্বামীজির কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত লিখিতেছেন, তিনি স্বামীজির এরূপ যথার্থ ভক্ত দেখেন নাই। একদিন ইনি এখানকার এক শিবমন্দির দর্শন করিতে যান। কাহাকেও কোন সংবাদ দেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তথায় গিয়া দেখিলেন, প্রায় ৫০০ লোক সমবেত হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে "শৈব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। তিনিও প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া ইংরাজী ভাষায় "শৈব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। আর এক দিন উপরোক্ত বিবেকানন্দ সমিতিতে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অনেক ফটোগ্রাফার ইঁহার ফটো লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও ইনি কোনমতে উহা লইতে দেন নাই। শেষে একজনের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে ইনি ফটো দিতে বাধ্য হন। পরে শুনিলেন, এই ফটো এক দিনে ৩০০ খানি বিক্রীত হইয়াছিল। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হয়, সিংহলবাসীর হিন্দুধর্ম্মে কিরূপ অনুরাগ। ইনি এখানে দুইটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করেন, তথায় কতক গুলি ভিক্ষুর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। ইনি দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি। পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর ২৩ আগষ্ট, ১৯০২ সালে কলিকাতার এলবার্ট হলে তাঁহার স্মরণার্থ এক সভা হয়। সেই সভাক্ষেত্রে কয়েক জন যুবক মিলিয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্বামীজি সমগ্র জগতের কল্যাণার্থ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই যথাসাধ্য পরিচালনা করা এই সভার উদ্দেশ্য। স্বামী সারদানন্দ প্রতি শনিবার এই সভায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

কাশী দরিদ্রদুঃখপ্রতীকারসমিতি। ইহার পরিচালনভার পূর্ব্বে একটী ম্যানেজিং কমিটির হস্তে ছিল। এক্ষণে ইহার অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে "রামকৃষ্ণ মিশনের" হস্তে ইহার পরিচালনভার অর্পিত হইয়াছে। ইহার নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাম হইয়াছে রামকৃষ্ণসেবাশ্রম (Ram-Kirshna Home of Service)। ইহার বিশেষ বিবরণ বিগত আগামীদের.

উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে।

বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। কাশীধামে স্বামীজি তাঁহার মহাসমাধির কিছু পূর্ব্বে স্বামী শিবানন্দকে একটী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লাক্সা নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো স্থাপন করিয়া পূজাদি এবং ধ্যান ধারণাদি করিতেছেন। সমাগত লোকগণকে উপদেশাদিও দিয়া থাকেন। আশ্রমের নাম হইয়াছে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম।

কলম্বো বিবেকানন্দ সমিতি। সিংহলের রাজধানী কলম্বো সহরেও বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার অনেক গণ্য মান্য হিন্দু ইহাতে যোগ দিয়াছেন। বিগত অগষ্ট হইতে উহার কার্য্য বিবরণ দেওয়া গেল।

২৪ শে অগষ্ট——"তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।
৩১ „ „———"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।
৭ই সেপ্টেম্বর—— ঐ
১৪ „ „—— ভগবদ্গীতা পাঠ আরম্ভ।
২১ শে „ —— ঐ
৫ই অক্টোবর ——"সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১২ই „ ——ভগবদ্গীতা পাঠ।
১৯শে „ ——"মাণিক্য বাসগ স্বামুগল"নামক সাধুর জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
২৬ শে,, ———"ভগবদ্গীতা পাঠ সম্বন্ধে কতকগুলি সঙ্কেত"বিষয়িণী বক্তৃতা।
২রা নবেম্বর———"ভগবদ্গীতা" পাঠ।
১৬ই নবেম্বর"সাধনের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
২০ শে নবেম্বর—— ভগবদ্গীতা পাঠ।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব। বিগত ৪ঠা মাঘ রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন ও লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির কালীবাটীতে দক্ষিণেশ্বর ও বরাহনগর নিবাসী কয়েকটী ভক্তের উদ্যোগে একটী ছোট খাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব। বিগত৬ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড়মঠে পূজা প্রভৃতি এবং তৎপরের রবিবার ১১ই মাঘ সাধারণের জন্য উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা, ধর্ম্মসঙ্গীত,

কাঙ্গালীভোজন প্রভৃতি হইয়াছিল। বিশেষ বিবরণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসবে নিমন্ত্রণ। আগামী ২৪শে ফাল্গুন রবিবার বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে মঠাধ্যক্ষ সর্ব্ব সাধারণকে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

সার জন জার্ডিন ও ভারতবাসী। সার জন জার্ডিন বিগত ১৫ই অক্টোবরে এডিনবর্গে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভারতবাসীর আচার ব্যবহার গুলিকে খুব সহানুভূতির সহিত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইউরোপীয়েরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ ভারতবাসীর উপরে নানাপ্রকার অলীক দোষারোপ করেন। হয়ত কেহ ভারতের কোন স্থান বিশেষের দু একটি লোকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। মুষ্টিমেয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া সমগ্র ভারতসম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা কি রকম, না, যেমন হলাণ্ড বা স্পেন মাত্র দেখিয়া সমগ্র ইউরোপবাসী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বিশপ হেবার, লর্ড রিপণ, সার রিচার্ড টেম্পল, লর্ড চ্যান্‌সেলার সেলবোর্ণ, সার জর্জ্জ বার্উড, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি বিজ্ঞ ও উদার রাজপুরুষগণের মত পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। অনেক ইউরোপীয়ের মত, "পুনর্জ্জন্মবাদ" ভারতবাসীকে নিরুদ্যম ও অদৃষ্টবাদী করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ইনি ব্রহ্মদেশীয় একজন রাজকর্ম্মচারীর মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবিক ইহার ফল এতদূর শোচনীয় নহে, বরং এই মতে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুঃখ বিপদে ধৈর্য্যশীল, উদারহৃদয় ও দয়াবান হইয়া থাকেন। আমরা বলি, সকল মতই মানুষকে ভালও করিতে পারে আবার মন্দও করিতে পারে। উহাতে মতের দোষ নাই, মত ব্যাখ্যার দোষ। কালক্রমে সত্ত্বগুণ চলিয়া গিয়া যখন ভারতে তমোগুণের রাজত্ব হইল, তখন অতি উচ্চ উচ্চ মতও অতি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইল। তাহাতেই ভারতের এই দুর্দ্দশা। এক্ষণে প্রয়োজন, দেশহিতৈষী মহাত্মারা এই সকল মত খণ্ডনে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া এই সকল মতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করুন। তার পর, বাস্তবিক কোন্ মত সত্য, কোন্ মত অসত্য, তাহা নিশ্চয় করিতে গেলে এরূপ ভাবে দেখিলে হয় না। দেখিতে হইবে, পুনর্জ্জন্মবাদ কত দূর যুক্তিসহ, প্রকৃত ঘটনার সহিত কতদূর সঙ্গত।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" নামে একখানি মাসিক পত্র আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহার উপরিভাগে একখানি চিত্র দ্বারা "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" উভয়ই যে মানুষের অত্যাবশকীয়, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা মাত্র। সুতরাং ইহা সর্ব্ব সাধারণে ক্রয় করিতে পারেন। সম্পাদকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। "পরিব্রাজকের পত্র" নামক প্রবন্ধটী সুন্দর লাগিল।

কনখল সেবাশ্রম।

বিশেষ নিবেদন।

যদিও আমাদের তীর্থসমূহে সাধুগণের ভিক্ষার কষ্ট তাদৃশ নাই, কিন্তু অনেক সময় তাঁহারা পীড়িত হইলে ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। সাধারণে অবগত আছেন, সাধুগণের এই কষ্ট দূরীকরণাভিপ্রায়ে রামকৃষ্ণমিশন হইতে গত ১৯০১ সালের জুন মাসে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কনখলে 'রামকৃষ্ণসেবাশ্রম' নামে এক আশ্রম স্থাপিত হয়। এ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সাধারণের সাহায্যে বেশ চলিয়া আসিতেছে। কিছু দিনের জন্য হৃষীকেশে একটী শাখাসেবাশ্রম খোলা হয়। তাহাও সাধারণের জানা আছে। আগামী বৈশাখ মাসে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে। সেই সময় ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধু সমবেত হইবেন এবং মেলার পূর্ব্বে ও পরে হরিদ্বার, কনখল ও ইহাদের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে কয়েক মাস ধরিয়া থাকিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে এই সেবাশ্রমের কার্য্য বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। যদিও হস্তে এক্ষণে ২৭৬ টাকা উদ্বৃত্ত আছে, কিন্তু ঐ সময়ে তাহাতে কিছুতেই কুলাইবে না। সহৃদয় সাধারণ, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইহাকে অর্থ

দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সুতরাং পুনর্ব্বার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহা কি বলিতে হইবে যে, এই ধর্ম্মবীরগণ যাঁহারা নিজেদের চরিত্র ও জীবন দ্বারা সনাতন ধর্ম্মধন রক্ষা করিতেছেন ও প্রত্যেকের দ্বারে উহা বিলাইতেছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলে, তাহা অসদ্ব্যয় হইবে না?

যিনি যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা শীঘ্র নিম্নোক্ত ঠিকানাদ্বয়ের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা পাঠাইতে পারেন। ইহার জন্য এক পয়সা চাঁদাও সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রবুদ্ধ ভারত পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

ঠিকানাঃ—স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, কনখল পোঃ (সাহারাণপুর)
বা—স্বামী সচ্চিদানন্দ, সহকারী সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত, মায়াবতী
লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া)

ইতি. সচ্চিদানন্দ— সহ সং-প্রবুদ্ধ ভারত।

১৯০১ সালের জুন হইতে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত
কনখল সেবাশ্রমের কার্য্য বিবরণ।

কনখল মূল আশ্রম।

আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছেন;—৩৯৯ জন সাধু ও ১৩৭ জন গরীব গৃহস্থ। সাধুগণের মধ্যে ৩৬৮ জন আরোগ্যলাভ করেন, ২৭ জন ভাল হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান, এক জন মৃত্যুমুখে পতিত হন ও ৩ জন এখনও চিকিৎসিত হইতেছেন। গৃহস্থের মধ্যে ১১৭ জন আরোগ্য লাভ করেন, ১৯ জন আরোগ্য লাভের পূর্ব্বেই চলিয়া যান ও এক জন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন।—১২৮ জন সাধু; তাঁহার মধ্যে ১১২ জন আরোগ্য লাভ করেন, ১২ জন ভাল হইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা ত্যাগ করেন ও ৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হৃষীকেশ শাখাশ্রম।

আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়াছেন,—২৮৬ জন সাধু ও ৬৮ জন গৃহস্থ। সাধুগণের মধ্যে ২৬৯ জন আরোগ্যলাভ ও ১৭ জন চিকিৎসা ত্যাগ করেন। গৃহস্থের মধ্যে ৬৪ জন আরোগ্য লাভ ও ৪ জন চিকিৎসা ত্যাগ করেন।

আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত।—৩৬ জন সাধু, তন্মধ্যে ৩৩ জন আরোগ্য লাভ ও ৩ জন চিকিৎসা ত্যাগ করেন।

	কনখলের খরচ।	হৃষীকেশের খরচ।
খাইখরচ	২০২৷৵৬	৭৸৵৪½
বস্ত্র	৯৷৴৹	০
আলো	৭৷৶৩	৷৵৬
ডাকখরচ	২০৶৩	২৸৵০
ঔষধ ও চিকিৎসাগ্রন্থ	১১৩৸৶৬	২০৷৷৶৩
রেলভাড়া	৫৬৸৶৬	৶৩
ব্রাহ্মণ চাকরাদির বেতন	১০৫৷৷৹	৪৷৷৶০
বাড়ীভাড়া	৫৪৷৷৶০	০
মুটে ভাড়া	১৷৷৶০	৩৶৩
দান	২৷৷০৭½	৩৵৬
বাজে খরচ	৪৸৵৪½	৷৵৩
	মোট—৫৯৭৷৷৶০	মোট—৪৩৷৵৪½

সর্ব্ব শুদ্ধ জমা—৮৯৯—০—৬

" খরচ—৬২৩—০—৪½

তহবিল ২৭৬—০—১½

ইহা ব্যতীত কয়েক জন সহৃদয় বন্ধু উভয় আশ্রমের জন্যই ২৩ ২৪ মন আটা, ২৷৩ মন চাউল প্রভৃতি অনেক দ্রব্য দিয়াছেন। স্থানাভাবে সমুদয় প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

——— :*o*: ———

[শ্রীম—কথিত]

(২য় সংখ্যার পর)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাটীতে
ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে
কথোপকথন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[আগে বিদ্যা না আগে ঈশ্বর ?]

First Science or First God ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়্‌লে, বই না পড়্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জান্‌তে হয়, আগে সায়েন্স্ (Science) পড়্‌তে হয় (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝ্‌লে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল ? আগে Science, না আগে ঈশ্বর ?

বঙ্কিম। হাঁ, আগে পাঁচটা জান্‌তে হয়, জগতের বিষয়ে। একটু এ দিক্‌কার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জান্‌বো কেমন করে ? আগে পড় শুনা করে জান্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওই তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর তারপর তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ কর্‌লে, দরকার হয়ত সবই জান্‌তে পার্‌বে।

---

* প্রথম ভাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মূল্য এক টাকা, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

"যদি যদুমল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার যোসো করে, তাহলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদুমল্লিকের কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এও জান্‌তে পার্‌বে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ী ঢুক্‌তে গেলে দরওয়ানরা যদি না ঢুক্‌তে দেয়, তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এ সব ঠিক খবর কেমন করে জান্‌বে? তাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও এ কথা আছে। যতক্ষণ না লোকটীকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়, সে যেই সামনে আসে, তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গেই আলাপ করে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।

[মানুষ জীবনের এক উদ্দেশ্য (End of Life) ঈশ্বর লাভ] *

"আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রাম মন্ত্র জপ কর্‌তে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো, "মরা" "মরা" জপ কর। "ম" মানে ঈশ্বর আর "রা" মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তার পরে জগৎ। একেকে জান্‌লে সব জানা যায়। ১ এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে, অনেক হয়ে যায়। ১ কে পুঁছে ফেল্লে কিছুই থাকে না। ১কে নিয়েই অনেক। এক আগে তার পর অনেক; আগে ঈশ্বর, তার পর জীব, জগৎ।

"তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অতো জগৎ, সৃষ্টি, Science, সায়েন্স্ এসব কর্‌ছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। তোমার বাগানে কতশ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষকোটী পাতা, এসব খবর তোমার কায কি? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা। এ সংসারে মানুষ এসেছে, ভগবান লাভের জন্যে। সেটী ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়। আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়েই যা।

* আগে ঈশ্বর—"Seek ye first the Kingdom of heaven and all other things shall be added unto you."—Jesus

বঙ্কিম। আম পাই কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো এমন কোনও সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধে হয়ে গেল। কেউ হয়তো বলে দেয়, এমনি এমনি করো, তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম। কে? গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন! (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলেই কি পোলাওয়া কালিয়া খেলে হজম করতে পারে? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পোলাওয়া কালিয়া দেন না। যে দুর্ব্বল, পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন; তা বলে কি মা সে ছেলেকে ভাল বাসেন কম?

[উপায়,—ব্যাকুলতা, বালকের বিশ্বাস]

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু; তাঁর কথা বিশ্বাস করলে,—বালকের মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বর লাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে, "ও তোর দাদা হয়," অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা'। একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। তা সে ছেলে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা হয় তো ছুতোর কামারের ছেলে। মা বলেছে ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ওঘরে জুজু। এই বালকের বিশ্বাস, গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারি বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া; কপট হলে হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূর।

"কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ, মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, বলে, না, আমি মার কাছে যাবো; সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা করে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না। যার সংসারের এ সব "সুখ" ভোগ আলুনি লাগে,

যার আর কিছু ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা করে কাতর হয়। তারই জন্যে মার আবার সব কাজ ফেলে দৌড়ে আস্‌তে হয়।

"এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্য্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়্‌লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে নন। আব সব পথেই ভুল আছে—সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারু ঘড়ি ঠিক যায় না। তাবলে কারু কাজ আট্‌কায় না। ব্যাকুলতা থাকৃলে সাধুসঙ্গ জুট যায়, সাধু সঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্য গান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বামকৃষ্ণ কীর্ত্তন একটু শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য হইলেন। একেবাবে অন্তর্মুখ, সমাধিস্থ। দাঁড়াইযা সমাধিস্থ। সকলেই বেষ্টন কবিয়া দাঁডাইলেন। বঙ্কিম ত্রস্ত হইয়া ভিড ঠেলিযা ঠাকুবেব কাছে গিযা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই। কিয়ৎক্ষণ পবে একটু বাহ্য হইবার পর ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কবিতে লাগিলেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস মন্দিরে ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন। মাঝে অদ্ভুত নৃত্য! বঙ্কিমাদি ইংরাজী পড়া লোকেরাও দেখিয়া অবাক্! কি আশ্চর্য্য! এরি নাম কি প্রেমানন্দ? ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয়? এইরূপ কাণ্ডই কি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ করেছিলেন? এই রকম করেই কি তিনি নবদ্বীপে আর শ্রীক্ষেত্রে প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন? এঁর ভিতর তো ঢঙ হতে পারেনা। ইনি সর্ব্বত্যাগী, এঁর টাকা, মান, নামবের-নো কিছুরই দরকার

নাই। তবে এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? কোনোদিকে মন না দিয়ে ঈশ্বরকে ভাল বাসাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এখন উপায় কি? ইনি বল্লেন, মার জন্য দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল হওয়া। ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভালবাসাই উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও সেই অদ্ভুত দেবদুর্লভ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান, ঠাকুর রামকৃষ্ণের চারিদিকে, আর একদৃষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। 'ভাগবত ভক্ত ভগবান' এই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, জ্ঞানী, যোগী ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

আবার সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ ঈশ্বরে প্রেম।)

বঙ্কিম। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ যা বলেছি—ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মার জন্য, মাকে না দেখ্‌তে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে; সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্যে কাঁদ্‌লে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্য্যন্ত যায়।

"অরুণোদয় হলে পূর্ব্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরি নাই, সেই রূপ যদি কারু ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের আর বেশী দেরি নাই।

"একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, মহাশয়, বলে দিন, ঈশ্বরকে কেমন করে পাব। গুরু বল্লে, এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটী পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নাব্‌লো, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধরে জলে চুবিয়ে

ধর্‌লে। খানিক পরে ছেড়ে দেবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য বল্লে, প্রাণ যায় যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু পাটু কর্‌ছিল। তখন গুরু বল্‌লে, ঈশ্বরের জন্য যখন এইরূপ প্রাণ আটু পাটু কর্‌বে, তখন জান্‌বে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরী নাই।

"তোমায় বলি, উপরে ভাস্‌লে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছুঁড়্‌লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ কর্‌তে হলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিম। মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে (সকলের হাস্য)। ডুব্‌তে দেয় না।

রামকৃষ্ণ। তাঁকে স্মরণ কর্‌লে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাপ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন, ——

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ জ্ঞানের বাতী জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটী গাইলেন। সভা শুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বঙ্কিমের প্রতি) কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ী করে, শেষ কালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোকে এটি বোঝেনা যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

"আমি নরেন্দ্রকে* জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর্ যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্; তুই কোন্‌খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্লে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বল্লুম, কেন? মাঝ খানে গিয়ে, ডুবে খেলে কি দোষ? তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ রস তা নয়, এ রস অমৃতরস, এতে ডুব্‌লে মানুষ মরে না, অমর হয়।

"তাই বল্‌ছি ডুব দেও। কিছু ভয় নাই, ডুব্‌লে অমর হয়।

এই বার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন, তত নয়। একটী প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটীরে একবার পায়ের ধুলা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ তো ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম। সেখানেও দেখ্‌বেন ভক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতন কি? (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত। মহাশয়, গোপাল, গোপাল, ও গল্পটী কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে ২) তবে গল্পটী বলি শোন, এক জায়গায় একটী শেকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্ব্বদাই হরিনাম। সাধু বল্লেই হয়, তবে পেটের জন্য সেকরার কর্ম্ম করা। মাগ, ছেলেদের ত খাওয়াতে হবে। তারা পরম বৈষ্ণব এই কথা শুনে অনেক খরিদদার তাহাদেরই দোকানে আসে, কেন না তারা জানে যে, এদের কাছে সোণা রূপা গোল মাল হবে না। খরিদদার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম কর্‌ছে, আর বসে বসে কাজ কর্ম্ম কর্‌ছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বস্‌লো, একজন বলে উঠ্‌লো "কেশব কেশব কেশব"। খানিকক্ষণ পরে আর এক জন বলে উঠ্‌লো, "গোপাল গোপাল গোপাল্"। আবার একটু কথা বার্ত্তা হতে না হতে আর এক জন বলে উঠ্‌লো "হরি, হরি, হরি, হরি"। গয়না গড়াবার কথা যখন্ এক রকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর এক জন বলে উঠ্‌লো

* নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

"হর, হর, হর, হর"। কাযে কাযেই এত ভক্তি প্রেম দেখে সেকরাদের কাছে টাকা কড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো ; জানে যে এরা কখন ঠকাবে না। কিন্তু কথাটা কি জান ? খরিদদার দোকানে আস্বার পর যে বলেছিল "কেশব কেশব," তার মানে এই, এরা সব কে ? অর্থাৎ যে খরিদ্-দারেরা দোকানে আস্লো, এরা সব কে? যে বল্লে "গোপাল গোপাল," তার মানে এই, এরা দেখ্ছি গোরুর পাল গোরুর পাল। যে বল্লে "হরি হরি" তার মানে এই, যেকালে দেখ্ছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বল্লে "হর হর" তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখ্ছ, সেকালে সর্ব্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু (সকলের হাস্য)।

বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হইয়া কি ভাবিতে-ছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। হরি বোল হরি, গায় শুধু জামা। একটী বাবু চাদর খানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন।

বঙ্কিম কি ভাবিতেছিলেন ?

রাখাল শ্রীবৃন্দাবন ধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার কথা ঠাকুর, শরৎ ও দেবেন্দ্রের কাছে বলিয়া-ছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক ছিলেন, শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল।

শরৎ ও সান্ন্যাল এঁরা ব্রাহ্মণ, পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা এখনো জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভাল বাসেন। ভক্তের আবার জাতি কি ?

অধর, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি যত্ন পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন, ভোজনান্তে ভক্তগণ ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের মধুর কথা গুলি স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজভক্তি ও শিক্ষক ছাত্র।

(১লা জানুয়ারী ১৯০৩ বেলুড় স্কুলে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা)

রাজাকে দেববৎ পূজা করা আমাদের শাস্ত্র আজ্ঞা। প্রজাদিগের সর্ব্ব প্রকার হিত সাধন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠ করিয়া রাজা ও প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ, আমরা অবগত হইতে পারি। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতির প্রজাবৎসলতা ও তাঁহাদের প্রতি প্রজাগণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। রাজারা যেরূপ প্রজানুরঞ্জক ছিলেন প্রজারাও সেইরূপ রাজভক্ত ছিল। রাজা সর্ব্বদা প্রজাদিগের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকিতেন; প্রজারাও যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ বিপ্লব বা দৌরাত্ম্য না হয় এবং যাহাতে রাজার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন করিত। রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ অতি পবিত্র। শ্রীভগবান গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "নরাণাং চ নরাধিপঃ"—"আমিই মানুষের মধ্যে রাজা"। আরও আছে, "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্"—"যে যে প্রাণীতে ঐশ্বর্য্য,সম্পদ, শ্রী, তেজ ও বীর্য্য আছে, তাহারা আমারই তেজের অংশ হইতে সম্ভূত"। অতএব দেখা যাইতেছে, রাজাতে ভগবানের শক্তির বিশেষ প্রকাশ। রাজাই ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শ্রী, তেজ প্রভৃতি গুণসমূহের প্রধান আশ্রয়। রাজাকে ঠিক ঠিক ভক্তি করিলে ভগবানকে ভক্তি করা হয়।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মানীর মান ও গুণীর গুণের আদর যে না দিতে পারে, সে ঠিক মানুষ নয়।" রাজার তুল্য মানী বা গুণী আর কে হইতে পারে? অতএব এরূপ রাজাকে মান্য বা পূজা করা ও তাঁহার গুণের আদর করা প্রজার প্রধান কর্ত্তব্য।

এখন কথা হইতেছে, রাজাকে আন্তরিক ভক্তি করিতে হইবে, লোক-দেখানে ভক্তি দেখাইলে কিছু হইবে না। রাজভক্তি ও রাজভয় দুইটি অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ। ভক্তি দ্বারা রাজা ও প্রজার অনেকবিধ কল্যাণ সাধিত হয়; রাজভয়ে কল্যাণ কিছুই হয় না, প্রত্যুত প্রজাকে আরও কপট ও সঙ্কুচিতচিত্ত হইতে হয়। ভক্তি দ্বারা চিত্তের উদারতা হয়, ভয় চিত্তের মালিন্য উৎপাদন করে এবং ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতিরই অন্তরায় হয়। আজ যদি এই সভায় সমবেত ব্যক্তিগণ যথার্থ অন্তরের সহিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয়। আমাদের দেহমন এতই কলুষিত হইয়াছে যে, আন্তরিক ভাব প্রদর্শনে আমরা বড়ই পরাঙ্মুখ। মনে যে ভাব, মুখে—বাহিরেও সেই ভাব দেখান উচিত। পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মন মুখ এক করাই প্রধান ধর্ম্ম"। বলুন দেখি আমরা কতদূর মন মুখ এক করিতে পারিয়াছি? যদি বাস্তবিক সত্যানুসন্ধিৎসু হন, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের সরলতার কত অভাব। আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাই এই অসরলতার প্রধান কারণ। আমাদের স্বভাবই এই, হুজুক করিয়া লোক দেখান। লোক দেখান ভক্তি কোন বিশেষ কাযের হয় না। ইহাতে কোন অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু একটী অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য রাজভক্তির ভান করা ভাল নয়। আমি বলি, আপনারা সকলে অন্তরের সহিত রাজাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করুন। অন্তরে ভক্তি রাখিয়া বাহিরে কিছু প্রকাশ করা ভাল, কিন্তু অন্তরে এক পাই ভক্তি নাই, বাহিরে ভয়ে ভক্তি প্রদর্শনের ছল করিলে কি হইবে? আমরা ইংরাজ রাজত্বে সুখে আছি, ইংরাজ রাজ আমাদের কত সুবিধা দিয়াছেন। আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই ও তাঁহাকে ভক্তি করি, ইহাই আমাদের উচিত।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। এখন কি উপায়ে এই দুর্ব্বলতা বিনষ্ট হয়? অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়স উভয় সাধনেই শারীরিক ও মানসিক শক্তির আবশ্যক। শরীর দৃঢ়িষ্ঠ না হইলে কোন কাযই হয় না। শরীর দৃঢ় বা বলিষ্ঠ করিতে হইলে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার এবং ব্যায়াম আবশ্যক।

আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। আমাদের দেশে যথেষ্ট শস্যাদি উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু বিদেশীয় বাণিজ্য প্রভাবে তাহার অধিকাংশই দেশ হইতে দেশান্তরিত হইয়া যায়। সময়ে সময়ে আমাদের আহারের উপযুক্ত পরিমিত শস্যাদিও থাকে না। এই জন্যই আমাদের দেশে এত দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য ফল সংক্ষয়। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, গত ১০৭ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধে সমস্ত জগতে ৫০ লক্ষ লোক নষ্ট হয়। আর বিগত দুর্ভিক্ষে ভারতে মৃত্যু সংখ্যা এক কোটী নব্বই লক্ষ। মহোদয় ডিগ্‌বি তৎপ্রণীত Prosperous British India য় লিখিয়াছেন, ভারতে গড়ে প্রত্যেক লোকের বাৎসরিক ৩০ টাকা হইলে এক রকম খোরাক পোষাক চলিয়া যায়, কিন্তু উপস্থিত আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, বাৎসরিক ১৭৲ টাকার বেশী প্রত্যেক লোকের আয় নাই। দেখুন কত অভাব। এই অভাব পূরণের জন্য আমরা কি করিব? কোন নূতন অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কোনরূপ নূতন ব্যবসা বাণিজ্য উদ্ভাবন করিয়া যাহাতে দেশের লোক দুমুটা খাইতে পায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। আমরা এই জন্য বদ্ধপরিকর হইব। শরীর আহার ব্যতীত রক্ষিত হয় না, অতএব আহারের সংস্থান করা প্রধান কর্ত্তব্য। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি ভোগপ্রধান দেশের আহারের তুলনায় আমাদের দেশের লোকে অনাহারে রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক সময়ে সিমুলতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ও আমি কিছু দিন একটী বাগানে ছিলাম। সেই বাগানে একটি মালি ছিল, সে সমস্ত দিন সেই বাগানে কায করিত, কূয়া হইতে জল তোলা, কোপান ইত্যাদি। পশ্চিমে কূয়া হইতে জল তোলা কতদূর কঠিন, তাহা কথন যাঁহারা পশ্চিমে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সেই মালিটি মধ্যাহ্নে আমাদের নিকট হইতে ভাতের ফেন ভিক্ষা করিয়া খাইত এবং সন্ধ্যার সময় মৌউয়া ফল সিদ্ধ ও ভাত খাইত; এই তাহার সমস্ত দিনের আহার। ৪।৫ টাকা মাহিনা পায়, তাহাতে হয়ত ৫।৭ টী পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে হয়। বলুন দেখি, আমাদের দেশে কিরূপ অন্নাভাব! যাহাতে এই অন্নাভাব দূর হয়, তাহার জন্য যত্নবান হওয়া সকলের উচিত।

আহারের সহিত শরীরের ও মনের খুব নিকট সম্বন্ধ। উপযুক্ত আহা-

রাভাবে শরীর শুষ্ক হয় এবং মনের তেজও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। পুষ্টিকর আহার পাইলে আবার শরীর সবল হয়, মনেরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। অর্থ বলুন, ধর্ম্ম বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন, সমস্তই শরীর ও মনের সাহায্যে সাধিত হয়। শরীর কেল্লার মতন, শরীরটী সবল ও দৃঢ় থাকিলে ইহার আশ্রয়ে মনের সাহায্যে সকল কার্য্য ও সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। উপযুক্ত আহারের সম্যক্ পরিপাকে শুদ্ধ মন গঠিত হয়; শুদ্ধ মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় এবং এই সাত্ত্বিক ভাব হইতে ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি প্রসূত হয়। এবং এই সত্ত্বগুণ প্রভাবে আমরা মানীর মান দিতে পারি ও গুণীর গুণ উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের দেশের উপস্থিত শিক্ষাপ্রণালী ভাল নহে। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য মানুষ প্রস্তুত করা, মানুষের ভিতর যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহার স্ফুরণ করাইয়া দেওয়া। কতকগুলি পুস্তক পড়াইয়া কোমলমতি বালক বালিকার মনে একটি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া অতীব অন্যায় কার্য্য। বালকদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া পিতা মাতা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়াও তেমনি কর্ত্তব্য। যাহাতে বালকেরা আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের ব্যবহার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষদের প্রধান কার্য্য। কতকগুলি পুস্তক পড়াইয়া মানসিক দুর্ব্বলতা আনিয়া কি লাভ হইবে? কতকগুলা পুস্তক মুখস্থ করিয়া ৩।৪ টা পাস্ করা অপেক্ষা আপনার চক্ষু কর্ণ ও মনের ব্যবহার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা অনেক ভাল। চর্ব্বিত চর্ব্বণে ফল কি? মানুষ হওয়াই চাই। আমি কে, এই যে হস্ত পদ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট শরীর, এইটাই কি সর্ব্বস্ব, না, ইহার উপর কিছু আছে? ইত্যাদি চিন্তা ও মনের শক্তিতে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হওয়া চাই। বাহির হইতে কিছুই আসেনা। সমস্ত শক্তি তোমার অন্তরে নিহিত, সেই মহাশক্তির প্রকাশ করা চাই। বাহিরে হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। যিনি এই শক্তি জাগাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গুরু, তিনিই যথার্থ শিক্ষক। যিনি সমস্ত বহির্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গুরু।

পরমহংসদেব বলিতেন, মনটা যেন এক পুঁটুলি সরিষা। যদি ছড়াইয়া

দেওয়া যায়, তাহাকে পুনঃ সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য। আমাদের মন বিষয়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে। শব্দে, স্পর্শে, রসে, রূপে, গন্ধে আমাদের মন পড়িয়া রহিয়াছে। এই মনকে বিষয় হইতে অভ্যাস দ্বারা গুড়াইয়া লইতে হইবে। একত্রীকৃত মনের শক্তি অসীম। একত্রীকৃত বা সংযত মন সকল কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। অভ্যুদয় বলুন বা নিঃশ্রেয়স বলুন, উভয়বিধ কল্যাণই এই সংযত মনের শক্তিতে সংসাধিত হয়।

বালকদিগের মন অতি কোমল। সেই কোমল মনে যে ছাপ দেওয়া যায়, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। পরমহংসদেব বলিতেন, "কাঁচা মাটিতে কুমোররা সব রকম গড়ন ও ছাপ দিতে পারে, কিন্তু পোড়া মাটিতে কোন ছাপ লাগে না"। এইজন্য বালকদিগের কোমল মনে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষার ছাপ দেওয়া উচিত। বয়স্ক হইলে শিক্ষার বিশেষ সুফল হইবে না। কাঁচা বাঁশ সহজে নোয়ান যায়, কিন্তু পাকা বাঁশ নোয়ান সহজ নয়। নোয়াইতে শেষে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়।

আধুনিক শিক্ষার আর একটী দোষ এই, সকল বিদ্যার্থীকেই কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ও নির্দ্দিষ্ট বিষয় পড়ান হয়। সকল বালকের সকল বিষয়ে প্রকৃতিগত অনুরাগ হয় না। আমরা দেখিতে পাই, কোন বালক সাহিত্য পড়িতে ভাল বাসে, কেহ অঙ্ক কসিতে ভাল বাসে, কেহ ইতিহাস, কেহ শিল্প, কেহ সঙ্গীত ইত্যাদি। এখন এই বিভিন্ন অনুরাগ বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বা নির্দ্দিষ্ট বিষয় পড়াইলে ফল কি হইবে? ইহার ফল এই হইবে, তাহারা আপনাপন রুচির বিরোধী বিষয় শুনিতে হয় অনাস্থা করিবে, না হয় মুখস্থ করিয়া একরকমে দৈনিক পাঠ প্রস্তুত করিবে। ইহার ফল কি? মানসিক দুর্ব্বলতা। যে শক্তিটা রুচিবিরোধী বিষয়ে বৃথা ব্যয়িত হয়, সে শক্তি যদি রুচি অনুযায়ী বিষয়ে ব্যয়িত হইত, কত লাভ হইত। সে সেই বিষয়ে কত উন্নতি করিতে পারিত। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রেণীভুক্ত করিয়া বালকদিগকে কতকগুলা বিষয় একেবারে শিক্ষা দিতে গেলে কি অনিষ্ট হয়। বালকদিগের এই স্বাভাবিক রুচি অনুসন্ধান করিতে হইলে শিক্ষকের কতদূর বহুদর্শিতা, বহু জ্ঞানের দরকার। শুধু তাহাই নহে, মানব চিত্তের বিচিত্রতাও জানিতে হইবে। এবং বিভিন্ন করিয়া বালকদিগকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা

দিতে হইবে। পণ্ডিতবর ইউক্লিড বাল্যকালে পড়াশুনায় অত্যন্ত অনা-বিষ্ট থাকিতেন। ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ হয় নাই। তাঁহার পিতা অনেক সুশিক্ষিত বিচক্ষণ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। কোন শিক্ষকই তাঁহার স্বাভাবিক রুচিকর বিষয় অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহামতি আরিষ্টট্‌লকে শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। আরিষ্টট্‌ল অল্পদিনেই নিজ প্রতিভাবলে ইউক্লিডের প্রকৃতিগত বিষয়ে অনুরাগ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে কেবল অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। দেখুন, সেই ইউক্লিড্ অঙ্কশাস্ত্রে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-প্রসূত জ্যামিতি পাঠ করিয়া আমরা জ্যামিতি শিখিয়া থাকি। অতএব ছাত্রের স্বাভাবিক অনুরাগ বা রুচির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে সে শিক্ষকের কার্য্য নহে। শিক্ষকের দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত। ছাত্রদিগের নিকট তাঁহার দায়িত্ব, পিতা মাতার দায়িত্ব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যদি Aristotle এর ন্যায় শিক্ষক সংযোগ না হইত, তাহা হইলে হয়ত Euclid এর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ একেবারেই হইত না।

শিক্ষকের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন না হয়। যাহাতে ছাত্রের যথার্থ হিত সাধন হয়, তাহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি যেন বৃত্তিলোভে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত না হন। ছাত্রের কল্যাণ করাই যেন তাঁহার ব্রত হয়। তিনি সমগ্র জীবন যেন এই শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্য শিক্ষকদিগের বেতন অল্প। তাঁহাদের বেতন বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু কোন মহৎ উদ্দেশ্যই ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত সাধিত হয় না। অতএব এই সুশিক্ষা দান বা মানুষ প্রস্তুত করণ রূপ মহৎ উদ্দেশ্যে, তিনি কিছু ত্যাগ স্বীকার করুন। শিক্ষক মহাশয় যেন সমগ্র অন্তঃকরণের সহিত শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। দুই চারি মাস বা ২ ৪ বৎসরের জন্য সক্ করিয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী না হন। বালকদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। যে শিক্ষক বালকদিগের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন না হইতে পারেন, তাঁহার দ্বারায় বালকদিগের শিক্ষা কিছুই হয় না। গুরুকে বা শিক্ষককে যমের মতন বা বাঘের মতন দেখিলে কোন কালে কিছু ফল লাভ হয় না। শিক্ষ-

কেরা ও পিতা মাতারা বর্ত্তমান সমাজের গণ্য অঙ্গ, সমাজের ভাল মন্দ সমস্তই তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে বা ২০।২৫ বৎসর পরে এই বালক ও বালিকাগণ আবার নূতন সমাজের নেতা বা অঙ্গ হইবে। তখন সমাজের উন্নতি, অবনতি, সুরীতি, কুরীতি তাঁহাদের সন্তান বা ছাত্রদিগের উপর নির্ভর করিবে। অতএব আমাদের দায়িত্ব কতদূর দেখুন। বালকগণকে সুশিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপচয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। আমরা মানুষ হইতে পারিলে, আমাদের বালকেরাও মানুষ হইবে, আশা করা যায়। বালকেরা আমাদের দেখিয়াই তো শিখিবে। এই সমস্ত বিচার করিয়া বলুন দেখি, আমাদের দায়িত্ব কিরূপ! আমরা যদি পশুবৎ ব্যবহার করি, আমাদের ছেলেরাও কেন না সে রূপ করিবে? চণ্ডীতে আছে—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—জগতে যত স্ত্রী আছেন, সকলেই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশ। বলুন দেখি, সাধারণতঃ এই পূজার্হা স্ত্রীজাতিকে কি দৃষ্টিতে দেখা হয়? আমরা যদি স্ত্রীজাতিকে ভগবতীর অংশ রূপে বুঝিয়া ভক্তি করি, আমাদের ছেলে বা ছাত্রেরাও সেইরূপ করিবে। ছাত্র বা শিষ্যদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিতে হইবে। সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ করিতে হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে। বাহিরে কিছু নাই, বাহির হইতে কিছু আসেনা। মেঘাচ্ছন্নিত সূর্য্যের ন্যায় এই অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বা জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে হইবে। পুস্তকে কি আছে? পুস্তক প্রণয়ন তো অনেক শেষে হইয়াছে। পুস্তক প্রণয়নের পূর্ব্বে কি জ্ঞান ছিল না? পুস্তক তো মানুষেই লিখিয়াছে। যাঁহারা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাব দেখিয়াই লিখিয়াছেন। সেই প্রকৃতি এখনও সমভাবে বর্ত্তমান; আমরা কেন প্রকৃতি হইতেই শিক্ষা না করি?

এরূপ বলিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না, পুস্তক পাঠ দ্বারা কোন লাভই হয় না। আমার বলার উদ্দেশ্য, পুস্তক পাঠ শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় মনে না করা। পুস্তক শিক্ষার সাহায্য করে মাত্র। পুস্তকের উপর সমস্ত নির্ভর করা উচিত নহে। পুস্তক মুখস্থ করিয়া বা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া লাভ কি হইবে? পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুদ্ধির পরিচালনা করা চাই। যদি

সর্ব্বদা পুস্তক হাতে করিয়া বা পুস্তক পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায়, তবে পুস্তকের কীট কেন পণ্ডিত হয় না? যদি পুস্তক কেবল মুখস্থ করিলে বিদ্যা শিক্ষা হয়, তবে স্বয়ং পুস্তক অপেক্ষা বিদ্বান কে? আমার বলার উদ্দেশ্য এই, পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আপনাপন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির পরিচালনা করা।

আজকাল স্কুল কলেজ করা একটি ব্যবসা হইয়াছে। যাঁহারা স্কুলের সত্ত্বাধিকারী, তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, কিসে দুই টাকা লাভ হয়। ছাত্রদিগের নিকট হইতে রীতিমত মাহিনা প্রতিমাসে আদায় করা হয়। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের শিক্ষার জন্য তত ভাবেন না। অল্প বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং অনেক কলেজে শিক্ষকেরা প্রতিমাসান্তেও বেতন পান না। শুনিলে বিস্মিত হইবেন, আমার জনৈক বন্ধু কোন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন—সে দিন তাঁহার সহিত দেখা হওয়ায় শুনিলাম, তাঁহার চাকরীর জবাব হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, পরীক্ষার ৫।৬ মাস পূর্ব্বে অনেক অধ্যাপককে জবাব দেওয়া হয়। ঐ সময়ে কলেজের ২য় ও ৪র্থ বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য ছাত্রদিগকে অবকাশ দেওয়া হয়। ঐ অবকাশে ২।৪ জন প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্যতীত অধস্তন অধ্যাপকদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। দেখুন সত্বাধিকারীর মতলব কি। ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক বেতন অগ্রিম আদায় করিবেন, কিন্তু শিক্ষকদিগকে মাসান্তেও বেতন দেন না। সে বরং ভাল, একেবারে হঠাৎ ছাড়াইয়া দেওয়া অতীব ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অন্যায়। এরূপ স্থলে শিক্ষকদিগের নিকট হইতে পরিশ্রম বা যত্ন কি রূপে আশা করা যাইবে? শিক্ষকেরাও এক রকম গোলমাল করিয়া ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। অতএব কেবল ব্যবসার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত নয়। বিদ্যাদান কিছু প্রতিদান ব্যতীত হইলেই ভাল হয়। যদি দেশ কালের গতিকে তাহা না ঘটিয়া উঠে, অন্ততঃ ন্যায়মত কার্য্য করা উচিত।

শিষ্যের বা ছাত্রের, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। শিক্ষকের বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। শিক্ষকের আজ্ঞা পালন করা ছাত্রের প্রধান ধর্ম্ম। "গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক।" শিক্ষা অনেক জিনিষ হইতে পাওয়া যায়। কেবল শিক্ষা গ্রহণ করিতে জানিতে হয়। মনে যথার্থ শিক্ষার ইচ্ছা থাকিলে সুশিক্ষকের

অভাব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছাই সুশিক্ষক আনিয়া দেয়। বিনয়, নম্রতা, আজ্ঞাবহতা প্রভৃতি কতিপয় গুণ ছাত্রের একান্ত আবশ্যক। শিক্ষক বা গুরুর বাক্যে একান্ত বিশ্বাস থাকা চাই। কোন মঠে একব্যক্তি শিষ্য হইতে আসে। শিষ্য হইলে কি কি করিতে হইবে, তাহাকে বলা হইল। শিষ্যকে গুরুর সেবা, মঠ পরিষ্কার রাখা, ঠাকুর পূজা, আবশ্যক হইলে আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করা, জল তোলা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে শুনিয়া সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, গুরুকে কি করিতে হয়? গুরু কেবল আজ্ঞা করিবেন ও সেবা গ্রহণ করিবেন শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, আমাকে গুরু বানাইয়া দাও। দেখুন, গুরুকে কোন কার্য্য করিতে হইবেনা শুনিয়া সেই ব্যক্তি গুরু হইতে চাহিল। একবার ভাবিল না, শিষ্য না হইয়া গুরু হইবে কি করিয়া। গুরু হইবার পূর্ব্বে গুরুকে কত তপস্যা, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কত সেবা করিতে হয়, সে ব্যক্তি একবার ভাবিল না। গুরুর সুখের কথা শুনিয়া একেবারে গুরু হইতে চাহিল। আমাদেরও সচরাচর এইরূপ হইয়া থাকে। আলস্য-পরবশ হইয়া আমরা কষ্ট স্বীকার করিতে একেবারে বিমুখ। অতএব ছাত্রের আলস্য বা সুখভোগেচ্ছা না থাকে। আলস্য ও বিলাসিতা অনর্থের মূল। আর এক কথা,—ছাত্রের একান্ত উদ্যম থাকা চাই। ভয় একেবারেই না থাকে। আমি এ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবনা, ইহা বড় কঠিন ইত্যাদিরূপ ভয় একেবারেই থাকিবে না। চাহিতেছ শিক্ষিত হইতে, পাঠকে কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়া শুনা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। যদি কষ্ট স্বীকার না করিয়া পণ্ডিত হইতে পারা যায়, তাহাতে তুমি খুব প্রস্তুত। পণ্ডিত হইয়া যশোলাভের ইচ্ছা আছে, কিন্তু পড়াশুনা কঠিন বলিয়া বলিতেছ, পড়িয়া শুনিয়া কি হইবে। যদি এরূপ মনে কর, মহা ভ্রমে পড়িয়াছ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এইরূপ মোহ দূর করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রতিপক্ষীয় সেনাপতিগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে মোহ ও ভীতি উৎপন্ন হয়। অর্জ্জুন কর্ত্তব্যানুরোধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও মোহ ও ভীতি প্রযুক্ত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে অর্জ্জুনের মোহ নাশ করেন। কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইয়া অভিমান ও ভয়ে

অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। ভগবান্ অন্তর্যামী, অর্জ্জুনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিলেন এবং যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। এইজন্য বলি, সকল বিষয়ে আফলসিদ্ধি উদ্যম থাকা চাই। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে মন আমাদিগকে ঠকাইতে চাহিতেছে; মনের এই জুয়াচুরি দূর করিতে হইবে। বিচারপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক হেতু কি বুঝিতে হইবে।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকলকেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যিনি সন্ন্যাসী, তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। আমি আমার ইত্যাদি অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার স্তুতি ও নিন্দায়, শীত ও উষ্ণে সমভাব হইবে। তিনি সর্ব্বদা ভাবিবেন, আমি নিত্য, শুদ্ধ, চিন্ময়। তাঁহার প্রধান সাধন ত্যাগ। যিনি ব্যবসায়ী, তাঁহাকেও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ব্যবসার উন্নতির জন্য আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা, আলস্য প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় অন্তরায় ত্যাগ করিতে হয়। যিনি ছাত্র, তাঁহাকে কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যিনি শিক্ষক, তাঁহাকেও ছাত্রের কল্যাণের জন্য সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ত্যাগ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। ব্যবহারিক বল, পারমার্থিক বল, সকল বিষয়েই সিদ্ধির জন্য ত্যাগের আবশ্যক। স্বার্থত্যাগই প্রধান ধর্ম্ম। যে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোন শিক্ষার অভাব নাই। যাহার চিত্ত উদার হইয়াছে, যে সর্ব্বভূতে সমদর্শন করে, তাহার আর বাকী কি? সমগ্র গীতার উদ্দেশ্য এই ত্যাগ শিক্ষা। এই ত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গীতা শব্দটী দশবার উচ্চারণ করিলে ত্যাগী হইয়া যায়। এই ত্যাগই ধর্ম্ম। আসুন, আজ এই শুভদিনে আমরা সকলে আপনাপন স্বার্থত্যাগ করিতে ব্রতসংকল্প হই! সকলে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিলে একটী মহৎ কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেকে আপনাপন বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা পরিষ্কার করিলে সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রথমে এই গ্রামের যে সমস্ত অভাব আছে, তাহাই দূর করিতে আমরা চেষ্টা করি, আসুন। সকলের একত্রিত উদ্যমে কিনা সিদ্ধ হয়?

৺স্বামী বিবেকানন্দ।

(হিন্দু পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বঙ্গের সুকীর্ত্তিমান সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সেই নবোদীয়মান মূর্ত্তিমান প্রতিভা আজ অস্তমিত। স্বামী বিবেকানন্দের এই অকাল-কাল-প্রাপ্তিতে আজ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শোক-স্পৃষ্ট। ফলে "অকালমৃত্যু" কথাটা লৌকিক বিচারের কথা মাত্র। যে কোন কালের মৃত্যুই সেই মৃতের পক্ষে কাল মৃত্যু। অকালে মহাসংহারিণী সাংঘাতিকতাও অনায়াসে অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু কালে অতিদুর্লক্ষ্য সামান্য সূত্রেও অলক্ষ্যে জীবন-সূত্র ছিন্ন হয়।

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

অর্থাৎ—

অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে॥

কে ভাবিয়াছিল যে, এত শীঘ্র এই পৃথিবী-প্রখ্যাত নবকীর্ত্তিমান ধর্ম্মপ্রচারক পরলোক প্রাপ্ত হইবেন? কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা জন-রঞ্জন অভিনয় করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ কোন অপরিহার্য্য কারণে সূত্রধার কর্ত্তৃক নেপথ্যে আহুত হন, তবে সেই আকস্মিক অভিনয়-ভঙ্গের অনিবার্য্য হেতুত্ববোধাভাবে দর্শকমণ্ডলীতে যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দের এই আকস্মিক তিরোধানে অস্মদ্দেশে অনেকের অন্তরে সম্ভবতঃ সেই ভাব লাগিয়াছে। অবশ্য পরলোকগত স্বামীজীর সম্বন্ধে সকলের অভিমত সমান নহে; আর তাহা হওয়াও অসম্ভব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিন্দকের অভাব নাই। আজ যাঁহার গীতার সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে জগদ্ব্যাপী গৌরব, তাঁহারই সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়ী মহালীলা বিষয়ে আজিও এই ভারতেই শত মতভেদ বর্ত্তমান। এ হেন পরম-প্রেমাবতার অকলঙ্ক চন্দ্র গৌরচন্দ্রের চরিত্র-চন্দ্রিকাও অনেকের হৃদয়ান্ধকূপে প্রবিষ্ট

হইতেছে না! তবে বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সহস্র মতভেদ থাকিলেও তিনি যে অন্ততঃ একজন সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক ও সুপ্রতিভাবান শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। পাশ্চাত্য ভূমে তাঁহার ন্যায় সুগৌরব-সমাদর লাভ অতি অল্প ভারতবাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেন ইউরোপে বাঙ্গালী নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের—বিশেষতঃ বেদান্তবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব তত্ত্বব্যাখ্যায় যুগপৎ ইউরোপ ও আমেরিকাকে এরূপ বিস্মিত ও বিমোহিত করিতে বিবেকানন্দের ন্যায় কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। আজ নিত্যনবোন্নতিবিলাসী সর্ব্বোন্নতিপ্রয়াসাভিলাষী মার্কিন সমাজে আমাদের দরিদ্র বিবেকানন্দ বেদান্ততত্ত্ব চর্চ্চার তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া, নবধর্ম্মোন্নতির যে উদ্যম উৎসারিত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তাহা কালক্রোড়-পোষণে কালে কি আকার ধারণ করিবে, কে জানে? সে তরঙ্গ আজ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক তরঙ্গায়িত করিতেছে।

চিকাগোর সেই সর্ব্বধর্ম্মসমালোচনা মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই পাশ্চাত্যচিত্তচমৎকারিণী বক্তৃতা আমরা মুদ্রিত পুস্তিকায় পাঠ করিয়াছি; তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব মৌলিকতাময়ী, অথচ সৎশাস্ত্রানুসারিণী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানানুরাগিগণের বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহিণী। তার পর ইংলণ্ড এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় ছিল। অপর, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যল্প কাল মধ্যে যে কতিপয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহারই অভিভাবকতায় উদ্ভূত ও পরিচালিত "উদ্বোধন" নামক সাময়িক পত্রটিও বেশ চলিয়াছিল। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিত, সতীর্থ ও সহকারিগণের সম্যক্ সাত্ত্বিক যত্ন থাকিলে, এখনও উহা ভাল চলিতে পারিবে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই প্রতিভা ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত "রামকৃষ্ণ মিশন" এখনও আমাদিগের আশাস্থল। আশা করি, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত অথচ সমুজ্জ্বল জীবনের

স্থমহান্ উদ্দেশ্যের অনুসরণেই রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্য চলিবে।

আমাদের বোধ হয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও প্রচারণ; দ্বিতীয়, উন্নততম আধ্যাত্মিক আদর্শে ভারতীয় জাতিসাধারণের সমুন্নয়ন এবং তৃতীয়, পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের ধর্ম্মগুরুত্ব প্রতিষ্ঠাপন। বেদান্ত—বেদের অন্ত বা শেষভাগ; অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বা সার ভাগ। "বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্"—বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। এই মূলেরই সর্ব্বশেষ পরিণতি বেদান্তামৃতফল। যে বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার বলে ভারত একদিন জগৎগুরুত্ব পদ লাভ করিয়াছিল, যে ব্রহ্মবিদ্যার অবনয়নে আজ ভারতের এই অত্যবনতি এবং যে ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুত্থানেই কেবল ভারতের আশা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্তবিদ্যার পুনঃসঞ্জীবন সুসাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্যই হউক, বিবেকানন্দের জীবন তৎসঙ্কল্পেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

তার পর, বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচারের একদেশ-দর্শিতার পরিবর্ত্তে স্বাধিকারানুযায়ী সর্ব্ব সাধারণে্য তৎপ্রচারই বিবেকা-নন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেকে হয়ত তাঁহাকে হিন্দুসমাজ-বিপ্লাবক ভাবিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সামাজিক বিপ্লব না ঘটাইয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর ভাবে যেরূপ সংস্করণ বা পরিবর্ত্তন সমাজোন্নয়নার্থ আবশ্যক, তাহাই তাঁহার উদ্দিষ্ট ও কর্ত্তব্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি অবশ্য জগদাচার্য্য ব্রাহ্মণ জাতির অবনয়ন অভিলাষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ আপন অধিকারে উন্নতই থাকুন, বরং আত্ম সংস্কার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবনতির প্রতীকার করুন; আর সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে আত্মগঠন পূর্ব্বক উন্নত হউন, বিবেকানন্দের তাহাই আশা। গুণ, জ্ঞান, সদাচার, এ তিন লইয়াই সভ্যতা, অতএব সভ্যতাই মনুষ্যত্বের মূলধন। এই মূলধন কেবল কতিপয় "ভদ্র" আখ্যাধারী সম্প্রদায়বিশেষে চিরনিবদ্ধ না থাকিয়া অধিকারভেদে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতিসাধারণেই বিস্তারিত হউক, ইহাই বিবেকানন্দের উদার উদ্দেশ্য বা অভিমত।

সৃষ্টি ক্রমোন্নতিশীল; মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী। অতএব অব-

নতের উন্নয়ন বিপ্লবের কারণ নহে, উহা স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নতের অবনয়নই জগতের সর্ব্ব বিপ্লবের হেতু। অতীতসাক্ষী ইতিহাসের কুক্ষিতে ইহার শত উদাহরণ সুরক্ষিত। যাহা হউক, সাধারণতঃ লৌকিক নিয়মেও দেখা যায় যে, অজ্ঞান জ্ঞানী হইলে, দরিদ্র ধনী হইলে বা রোগী সুস্থ হইলে তাহাতে কোন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না; কিন্তু ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলে, জ্ঞানী জ্ঞানভ্রষ্ট বা সুস্থ রোগগ্রস্ত হইলেই যত বিপদ-বিপ্লব বিড়ম্বনা ঘটে। ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে অবনত হইলেই সমাজের অনিষ্ট; কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নত হইলে তাহাতে সমাজের বিশিষ্ট ইষ্টই হইবার কথা। অতএব ব্রাহ্মণাদি স্বপথে থাকুন, শূদ্রাদিও ব্রাহ্মণাদির আদর্শে আত্মোন্নয়ন সাধনে যত্নবান হউন, এই নীতিসূত্রই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের নিয়ামক।

তার পর, আমাদের এই গতগর্ব্ব, হৃতসর্ব্ব, অধঃপতিত ভারত আজ জগতের চক্ষে অপর সমস্ত বিষয়ে দীনহীন হইলেও, একটি বিষয়ে ইহা আজও ভূতলে অতুল। সেটি ইহার আধ্যাত্মিকতা রূপ অমূল্য সম্পদ। সাধারণ গ্রাম্য প্রবাদকথায় বলে, "রাজার হাতী মলেও লাক টাকা।" এ বিষয়ে সেই প্রবাদ প্রকৃতরূপেই প্রমাণিত। ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতির শিক্ষা-গুরুত্বের অধিকারী। এই অধিকার পৃথিবীর এই নবযুগে আবার পরিজ্ঞাত, প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হউক, এতদিচ্ছাই বিবেকানন্দের সর্ব্বোদ্দেশ্যের সারতম তৃতীয় উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্যের জনয়িত্রী। অধুনা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতের অনেক ঐহিকশিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং তদ্ভিন্ন ভারতের এই নবযুগানুসারী পুনরুন্নয়ন একান্তই অসম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যভূমি ভারতকে আর তুচ্ছ না করিয়া, পরন্তু গুরুগৌরবের চক্ষে দেখিলেই তাহার নিকট হইতে সে গুরুদক্ষিণা অনায়াসলভ্য হইতে পারে। এই জন্যই দরিদ্র বিবেকানন্দের বেদান্তবিদ্যালোকিত ক্ষুদ্র জীবনে বিশাল ও বিপুল আয়োজনের আশা জাগিয়াছিল। এই জন্যই চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভার সুযোগ বুঝিয়া, সুযোগ্য বিবেকানন্দের ছুটিয়া আমেরিকায় গমন এবং ভগবৎকৃপায় তথায় আশাতীত সুকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁহার সেই সুমহদুদ্দেশ্যের শুভ বীজবপন; এই জন্যই তাঁহার ইউরোপ-পরিভ্রমণ; ভারতের তীর্থপর্য্যটন; হিমালয়ের সাধুসিদ্ধ নিষেবিত দুর্গম প্রদেশ পরিদর্শন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যত্রয় সাধনার্থ তিনি ভারতে আবার সেই শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথায় কালোপযোগী ভাবে বেদান্ত বিদ্যার বিস্তার ও তদর্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় সুবিদ্বান সন্ন্যাসিমণ্ডলীমণ্ডিত মঠস্থাপন,তদ্রূপ কার্য্যক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমিত উৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়। বুঝি এই অভিশপ্ত দেশেরই দুর্ভাগ্য-দোষে এহেন ধর্ম্ম-বীর ও কর্ম্মবীরের আকস্মিক তিরোধান হইল। আর তাই বা বলি কেন ? প্রকৃতির রীতিই যেন এই। তৃণের জ্বলন বা ওষধির ফলনের ন্যায় যাহার প্রতিভার শীঘ্র শীঘ্র অতি অভ্যুদয় হয়, তাহার শীঘ্র শীঘ্র অবসানও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ইহা আমাদেরই যুগযুগান্তরের পরীক্ষাপূত "ফলিতজ্যোতিষ" শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই যেন পৃথিবীর অত্যল্পকালস্থায়ী অতিথি। যেন তাঁহারা পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া, আবার শীঘ্রই সে ভ্রম সংশোধন করেন। সেই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি হইতে আধুনিক রামকৃষ্ণ, কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অন্ততঃ এ দেশে ত প্রকৃতির এই নিয়মই দেখিতেছি। ভগবদিচ্ছায় আমাদের বিবেকানন্দও একটু অসাধারণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, অতএব তিনিই বা কিরূপে সে নিয়মের বহির্ভূত রহিবেন ?

চিকাগোর সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পূর্ব্বে আমাদের সেই নরেন্দ্র নাথ দত্তের এই বিবেকানন্দত্ব কলিকাতার কোন্ কোণে কয়জনে জানিত ? কিন্তু চিকাগোর সেই কাণ্ডের পরে, এমন একজন শক্তিশালী বাঙ্গালী যে এতদিন এদেশে লুক্কায়িতপ্রায় থাকিয়া অকস্মাৎ ঐ দূরাতিদূর বিদেশে উদিত হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ অনেকেরই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। বিবেকানন্দকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহার শিক্ষা সঙ্গ পাইতে অনেকেরই অন্তরে ঔৎসুক্যের উৎস ছুটিয়াছিল। তার পর, সেই বিবেকানন্দ দেশে ফিরিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মহালোকারণ্যের কৌতূহল-কোলাহলময়ী যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, সে সমারোহ স্বচক্ষে দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্বাসিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, সেই বৃহচ্চক্ষু-

বিভাসিত প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখচ্ছবি এত শীঘ্র কালযবনিকার অন্তরালে লুকাইবে। ফলে ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আর আক্ষেপের অপেক্ষা কি? তবে আমরা নাকি সংসার-মোহের দাস, তাই শোক-দুঃখ দুরাশা-নিরাশা, সব আমাদেরই চিত্তের নিত্যভোগ্য দণ্ড।' বিবেকানন্দ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সতীর্থ, সঙ্গী, সহকারী ও শিষ্যবর্গ; এবং তাঁহার সমর্থক, সহানুভাবক ও সাহায্যকারিগণ ঈশ্বরেচ্ছা জানিযাও নিরাশা ও নিরানন্দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, আশা করি, ভগবৎকৃপায় ক্রমে তাঁহাদের শোকভগ্ন ও নিরাশা-নিমগ্ন হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে। ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের সেই স্বর্গগত প্রিয় অধিনায়কের প্রদর্শিত পথে স্ব স্বধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা ও সহৃদয়তার বলে অস্খলিত পাদক্ষেপে পুনরগ্রসর হইতে পারিবেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুযোগ্য, সুবিদ্বান, সুপ্রতিভান্বিত ও সুধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা বিবেকানন্দকে হারাইয়াও তাঁহাদের দিকে আশ্বাসিত চক্ষে চাহিতেছি।

আমাদের পরমধামগ পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বলিয়াই বিবেকানন্দ পরিচিত। ফলে তিনি উক্ত পরমহংসদেবের নিকট রীতিমত কোন ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য বা সাধারণতঃ কৃপাশ্রিত জ্ঞানোপদিষ্ট শিষ্য, তাহা আমারা অবগত নহি; আর তদবগতির বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। তবে যুবক বিবেকানন্দ যখন বালক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তখনই তিনি পরমহংসদেবের বিশেষ স্নেহাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার বালক কৃপাশ্রিত-গণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই নাকি অগ্রগণ্য ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত মহা-পুরুষের মহাশীর্ব্বাদ ও মহতী কৃপাশক্তি যে নরেন্দ্রনাথের এই বিবেকানন্দত্ব লাভের অন্ততঃ বিশিষ্ট হেতু, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। "মহৎ-কৃপা-লেশ" ভিন্ন সাধারণতঃ কেহই কোনরূপ অসাধারণতা লাভে অধিকারী হয় না। যাহা হউক, বুঝি গুরু রামকৃষ্ণের বিরহ অধিক দিন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরকুমার জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ও আরব্ধ প্রিয় কার্য্যনিচয় অসমাপ্ত ফেলিয়াই গুরুচরণানুসরণ করিলেন। অতএব আমরা আশা করি, পরলোকে সেই গুরুকৃপাবলেই আমাদের বিবেকা-নন্দের আত্মা বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের শ্রীপদাশ্রয়ে চির শান্তি লাভ করুন।

শ্রীশঃ——

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।
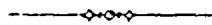
চিকাগো।
২ রা নবেম্বর, ১৮৯৩।

প্রিয়——

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ, তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আপনাকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তার পর হইতে ভগবান আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রাইট মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারো আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন, এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে, "শিল্পপ্রাসাদ" নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটী বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইএর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধি জৈন সমাজের প্রতিনিধি রূপে এবং এনিবেসান্ট ও চক্রবর্ত্তী থিয়-

সফির প্রতিনিধিরূপ আসিয়াছিলেন। মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। খুব ধুমধামের সহিত যাত্রা হইল, আমাদের সকলকেই প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল ও তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট আর প্লাটফর্ম্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতি পূর্ব্বক ধুমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন এক জন এক জন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুড় দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্ব্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই প্রস্তুত ছিলেন, সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি "আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তার পর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পর দিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং"—হে ভগবন্, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেই দিন হইতে আমি

একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম আর যে দিন হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটী সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, "কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই—বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল।" ইত্যাদি। আমি যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি জান, আমি নাম যশকে অতিশয় ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াই, তখনই আমার জন্য কর্ণ-বধিরকারী হাততালি পড়িয়া যায়। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমার যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি আর ইউরোপে যাইবার আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা—তোমরা যে টাকা পাঠাইয়াছিলে, তাহার মধ্যে আমি কুক কোম্পানির নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। নরসিংহাচার্য্য নামে একটী বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো সহরে অলসভাবে কাটাইতেছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভালবাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর প্যারিস একজিবিসন হয়, সেই বৎসর সে ইউরোপে আসে। আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে।

আর আমার বাটী ভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিষ জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে। ইহারা খুব সহৃদয় ও খোলা লোক। যে কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আইসে আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য্য ও লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে চাই। এসিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল, ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের স্বর্গস্বরূপ—সহজেই ইহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর এইদেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছে।

ভারতে যে "দৃঢ়চর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ান" (ইহা ইহাদেরই কথা) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগকে বিচার করিও না। এখানেও আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। আর এই মহান্ জাতি দ্রুতবেগে সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহা হিন্দুর প্রধান গৌরবের সামগ্রী।

হিন্দু যেন কখন তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্ম্মকে উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকেই সমুদয় পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অবনতির জন্য দায়ী করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল?

ফল হইল এই যে, সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, 'জাতিভেদ একটি ধর্ম্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যাহাই বলুন, জাতি একটী সামাজিক বিধান মাত্র। এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য্য সমুদয় করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারান সামাজিক ব্যক্তিত্ব জাগরিত করা যায়। এখানে যে কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে, আমি একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায়, সেই জানে, সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর স্বাধীনতাই উন্নতির এক মাত্র সহায়ক; স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে! এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, ব্রাহ্মণ জুতা ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর তাহার জীবিকার জন্য কোনরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধা নাই। ইহার ফল ঘোর প্রতিযোগিতা। সুতরাং সহস্র সহস্র ব্যক্তি, যে উচ্চ পদের উপযুক্ত, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া তাহা পাইতেছে। নীচে পড়িয়া থাকিয়া আর সুযোগ অবহেলা করিতেছে না।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তার পর ইউরোপে যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই সব যোগাইয়া দিবেন। সুতরাং তুমি সে বিষয়ে কিছু ভাবিও না। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থ ভাবে করিব, নাম যশের জন্য নহে।

আমাদের কার্য্য—কায করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ

কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধস্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেম সম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান্ তোমাকে; আশীর্ব্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ও যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের দরওয়ান তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব। প্রত্যেক আমেরিকান নারী, লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণ ও কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন? অবশ্য তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে।

মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কি না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

এই আশ্রম পূর্ব্বে দরিদ্রদুঃখপ্রতীকারসমিতি নামে অভিহিত ছিল। বিগত ভাদ্রমাসের উদ্বোধনে ইহার কতকটা কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গের স্মরণার্থ ইহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব।

বারাণসী হিন্দু মাত্রেরই পরম তীর্থ স্বরূপ। সংসারের লীলা খেলা শেষ করিয়া হিন্দু এই পরম ধামের সহায়তায় সেই পরম শিবে সম্মিলিত হইতে চাহে। তাই এখানে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অনাথ অনাথার সমাবেশ।

'অন্নপূর্ণার কৃপায় কেহ এখানে উপবাসী থাকে না,' এ প্রবাদ বাক্য সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক সত্য বটে, কারণ, এখানে শত শত অন্নসত্রে প্রত্যহ অন্ন বিতরিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কাল কলির কি প্রতাপ! অন্ন কে পাই-তেছে, তাহার কে খোঁজ রাখে! অসমর্থ, জীর্ণ, শীর্ণ, চলৎশক্তিহীনেরা কি এ অন্ন পায়? না, তাহাদের মুখের গ্রাস চতুর অলস বলবান লোকে গ্রাস করে! এ সংবাদ কে লয়? তার পর শুধু অন্নে মানুষের চলে না। রোগ হইলে উপায় কি? অথর্ব্ব ও নিরাশ্রয়গণের উপায় কি? যাঁহারা ৺কাশীর সমাচার বিশেষ অবগত, তাঁহারা জানেন, এ সম্বন্ধে ৺কাশীধামের কতদূর শোচনীয় অবস্থা। লোকে ৺কাশীতে যায় মরিতে সত্য, কিন্তু তাহাকে শান্তিতে মরিতে দাও। মনুষ্যসাধ্য সেবাযত্ন কর। এ কথা আমাদের অসারজ্ঞান-কচকচিপরিপূরিত, বিপথগামী কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরবিঘূর্ণিত কীটদষ্ট মস্তিষ্কে সহজে প্রবিষ্ট হয় না। জীবসেবা ধর্ম্ম এখনও হিন্দু জানে না।

যাঁহার শুভাগমনে সমগ্র জগতে আজ সত্যযুগের ছায়া পড়িয়াছে, সেই ভগ-বান শ্রীরামকৃষ্ণানুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক বীর শিষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরে-চ্ছায় এই শক্তি জাগিয়াছে। সেই শক্তিতে আজ ৺কাশীধাম তোলপাড় করিয়া দিতেছে। সেই অল্পবয়স্ক বালক বীর আজ অদ্ভুত আত্মত্যাগবলে সমগ্র জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। পাঠকগণ! যদি পুণ্যসঞ্চয় করিবার বাসনা থাকে, যদি অনাথ, আর্ত্ত, পতিতের ক্রন্দনে এক বিন্দুও হৃদয় বিগলিত হয়, যদি প্রত্যক্ষ নিষ্কাম ধর্ম্মে সহায়তা করিয়া ধন্য হইতে বাসনা জন্মিয়া থাকে, তবে ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

ঠিকানা—চারুচন্দ্র দাস, রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস সিটি।

এস মৃত্যু।

এস মৃত্যু, শান্তি শান্তি! হ'ক অবসান
জীবনের ক্ষীণ দীপ ; মোহন শ্মশান
কোলে লহ মর্ত্ত্য দেহ ; মিশুক ধূলায়
ধূলার শরীর এই পালিত মায়ায়।
যাক দূরে মিছে দ্বন্দ্ব, উৎকট বাসনা,
সন্দেহ, বিষয় তৃষা, অসাধ্য সাধনা।
খুলে যা'ক অনন্তের মধুর নির্ঝর ;
এস মৃত্যু, এস শান্তি, এস মনোহর।
কত কাল বল আর রহিব প্রবাসে?
কত কাল বদ্ধ রব দৃঢ় মায়াপাশে?
এস মৃত্যু, ভেঙ্গে দা'ও সোনার শিকল ;
অমৃতত্ব লভি, পেয়ে পরশ কোমল।
মুছে যা'ক সুখদুঃখ পূর্ব্ব স্মৃতি যত ;
চলে যা'ক শ্রান্তি, ভ্রান্তি ; হইব বিরত
বৃথা কাজে ; ভূমানন্দে করিব বিশ্রাম ;
এস মৃত্যু, এস শান্তি, এস প্রাণারাম।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বামীজীর প্রতি।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

প্রাণের আরাধ্য দেব! পাশরি মরত ধাম
যে দেশে গিয়েছ চলি সে দেশের কিবা নাম?
তোমার বিহনে নাথ, হৃদয়ে যে বজ্রাঘাত
পড়িয়াছে আষাঢ়ের বিংশতি দিনের পর,
যম যান্তনায় চেয়ে সে দুঃখ যে তীব্রতর॥ ১॥

সমগ্র পৃথিবী জুড়ি যে রোল উঠিল হায়!
তোমার বিহনে প্রভো! ভাষায় কি কহা যায়?
পরের কথায় যাঁর, ঝরিত নয়ন ধার,
সমগ্র ভূলোকবাসী কাঁদে এবে তব শোকে
তা শুনে কেমনে স্থির রয়েছ অজ্ঞাত লোকে? ২॥

অথবা সে লোকে বুঝি পশেনা মোদের কথা
পাপ পুণ্য সংসারের মায়া মোহ শোক ব্যথা!
তা হলে কি দয়াধার! আসিতে না একবার,
সান্ত্বনা প্রদান দিতে আমা সবে পুনরায়
যথায় গিয়েছ প্রভো! নিয়ে যাও মোসবায়॥ ৩॥

দেহ মন প্রাণ তব পদে করি সমর্পণ
ক্রীতদাস হইয়াছি ওহে জীবনের ধন!
তুমি কি যত্নের ধন, নররূপী ত্রিলোচন।
বুঝেছিল রামকৃষ্ণ হেরি তোমা বাল্যকালে।
আর বুঝিয়াছে তারা যাদিগে তুমি বুঝালে॥ ৪॥

কেন বা থাকিবে তুমি নশ্বর জগতীতলে ?
কে বুঝিল বঙ্গদেশে যথায় জনম নিলে ?
ঘোর দ্বেষ ঈর্ষানলে, নিয়ত যে দেশ জ্বলে,
পরের উন্নতি দেখি যথা লোকে ম্রিয়মান।
সে দেশে কি হতে পারে তোমার আবাসস্থান ?

ধন্য আমেরিকা, নমি সে দেশের নর নারী
যাঁহারা তোমার নামে ফেলে নয়নের বারি।
তাঁরাই সর্ব্ব প্রথমে, চিনাইল ভবধামে
অতুল্য প্রতিভা তব জ্ঞানভক্তি সমন্বয়।
দেশের রতন নাহি দেশেতে আদৃত হয়॥ ৬॥

রূপে গুণে প্রতিভায় তপস্যায় বাগ্মিতায়
তোমার তুলনা নাহি দুটী মিলে এ ধরায়।
যাঁরে কৃপা দৃষ্টি বলে, একবার ভুলাইলে,
সে যে ক্রীতদাস হয়ে চরণে বিকায়ে গেছে।
প্রাণ তার তব পদে, ভবে শুধু দেহ আছে॥ ৭॥

মূর্খ পণ্ডিতের দল দাম্ভিকতা মূর্ত্তিমান
তারা কি বুঝিবে তোমা ওহে গুরু মতিমান ?
মোদের অঞ্জন দিতে, এসেছিলে অবনীতে,
পরহিতে প্রাণ দিতে দেখি নাই এই ভবে।
বলেছিলে জীবহিতে আরো লক্ষ জন্ম নিবে॥ ৮॥

দেখেছে মানব শুধু কিঞ্চিৎ প্রতিভা ছটা,
কঠোর তপস্যা তব ভূলোকে জেনেছে কটা ?
জীব হিতে এসেছিলে, তপস্যার ফল দিলে,
ধন্য ধন্য অহেতুকদয়াসিন্ধো ! হে স্বামিন্ !
তব পাদপদ্মে যেন থাকে মতি চিরদিন॥ ৯॥

তোমার আদর্শ ভবে হয় নাই নাহি হবে
শপথ করিয়ে বলি—একথা না মিথ্যা হবে।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি, এসেছিলে আপ্তকামী,
পূর্ণ করিবারে লীলা রামকৃষ্ণ অবতারে।
আসিতে হইল ভবে অনিচ্ছায় দেহ ধরে॥ ১০॥

সপ্তর্ষি নিষ্প্রভ ছিল যতদিন ছিলে ভবে।
দ্যুলোক শ্রীহীন ছিল তোমার আলোকাভাবে॥
পূর্ণ এবে নিত্যধাম, কাঁদে কিন্তু অবিরাম,
ভূলোক বিরহে এবে ওহে চিদ্‌ঘনকায়!
কোন্ লোকে এবে তুমি—বলে দাও মো সবায়॥ ১১॥

যাইব তথায় তোমা একবার দেখিবারে,
কিছু না কহিব কথা—শুধু পদ স্পর্শিবারে।
সে ফুল্ল কমল আঁখি, শুধু একবার দেখি,
সেখানে থাকিব মগ্ন না ফিরিব ভবে আর,
করুণা করহ প্রভো। ওহে ভবকর্ণধার। ১২॥

ঘোর ঘনাচ্ছন্নাকাশে চপলার উন্মেষণ,
হেরিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিনু ফুল্লমন।
দ্বিগুণিত অন্ধকার, হেরি এবে চারিধার,
নিরাশায় শুষ্ক প্রাণ, আশ্বস্ত কর সবারে,
তুমি নাই ভবধামে—স্মরিলে হৃদি বিদরে॥ ১৩॥

এ জন্ম বৃথায় গেল, না সেবিনু ও চরণ,
কাচ বলি স্পর্শমণি করিলাম অযতন।
এবে অনুতাপানলে, নিয়ত হৃদয় জ্বলে,
কেননা শ্রীপদে সদা করিলাম অবস্থান
কেন কাটাইনু কাল লভিবারে ধন মান? ১৪॥

জন্মাবধি ত্যজিলে হে হেয় কামিনী-কাঞ্চন
জ্ঞান ভক্তি দয়া তব শ্রীঅঙ্গের বিভূষণ।
নয়নে বিবেক জ্যোতি, রসনায় সরস্বতী,
নিয়ত করিত বাস—অষ্টাদশ শক্তিধর !
তোমার সুনাম তাই গায় বিশ্বচরাচর॥ ১৫ ॥

এখন অভাব তব বুঝিযাছে নরলোক,
এখন তোমার তরে সবাই করিছে শোক।
কিন্তু যবে দেহ ছিল, কেহ তোমা না চিনিল,
রামকৃষ্ণদেব আর গুরুভ্রাতৃগণ বিনে।
আর যাহাদেরে কৃপা করেছিলে নিজগুণে॥ ১৬ ॥

কথায় করমে এক দেখাইলে এ জীবনে
মোহিত করিলে ধরা অতুল্য প্রতিভা গুণে।
তব গুণ বর্ণিবারে, মনোবুদ্ধি বাক্য হারে,
তুমি যে অখণ্ড নিত্য সচ্চিৎ আনন্দময় !
জন্মে জন্মে তব পাদপদ্মে যেন মতি রয়॥ ১৭ ॥

অকৃতী সন্তান তব—এ দীনের কেহ নাই
অন্তকালে যেন গুরো! শ্রীচরণে স্থান পাই।
তোমার সে পুণ্য নাম, রসনায় অবিরাম,
বলিতে বলিতে যেন এ দেহ পতিত হয়।
বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়॥ ১৮ ॥

দারিদ্র্য ও অর্থাগম।

(স্বামী সারদানন্দ।)

গত ২০০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের ধনভাণ্ডার জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ধনের জন্যই এ দেশের অন্য নাম "সোনার ভারত।" যবন কবিগণ আবহমান কাল হইতে এই ধনের কথা গান করিয়াছে। এসিয়া ও ইউরোপে যখন যে রাজা বলশালী হইয়াছে, ভারতের ধন রাশির দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহারই রসনায় জল ঝরিয়াছে। ইহুদী রাজর্ষি সোলেমানের রাজত্বকালে ভারতের চন্দনকাষ্ঠ, ধূপ, হীরকাদি রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র এবং বানর, ময়ূর প্রভৃতি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়, এ কথা বাইবেলের পূর্ব্বকাণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। বিলাসী রোমক সম্রাটের বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ভারতের মস্‌লিন কিংথাপে প্রস্তুত হইত। ভারতের সহিত বাণিজ্যাধিকার স্থাপনের জন্যই পর্ত্তুগিজ নাবিক যোদ্ধা ভাস্কো দে গামার অপূর্ব্ব উদ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতাগমনের জলপথ আবিষ্কৃত। ঐ উদ্দেশ্যেই কলম্বসের আমেরিকা পদার্পণ এবং ভারতভ্রমে উক্ত মহাদেশের পশ্চিম ভারত নামকরণ। আবার ঐ উদ্দেশ্যেই ইংরাজ বণিকের ভারতে শুভাগমন এবং ক্রমে ভারতাধিকার। এইরূপ কত কথাই না ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

কিন্তু সেই ধনরাশি যেন মায়াবীর কুহক দণ্ড স্পর্শে আজ কোথায় অন্তর্হিত এবং সেই ভারতের বর্ত্তমান দরিদ্রতা, জগতের সহৃদয় নরনারীর দয়াবিগলিত অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা দিতেছে। এখনও কি দরিদ্রতার তলস্পর্শ হইয়াছে? কে জানে? কতদূরে গিয়া যে আবার ভাগ্যচক্র ঘুরিবে, আবার লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক, দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের পরিচয় মহোদয় ডিগ্‌বি সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নের তালিকা হইতে কতক পাইবে।

সাল।	প্রত্যেক প্রজার গড়পড়তা দৈনিক আয়।
১৮৫০ খৃষ্টাব্দ	২ পেন্স -৶০ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নহে, অপর লোকের গণনা।

১৮৮২	১½ ঐ =/১০ সরকারী কর্ম্মচারীদের গণনায় আবিষ্কৃত।
১৯০০	¾ ঐ =৻১৫ উইলিয়ম ডিগ্‌বি সাহেবের গণনা।

দরিদ্রতা তো বাপের ঠাকুর, সমগ্র প্রজার আয় ধরিয়া প্রজা-সংখ্যায় বিভাগ করিয়া একটা মোটামুটি গড়পড়তা হিসাব করিলে, প্রত্যেক প্রজার অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য বাৎসরিক আয়ভাগে ডিগ্‌বি সাহেবের গণনায় সতের টাকা এবং বড়লাট কর্জ্জন সাহেবের গণনায় ত্রিশ টাকা মাত্র হয়!!! ইহাও আবার যে বৎসর প্রচুর শস্যাদি হয় এবং দুর্ভিক্ষাদি না থাকে। এই সতের টাকা বা ত্রিশ টাকা আয়ে তাহার এক বৎসরের অন্নবস্ত্র চলিতে পারে কি না, তাহা পাঠক একবার ভাবিয়া দেখিও।

বিচিত্র নহে, করালবদন নরমাংসাদ দুর্ভিক্ষ এখন ভারত প্রজার পরিবারান্তর্গত অন্যতম পোষ্যবিশেষ হইয়াছে এবং প্রজাহিতরত ব্রিটিশ রাজকে এই নবপ্রসূত দারিদ্রসূনু বিকটাকার দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রামের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে হইতেছে। কিন্তু ঐ চেষ্টা উগ্রমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ শরীরের একেবারে উচ্ছেদের দিকে না হইয়া কেবল তাহার তাৎকালিক দৌরাত্ম্য মাত্র নিবারণের দিকে হওয়ায় ধীরে ধীরে ঐ শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। এ তথ্য বুঝাইতে বড় বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হইবে না। একবার ডিগ্‌বি সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত উনবিংশ শতাব্দীর দুর্ভিক্ষতালিকা দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৎসর।	দুর্ভিক্ষ সংখ্যা।	মৃত্যু সংখ্যা।
১৮০০—১৮২৫—২৫	৫	দশ লক্ষ (সম্ভবতঃ)।
১৮২৫—১৮৫০—২৫	২	পাঁচ লক্ষ (সম্ভবতঃ)। (সরকারি পুস্তকে লিপিবদ্ধ)
১৮৫০—১৮৭৫—২৫	৬	পঞ্চাশ লক্ষ।
১৮৭৫—১৯০০—২৫	১৮ (!!!)	দুই কোটী ষাট লক্ষ (!!!) (সরকারি গণনায় ধৃত)।

এই তালিকার সহিত নিম্নোদ্ধৃত তালিকাটী তুলনা করিয়া দেখিলেই দেশে যে দিন দিন দরিদ্রতা কত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কতক

আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ডিগ্‌বি সাহেব বলেন, ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব শতাব্দী সকলের এই নিম্নোদ্ধৃত দুর্ভিক্ষতালিকা একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক এবং দুইজন যোগ্য ভারতবাসীর দ্বারা প্রস্তুত।

শতাব্দী।	দুর্ভিক্ষ সংখ্যা।	দুর্ভিক্ষাধিকৃত ভূমি পরিমাণ।
একাদশ	২	যে দুই জেলায় অন্ন উৎপন্ন হয় নাই।
ত্রয়োদশ	১	দিল্লীর চতুর্দ্দিকে মাত্র।
চতুর্দ্দশ	৩	তিন জেলায় মাত্র।
পঞ্চদশ	২	দুই " "
ষোড়শ	৩	তিন " "
সপ্তদশ	৩	বহুস্থানব্যাপী—আক্রান্ত ভূমি পরিমাণ অজ্ঞাত।
অষ্টাদশ	৪	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, দিল্লী এবং সিন্ধুপ্রদেশ।

আর এককথা, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ অল্পস্থানব্যাপী; ঐ দুর্ভিক্ষ দুই চারিটী পরগণা বা জেলা লইয়া হইত। কিন্তু ঐ শতাব্দীর পরার্দ্ধের দুর্ভিক্ষ গুলি বহুদূরব্যাপী। বিশেষতঃ, শেষ দুইটি (১৮৯৬ ও ১৯০০) সমগ্র দেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার দুই ভাগেরও অধিক ভূমি অধিকার করিয়াছিল। ডিগ্‌বি সাহেব এই অপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ বিস্তার সহজে বুঝাইবার জন্য গণনায় দেখাইয়াছেন,--

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০৭ বৎসর ব্যাপিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেশের যুদ্ধ বিগ্রহে লোকমৃত্যুসংখ্যা—

পঞ্চাশ লক্ষ।

এবং

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর দুর্ভিক্ষে ভারতীয় প্রজার মৃত্যু সংখ্যা—

এক কোটি নব্বই লক্ষ (!!!)।

প্রায় চতুর্গুণ !!!

স্বল্পকালপ্রসূত দুর্ভিক্ষ শিশুর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর হইতেই এই অভূতপূর্ব্ব শরীর বিস্তারের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকে অনেক কথা কহিয়াছেন। স্বল্পবুদ্ধি জনসাধারণ, অনাবৃষ্টি এবংলোকসংখ্যাবৃদ্ধিরূপ

যে কারণ দুইটি নির্দ্দেশ করিয়া এই জটিল প্রশ্নের সরল সমাধান করিয়া থাকেন, তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞেরা সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদপ্রসূত মনে করেন। চিরকালই মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর বৃষ্টিপাতের অভাব হইয়াছে। কিন্তু কখনই ত দুর্ভিক্ষশরীর এত পুষ্টিলাভ করে নাই। আর দেশের ক্ষেত্রফল ধরিয়া ইউরোপের অনেক দেশের সহিত ভারতের লোক সংখ্যার তুলনা করিলে ইউরোপান্তর্ব্বর্ত্তী সকল দেশেরই লোক সংখ্যা এবং সমকালিক লোক বৃদ্ধির হার ভারতাপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রমাণিত হয়। অতএব অনাবৃষ্টি ও লোকসংখ্যাবৃদ্ধি যে দুর্ভিক্ষ বিস্তারের কারণ নহে, তাহা স্থির। তবে উহার কারণ কি? তাঁহারা নিম্নলিখিত কারণ পঞ্চক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১ম এবং প্রধান কারণ,—দেশের আয়ের অধিকাংশ রাজস্ব এবং অন্যান্য বিভাগ দিয়া প্রতি বৎসর বিলাত গমন করিতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে তৎসমকক্ষ মূল্য ভারত ফিরিয়া পাইতেছে না। দেশে আয় থাকিলে কি হইবে? গত দুই শত বৎসর ধরিয়া যে ধনরাশি পূর্ব্বোক্ত ভাবে বাহিরে গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে, তাহার অভাব পূরণ করিবার উপায় নাই এবং উহা এত দিনে এই ভাব ধারণ করিয়াছে। ভিন্নদেশবাসী রাজার ভিন্ন রাজ্য পরিচালনার এই ফল অনিবার্য্য ও সর্ব্বত্র লক্ষিত।

২য়,—প্রজার অভাবের দিকে তত লক্ষ্য না রাখিয়া রাজার রাজস্ব আদায়ের দিকেই বিশেষ মনোযোগ এবং অত্যধিক করনির্দ্ধারণ।

৩য়,—কৃষিই ভারতের প্রধান বৃত্তি। সেই কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য আবশ্যক—জল। স্বাভাবিক জলাভাবে আবশ্যক—কৃত্রিম জলপ্রণালী খনন। কিন্তু এ দিকে যত ব্যয় করা হইয়াছে, তদপেক্ষা সাতগুণ অধিক মুদ্রা ব্রিটিশরাজ বাষ্পীয় যানের লৌহময় বর্ত্ম বিস্তারে এতাবৎকাল ব্যয় করিয়াছেন।

৪র্থ,—দেশে খাদ্যের অভাব তত নহে; কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ সেই খাদ্য ক্রয় করিবার শক্তি প্রজার নাই এবং সেই দারিদ্র্যের দিন দিন বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইতেছে না।

৫ম,—দরিদ্র ভারতের রাজ্যপরিচালনযন্ত্র অনেক ধনী দেশাপেক্ষাও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ, যথা, রাজকর্ম্মচারীদের মাহিনা এবং পেন্সনের অত্যধিক হার নির্ণয়।

ইংলণ্ড ভিন্ন দেশের খৃষ্টান পাদ্রিদের ভিতরও কেহ কেহ ভারতেতিহাস পর্য্যালোচনায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমেরিকার বোস্তন সহর হইতে প্রকাশিত নিউ ইংলণ্ড ম্যাগাজিন নামক মাসিক সংবাদপত্রের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পাদ্রি জে, টি,' সণ্ডরল্যাণ্ড ভারত দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয়সূচক প্রবন্ধে ঠিক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ব্বযুগের রোমক সম্রাটদিগের ন্যায় ইংরেজ ভারত শোষণ করিয়া নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিদেশী রাজাকে বাৎসরিক আড়াই বা তিনকোটি পাউণ্ড (১ পাউণ্ড=১৫,) রাজস্ব দান, ভারতের কেন, পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবং ভারতীয় রাজ্যবিভাগের ন্যায় ব্যয়শীল রাজ্য বিভাগ এবং রাজকর্ম্মচারীদের এত মাহিনা ও পেন্সন, সমদরিদ্র আর কোন দেশে দেখা যায় না।

ডিগ্‌বি সাহেব বলেন, এই ভীষণ দারিদ্র্যপেষণে ভারতীয় প্রজার আয়ুপরিমাণও দিন দিন হ্রাস হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রজার গড়পড়তা আয়ুপরিমাণ চল্লিশ বৎসর আর ইংরেজ রাজের ভারতীয় প্রজার গড়পড়তা জীবিতপরিমাণ বাইশ বৎসর মাত্র।

ভারতীয় প্রজার দারিদ্র্য বুঝিতে হইলে ভারত ভিন্ন অপরাপর দেশীয় প্রজার বাৎসরিক আয়তালিকা একবার দেখিলেই হইবে। ডিগ্‌বি সাহেবের পুস্তকে নিম্নলিখিত তালিকাটি সন্নিবেশিত আছে,—

দেশের নাম।	প্রত্যেক প্রজার বাৎসরিক আয়।
ভারত	১ পাউণ্ড = ১৫৲ টাকা।
রুসিয়া	১১ „ = ১৬৫৲ „
ইটালি	১২ „ = ১৮০৲ „
জর্ম্মানি	২২ „ = ৩৩০৲ „
কানাডা	২৬ „ = ৩৯০৲ „
ফ্রান্স	২৭ „ = ৪০৫৲ „
আমেরিকার যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স)	৩৯ „ = ৫৮৫৲ „
অষ্ট্রেলিয়া	৪০ „ = ৬০০৲ „
স্কটল্যাণ্ড	৪১ „ = ৬১৫৲ „

ডিগ্‌বি সাহেবের পুস্তক হইতে আর একটি তালিকাও এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল।

ইংলণ্ড এবং ভারতবাসী প্রজার বৃত্তি নির্ণয়।

	কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত।	শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত।	অন্যান্য উপায়ে জীবিকাসংগ্রহে নিযুক্ত।
ভারতীয় প্রজা	শতকরা ৮৬	শতকরা ১২	শতকরা ২
ইংলণ্ডীয় প্রজা	,, ১৪॥	,, ৩০॥	,, ৫৫

এদিকে আমাদের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট কর্জ্জনপ্রমুখ প্রায় যাবতীয় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর মতে ব্রিটিশরাজের ভারতীয় প্রজার দিন দিন ধনবৃদ্ধি হইতেছে, এবং ভারতসাম্রাজ্য দিন দিন সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে। ভারত দরিদ্র হইতেছে, একথা বলিলে রাজা এবং রাজশাসন প্রণালীর ঘাড়েই দোষ পড়ে, এজন্য ইহা তাঁহাদের ভাল না লাগিবারই কথা। ডিগ্‌বি সাহেবের "ব্রিটিশরাজের সমৃদ্ধভারত" নামক পুস্তকখানি বাহির হইবার পর, উহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, অতএব বিশ্বাসের অযোগ্য, এ কথা জন সাধারণকে বুঝাইতে রাজকর্ম্মচারিগণের উদ্যম, প্রয়াস এবং যত্নও দেখা গেল। ভারতীয় প্রজার গড়পড়তা দৈনিক আয় তিন পয়সা নয়, পাঁচ পয়সা, এই প্রকার গণনা এবং বিচারাদি হইল। কিন্তু ভারতীয় প্রজার গড়পড়তা দৈনিক আয় পাঁচপয়সা স্থির হইলেও ভারত দরিদ্র। এ কথা বুঝিতে অধিক যুক্তি আবশ্যক করে না। এ ভীষণ দারিদ্র্য বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষাধিকার দেশ হইতে বিদায় হওয়া অসম্ভব। কারণ, কেমন করিয়া তিন চারি পয়সায় বা রাজকর্ম্মচারীদিগের গণনায় স্বীকৃত ছয় পয়সায় প্রজার দিন যাপন হইতে পারে? অন্নাভাবে শীর্ণতনু প্রজাসমূহ কেমনেই বা লবণ ব্যবহারে পর্য্যন্ত করপ্রদান করে আর কেমনেই বা যথোচিত উৎসাহে দুই পয়সা ব্যয় করিয়া উপস্থিত রাজোৎসবে দিল্লীদরবারের আমোদ প্রমোদে যোগদান করে, ইহা ভাবিয়া উঠা যায় না।

হে পাঠক, আমরা রাজনীতিজ্ঞ নহি। রাজনীতির কূট প্রশ্ন বুঝিতে আমাদের সামর্থ্য এবং প্রয়োজনও নাই। সোজাসুজি উপায় ধরিয়া তোমার পরিচিত এবং আমার পরিচিত সহর বা পল্লীগ্রামবাসী ব্যক্তিদের বিষয় অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? দরিদ্রতা, অন্নাভাব, হাহাকার! যে গ্রামে আগে বিশখানা দুর্গাপ্রতিমা বাহির হইত, সেখানে এখন পাঁচ সাত খানা বাহির হয় কি না সন্দেহ। যেখানে পার্ব্বণাদিতে অকাতরে অন্নদান হইত, দেখা

বা শুনা গিয়াছে, সেখানে মুষ্টিমেয় চাউল ভিক্ষা দিতেও লোকে কাতর। দেবালয়, জলাবতরণ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মহাভারত বা পুরাণাদির কথাদান কত কমিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ। দানাভাবে দেশের কতগুলি টোলের লোপ হইযাছে, তাহাও ভাবিও এবং যে গুলি এখনও বর্ত্তমান, তাহাদের পূর্ব্বাবস্থার সহিত তাহাদের আধুনিক অবস্থারও একবার তুলনা করিও। অর্থাভাবে অধ্যাপকেরাও কতদূর ধনীর মুখাপেক্ষী হইযাছেন এবং স্বাধ্যায়ে কালক্ষেপ না করিয়া তোষামোদে ধনীর মনোরঞ্জনেই কালযাপন করিতেছেন, তাহাও ভাবিতে ভুলিও না। বলিতে পার, সংস্কৃতচর্চ্চা অর্থকরী না হওয়াতে অধ্যাপকদের অবস্থা হীন হইয়াছে অথবা আপাত ইন্দ্রিয়সুখকর পাশ্চাত্য ভোগবিলাসাদিতে লোকে অর্থব্যয় করিতেছে, এজন্য অধ্যাপকের বিদায়াদি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পুরাতন প্রথা ও কীর্ত্তি প্রিয় হিন্দু পরিবার, আয় থাকিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত চাল চলন ঠিক বজায় রাখিত। দূরে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? ভারত সম্রাটের রাজধানী কলিকাতার ভিতরই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর লোকের ধার কর্জ্জ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতে হয এবং পরিবারপোষক রোজগারি পিতা বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে স্বজনবর্গ যে কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হয়, তাহাও সকলের প্রত্যক্ষ। যে যাহাই সিদ্ধান্ত করুক, দেশে যে ক্রমে দারিদ্র্য বিস্তার হইতেছে, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এখন উপায়?

উপায় রাজার হাতে যতদূর আছে, তিনি তাহা বুঝিয়া অনুষ্ঠান করুন। না করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, দারিদ্র্যতাড়িত প্রজার অনুষ্ঠিত পাপরাশির অংশী হইযা রাজশ্রী দ্রুতপদসঞ্চারে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে। কাহারও রোধ করা সাধ্যায়ত্ত হইবে না। পূর্ব্বকালীন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতির ন্যায় আমরা এখন রাজগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত নহি এবং বর্ত্তমান কালের ইউরোপ,আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীনদেশের স্বাধীনস্বভাব প্রজার ন্যায় আমাদের মন ও মুখ বন্ধনমুক্ত নহে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উহা অনধিকারচর্চ্চা। আর চর্চ্চা করিলেই বা "শুনতা কৌণ"? গল্প আছে, রাবণবিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া কোনসময়ে এক ভেকের উপর আপন ধনুকের অগ্রভাগ রাখিয়া দণ্ডায়মান হন। ভেক রুধিরাক্তদেহ এবং বেদনায় অধীর হইয়াও পলাইবার উদ্যম বা চীৎকার করিল না। কিয়ৎকাল পরে ধনুর

অগ্রে রুধির ধারায় দৃষ্টি পড়ায় রামচন্দ্রের চেতনা হইল। তখন ধনুর চাপে মৃতপ্রায় ভেককে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভেক, তুমি সাপে ধরিলে বা সামান্য আঘাত পাইলে কত চীৎকার কর, আর আমার এই গুরুভার ধনুকের আঘাতেও ডাকিলে না যে?" ভেক বলিল, "দুঃখে কাতর হইয়া দুঃখ দূর কর বলিয়া লোকে রামকে ডাকে। কিন্তু সেই রামের মার যাহার উপর হয়, সে কাহাকেই বা ডাকে আর কোথায়ই বা পলায়?"

যতটা উপায় প্রজার হাতে আছে, তাহার কিছু অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এ ভীষণ দারিদ্র্য বিস্তার নিবারণের কোন উপায় কেবলমাত্র প্রজার দ্বারা হইতে পারে কি? এবং যদি হওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা কি পরিমাণেই বা সম্ভব? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রজাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রজানিহিত শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই রাজশক্তির অভ্যুদয় ও স্থিতি। যে দিন কোন দেশ-বিশেষের সমগ্র প্রজাশক্তি তদ্দেশীয় রাজশক্তিকে ত্যাগ করে বা তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, সেই দিনই সেই রাজশক্তির পতন অনিবার্য্য। বলা যাইতে পারে, রাজশক্তি যেমন প্রজাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাশক্তিও ত আবার রাজশক্তি আশ্রয়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? সত্য, কিন্তু উহা প্রজাশক্তি বলে রাজশক্তি উদ্বোধিত হইবার পরের কথা। কারণ, সম্যক্‌প্রবুদ্ধ ও পরিজ্ঞাতস্বমহিম প্রজাশক্তি বরং একদিন রাজশক্তিকে আপন অঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারে,—যথা মার্কিনের যুক্তরাজ্যনিচয় (United States) কিন্তু রাজশক্তি, প্রজাশক্তিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া কখন কোথাও যে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে বা বহু কাল অবস্থিতি করিয়াছে, জগতের ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রবলপ্রধান যুগসমূহে প্রজাশক্তি স্বমহিমা অপরিজ্ঞাত থাকিয়া স্বাশ্রয়ে উদ্বোধিত রাজশক্তিকে দেবানুগ্রহসম্ভূত বলিয়া মনে করিত, যথা—ইংলণ্ডে প্রথম জেম্‌স নরপতির সময় এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে, বিদ্যালোক বিস্তারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতচালিত ক্ষত্রবলপ্রাধান্যের সময়। কিন্তু এখন সে কাল অন্তর্হিত। বিদ্যাপ্রভাবে বৈশ্য এবং শূদ্রবল, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রবলকে আপনাদের সহিত অভিন্ন পরিজ্ঞাত

হওয়ায় চারিদিকে প্রজাশক্তি সম্যক্ জাগরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজশক্তি নিয়মনে পার্লিয়ামেণ্ট সভার যুদ্ধাদি উদ্যম, ফ্রান্সের প্রজাশাসনতন্ত্র প্রচলনের জন্য বিদ্রোহাদি, ইংরাজের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া মার্কিনের প্রজাপ্রাধান্যস্থাপনাদি ইহার প্রমাণস্থল। রুসিয়া, জর্ম্মাণি, প্রভৃতি সাম্রাজ্য সকলেও উদীয়মান প্রজাশক্তিকে বহুযত্নে ক্ষত্রবলসহায়ে কথঞ্চিৎ দমনে বাধ্য হইয়াছে মাত্র। আর উহা বড় বেশী দিন দমনে থাকিবে বলিয়া বোধও হয় না। জগতেতিহাস পর্য্যালোচনে এইরূপ সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত।

অতি সহজেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনে কর, একদেশের সমগ্র প্রজা তদ্দেশীয় রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রস্থান করিল। তখন ঐ দেশের রাজার রাজত্ব আর কোথায় রহিল? ইট পাথর গাছ পালার উপর আধিপত্য করা আর বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা হওয়া একই কথা বৈ আর কি?

তবে বহুকালপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির উপর প্রজার বহুকালসঞ্চিত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, অনুরাগ, নির্ভর প্রভৃতি থাকে এবং উহাই, রাজশক্তি স্বার্থভোগবিলাসাদিদূষিত এবং যথোচিত ব্যবহৃত না হইলেও প্রজাকে আশাবদ্ধ করিয়া রাখে। ইহার উপর পুরুষানুক্রমে একদেশে বাসজনিত মমতাকর্ষণ, যাহা স্বদেশানুরাগ নামে অভিহিত হয়, তাহাতো আছেই।

এইরূপে প্রজাতেই যে অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই প্রজাশক্তি যে জাগরিত হইলে অনন্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রমে সমর্থ, এ বিষয়েও জগতেতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব সমগ্র প্রজার এককালীন উদ্যমে যে ভারতে দারিদ্র্য বিস্তার রোধ হইতে পারে, এ আর কি বড় কথা? প্রজার শক্তি প্রজা না জানাতেই ভারতের এই দুর্দ্দশা। উদ্বোধন! সেই কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং বজ্র হইতেও কঠোর অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রাবস্থিত বিরাট প্রজাশক্তির উদ্বোধনে বদ্ধপরিকর হও। তোমার মঙ্গল হউক।

বেলুড় মঠে

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

মর্ত্যধামে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাণ্ডার হইতে জ্যোতিঃকণা পড়িয়াছিল, উহা আবার নিজধামে প্রত্যাগত। যখন উহার আবির্ভাব হয়, তখন কেহ জানিতে পারে নাই। বোধ হয়, স্বর্গধামে দেবতারা উৎসব করিয়াছিল; আর আনন্দ করিয়াছিল এক অপূর্ব্ব বালক। যখন বালকশরীরের ভিতর দিয়া সেই অপূর্ব্বশক্তি একটু উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল, তখন ক্ষুদ্রদৃষ্টি বাসনামুগ্ধ জীব ভাবিয়াছিল, এ কোথাকার এক ত্রিপণ্ড বালক! যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ঘটিল। অনেক কষ্টের পর হারানিধির সাক্ষাৎ হইলে যেমন প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাই হইল। বালকও ধীরে ধীরে তাঁহাকে চিনিলেন। জগতের সমক্ষে তাঁহাকে চিনাইবার জন্যই যেন আয়োজিত চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার কথা আজ কে না জানে? সেই অবধি যাহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছে বা যাহাদিগকে তিনি কৃপা করিয়া একটু চিনাইয়াছেন, তাহারাই জানে, কি বস্তুর সঙ্গে আমরা একত্র বাস করিয়াছি। তাঁহার জন্ম অর্থাৎ শরীর ধারণে জগতের পরম লাভ হইয়াছে, তাই তাঁহার জন্মোৎসবে সমগ্র জগৎ এত কোমর বাঁধিয়া উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে। বিরহের নবীন অশ্রু আজ ক্ষণকালের জন্য মুছিয়া সমগ্র জগৎ তাঁহার জন্মোৎসবে এত আনন্দ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" তাঁহার আবির্ভাব। ধর্ম্মের সংশয়চ্ছেত্তা ইঁহার ন্যায় কেহ আছেন কিনা বলিতে পারি না। নানাশাস্ত্রের নানাবাদে নানাজনের, নানা ব্যাখ্যায় দিগ্‌ভ্রান্ত আমাদের তিনি দিগ্‌দর্শনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রগুলি অপূর্ব্ব শিক্ষার খনি। ঐ সকল পাঠ করিয়া কত লোকের যে চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঐ গুলি আমাদের সমুদয় বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্রের সার স্বরূপ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে অনুপ্রাণিত। যে ঐ গুলির কিছুমাত্রও আস্বাদ করিয়াছে, সেই নূতনশক্তি, নূতনভাব ও নূতনবল পাইয়াছে। সাক্ষাতে কথা কহিবার সুযোগ যে সকল ভাগ্যবানের ঘটিয়াছে, তাহারা ত চির জীব-

নের জন্য তাঁহার চরণে প্রাণ মন বিকাইয়াছে।

দূর হইতে দেখিলে তাঁহাকে কেবল একজন অপূর্ব্ব সংশয়চ্ছেত্তা, উৎসাহ ও শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া বোধ হয়। একটু নিকটে গেলে অন্যরূপ। আহা! তখন তাঁহার অপূর্ব্ব হৃদয়, জীবের জন্য অপার ভালবাসা, পতিত, মূর্খ, ঘৃণিত, পাষণ্ডগণের জন্য হৃদয়বিদারক ক্রন্দন দেখিয়া প্রাণে আর এক মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। সে পুরুষ এখনও তিরোধান হন নাই। আমরা শুধু তাঁহার জড়শরীর মাত্র দাহ করিয়াছি। তিনি ত এখনও রীতিমত কার্য্য করিতেছেন। এখন অলৌকিক রূপে—এখন আমাদের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে, এখন যবনিকার অন্তরালে।

তাঁহার জন্মভূমির লোক তাঁহাকে চিনিল না। মহা জ্যোতিষ্কের আলোকেও অন্ধ হইয়া রহিল। আমরা, যাহারা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ চিনিয়াছি, আমরা এখন সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট তাঁহাকে চিনাইবার চেষ্টায় ও তাঁহার উপদেশাবলি প্রচারে বদ্ধপরিকর। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই জন্মমহোৎসব আমাদের সেই উদ্যমেরই ক্ষুদ্র বিকাশ মাত্র। ক্রমশঃ তাঁহার সংকল্পিত সমুদয় কার্য্যে পরিণত হইবে।

কতকগুলি ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দকে আকাশে তুলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তাঁহার প্রাণের প্রিয় বস্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে সাধারণের সমক্ষে ঘৃণিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবানুযায়ী চলুন, কিন্তু জানিয়া রাখুন, এই মিশন এক্ষণে অসহায় নগণ্য হইলেও ইহা অনন্ত শক্তির আধার। এই শক্ত্যাধারের বৈদ্যুতিক কম্পনে সমগ্র জগৎ বিস্মিত হইবে। যাহা হউক, বাক্যে আমাদের কায নাই, কার্য্যেই ফল দেখাইবে।

এই মহোৎসবে কি কি হইল ও কি কি শিখিলাম? ৬ই মাঘ তাঁহার জন্মতিথির দিবস। সে দিন, যে শক্তির অনুপ্রাণনে তিনি জগতে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইল। আমাদের স্বামীজি তাঁহার নিজের পূজার বিরোধী ছিলেন, তাই তাঁহাকে পূজা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও আকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখিয়া কেবল তাঁহার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ ধরিয়া দিলাম ও পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলাম। তাঁহার শয্যাগৃহ ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইল। সেই পরম প্রেমিকবরের যেন বাসর সজ্জা রচনা হইল।

তাঁহার শুভ জন্মতিথি পূজা হইল। আমি কি পূজা করিব ভাবিয়া তাঁহার অতি প্রিয়

মনোজবং মারুততুল্যবেগং

জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং

শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি

করিলাম। শ্রীহনুমানের বাহুল্যরূপে পূজা প্রচারিত করিয়া বঙ্গদেশে ব্রহ্মচর্য্যের বীজ বপন তাঁহার এক জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই সেই নিষ্কাম সেবার মূর্ত্তি শ্রীমৎ মহাবীরের একবার পূজা করিলাম।

আবার তাঁহার সেই—

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা

বম বব বাজে গাল।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে

দুলিছে কপাল মাল।

গরজে গঙ্গা জটা মাঝে

উগরে অনল ত্রিশূল রাজে

ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

মনে পড়িয়া গেল। তাই সেই পরমযোগিবর শিবের চরণেও দুই চারিটী পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তিনি বেদ, উপনিষৎ, গীতা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাই তাঁহার প্রিয় গুটি কয়েক বৈদিক সূক্ত, অতি প্রিয় কঠোপনিষৎ ও সমগ্র গীতা তাঁহাকে শুনাইলাম। এদিকে ভোগ আরতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন।

প্রসাদ পাইয়া অনেক ভক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ দিকে ব্রহ্মচারিগণ মহানিশীথে মহাশক্তির আরাধনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপরদিকে ভগবৎসঙ্গীতের লহরী ছুটিতেছে। আমরা একটু বিশ্রাম করিলাম। ঠাকুরের নিত্য আরতি ও ভোগসমাপনান্তে পূজা আরম্ভ হইল। যে মহাশক্তির সাধনায় তাঁহার জীবন কাটিল, তাহার কি একবিন্দুও উদ্বোধন করিতে পারিয়াছিলাম? জানিনা, কিন্তু যথাসাধ্য উপচারে ও যথাশক্তি পূজা করিয়া মহামায়ার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোমান্তে উষাকালে সকলে মিলিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

তৎপরের রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্ত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। নানা-স্থানে স্বামীজির ফটো লিথো প্রভৃতি চিত্রাবলি অতি মনোহর ভাবে সজ্জিত হইয়া দর্শকগণের মনে তাঁহার সেই উৎসাহদীপ্ত মুখ জাগাইয়া দিতেছিল। প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমপ্রদর্শিত শত শত প্রলোভনে অনাকৃষ্ট ভাব, যমমুখ হইতে মৃত্যুর রহস্ত ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যাত হইল। পরে অদ্বিতীয় ধ্রুপদগায়ক বাবু কাশীনাথ সুকুল, বাবু কেশব মিশ্র, সাধকবর রামলাল দত্ত মহাশয় এবং অঘোর বাবু সমস্ত দিবস ধরিয়া সুমধুর গীতে সমাগত দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিলেন। শালখিয়ার ভক্তবৃন্দ স্বামীজির গুণানুবাদ গীতে সকলকে পরমানন্দ দিলেন। জলতরঙ্গ বাদ্যও অতি দক্ষতার সহিত বাদিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। স্বামীজি নিজে একজন অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে ধ্রুপদগানের বিজ্ঞান ও কীর্ত্তনের ভাবপ্রকাশ (Expression) এই দুই একত্রীভূত করিয়া সঙ্গীত জগতে যুগান্তর উপস্থিত করা তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্ত ছিল।

এ দিকে গান চলিতেছে, ও দিকে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় ৪।৫ শত ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইলেন। এইবার স্বামীজির কথিত সেই "দরিদ্র অনাথ নারায়ণগণ" সমাগত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যগণ এবং অন্যান্ত ভক্তবৃন্দ কোমর বাঁধিয়া উৎসাহের সহিত এই সকল নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রায় ১৫০০, ২০০০ অনাথকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইল।

এই মহোৎসব হইতে শিখিলাম কি ? শিখিলাম—অগ্নি এখনো নিভে নাই, বরং আরো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা করযোড়ে তাঁহার নিকট কেবল এই প্রার্থনা করি, হে শক্তিস্বরূপ, আমাদিগকে শক্তি দাও, হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বল দাও, হে ওজঃস্বরূপ, আমাদিগকে ওজঃ দাও, বীর্য্য দাও, যেন তোমার শিক্ষা, তোমার উপদেশ নিজ নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া সমগ্র জগতে ছড়াইতে পারি।

শুধু বেলুড়ে নয়, ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে উৎসব বার্ত্তা আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ, কলম্বো, বাঙ্গালোর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে উৎসবের বার্ত্তা পাইয়াছি। আজ দেখিতেছি, সমগ্র জগৎ আনন্দগানে পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুরের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন।
শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের বাটীতে মহোৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ সঙ্গে।]

শুক্রবার, বৈশাখের শুক্লা দশমী, ২৪শে এপ্রেল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। মাষ্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈটকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিদ্রিত। দু একটী ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন।

মাষ্টার একপার্শ্বে বসিয়া সেই সুপ্ত বালক মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন।

মাষ্টার আস্তে আস্তে একখানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এলোথেলো হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সস্নেহে)। ভাল আছ? কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েচে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু? (চিন্তিত হইয়া) আমের অম্বল করেছিল, সব একটু একটু খেলুম। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার পরিবার কেমন আছে? সে দিন কাহিল দেখ্‌লুম—ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, মূল্য এক টাকা, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

মাষ্টার। কি, ডাব্ দেওয়া যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ,—মিছরির সরবত খাওয়া ভাল।

মাষ্টার। আমি রবিবার বাড়ীতে গিয়েছি।*

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ করেছ। বাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধে। বাপ টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখ্‌তে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুখাইতে লাগিল—বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমার মুখ শুকুচ্চে। সব্বাইএর কি মুখ শুকুচ্চে ?

মাষ্টার (এঁড়েদর যোগীনের † প্রতি)। যোগীন বাবু, তোমার কি মুখ শুকুচ্চে ?

যোগীন্দ্র। না, বোধ হয় ওঁর গরম হয়েছে।

ঠাকুর এলোথেলো হয়ে বসে আছেন—ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। যেন মাই দিতে বসেছি (সকলের হাস্য)। আচ্ছা, মুখ শুকুচ্চে, তা ন্যাশপাতি খাব ? কি, জামরুল খাব ?

বাবুরাম। তাই বরং আনিগে—জামরুল আনিগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর আর রোদ্রে গিয়ে কায নেই।

মাষ্টার পাখা করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। থাক্, তুমি অনেকক্ষণ——

মাষ্টার। আজ্ঞে, আমার কষ্ট হচ্চে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হচ্চে না ?

মাষ্টার নিকটবর্ত্তী একটি স্কুলে অধ্যাপনা কার্য্য করেন। তিনি একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন। এইবার স্কুলে আবার যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরের পাদবন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এক্ষুণি যাবে ?

একজন ভক্ত। স্কুলের এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার এসেছিলেন।

---

* মাষ্টার কলিকাতায় নিজের বাড়ী ত্যাগ করিয়া বাসা করিয়া এতদিন ছিলেন।

† যোগীন — স্বামী যোগানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। যেমন গিন্নি, সাত আটটী ছেলে বিয়েন, সংসারে রাত দিন কায, আবার ওর মধ্যে এক এক বার এসে ভাতারের সেবা করে যায় (সকলের হাস্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে।]

চারটের পর স্কুলের ছুটি হইল। মাষ্টার বলরাম বাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন, বসিয়া আছেন। ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র* আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

বলরাম থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া নরেন্দ্রের প্রতি)। ওরে মাল এসেছে! মাল! মাল! খা! খা! (সকলের হাস্য)

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের বাড়ী যাইবেন, সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইযা গিরিশ উৎসব করিবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার, পশ্চাতে আরও দু একটী ভক্ত। দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটী হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতেছে। রাম নাম শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাস্য—দেখিতে দেখিতে মন অন্তর্মুখ হইতেছে। এরূপ ভাবে খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, বেস সুর। একজন ভক্ত, ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাষ্টারকে বল্লেন, হ্যাঁগা, কি বলে, পরমহংসের ফৌজ আস্‌চে? শালারা বলে কি! (সকলের হাস্য)

---

* নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[অবতার ও সিদ্ধপুরুষের প্রভেদ]

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরিশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিশ অনেক গুলি ভক্তকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও সকলে বসিলেন। গিরিশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম, যোগীন, দুই নরেন্দ্র, চুনি, বলরাম ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। গিরিশ ঘোষকে বল্লুম, তোমার নাম করে, এক জন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাঁটু জল। তা এখন যা বলেছি, মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজনে বিচার করো, কিন্তু রফা কোরোনা। (সকলের হাস্য)

মহিমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না হইতে রাম বলিলেন, "ও সব থাক্, কীর্ত্তন হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)। না, না, এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।

মহিমাচরণের মত, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল। গিরিশের মত, শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের মত হইতে পারিবে না।

মহিমাচরণ। কি রকম জানেন? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হতে পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়।

গিরিশ। তা মশায় যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন আর যাই বলুন, সেটী হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হতে পারেন। যদি সেই সব ভাব, মনে করুন, রাধার ভাব কারু ভেতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেইই অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কারু ভেতর দেখ্‌তে পাই, তখন বুঝ্‌তে হবে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই দেখ্‌চি।

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক রকম গিরিশের কথায় সায় দিলেন।

মহিমাচরণ (গিরিশের প্রতি)। হাঁ, মহাশয়, দুইই সত্য। জ্ঞানপথ, সেও তাঁর ইচ্ছে, আবার প্রেমভক্তি, সেও তাঁর ইচ্ছে। ইনি যেমন বলেন, ভিন্ন পথ দিয়ে এক যায়গাতেই পৌছান যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি একান্তে)। কেমন, ঠিক বলিছি না?

মহিমাচরণ। আজ্ঞে, যা বলেচেন, দুইই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আপনি দেখ্‌লে, গিরিশের কি বিশ্বাস! জল খেতে ভুলে গেল! আপনি যদি না মান্‌তে, তা হলে ছিঁড়ে খেত, যেমন কুকুরে মাংস খায়। তা বেশ হলো, দুজনের পরিচয় হলো আর আমারও অনেকটা জানা হলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে।]

কীর্ত্তনিয়া দলবলের সহিত উপস্থিত। ঘরের মাঝখানে তাহারা বসিয়া আছে। ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি বলুন, এরা কি গাইবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি বোল্‌বো?—(একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ।

কীর্ত্তনিয়া পূর্ব্বরাগ গাহিতে লাগিল।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণ দর্শন অবধি শ্রীমতীর অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন,—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
বয়েসে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধু বালা।
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল,—শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া সখীগণ বলিতেছেন,—

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বিরাধে॥
কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি॥
হেমকান্তি ঝামর হৈল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥
আঁখিযুগ অরুণ হইল।

মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল।
কি লাগিয়া এমন হইল॥
না কহিল ফাটি যায় হিয়া।
এত শুনি কহে ধনি রাই।
শ্রীযদুনন্দন মুখ চাই॥

কীর্ত্তনিয়া আবার গাইল,—শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের ন্যায় হয়েছেন।

সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে,
কেমনে শবদ আসি।
একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে,
মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া ধরমে,
করিল পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে, শোয়াস বারহে,
নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন, সেই কোন্ জন,
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে,
রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে, কনক* করে,
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে,
কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণ দর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। শ্রীমতী বলিতেছেন,—

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি,
কদম্ব কানন হৈতে।
তার পর দিনে, ভাটের বর্ণনে,
শুনি চমকিত চিতে॥

আর এক দিন, মোর প্রাণ সখী,
কহিলে যাহার নাম।
(আহা সকল মাধুর্য্যময় কৃষ্ণ নাম)
গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে,
তাহার এ গুণগ্রাম॥
সহজে অবলা, তাহে কুলবালা,
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে, আরতি বাঢ়য়ে,
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইনু,
পরাণ রহিবার নয়।
কহত উপায়, কৈছে মিলয়ে,
দাস উদ্ধবে কয়॥

'আহা সকল মাধুর্য্যময় কৃষ্ণনাম' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না। একেবারে বাহ্যশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। তাঁর ডান দিকে ছোট নরেন দাঁড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুরকণ্ঠে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" এই কথা সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন ও ক্রমে পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলেন।

কীর্ত্তনিয়া আবার গাহিতে লাগিল। বিশখা দৌড়িয়া গিয়া একখানি চিত্রপট আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন। চিত্রপটে সেই ভুবনরঞ্জন রূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখ্‌ছি, তাঁকে যমুনা তটে দেখা অবধি আমার এই দশা হয়েছে।

শ্রীমতীর উক্তি।

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিল বিশখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী-ধ্বনি শুনি।
সেই বটে এই রসিকমণি॥

ভাটমুখে যার গুণ গাঁথা।
দূতীমুখে শুনি যার কথা।
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
ইহা বিনে কেহো নহে আন॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিনু দেখাও সেজনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভনে ঘনশ্যামের দাস॥

ঠাকুর আবার উঠিলেন, সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে তারা দুভাই এসেছে রে।
তারা—তারা দুভাই এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
(যারা ব্রজের কানাই বলাই)
(যারা ব্রজের মাখন চোর)
(যারা জাতির বিচার নাহি করে)
(যারা আপামরে কোল দেয়)
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়)
(যারা হরি হয়ে হরি বলে)
(যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল)
(যারা আপন পর নাহি বাচে)
জীব তরাতে তারা দুভাই এসেছে রে।
(নিতাই গৌর)
নদে টলমল টলমল করে,
ওরে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

ভাব উপশম হইলে ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কোন্ দিকে মুখ ফিরে বসেছিলুম, এখন মনে নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র : ছলরূপী নারায়ণ।]

ঠাকুর ভাব উপশমের পর ভক্ত সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র* (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। হাজরা এখন ভাল হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই জানিস নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম রাম বলে।

নরেন্দ্র। আজ্ঞে না, সব জিজ্ঞাসা কর্‌লুম ; তা সে বলে, 'না'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপ টপ করে। কিন্তু অমন—— গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না।

নরেন্দ্র। আজ্ঞে না, সে বলে ত দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোথা থেকে দেবে?

নরেন্দ্র। এই রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করিছিস্?

"মাকে প্রার্থনা করিছিলুম, মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলুম। ও কিছু দিন পরে এসে বল্লে, দেখ্‌লে, আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)। কিন্তু তার পর চ'লে গেল।

"হাজরার মা বলে পাঠিয়েছিল রামলালকে দিয়ে, 'হাজরাকে একবার রামলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখ্‌তে পাই না।' আমি হাজরাকে অনেক করে বল্লুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস, তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।

নরেন্দ্র। এ বারে দেশে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর, তুই বুঝিস নি।

---

* নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

"গোপাল বলেছে, সিঁতিতে হাজরা কদিন ছিল। তারা চাল ঘি সব জিনিষ দিত। তা বলেছিল, এ ঘি, এ চাল কি আমি খাই? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিছ্‌ল। ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহ্যে যাবার জল আন্‌তে। এই বামুনরা সব রেগে গিছ্‌ল।

নরেন্দ্র। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশান বাবু এগিয়ে দিতে গিছ্‌ল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। ঐ টুকু জপ তপের ফল।

"আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাটা কাটা গা ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়।

ভবনাথ। থাক্ থাক্ ওসব কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই নাকি লোক চিনিস, তাই তোকে বল্‌ছি। আমি হাজরাকে ও সকলকে কি রকম জানি, জানিস্? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ লুচ্চরূপী নারায়ণ। (মহিমাচরণের প্রতি)। কি বল গো? সকলই, নারায়ণ।

মহিমাচরণ। আজ্ঞে, সবই নারায়ণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর ও গোপীপ্রেম।]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা এক দিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্চে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে, সাধারণী সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না, হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক' তোমারও সুখ হোক। এ খুব ভাল অবস্থা।

"সকলের উচ্চ অবস্থা সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর—কৃষ্ণ সুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক।

"গোপীদের এই ভাব বড উচ্চ ভাব।

"গোপীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে ভ্রমণ করতে করতে ষষ্টি সহস্র ঋষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন সস্নেহে। তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী।

একজন ভক্ত। মহাশয়, অন্তরঙ্গ কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি রকম জান? যেমন নাট মন্দিরের ভিতরের থাম, বাইরের থাম। যারা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। কিন্তু জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখতে পেলেন। তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই ঋষিরা বল্লেন, রাম, তোমাকে আজ আমরা দেখলুম, আমাদের সকল সফল হল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা। ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাস্তে লাগলেন।

"উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কতদিন। সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ করলুম। জড় হলুম। দেখলুম মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়। রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম।

"ঘরে ছবি টবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বল্লুম। আবার হুঁস যখন আসে, তখন প্রাণ যায় যায়। মন নেবে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে। শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকবো। তবে ভক্তি ভক্তের ওপর মন এল।

"তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলুম যে, এ আমার কি হল। তখন ভোলানাথ * বল্লে, 'ভারতে † আছে।' সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে, তখন কি নিয়ে থাকবে? কাযেই ভক্তি ভক্ত চাই। তা না হলে মন দাঁড়ায় কোথা?

* ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর মুহুরী ছিলেন, পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

† মহাভারত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

[সমাধিস্থ ও ভক্তিযোগ ; জীব ও ঈশ্বর ।]

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি একান্তে)। তোমায় একলা একলা বোল্‌ব, তুমিই একথা শোন্‌বার উপযুক্ত।

"কুমার সিং † ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তো। জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাৎ। জীবে সাধন ভজন করে সমাধি পর্য্যন্ত হতে পারে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফির্‌তে পারেন। জীবের থাক, এরা যেন রাজার কর্ম্মচারী। এদের রাজার বারবাড়ী পর্য্যন্ত গতায়াত। রাজার বাড়ী সাত তলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাত তলায় আনাগোনা কর্‌তে পারে আবার বাইরেও আস্‌তে পারে ; ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, এরা সব কি ? এরা বিদ্যার আমি রেখেছিল।

মহিমাচরণ। তাই ত, তা না হ'লে গ্রন্থ লিখ্‌লে কেমনে করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দেখ, প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল।

মহিমাচরণ। আজ্ঞে, হাঁ।

(জ্ঞানী ও অহঙ্কার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ জ্ঞান চর্চ্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি। হয়ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা হলে আর অহঙ্কার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। তবেই তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়, আর অহং থাকে না।

"কি রকম জানো ? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপর ওঠে। তখন মানুষটা চারদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নেই। তাই ঠিক জ্ঞান হ'ল—সমাধিস্থ হলে—অহংরূপ ছায়া থাকে না।

"ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো বিদ্যার আমি,

† সিপাহী সৈনিকদিগের হাবিলদার, ঠাকুরকে বড় ভক্তি করিতেন।

ভক্তির আমি, দাস আমি। সে অবিদ্যার আমি নয়।

"আবার জ্ঞান ভক্তি দুটিই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁরেই পাবে। জ্ঞানী এক ভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

ভবনাথ কাছে বসিয়াছিলেন ও সমস্ত শুনিতেছিলেন। ভবনাথ নরেন্দ্রের ভারি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে সর্ব্বদা যাইতেন।

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমি চণ্ডী বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক্‌ টক্‌ মার্‌ছেন। এর মানে কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওসব লীলা। আমিও ভাব্‌তুম ঐ কথা। তার পর দেখ্‌লুম, সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘরের পশ্চিম দিকের ছাতে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ, শুক্লা দশমী। জগৎ হাসিতেছে। ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

ঠাকুর "নরেন্দ্র" "নরেন্দ্র" করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখের পংক্তিতে অন্যান্য ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর লইতেছেন। অর্দ্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত। বলিলেন, নরেন্দ্র, তুই এই টুকু খা।

ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজির কথা।

১। আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ ত স্পষ্টতই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলিতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপ ভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞান-সমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত ও যুগাবসানে সূক্ষ্মভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হইলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞান সমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখি-ঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সহিত মিলে, তাহাই বেদ, অপরাংশ বেদ নহে। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

২। অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে, তার মোদ্দাটা এই যে, উহাতে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের স্থান নাই। আমরা আনন্দের সহিত এ কথা স্বীকার করিতে খুব প্রস্তুত আছি।

৩। বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে, সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুল্‌লেই দুঃখ, দুঃখ শুনে লোকে অস্থির হয়, কিন্তু উহার শেষটাতে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয় জগৎ, ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে যে সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভিতরই আছে। আমরা জগতে যে "সুখবাদ" দেখ্‌তে পাই, যে মতে বলে, জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কোরে, সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে।

৪। আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্যবস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্চে, আসল সত্য যে আত্মা, তাহার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয় জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায়, তাহার ভাবই এই যে, সত্য জগতের জ্ঞান লাভ।

গুরু।

—*—

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ লিখিত।)

আজকাল ধর্ম্মের আন্দোলন প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষরূপে ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাও আজ কাল নাস্তিকতা অবলম্বন না করিয়া কোন না কোনরূপে ধর্ম্মান্দোলনে যোগ দিতেছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যেমন আছে, কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া, যেমন লোকে করিয়া থাকে, জপ তপ কর, ঈশ্বরলাভ ইহাতেই হইবে। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই, তাহাতে মহাপাপ, সুতরাং কুলগুরুর যেরূপ চরিত্রই হউক না কেন, তাহা না দেখিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র লও ও যতটা পার, জপ তপ কর। ইহারা নিজেরাও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে মহাভারত পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তন্ত্রও কেহ কেহ দেখিয়া থাকেন।

কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা নিজেরা চেষ্টা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্র পাঠ করেন। আজ কাল গীতা, পুরাণ, উপনিষদ্, বেদান্ত, যোগ শাস্ত্রাদির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদের সাহায্যে, কেহ কেহ বা কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া শাস্ত্রাদির মর্ম্ম যথাসাধ্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন। ঐ সকল শাস্ত্র হইতে নিজ মনোমত একটি উপাসনাপ্রণালী লইয়া উপাসনাও করিয়া থাকেন। ইঁহারা গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না অথবা করিলেও উহা যে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করেন না। কেহ বা ও সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাই করেন না। ইঁহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি আছেন, তাঁহারা বলেন, সিদ্ধগুরু না পাইলে গুরু করা না করা সমান। অতএব যখন সিদ্ধগুরু পাইব, তখন গুরু করিব। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন, কেহ বা বিশেষ কিছুই করেন না।

ভগবান অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুনিবেন, যাহা প্রয়োজন, সব তিনিই দিবেন, বাহিক গুরুর আবশ্যক কি? এই কতকগুলি লোকের মত। আবার ইহার বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বলেন, গুরু নইলে কিছুই

হবে না। আর যে সে গুরুতেও কিছু হবে না, সিদ্ধগুরু আবশ্যক। যাঁহারা কুলগুরু করিয়া প্রচলিত মত সাধন ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে সচরাচর এই উত্তর পাওয়া যায়, গুরু যেমন বলেছেন, সেই রকম করে যাচ্চি মাত্র, কিন্তু উন্নতি কি হইতেছে না হইতেছে, তাহ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনের অশান্তি গিয়াছে কি? কই, তাও যায় নাই। আর দেখিতেও পাই, বাস্তবিক কই, তাঁহাদের দিন দিন ঈশ্বরানুরাগ ত বৃদ্ধি পাইতেছে না; সংসারের কামিনীকাঞ্চনে যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের জন্য তাহার এক কণাও ত তাঁহাদের দেখিতে পাই না।

এই সকল নানারূপ মত মতান্তর দেখিয়া প্রশ্ন আসিতেছে, মুক্তিলাভ বা ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য গুরুর কি কোনরূপ প্রয়োজন আছে? যদি বলেন, আছে, তবে এই প্রয়োজন কি অনিবার্য্য অর্থাৎ গুরুকরণ ব্যতীত কোনরূপে মুক্তিলাভ কি অসম্ভব? আর গুরুর কিরূপ লক্ষণসম্পন্ন হওয়াই বা আবশ্যক?

এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে হইলে যুক্তি, শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বাক্য এই তিনটীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তি এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাক। খুব যাঁহারা সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন, ঈশ্বরোপাসনা বা সাধন ভজন আপনার নিজেরই কার্য্য বটে, কিন্তু এমন লোক দেখা যায় না, যিনি পেট থেকে পড়িয়াই নিজে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া ঈশ্বর চিন্তায় বসিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। ইহা বুঝেনও অনেকে। কারণ, এরূপ নির্ব্বোধ কেহ নাই, যিনি অস্বীকার করেন যে, শাস্ত্র বা অন্যান্য অনেক পুস্তক পাঠে এবং নানা লোকের নিকট নানা কথা শুনিয়া তাঁহার ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়াছে। যাঁহারা গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের বোধ হয়, এরূপ বুদ্ধি নাই যে, সাধু সঙ্গে—ভাল লোকের কাছে অনেক সময় থাকিলে—তাঁহার উদাহরণ দেখিয়া অনেক উন্নতি হয় না—তাঁহার ঈশ্বরোপাসনায় অনুরাগ, তাঁহার পরোপকারব্রতনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া আমারও সেই সকল গুণসম্পন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না। তাঁহাদের বোধ হয় আশঙ্কা এই, এক বিশেষ ব্যক্তিকে চিরকাল মানিতে হইবে, তাঁহার উপদেশ চিরকাল শুনিতে হইবে, এ কিরূপ কথা?

ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যে কোন বিদ্যাই লোকে শিখুক, তাহাতেই কোন না কোনরূপে শিক্ষাদাতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। অপ-

য়ের কোনরূপ সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা করিতে গেলে শিক্ষা হয় না যে, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব হয়, অনেক কষ্ট পাইতে হয় ও অনেক ভুগিতে হয়। সকল বিদ্যা শিখিবারই নিয়ম এই, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যতটুকু জানিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়া তারপর যদি নিজে কিছু তাহার উপর শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা। এই যে অপরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ, ইহাও কেবল জড়ের ন্যায় কতকগুলি বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, ইহাতেও মহা পুরুষকারের আবশ্যক। অপরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করার অর্থ, তাহা আপনার করিয়া লওয়া। আধ্যাত্মিক গুরু সম্বন্ধেও এই সকল কথা অতি সত্য। কোন বিশেষ উন্নত মহাপুরুষের সহিত বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাঁহার জীবনে উপলব্ধ সত্যগুলি অনায়াসে নিজ জীবনে আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়।

তার পর প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে; তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে যে পথে পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের সর্ব্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধন কালীন নানা প্রকার বিঘ্নের সময় শিষ্যকে বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চ উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃত গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত, সদ্‌গুরুর মন্ত্র দান ও সাধারণ কুলগুরুর মন্ত্রদানের বিশেষ পার্থক্য আছে। সদ্‌গুরুগণ মন্ত্র-দানের সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন এবং সেই মন্ত্রও সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় সাধক কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

প্রকৃত গুরুগণ শিষ্যগণের আর এক উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শিষ্যগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শিষ্য বিপথে যাইলেও যাহাতে সে পুনরায় সৎপথে আগমন করে, তাহার জন্য লৌকিক, অলৌকিক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি এরূপ হয় যে, কোন সাধক এইরূপ গুরুর উপদিষ্ট সমুদয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আরো উচ্চ তত্ত্বান্বেষী হন, তবে তিনি অন্য উন্নত গুরু অবলম্বন করিতে পারেন,

কিন্তু শিষ্য খুব উন্নত না হইলে এক গুরুতে যাবজ্জীবন নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ ; নতুবা ভাব ঠিক রাখিতে পারেন না। গুরুর আজ্ঞা মানিবার কথা যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সদ্‌গুরু কখন কোনরূপ অন্যায় আজ্ঞা করেন না ; আর কাহাকেও সদ্‌গুরু রূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে যাকে তাকে ফস্ করে সদ্‌গুরু বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহার যথার্থ সদ্‌গুরু করিবার ইচ্ছা, তাঁহার যতদিন না গুরুকে যথার্থ সাধু বলিয়া ধারণা ও বিশ্বাস হয়, তত দিন দিন রাত্রি তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ তর্ক করেন, আমি যদি গুরু চিনিয়া লইতে পারিলাম, তবে ত আমিই গুরু হইলাম। এ কথায় বক্তব্য এই, এ কথা কূট তর্ক মাত্র। বাস্তবিক তুমি কি প্রতিপদেই ভালমন্দ ভেদ করিয়া থাক না? ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা না থাকিলে কাহাকেও সাধু, কাহাকেও বা অসাধু বল কেন? যদি চরিত্রদৃষ্টে কোন ব্যক্তিকে কামজিৎ, জিতক্রোধ, মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী, নির্লোভ প্রভৃতি বলিয়া বুঝিবার তোমার সামর্থ্য না থাকে, তবে তোমার উচিত, নিভৃতে বসিয়া করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা, হে ভগবান, আমাকে সদসৎ বুঝিবার শক্তি দাও। অনেকে যে প্রতারিত হইয়া থাকেন, তাহার কারণ, সদ্‌গুরুকে যথাসাধ্য পরীক্ষা না করিয়াই সদ্‌গুরু বলিয়া স্থির করা। একবার যখন তুমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে, তখন তুমি তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পালনে পরাঙ্মুখ হও কেন? তিনি কি কখন তোমাকে অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারেন? এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে, যাঁহারা কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া কোন উপকার পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি ভগবান লাভে যথার্থ উৎসুক হন, তবে অনায়াসে সদ্‌গুরু অবলম্বন করিতে পারেন। যদি কাহারও সদ্‌গুরুকরণের পর তাঁহার দেহত্যাগ বা দূরদেশাবস্থিতি প্রভৃতি কারণে তাঁহার সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি গুরূপদিষ্ট সাধনপ্রণালী পরিত্যাগ না করিয়া আবশ্যক বোধ করিলে অপর কোন মহাপুরুষের নিকট শিক্ষা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। কথিত আছে, অবধূত ২৪ টী উপগুরু করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, দেখা যাউক। শাস্ত্র লইয়া গুরু সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে অপর কোন প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা

রহিল। সর্ব্ব প্রমাণের মূল স্বরূপ শ্রুতি হইতে দুই চারিটী কথা বলিব।

শ্রুতি বলিতেছেন,——

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥"

তাঁহাকে জানিবার জন্য সমিৎ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে।

"আচার্য্যবান পুরুষো বেদ"——আচার্য্য যাঁহার আছে, তিনিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা"—পরমাত্মার তত্ত্ব যিনি বলেন, এবং যিনি শিক্ষা করেন, তাঁহাদের উভয়েরই অলৌকিক গুণশালী হওয়া আবশ্যক। "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ"—হীন আচার্য্য কর্ত্তৃক কথিত হইলে অনেক চিন্তা করিলেও ইঁহাকে সুন্দররূপে জানা যায় না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"—যাঁহার পরমাত্মায় প্রগাঢ় ভক্তি, আর পরমাত্মায় যেরূপ ভক্তি, গুরুতেও তদ্রূপ, সেই মহাত্মার হৃদয়ে এই শ্বেতশ্বতরোপনিষৎকথিত তত্ত্ব গুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিপ্রমাণ আছে।

তন্ত্রেও সদ্‌গুরু সম্বন্ধে অজস্র অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই জানেন। প্রকৃত গুরুর লক্ষণ, নিষিদ্ধ গুরুর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর বিচার তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধবাহুল্য করিলাম না। তাহার সমুদয় গুলির সার তাৎপর্য্য এই যে, সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া সাধনা করিলেই সিদ্ধি হইবে। এক আধটী প্রমাণে কুলগুরু যে রূপই হউন না কেন, তাঁহার নিকট দীক্ষা লও, ইহা দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটী যে প্রকৃত গুরুগণের অবনতি হইবার পর স্বার্থপর গুরুগণের শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বাক্য, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ধর্ম্ম কোন সামাজিক ব্যাপার নহে, ইহাতে বাধ্য বাধকতা বা লৌকিকতা কিছু মাত্র নাই। কুলগুরু অর্থাৎ আমার পিতার যিনি গুরু হইয়াছিলেন, তিনি আমার সামাজিক সম্মানার্হ হইতে পারেন, তাঁহাকে আমার সামর্থ্য থাকিলে অর্থ দানও যথাসাধ্য আমি করিতে পারি, কিন্তু যখন আমার প্রাণে, হে ঈশ্বর, তোমায় কিরূপে লাভ করিব, এই ব্যাকুলতা জাগরিত হয়, তখন আমি যেখানে সেই ব্যাকুলতার তৃপ্তি হইবে, তথা ব্যতীত আর কোথায় যাইব?

যাঁহার নিকট পিপাসা মিটিতেছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় জল অন্বেষণ করিব ?

. মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলেন, আমরা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সমীপে তাঁহাদের দত্ত সাধন প্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পদে পদে উপদিষ্ট হইয়া, প্রতিপদে তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্যসকলের আলোকে উৎসাহিত হইয়া তবে এই অবস্থায় আসিয়াছি। তোমারও যদি যথার্থই উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকেও এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে বৈ কি। "সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে" ইহা সকল মহাপুরুষের মত। দেখা যায়, যেখানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্ম্ম বিকাশ হইয়াছে, তাহারই পশ্চাতে কোন এক মহাপুরুষ গুরুরূপে সহায় ছিলেন। লোকে চলিত কথায় বলিয়াও থাকে, এ ব্যক্তির গুরুবল আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সদ্গুরু বলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শিষ্যকেও তিনি দেখিবার পথ দেখাইয়া দেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে লইয়া যান। প্রকৃত গুরুর দর্শন মাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরো নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইবা মাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়—মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান।

এ হেন গুরুর জন্য শিষ্য কিনা করিতে পারে ? তাঁহার প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতা হওয়া কি স্বাভাবিক নয় ? শাস্ত্রে গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা কি কখন গুরুব্যবসায়ীর উপর হওয়া সম্ভব ? পরন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষে সহজেই হইয়া থাকে। যাঁহারা মানুষে ব্রহ্মবুদ্ধি করা উচিত নয়, করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এইরূপ বালসুলভ যুক্তির অবতারণা করিয়া ঘোর দ্বৈতজালে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কল্পনা করিয়া গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে একান্ত বিরত, তাঁহাদিগকে আমরা অদ্বৈত বেদান্ত একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধনসম্পন্ন হইতে পরামর্শ দিই।

এই গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীশ্চিয়ান, সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ এ সকল প্রশ্নই আসিতে পারেনা। যিনি ব্রহ্মবিদ্, তিনিই গুরু, ব্রাহ্মণাদি উপাধি মাত্র।

আর অধিক কি বলিব? সংসারে অনেক গুরু দেখিয়াছি, তাঁহাদের নিকট উপদেশও লইয়াছি, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। তাহার কারণ, তাঁহাদের ভিতর ব্রহ্মবিদের কোন লক্ষণ নাই। তাঁহাদের সংসারাসক্তি যায় নাই। তাঁহাদের ভিতর বিবেকবৈরাগ্যের প্রভাব দেখি নাই। অন্ধের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও নিষ্ফল। তাঁহাদের সে উপদেশের সঙ্গে সে শক্তির সঞ্চার নাই। শুনিয়াছি ও বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মবিৎ গুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন যে, তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেই দিন হইতে তাহার নূতন বিশ্বাস, নূতন জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ গুরুর নিকট কত উপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু প্রাণে লাগে নাই। এ বিষয়ে মহাপুরুষের নিকট একটী গল্প শুনিয়াছি, তাহা এই,———

কোন রাজার এক সময়ে সংসারের উপর বৈরাগ্য হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, পরীক্ষিৎ সাত দিন ভাগবত শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী এক সুপণ্ডিতকে আনাইয়া ভাগবত শুনিতে আরম্ভ করিলেন। দুইমাস কাল নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়াও তাঁহার কিছু মাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল না। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, পরীক্ষিতের ৭দিন মাত্র ভাগবত শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল আর দুই মাস শ্রবণ করিয়াও আমার কেন কিছুই হইল না? ইহার উত্তর যদি আপনি কল্য না দিতে পারেন, তবে আপনি অর্থাদি কিছুই পাইবেন না। ব্রাহ্মণ রাজার ঘোরতর অসন্তোষ আশঙ্কায় অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অতিশয় কাতর হইয়া গালে হাত দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এক বুদ্ধিমতী পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যা ছিল। সে পিতাকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া পুনঃপুনঃ কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অগত্যা অপত্যস্নেহে বাধ্য হইয়া তাহাকে তাঁহার বিষাদের কারণ বলিতে হইল। কন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল, পিতা, আপনি কিছুমাত্র ভাবিবেন না, আমি কাল রাজাকে ইহার জবাব দিব। পরদিন কন্যা সমভিব্যাহারে পণ্ডিত মহাশয় রাজসভায়

উপস্থিত। বলিলেন, আমার কন্যা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কন্যা কহিল, প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে। রাজা স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণকন্যা প্রহরীদিগকে বলিল, একটী থামে আমাকে ও অপর থামে রাজাকে বাঁধ। রাজার আদেশে প্রহরীরা তাহাই করিল। তখন কন্যা রাজাকে বলিল, রাজন্! আপনি আমার বন্ধন শীঘ্র মোচন করিয়া দিন। রাজা বলিল, একি অসম্ভব কথা বলিতেছ! আমি নিজে বদ্ধ, তোমার বন্ধন কিরূপে মোচন করিব? তখন কন্যা হাসিয়া বলিল, রাজন্! এই আপনার প্রশ্নের উত্তর। রাজা পরীক্ষিৎ মুমুক্ষু শ্রোতা আর বক্তা সাক্ষাৎ শুকদেব, যিনি সর্ব্বত্যাগী, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাজ্ঞানী। তাঁহার নিকট ভাগবত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিতের জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। আর আমার পিতা নিজে সংসারাসক্ত, অর্থের লোভে আপনার নিকট শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া আপনার কিরূপে জ্ঞান লাভ হইবে?

এই উপদেশপূর্ণ গল্পটী দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত কখন বন্ধন মোচন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ প্রসঙ্গে আর দুইটী কথা সচরাচর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, শিষ্য যে রকমই হউক না কেন, সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ বা বলেন, গুরু যেরূপই হউন না কেন, শিষ্যের বিশ্বাস ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এ দুটী কথাই আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। তবে বাস্তবিক পক্ষে জগতে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গুরু শিষ্য উভয়েরই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দেখা যায়, একই মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভিতর কত তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারেই হইয়া থাকে। শিষ্য যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়ী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তবে সে অতি সহজেই গুরু-পদিষ্ট তত্ত্ব সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা পড়া যায়, তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্যের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিষ্যের শরীর মন প্রভৃতি এমন শিক্ষিত (Disciplined) হয় যে, সে একটি মানুষ হয়।

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয়। অনেকে আবার এই গুরুভক্তিকে তুলিয়া দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর।

যদি দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি অন্তর্হিত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে। গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, তাঁহার কথায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পার। অনেকে মনে করেন, গুরুর উপর এইরূপ নির্ভর করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে ও আমরা ক্রমশঃ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখনও কাহারও মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায় আপনি দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন। লোকে সামান্য একটু অর্থ কিম্বা দৈহিক কোন উপকার পাইয়া লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হয়। তবে যাঁহার নিকট তুমি জীবনের সারতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ পদার্থ লাভের সন্ধান ও তল্লাভে ক্রমাগত সহায়তা পাইয়াছ, তাঁহার নিকট সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে কেন এত অন্যায় মনে কর? হিন্দুর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। হিন্দু যে দিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সে দিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনও ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি সহায়ে হইবে, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইব, তাহা নহে, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য্য।

(শ্রীম—)

স্বামী বিবেকানন্দ মান্দ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।* মান্দ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে,আমি সারগর্ভ যা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার--

"Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it was his and his alone, and if I have told you many things which were not true, correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the responsibility." *Third Lecture, Madras.*

কলিকাতায় ৺ রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়, তখনও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শক্তি আজ জগদ্ব্যাপী। হে ভারতবাসিগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মহত্ত্ব লাভ করিবে। তিনি বলিলেন—

"If this nation wants to rise it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or any body. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life. * *

* "It was your generous appreciation of him whose message to India and to the whole world, I, the most unworthy of his servants, had the privilege to bear; it was your innate spiritual instinct which saw in him and his message the first murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers" *etc - Reply to Madras Address*

Within ten years of his passing away this power has encircled the globe.* *Judge him not through me.* I am only a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was."

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভক্তি!

আজ আমরা একটু আলোচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম স্বামী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১। ঈশ্বরদর্শন।

(Realisation of God.)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকগুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম্ম নয়। এই ঈশ্বর দর্শন হয়, যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তা এজন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। একদিনের তাঁহার কথাবার্ত্তা আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কথা হইতেছিল।

পরমহংসদেব কাশীপুরের ৺ মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীকে বলিতেছিলেন*—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। শাস্ত্র কত পড়্‌বে? শুধু বিচার কর্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর।

"বই পড়ে কি জান্‌বে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে, 'আলু লও,' 'পয়সা দাও'।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর শাস্ত্র, সায়েন্‌স (Science) সব খড়্‌কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে জান্‌বার জন্য অতো ব্যস্ত কেন?

"কিন্তু যোসো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক, তখন ইচ্ছা হয়তো তিনিই বলে দেবেন, তাঁর কখানা বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে

* রবিবার, ২৬এ অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম কর্‌বে। (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্‌লে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, দেখা দাও বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাক্‌লে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাক্‌লে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে, আর জল নড়্‌বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিক্‌টা একবার দেখা গেলো, মাছটা ধপাঙ্গ করে উঠ্‌লো। যখন দেখা গেলো, আবও আনন্দ।*"

ঠিক এই কথা স্বামীও চিকাগোর ধর্ম্মসমিতি সমক্ষে বলিলেন—অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা—

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God, and that alone can destroy all doubts. So the best proof, a Hindu sage gives about the soul, about God is, '*I have seen the soul, I have seen God*' * * The whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and this reaching God, seeing God, becoming perfect even as the Father in heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus."

Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions).

আমেরিকার অনেক স্থলে স্বামী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সকল স্থানেই এই কথা। Hartford নামক স্থানে বলিয়াছিলেন—

"The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in doctrines or dogmas * * The end of all religions is the realising of God in the soul. Ideas and

* যীশু খ্রীষ্টও তাঁর শিষ্যদের এই কথা বলিতেন। "Blessed are the pure in spirit, for they shall see God."

methods may differ, but that is the central point. That is the realisation of God, something behind this world of sense—this world of eternal eating and drinking and talking nonsense—this world of false shadows and selfishness. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world—*and that is the realisation of God within yourself.* A man may believe in all the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever written ; he may baptise himself in all the rivers of the earth , still if he has no perception of God I would class him with the rankest atheist."

স্বামী তাঁহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে বলিযাছেন যে, আজকাল লোকে বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বর দর্শন হয় ; লোকে বলে, হাঁ, পূর্ব্বকালে ঋষিরা অথবা খ্রীষ্ট আদি মহাপুরুষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়—মনের যোগ (concentration)অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে—

"The teachers all saw God, they all saw their own souls, and what they saw they preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in modern times, a peculiar claim is put before us and that claim is that these experiences are impossible at the present day, they were only possible with a few men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the rigorous law of nature , what once happened can happen always."

Raja Yoga : Introductory.

স্বামী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে (*Ideal of a Universal Religion*) এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—অর্থাৎ যে ধর্ম্মে জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী বা কর্ম্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বরদর্শন যে সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন,—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়—কিন্তু গন্তব্য স্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। স্বামী বলিলেন—

"Then again all these various *Yogas* (work or worship, psychic control or philosophy) have to be carried out into practice ; theories will not do. We have to meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, not talk, nor doctrine, nor theories, however beautiful they may be. It is being and becoming not hearing or acknowledging ; it is not an intellectual assent By intellectual assent we can come to a hundred sorts of foolish things and change them next day, but this being and becoming is what is religion."

মাদ্রাজীদের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ কথা—হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব ঈশ্বর দর্শন—বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ঈশ্বর দর্শন—

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language is that man must realise God. * * Thus to realise God, the *Brahman* as the *Dvaitas* (dualists) say, or to become *Brahman* as the *Advaitas* say is the aim and end of the whole teachings of the *Vedas*"

Reply to Madras Address.

স্বামী, ২৯এ অক্টোবর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে বক্তৃতা করেন:—বিষয়, ঈশ্বর দর্শন (*Realisation*)। এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, বাপু, যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভাল বাসিলে বস্তু লাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নাস্তিক, কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্বাস আসিবে।

"We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We are all in the dark ; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere talk—this man talks well and that man evil. Religion will begin

when that actual realisation in our souls begins. That will be the dawnof religion * * . Then will real Faith begin."

Realisation. London.

২। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

(Harmony of all Religions)

নরেন্দ্র * ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, একথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে তো বলিতেন। কিন্তু তিনি আরো বলিতেন, সকল ধর্ম্মই সত্য—অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম দিয়া ঈশ্বরের কাছে পঁহুছান যাইতে পারে। এক দিন, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, ৺কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ষ্টীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পথে জাহাজের উপরে অনেক বিষয়ে কথা হইল। ঠিক এই সকল কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কথা আমাদের diary হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

৺কেদারনাথ চাটুর্য্যে সে দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মহোৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়া বেলা ৩৷৪ টার সময় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। মত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

"নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সেখানে সব এক।

"ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, আর শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠা যায়। তবে উঠ্‌বার সময় একটা ধরে উঠ্‌তে হয়—দু তিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠা যায় না। তবে ছাদে উঠ্‌বার পর সব রকম সিঁড়ি দিয়া নামা যায়, উঠা যায়।

"তাই প্রথমে একটা ধর্ম্ম আশ্রয় কর্‌তে হয়। ঈশ্বর লাভ হলে সে ব্যক্তি সব ধর্ম্ম পথ দিয়ে আনাগোনা কর্‌তে পারে। যখন হিন্দুদের ভিতর

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বের নাম।

থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু, যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান, আবার যখন খৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে, সকলে ভাবে ইনি বুঝি খৃষ্টান।

"সব ধর্ম্মের লোকেরা একজনকেই ডাকৃছে। কেউ বল্‌ছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ God, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।

"একটা পুকুরের চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্চে, তারা বল্‌ছে জল। আর এক ঘাটে মুসলমান, তারা বল্‌ছে পানি। আর এক ঘাটে খৃষ্টান, তারা বল্‌ছে 'water'। আবার এক ঘাটে কতকগুলো লোক বল্‌ছে 'aqua'। (সকলের হাস্য)। বস্তু এক—জল। নাম আলাদা, তবে ঝগড়া করবার কি দরকার? সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকৃছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।

একজন ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যদি অন্য ধর্ম্মে ভ্রম থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা ভ্রম কোন ধর্ম্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ী ঠিক যাচ্চে। কিন্তু কোন ঘড়ীই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়ীকেই মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে মিলাইতে হয়।

"ভুল কোন্ ধর্ম্মে নাই? আর যদিই ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তা হলে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।

"মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে—ছোট বড়। সকলেই 'বাবা' বল্‌তে পারে না। কেউ বলে 'বাবা', কেউ 'বা' কেউ বা কেবল 'পা'। যারা 'বাবা' বল্‌তে পার্‌লে না, তাদের উপর বাপ রাগ কর্‌বে নাকি? (সকলের হাস্য)। না, বাপ সকলকেই সমান ভাল বাস্‌বে? *

"লোকে মনে করে, 'আমার ধর্ম্ম ঠিক, আমি ঈশ্বর কি বস্তু বুঝেছি, ওরা বুঝ্‌তে পারে নাই। আমি ঠিক তাঁকে ডাকৃছি, ওরা ঠিক ডাকৃতে পারে না, অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন না।' এসব লোক জানে না যে, ঈশ্বর সকলের বাপ মা, আন্তরিক হলে তিনি সকলকেই দয়া করেন'।

কি প্রেমের ধর্ম্ম। এ কথা তিনি তো বার বার বলিলেন, কিন্তু কয়-

* ঠিক এই কথা এক খানি ইংরাজী গ্রন্থে আছে—Maxmuller's Hibbert Lectures মোক্ষমূলরও এই উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেবদেবী পূজা করেন, তাঁহাদের ঘৃণা করা উচিত নয়।

জন ধারণা করিতে পারিল? এক ৺ কেশব সেনই কতকটা পারিয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ। তিনিই জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম্ম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মতুয়ারবুদ্ধি* করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা' এটীর নাম 'মতুয়র বুদ্ধি'—এইটী যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো-ধর্ম্ম-সমিতি সমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্ম্মের নামে কত বকাবকি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়াছেন।

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism, have possessed long this beautiful earth. It has filled the earth with violence,drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair." *Lecture on Hinduism ; Chicago Parliament of Religions.*

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় 'সকল ধর্ম্ম সত্য' এ কথা বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—

"If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of these religions and destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu ? God fobid Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian ? God forbid

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water ? No, It becomes a plant, it assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows a plant

"Similar is the case with religion The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist nor the Hindu or the Buddhist te become a Christian But each must assimilate the others and yet preserve its own law of growth."

আমেরিকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দু

* মতুয়র বুদ্ধি—dogmatism

ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis Janes সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, একজনের ধর্ম্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম সত্য বলিতেছ, সে একটী ব্যাধি বিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটি আঙ্গুল আর একজনের যদি ছয়টি হয়, বলিতে হইবে যে, ইহা তাহার একটি রোগবিশেষ।

"Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my hand while all of you had only five, you would not think that my hand was the true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would have again to say that, that religion is diseased If one religion is true, all the others must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine."

Lecture at Brooklyn.

স্বামী চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন, যে বক্তৃতা শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন†, সেই বক্তৃতা মধ্যে এই সমন্বয়-বার্ত্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন—

"I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and universal acceptance. *We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true* I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word 'exclusion' is untranslatable."

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, কর্ম্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা বলিতেন, 'আমি ও আমার' এইটি অজ্ঞান, 'তুমি ও তোমার' এইটি জ্ঞান।

† "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America there arose a peal of applause that lasted for several minutes". *Dr. Barrows's Report* "But eloquent as were many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the parliament of religions and its limitations as the Hindu monk. * * He is an orator by Divine right"

New York Critique.

একদিন ৺ সুরেশমিত্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছিল, রবিবার ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি ভক্তও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন—

"দেখ, আমি ও আমার এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলেনা যে, ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক করে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। এ কথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় এটী হয়েছে। আমি করেছি, এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিষ, এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিষ, এ সব কথা জ্ঞানীর।

"আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোক-গুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোককে ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এরা দয়া রেখেছিলেন।"

ঠাকুরের কথা—শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন ?

স্বামী চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় একদিন বলিয়াছিলেন, আমার গরীব স্বদেশ-বাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ভারি কঠিন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট যাহারা খ্রীষ্টান নয়, তাদের জন্য টাকার জোগাড় করা কঠিন।

"The crying evil in the East is not religion—they have religion enough, but it is bread that these suffering millions of burning India cry out for with parched throats. * * * I came here to seek aid for my impoverished people and fully realised how difficult it was to get help for heathens

from Christians in a Christian land." *Speech before Parliament of religions.*" (Chicago Tribune).

স্বামীর একজন প্রধান শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন, তা তিনি যে জাতিই হউন—হিন্দু হউন বা মুসলমান বা পার্শী বা যাহাই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটিতে অতিথিরূপে থাকিতেন। সেই খানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন; আর তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন,—

"At Chicago any Indian man attending the great World Bazar, rich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not. might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have cost them his presence."

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্ব্বদা ভাবিতেন।

কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (Coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম, 'তুমি কি আফ্রিকাবাসী ?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন ?" স্বামী বলিলেন, কেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয় ?

অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎ ছাড়া ? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা,

স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকা, তাই তাদের সেবা আগে। এরি নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্ম্ম-যোগ। সকলেই কর্ম্ম করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে তো মায়া হইল; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা,' তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কাজ,' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রতপালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।

যথার্থ স্বদেশ হিতৈষিতা (Ideal Patriotism) কাহাকে বলে, লোক শিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা-দের গৃহ পরিজন আছে, কখন ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মান সম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্ হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষিতার এই মহান উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিবে? স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা এটীও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামী বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দর্শন করিতে আলমোরায় গিয়াছিলেন। আলমোরাবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিম-গিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলি সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহাদেরই শ্রীমুখ হইতে বেদ-মন্ত্র বিনির্গত হইয়াছিল। হায়! কবে আমার সে দিন হইবে? আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেক দিন পরে আবার আসিবার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হই-তেছে। ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া শেষ কয় দিন হরিপাদপদ্ম চিন্তায় গভীর সমাধি মধ্যে নিমগ্ন হয়ে কাটাইয়া যাই।

"It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of mountains, where *Rishis* lived where philosophy was born." *Speech at Almora.*

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না—মনে এক চিন্তার উদয় হয়—কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

"As peak after peak of this Father of mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my brain for years, seemed to quiet down, and the mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers—*Renunciation.*"

এই কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়—আর সকল বস্তুই ভয়াবহ—

"সর্ব্বং বস্তু ভয়াম্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

"Every thing in this life is fraught with fear. It is renunciation that makes one fearless."

"এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া বিবাদ কোথায় পালাইয়া যায়।* কেবল একটী মহান্ সত্যের ধারণা হয়—ঈশ্বর-দর্শনই সত্য, আর যা কিছু জলের ফেনার ন্যায়—ভগবানের পূজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সমস্তই মিথ্যা।

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু! অথবা মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পাইলে আর ভন্ ভন্ করে না।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া-

* "Strong souls will be attracted to this Father of mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered anymore, and quarrels between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that *there is but one eternal religion and that is the perception of the Divine within, and the rest is mere froth!* Such ardent souls will come here knowing that the world is but vanity of vanities, knowing that *everything is useless except the worship of the Lord and the Lord alone.*"....*Speech at Almora.*

ছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহ, ধন, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বদেশ বিদেশ আবার কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জান্‌লে এসব ধন, বিদ্যা কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জানো, তার পর অন্য কথা। স্বামী এইটী জগৎকে দেখাইলেন। যেন বলিলেন, হে জগৎবাসিগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তার পর যা কিছু কর, কিছুতেই দোষ নাই, স্বদেশের সেবা কর, ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই, কেন না তুমি এখন বুঝিতেছ যে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নাই—সংসার, স্বদেশ কিছুই তিনি ছাড়া নয়। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে, তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিযাছিলেন, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, তবে ত্যাগ কোরো ¶। রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, ছুরীর ব্যবহার জেনে, ছুরী হাতে কর। স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে, যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন।

দেশের কি উপকার করিবে? স্বামী জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রদের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য্য; তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পর জীবন দান; তাহার পরে অন্ন বস্ত্র দান। সংসার দুঃখময়। এ দুঃখ তুমি কয় দিনের জন্য ঘুচাইবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺কৃষ্ণদাস পালকে * জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা'। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী † বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি কর্‌বে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গার কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খপর নিচ্চেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য—তারপর যা হয় কোরো, কারুর উপকার কর্‌তে ইচ্ছা হয় কো'রো।

¶ যোগবাশিষ্ঠ।

* ৺কৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

† রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি—বিধবার ছেলের বুদ্ধি, হীন বুদ্ধি, কেন না সে ছেলে অনেক নীচ উপায়ে মানুষ হয়, পরের তোষামোদ করিয়া, ইত্যাদি।

স্বামীও একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন—

Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever ; any other knowledge satisfies wants only for a time * * He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind. Next to spiritual help (ব্রহ্মজ্ঞান) comes intellectual help (বিদ্যাদান) ; the gift of secular knowledge is far higher than the giving of foods and clothes ; the next gift is the gift of life and the fourth the gift of food." *Karmayoga* (New York) , *My plan of Campaign* (Madras.)

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য ; আর এ দেশের ঐ এক কথা। আগে ঐ কথা, তারপর অন্য কথা। 'রাজনীতি' (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যান চিন্তা কর, হৃদয় মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন 'স্বদেশের' মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে ; কেন না, তখন মন অনাসক্ত ; 'আমার দেশ' বলিয়া সেবা নয়—সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন বলিয়া তাঁহারই সেবা। তখন স্বদেশ বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গল সাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, দাবাবড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝ্‌তে তত পারে না ; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল বেশ বলে দিতে পারে। কেননা, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত। উদাসীন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নির্জ্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না ;—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

হিন্দুর রাজনীতি সমাজনীতি তাই সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁরা উদাসীন হয়ে দাবাবড়ের চাল বলে দিচ্ছেন, তাই দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাঁহাদের কথায় একটী ভুল হইবার যো নাই।

বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রত রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই কর্ম্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার কথার এতো মূল্য। অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থে বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটী কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে হইবে।—তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে। তবে এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই তোমার গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ! তাঁর মহামন্ত্র—আগে ঈশ্বর লাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া দিলে, এ সংসার যথার্থই স্বপ্নবৎ, ভেল্কী বাজি; তাই সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তাঁর সাধন আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে, সর্ব্ব বস্তুর প্রাণ তিনি, যখন দেখিলে, তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ করিলে; তখন হে মহাযোগিন্, সর্ব্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর নারী, সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্য বশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া চক্ষের জলে ভাসাইয়া, গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন সেই মাকে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে! তোমার গুরুভাইরা তোমার অদ্ভুত স্নেহ ও তোমার সর্ব্বভূতে সেই অপার প্রেম স্মরণ করিয়া আজ তোমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তোমার সেই পঞ্চমবর্ষীয় প্রেমানুরঞ্জিত বালকমূর্ত্তি, তোমার সদানন্দ রূপ আজ না দেখিতে পাইয়া ভগ্নহৃদয় লইয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা নিশিদিন বিরলে বসিয়া তোমার জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাখালদিগের ন্যায়, আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন,—তাঁহারা দিন গণনা করিতেছেন, কবে পিতা ও তোমার সহিত পিতার পরমধামে তাঁহাদের সম্মিলন হইবে! তুমি পিতার কার্য্য সাঙ্গ করিয়া আজ তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আছ ও তোমার গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত অতুলনীয় কণ্ঠে তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করিতেছ। এসো, একবার আসিয়া তোমার প্রাণের

ভাইদের সান্ত্বনা কর! আর যাহাদিগকে গুরুদেবের পথ প্রদর্শন করাইয়া, তাঁহার পথে তুলিয়া লইয়া, কাছে রাখিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহাদের একটু অসুখ হইলে চিন্তিত হইতে ও শতবার খপর লইতে, তাহারা তোমাকে অনেক দিন দেখে নাই; তাহারা মাতৃহীন বালকের ন্যায় দীনহীন হইয়া রহিয়াছে, এসো, তাহাদের ও তোমার ভাইদের সান্ত্বনা করিবে! আর সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গার তীরে যে তপোবনে মহাপূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, হরিময় জগতের সেবার্থ অশ্রুত-পূর্ব্ব পরিশ্রম সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম সাঙ্গ করণান্তর বিশ্রামার্থ যে তপোবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলে; যে তপোবনে, গভীরতত্ত্বচিন্তা ও ধ্যান সমাধি হইতে মন নামাইবার জন্য মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় তরু লতা পশু পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করিতে ও তাহাদের সন্তান বোধে লালন পালন করিতে; যে তপোবনে সাক্ষাৎ মহাকালীর সম্মুখে তাঁহার সেবায় মহাসমাধিমগ্ন তোমার মহামন্ত্রপূত দেবদেহ প্রজ্বলিত হোমাগ্নি মধ্যে আহুতি প্রদান করিয়াছ,—আজ সেই তপোবনে তোমার ভাইরা বিষণ্ণবদনে সাশ্রুনয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ দিন যাপন করিতেছেন; আজ সেই তপোবনে তোমার লালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাতর, তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার দিবে বলিয়া ও তাহাদের লইয়া আনন্দ করিবে বলিয়া, তুমি কখন আসিবে বলিয়া, তাহারা ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; অতএব এসো, ভক্তচূড়ামণি, তোমার গভীর স্নেহের জিনিস গুলিকে একবার দেখিয়া যাও, একবার আসিয়া তাহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর কর!!

(ক্রমশঃ)

গৃহ সংস্কার।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত।)

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির বর্ত্তমান শোচনীয় দশা দেখিয়া হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই কাতর। যেন চারিদিকে অন্ধকার,—কি করিলে দুর্ভিক্ষব্যাধিপ্রপীড়িত, মহামারী প্রভৃতির আবাসস্থল, অজ্ঞানান্ধ ভারত-বাসীর দুঃখের রজনী অবসান হইবে, কেহই যেন সে সদুপায়টী দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ধরিতে পারিতেছেন না। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়, পাশ্চাত্য জগতের সহিত সংঘাত, অতীত গৌরবের স্মৃতি, ভবিষ্যতের দুরাশা ইত্যাদি বহুবিধ অনুকূল প্রতিকূল শক্তিনিচয়ের বর্ত্তমান ক্রীড়াক্ষেত্র আমাদের জন্মভূমি। এ শক্তিসমূহের সংঘাতের শেষ ফল কি, কোন্ পথে এ শক্তিগুলিকে পরিচালিত করিলে ভারতের নিশ্চিত মঙ্গল, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও তদবধারণে ভ্রমে পতিত। কোন বিশেষ উপায় প্রথমে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বোধে গৃহীত হইলেও, কিছুদিন পরে তাহার নিষ্ফলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া, সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, হাত পা গুটাইয়া অরণ্যে রোদনও যে কাপুরুষতা, ইহাও সত্য। যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যরূপ নৈসর্গিক অকাট্য নিয়ম বলে, ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়, তথাপি শেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসার আয়োজনও যথেষ্ট হইতেছে, দেখিতে পাই। দেখিলে আশা হয়, বুঝি ভারতের এ দুর্দ্দিনের অবসান সন্নিকট। দেশের উন্নতি কতকগুলি স্বদেশপ্রাণ বীরহৃদয় ব্যক্তিসাপেক্ষ। ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার তিনটী কথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক। প্রথম—হৃদয়বত্তা। দেখা উচিত,—লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রতি বৎসর অনাহারে মরিতেছে, কুসংস্কার, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ঘোর অন্ধকারে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ জ্ঞান দৃষ্টি আচ্ছন্ন, এই সকল চিন্তা দিবারাত্র তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় কি না। কেবল যুক্তি সহায়ে এ অবস্থা অনুভব করিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না। হৃদয় যথার্থ ব্যথিত কি না, দেখিতে হইবে। নিজের স্ত্রী পুত্রের দুঃখে তিনি

যেরূপ দুঃখিত, নিজের শরীরের কষ্টাপনয়নে তিনি যেরূপ ব্যস্ত, সমগ্র দীন দুঃখী ভারতবাসীর দুঃখে তিনি সেরূপ, শুধু তাহাই নহে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে দুঃখিত কি না? তাহাদের কষ্ট দূর করিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ আছে কি না? স্বপ্নে জন্মভূমির দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া তিনি সমস্ত রজনী অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন কি না? এ গভীর হৃদয়বত্তা অসত্ত্বে ভারত সংস্কারের আসনগ্রহীতার কার্য্যের সারবত্তা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথা—তাঁহাকে দেখিতে হইবে, তিনি কোন বিশেষ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন কি না? যে পথ তাঁহার প্রবৃত্তির অনুগত, যে পথ অবলম্বনে কার্য্য করিতে তিনি যথাশক্তি সক্ষম, যে পথে কার্য্য করিলে তাঁহার বিশ্বাস, তিনি ভারতের কম বেশী কিছু না কিছু কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। জলমজ্জনোন্মুখ বালককে তাহার পূর্ব্বের অনবধানতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বৃথা কালক্ষেপ অপেক্ষা হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার প্রাণ বাঁচান প্রথম কর্ত্তব্য। স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া স্বদেশীর উপর বৃথা গালাগালি না করিয়া, কিসে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হয়, এরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করাই উচিত।

তৃতীয় কথা—সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অদম্য উদ্যমশীলতা, "মন মুখ এক"—রূপ সরলতা ও পুরুষত্ব। চাই সেই পুরুষত্ব, যে পুরুষত্ব শত বাধাবিঘ্ন তৃণবৎ পদদলিত করিয়া স্বীয় ইষ্ট অভিমুখী; যে পুরুষত্ব তাঁহাকে নিজের মান সম্ভ্রম, শরীর, আত্মীয়, স্বজন, সমস্ত ত্যাগ করাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তে নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যু আলিঙ্গনে প্রস্তুত করে।

যে সংস্কারক এই তিনটী সদ্‌গুণের আধার, তিনিই মাতৃভূমি-রূপ মহাদেবীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত স্বার্থত্যাগরূপ মহাযজ্ঞের প্রকৃত নৈষ্ঠিক যজমান।

স্বদেশের ঠিক ঠিক অবস্থা না বুঝিয়া সংস্কারক হইতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রীতি নীতি স্বচক্ষে দেখা অতি আবশ্যক। শুধু ভারতবর্ষের কেন, ইউরোপ আমেরিকা ইত্যাদি সুসভ্য দেশের অবস্থাও তাঁহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। সে সমস্ত দেশের লোক কি খায়, কি পরে, কি ভাবে, কি শেখে, কি করে, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিরূপ ঘৃণিত চক্ষে তাহারা আমাদের দেখে, এ সমস্ত বিষয় সেই সেই দেশে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না। তার

পর, সে সমস্ত দেশের সহিত নিজ দেশের তুলনা করিতে হয়। তুলনার ফল—অজ্ঞান চক্ষু খুলিতে থাকে। কূপমণ্ডুকের ভাব দূরীভূত হয়। নিজের ভাল হবার ইচ্ছা হয়। একটা না একটা সদুপায়ও মাথায় লেগে যায়। ঘরের বাহির না হইয়া এত বড় বৃহৎ দেশের সংস্কারক হইবার উদ্যোগ কি ছেলেখেলা নয়?

নীচ ইতর জাতিই দেশ মাত্রের মূলভিত্তি। তাহারা কৃষক, তাহারা শিল্পকার; তাহারা প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে সকল জিনিষ উৎপন্ন করে, তাহারই সাহায্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ দেশবাসী লালিত ও সুখী। তাহারাই বৃক্ষের মূল; বৃক্ষকে বাঁচাইতে হইলে জল সেচনের আবশ্যক প্রথম এই মূলে; নীচ ইতর জাতি জাতীয় শরীরের হৃদয়, বড় লোক তাহার মস্তক। যে হৃদয়ের রক্তে শরীর পরিপুষ্ট, তাহার অবহেলা রূপ মহাপাপের শাস্তি যে দুরপনেয়, এ নিশ্চিত। কয়জন সংস্কারক আছেন, যিনি ধনী মানী শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর সুখ সহবাস তুচ্ছ করিয়া দরিদ্র, মূর্খ, অসভ্য ইতর জাতিকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত?

যাহাদের উদ্দেশ্য ভারতের উন্নতি, তাঁহাদের করুণ দৃষ্টি প্রথম এই ইতর জাতির দিকে পড়া উচিত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের বুদ্ধি শুদ্ধিবলে নিজেদের উন্নতি সাধন করিবার কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতেছে। ইতর শ্রেণী অজ্ঞ নিঃসম্বল, নিজেদের কিসে ভাল হয়, তাহা ঠিক ঠিক বোঝে না। তারা বালক, পিতৃতুল্য সংস্কারকের প্রীতিস্নিগ্ধ হস্ত প্রথমে কি তাহাদের দিকে প্রসারিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়?

ইতর শ্রেণীর প্রধান কষ্ট দারিদ্র্য। তাহারা যাহাতে দু বেলা পেট ভরে দু মুটো ভাত খেতে পায়, সে বিষয়ে নজর করাই প্রথম আবশ্যক। নানা কারণের মধ্যে এ দরিদ্রতার এক কারণ অজ্ঞতা; যে কৃষি ও শিল্পকার্য্য তাহাদের জীবনোপায়, সেই কৃষি ও শিল্প কার্য্যের যে প্রকারে প্রকৃষ্ট উন্নতি হয়, যাহাতে সে সমুদায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের পথ হয়, তদুপযোগী কৌশলের অজ্ঞতা।

যে কোন দেশেরই বাস্তব আর্থিক উন্নতি, সেই দেশে উৎপন্ন জিনিষের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কেবল মাত্র বাণিজ্যে অর্থাৎ নিজের দেশে নূতন জিনিষ না জন্মাইয়া কেবল মাত্র পরদেশ-

জাত দ্রব্য সে দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজের দেশে বিক্রয়ের দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি আপামর সাধারণের পক্ষে হয় না। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে এ দেশে নূতন জিনিষ প্রচুর ও উত্তমরূপে জন্মাইতে হইবে।

তদনুকূল সুবিধাও বিস্তর আছে। শিল্প সম্বন্ধে দেখ, আমাদের দেশে কামার, ছুতোর, সেক্‌রা, তাঁতি, পোটো, সাঁখোরি, কুমোর, কাঁসারি, ঘরামি, রাজমজুর ইত্যাদি নানা শিল্পিসম্প্রদায় রহিয়াছে। ইহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ানুসারে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ও এক এক জাতি বহুদিন হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষানুক্রমে এক এক পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। পুরুষানুক্রমে এক ব্যবসায়েই নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত সে ব্যবসায়ের দক্ষতা তাহাদের হাড়ে হাড়ে, রক্তে রক্তে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের হাত, আঙ্গুল সুন্দররূপে শিল্পকার্য্যোপযোগী আছে। বিদেশী ও স্বদেশী, যিনিই উহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিল্পদক্ষতা সযত্নে পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিবেন। দক্ষতারূপ শক্তি বর্ত্তমান; অভাব—সে দক্ষতার চালনা। বিজ্ঞানের উৎকর্ষে আজ কাল যে যে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, যে যে নূতন সহজে কায করিবার প্রণালী বাহির হইতেছে, সে সকল তাহাদিগকে বলিয়া দিবার কেহই নাই। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ধান্য, যব, আলু, নানাবিধ ডাল, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, বহুবিধ ফল ইত্যাদি ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণপরিচিত বহুবিধ কৃষিলভ্য জিনিষ ভারতবর্ষে জন্মায়। কি রকম সার কিরূপ মাটীতে কতদিন অন্তর দিলে উৎকৃষ্ট জিনিষ জন্মায়, কোন্ জমি কোন্ শস্যের উপযোগী, কি প্রকারে এক শস্যের জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিতে পারা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের উন্নতির নানাবিধ কৌশল এ দেশের কৃষকেরা এক রকম জানেনা বলিলেই হয়। শিল্পী ও কৃষকের উক্তরূপ অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে, তাহাদের ও দেশের যে অশেষ মঙ্গল, এ অতি নিশ্চিত।

আমেরিকায় কৃষিবিভাগের উপর এক মহা পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছেন। তিনি পরীক্ষা (experiment) করিয়া স্বদেশের চাষ বাসের উন্নতির উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করেন। পরে সে উপায় ও কৌশল আপামর সাধারণ কৃষককে জানান হয়।

আমাদের দেশের ইতর শ্রেণী মান্ধাতার সময়ের প্রথা ও যন্ত্র নিয়ে ঠুক্ ঠাক্ করছে। কোন রকম করে ছুটো ধান যা তা জমিতে ছড়িয়ে আসছে, হয় হলো, না হয় হলো না।

কৃষক ও শিল্পীর অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে প্রথম কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত করা আবশ্যক। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থাকিবে, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক উপর্য্যুক্ত যন্ত্র ও উপায় কৌশলাদি বিষয়ে কয়েক জন শিক্ষককে অভিজ্ঞ করা। এই শিক্ষকগণ প্রথমে ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে শিল্প ও কৃষির উন্নতি সম্পাদনকারী আধুনিক যন্ত্র ও উপায়াদি সুন্দর রূপে শিখিবেন। পরে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া আপামর সাধারণকে তৎসমুদায় শিখাইবেন ও যাহাতে ইতর শ্রেণীর মধ্যে ঐ সকল যন্ত্র ও উপায়াদিব প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন। ৪০।৫০ টি গ্রাম এক জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিতে পারে। অবশ্য শিল্প ও কৃষিকার্য্যের নানা বিভাগ। এক এক জন শিক্ষক ৩।৪ বিভাগ অনায়াসেই আয়ত্ত করিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষকের প্রথা কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের লোকেব শিল্প ও কৃষিকার্য্য বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক দূর হওয়া সম্ভব।

মুর্শিদাবাদে বেশমের চাষ হয়। সেখানে কয়েকটি ইউরোপীয ব্যবসায়ী পরিচালিত রেশমের কল আছে। উক্ত ব্যবসায়িগণের উদ্যমে কয়েক জন যুবক রেশম তৈয়ারেব প্রথা শিথিয়াছেন। ইহারা স্ব স্ব অধীনস্থ গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঐ প্রথা রেশম উৎপাদনকারী সাধারণকে শেখান। এক জন ঐরূপ শিক্ষকের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ রূপ প্রথা সমস্ত শিল্প ও কৃষি কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগে অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।

ঐ সকল শিক্ষকের দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কার্য্য সাধিত হইতে পারে। দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি কমান। অনেক স্থলে কৃষকেরা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীনতা বশতঃ সঞ্চয় করিতে জানে না। যে বৎসর ভাগ্যক্রমে প্রচুর শস্য জন্মায়, সে বৎসর তাহারা টাকার লোভে নিজেদের সে বৎসরের খাবার মতন রাখিয়া অবশিষ্ট শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। আগামী বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে হয়তো কিছুই জন্মাইবে না—এ কথাটা তারা ভুলিয়া যায়। শিক্ষকেরা গ্রামে গ্রামে একটি করিয়া পঞ্চায়ৎ স্থাপন করিতে পারেন। এ পঞ্চায়ৎ গ্রামের সকলের সহিত মিশিয়া ও পরামর্শ করিয়া, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বুঝিয়া, যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া

পরে যাহাতে অতিরিক্ত অংশ বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবেন।

এই শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ও শিক্ষকদিগকে বেতন দিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ কোথায়? অর্থ এক্ষণেও দেশে আছে। তাহার কেবল সদ্ব্যবহার চাই। দেশের রাজা, জমীদার প্রভৃতি ধনীদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। স্বার্থ ত্যাগ বিনা কোথায় কবে বড় কায হয়? প্রথমে ধনী ব্যক্তিদিগকে নিজের ঘরের টাকা দিয়া এ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে. কত দিকে তাঁহারা কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। যদি কিছু টাকা এ দিকে দেন, তা হইলেই হইল। এ টাকাটা যে একেবারে জলে পড়িবে, তাহাও নয়। ঐ ইতর শ্রেণীই তাঁহাদের ধনাগমের প্রথম দ্বার। তাহারা যে খাজনা দেয়, সেই খাজনাতেই জমীদারদিগের অর্থ। সেই ইতর শ্রেণীর অবস্থা ভাল হইলে, তাহারা সম্পত্তিপন্ন হইলে, পরিণামে জমীদারদিগের স্বার্থ সিদ্ধি। আপাততঃ স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, কি তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন না?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪।

প্রিয়কিডি,

আমি তোমার সব চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু কি জবাব দিব, ভাবিয়া পাই নাই। তোমার শেষ চিঠি খানিতে আশ্বস্ত হইলাম। এখন আমার বোধ হয়, তোমার একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র ইহাতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে, এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু উহাতে আবার গোঁড়ামী আসিবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হইবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে আশঙ্কা, পাছে উহা শুষ্ক বাদ বিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

ভক্তি খুব বড় জিনিষ, কিন্তু উহা হইতে নিরর্থক ভাবুকতা আসিয়া আসল জিনিসটাই নষ্ট হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

এই সব গুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এইরূপ সমন্বয়-পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষগণ কালে ভদ্রে জগতে আসিয়া থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ স্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগুতে পারি। আর আমাদের মধ্যে একজনও যদি সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ না করতে পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ করে এমন করে তুল্‌তে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলো জীবন মিলে একটা পূর্ণ জীবন, এক জনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্চে। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হোলো আর তাই যে অন্য অন্য প্রচলিত ধর্ম্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপান হোলো।

কোন ধর্ম্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কার্য্য করতে চায়, তা হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক, কিন্তু যেন উহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, এটী লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্যে একটী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা, তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদারভাবও থাকবে।

ভগবান যদিচ সর্ব্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্র স্বরূপ করে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক, যার যা খুসি, সে তাঁকে সেই ভাবে নিক।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করি না, তবে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার আর তাঁর শিষ্যদের ভেতর যাতে কি মতে, কি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটীর দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই না। এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হউক বা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগতই বলুক, অদ্বৈতবাদীই হউক বা বহুদেবে বিশ্বাসীই হউক, অজ্ঞেয়বাদীই হউক বা নাস্তিকই হউক, আমরা কাকেও বাদ দিতে চাই না। কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তাকে কেবল এইটুকু মাত্র কর্ত্তে হবে যে, তাকে এমন চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, তা যেমন উদার তেমনি গভীর।

চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতিক মতের পোষকতা করি না বা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সকলকে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বলি না, অবশ্য যাতে অপরের কিছু অনিষ্ট হয়, তা করতে আমরা লোককে বারণ করে থাকি।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এইটুকু লক্ষণ বলে আমরা লোককে তার পর নিজের বিচারের উপর নির্ভর করতে বলি। যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম্ম।

তার পর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেচে নিয়ে সেই পথে যাক্, এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই। এক জনের হয়ত মাংস খেলে উন্নতি সহজে হতে পারে, আর এক জনের ফলমূল খেয়ে থাক্‌লে হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক। কিন্তু একজন যা কচ্চে, তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে পারে বলে সেই অপরের কোন অধিকার নেই যে, সে তাকে গাল দেবে। অপরকে নিজের মতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ত দূরের কথা। কতকগুলি লোকের হয়ত সহধর্ম্মিণী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয়ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বল্‌বার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ভুল পথে যাচ্চ, জোর করে তাকে নিজের মতে আন্‌বার চেষ্টা ত দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস,—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত আর এক জনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই,—কোন সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ আর ভৌতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই,—আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্চে।

এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন;

আমাদের বিশ্বাস,—ইহাই বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস,—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তাহার সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত আর তাকে কোন মতে ঘৃণা, নিন্দা, বা কোন রূপে তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, তাহা নয়, সকল নরনারীরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস,—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁহাতে অপূর্ণতা নাই।

আমাদের বিশ্বাস,—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও একথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু, যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের সহিত সমাজ সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের

সহিত আমরা একমত। কিন্তু তাঁহাদিগকে আবার আমাদের একথা মান্‌তে হবে যে, তাহলেই ধর্ম্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দিবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার কর্‌বার কোন অধিকার নেই, যখন ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্চে,—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।

যদি একথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করিব,—

তাহাতে আমাদের উত্তর এই, তাঁহারা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি বলিতেছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।

বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম, না, যেন অসৎ কার্য্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্চে, সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসজ্জাত হইতে উৎপন্ন—ধর্ম্মের অনুমোদনে। ধর্ম্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্ম হাত দিলেন, কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে বল্‌চেন, সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ। একথা বলায় ধর্ম্ম নিজের আচরণ নিজেই খণ্ডণ কচ্চেন। সত্য, এখন দরকার হচ্চে যেন ধর্ম্ম সমাজসংস্কারে না দাঁড়ায়, কিন্তু আমরা তাই জন্যেই একথাও বলি, ধর্ম্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে।

অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১ম, শিক্ষা হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ করা।

২য়, ধর্ম্ম হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই উপদেষ্টার কার্য্য কেবল পথ থেকে বাধা বিঘ্ন গুলি সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্ব্বদা বলে থাকি, অপরের অধিকারে হাত দিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য,—রাস্তা সাফ করে দেওয়া—তিনিই সব করেন।

সুতরাং তোমার এইটুকু বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, কারণ, দেখ্‌ছি, তোমার দিন রাত মনে হয়, ধর্ম্মের কায কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক

বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখ্‌বার দরকার নেই। তোমার এ কথাও ভাবা উচিত যে, যে যুক্তিতে এখন ধর্ম্মকে সমাজসংস্কার থেকে পৃথক্ কোর্‌ছো, ঠিক সেই যুক্তিই, ধর্ম্ম সমাজের বিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়া পূর্ব্ব হইতেই যে অনর্থ করিয়া বসিয়া আছে, ধর্ম্মের সেই অনধিকার চর্চ্চাতেও দোষারোপ করে। এখন ধর্ম্মকে সমাজ থেকে পৃথক্ কর্‌বার চেষ্টা কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর করে এক জনের বিষয় কেড়ে নিয়েচে। এখন সে ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাচ্চে, তখন সে নাকে কেঁদে মানবাধিকারের পবিত্রতার মত ঘোষণা কর্‌ছে!!!

বদ্‌মাস পুরুত গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্চে।

তুমি মাংসভুক্ ক্ষত্রিয়গণের কথা বলিয়াছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক, আর নাই খাক, তারাই হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্চ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঙ্গে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ কর্‌ছেন। ঈশ্বর কি তোমার মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান যে, একটুক্‌রা মাংসে তাঁর দয়ানদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এক কড়া কানা কড়িও নয়। যাক, ঠাট্টা থাক—বৎস, তোমায় আমার বক্তব্য এই, এই চিঠিতে কি প্রণালীতে তোমার চিন্তাকে নিয়মিত কর্‌তে হবে, তার গোটা কতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, পূর্ব্বেই তোমায় বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, মান্দ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উন্নতি হবে। তাই বল্‌ছি হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের

মধ্যে গোটা কতক লোক এই নূতন ভগবান রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই নূতন ভাবে একেবারে মাতিয়া উঠিতে পার কি? উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণজীবনী লেখ দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ কোরো না অর্থাৎ জীবনীটা লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। খবরদার, তার মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাকবে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আর জীবনীটা তারই উদাহরণ স্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণ লোকের জন্য নয়। আমি নিজে অযোগ্য হলেও আমার একটা কায ছিল এই, যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মান্দ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

আমাকে মনে কর, আমি আমার করবার যা কিছু করে চুকিছি—এখন মরে গেছি; এইটা ভাব যে, সব কাযের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, ভাব যে, তোমরা এই কায করবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তোমরা কাযে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর, তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। জাতিভেদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিও না অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বলবার দরকার নাই। কেবল লোককে বল, 'গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যেও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক বৎসগণ, তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদেরি বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচার কার্য্য।

১৫৪ পৃষ্ঠার পর।]　　　　　　　　[শ্রীম—

৪। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

এক দিন ৺ কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে সাকার নিরাকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন, আমি মাটীর কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালী। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন 'ব্রহ্ম'; যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, তখন কালী, অর্থাৎ যিনি কাল * সঙ্গে রমণ করেন। তাঁহাদের নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা একটু তুলিয়া দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কূলকিনারা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়; স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট্ বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গলে যায়—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ্ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি মুখে বলা যায় না—মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

"যে লোক এ একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জান্‌তে পারে। যে নিরাকার জান্‌তে পারে, সে সাকারও জান্‌তে পারে। সে পাড়াতেই গেলে না—কোন্‌টা শ্যামপুকুর, কোন্‌টা তেলিপাড়া, জান্‌বে কেমন করে?"

সকলে নিরাকার পূজার অধিকারী নয়, তাই সাকার পূজার বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাও পরমহংসদেব বুঝাইলেন। বলিলেন—

"এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার যা পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়।"

---

* কাল—The Spirit of Eternity

এদেশে সাকার পূজা হয়। খ্রীষ্টান মিসনরিরা আমেরিকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন—ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ আমেরিকাতে প্রথমেই বুঝাইলেন। বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying all the attributes of *God* to these *Images*."

Lecture on Hinduism.

ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারে না, একথা মনোবিজ্ঞান (Psychology) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন—

"Why does a Christian go to Church ? Why is the cross holy ? Why is the face turned towards the sky in prayer ? Why are there so many images in the Catholic church ? Why are there so many images *in the minds* of Protestants when they pray ? My brethren, we can no more think about ***anything*** without a material image than we can live without breathing. Omnipresenee to almost the whole world means nothing. Has God superficial area ? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth , that is all."

Lecture on Hinduism (Chicago)

স্বামীজীও বলিলেন "অধিকারিভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে—মিথ্যা নহে, 'নিম্নস্থানীয় সত্য"—

"If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin ? Nor even when he has passed that stage, should he call it an error. To the Hindu, man is not travelling from error to truth but from lower to higher truth."

স্বামীজী বলিলেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানা ভাবে প্রকাশ হইতেছেন। হিন্দু এইটী বুঝেন।

"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu

has recognised it. Other religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them; they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, all alike If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. *The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or stated only through the Relative.*"

৫। পাপবাদ।

স্বামীজীর গুরুদেব বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পালিয়ে যায়। যেমন তুলার পাহাড় অগ্নিস্পর্শে এক-ক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখী অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব উড়ে যায়। এক দিন কেশব বাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' জোর করে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বল্‌তে বল্‌তে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয় যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই (Bible) একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বল্‌লাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ।

"তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' আমি পাপী,' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি। আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাক্‌বে। আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়াছিল। এক দিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, 'ওরে তুই আমায় একঘটী জল দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বল্লে, 'ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত মুচি'। কৃষ্ণকিশোর বল্লে, 'তুই বল্ শিব, আর জল তুলে দে'।

"ভগবানের নাম কর্‌লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বলো যে, 'অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি, তা আর কর্‌বো না।' আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

স্বামীজী খ্রীষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কি। তোমরা অমৃতের অধিকারী Sons of Immortal Bliss, তোমাদের ধর্ম্মযাজকেরা রাত দিন নরকাগ্নির কথা বলে, সে কথা শুনিও না।

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, yea, divinities on earth. Sinners? It is a sin to call a man so. Come up, oh lions! and shake off the delusion that you are sheep! You are souls immortal, spirits free and blest and eternal, ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter."

Lecture on Hinduism (Chicago).

আমেরিকায় Hartford নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Patterson সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার খ্রীষ্টানদের পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তাহ'লে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' করিলে কি হইবে? আলো আলো, তবে তো হবে—

"Shall we advise men to kneel down and cry —O miserable sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine nature. * * If the room is dark, do you go about striking your breast and crying, 'It is dark!' No, the only way to get the light is to strike a light and then the darkness goes. The only way to realize the light above you is to strike the spiritual light within you and the darkness of impurity and sin will flee away. Think of your higher self, not of your lower."

স্বামী পরমহংসদেবের কাছে একটী গল্প * শুনিয়াছিলেন, সেই গল্পটী বলিলেন। "একটা বাঘিনী এক ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। পূর্ণগর্ভা, তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘিনীর মৃত্যু হইল। ছানাটী ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগ্‌ল, আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগ্‌ল ও

* এই আখ্যায়িকাটী সাংখ্যদর্শনে আছে। আখ্যায়িকা প্রকরণ।

'ব্যা—অ্যা, 'ব্যা—অ্যা' করতে লাগ্‌ল। কিছুদিন পরে সে ছানাটী বেশ বড় হইল। একদিন ছাগলের পালে আর একটা বাঘ পড়িল। সে দেখে অবাক্ যে, একটা বাঘ ঘাস খাচ্চে, আর ব্যা ব্যা কর্‌ছে, আবার তাকে দেখে ছাগলের মত পালাচ্চে! তখন তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বলিল, 'তুইও বাঘ, তুই ঘাস খাচ্চিস কেন, আর ব্যা ব্যা কর্‌চিস্ কেন—দেখ্ আমি কেমন মাংস খাচ্চি, তুইও খা, ঐ দেখ্ জলে তোর মুখ দেখা যাচ্চে, আমারই মত।' বাঘটা সব দেখিল, মাংসেরও আস্বাদ পাইল।"

৬। 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ'—সন্ন্যাস।

একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমাদের diary হইতে সেই কথাবার্ত্তার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম—

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে লোক শিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখনা, কেশব (সেন) ঐটী পার্‌লেনা বলে কি হলো শেষটা। তুমি নিজে ঐশ্বর্য্যের ভিতর, কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু, অনেকে তোমার কথা শুন্‌বে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরী রয়েছে, পরকে বল্‌ছে 'গুড় খেওনা'! তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করলেন। তা না হলে জীবের উদ্ধার হয় না।

বিজয়। হাঁ, চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কফ যাবে বলে পিপ্পল খণ্ড তএর কর্‌লাম *—কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হ'ল, কফ বেড়ে গেল; নবদ্বীপের অনেক লোক ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ও বলিল, নিমাই পণ্ডিত বেশ আছে হে, সুন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নাই, বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব যদি ত্যাগী হোতো, অনেক কাজ হোতো। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাক্‌লে আর ঠাকুর সেবা হয় না, বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হলে লোক শিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হলে কজন তার কথা শুন্‌বে?

বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাই তাঁর ঈশ্বর বিষয়ে লোক শিক্ষা দিবার অধিকার। বিবেকানন্দ বেদান্তে ও ইংরাজি ভাষা ও দর্শনাদিতে

* পিপ্পলখণ্ড—অর্থাৎ নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য? বিবেকানন্দ অসাধারণ বাগ্মী, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য? এর উত্তর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এই ছেলেটীকে † দেখ্‌ছো, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী, আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হইলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়্‌লেই ডিমটা পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোখ্‌ ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ্‌ ফুটলেই দেখ্‌তে পায় যে, সে পড়ে যাবে, আর মাটীতে লাগ্‌লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখী'—তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া—গায়ে মাটী না ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে কর্‌তে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, 'পাণ্ডিত্য! শুধু পাণ্ডিত্য কি হবে? শকুনিও অনেক উঁচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে! কোথায় পচা মড়া! পণ্ডিত অনেক শ্লোক ফড়র্ ফড়র্ করতে পারে, কিন্তু মন কোথায়? যদি হরিপাদপদ্মে থাকে, তবে তাকে আমি মানি, যদি কামিনীকাঞ্চনে থাকে, তাহলে আমার খড়্‌কুটো বোধ হয়।'

† স্বামী বিবেকানন্দ তখন General Assembly কলেজে পড়েন। বয়স সবে ১৯।২০। তাঁহার বাড়ী তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়ায়। পিতার নাম ৺ বিশ্বনাথ দত্ত, হাই-কোর্টের আটর্নি। বালকের নাম নরেন্দ্র। কলেজে থাকিয়া বি, এ, পাশ করেছিলেন। তখন Hastie সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মা আছেন ও ভাই ভগ্নীরা আছেন।

স্বামীর জন্মদিন সোমবার পৌষ সংক্রান্তি ১২৬৯ সাল প্রাতে ৬।৩৩।৩৩ সময়, সূর্য্যোদয়ের ৬মিনিট পূর্ব্বে, বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন,—তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকা-বাসিগণ ভৃত্যের ন্যায়, সন্তানের ন্যায়, তাঁহার সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ *। আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠা। তাহাতে সর্ব্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বদা আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামী! আমার সর্ব্বস্ব ও আমাকে আপনাতে সমর্পণ করিলাম।" স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, "ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা।"

ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য! তোমার গায়ে যথার্থই পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই। তোমার গায়ে কামিনীকাঞ্চনের দাগটী পর্য্যন্ত লাগে নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়া শ্রীনগরে বাস করিয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ! তুমি সামান্য জীবের ন্যায় দিন কাটাইতে চাও নাই! তুমি দেবভাবের অনন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছ।

৭। স্বামী ও কর্ম্মযোগ; নিষ্কাম কর্ম্ম।

পরমহংসদেব বলিতেন, "কর্ম্ম সকলেরই করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এ তিনটী ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ। কর্ম্ম করিলে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। 'আমি কর্ত্তা' এটী অজ্ঞান, আমার ধন জন, কার্য্য-

* Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be
Nor he who owns however little, nor he—
Whom anger chains can ever pass through maya's gates.
So give these up, *Sanyasin* bold, say
"Om tat sat, om"

Song of the Sanyasin by Vivekananda.

কলাপ, এটীও অজ্ঞান। আপনাকে অকর্ত্তা জেনে ঈশ্বরকে ফল সমর্পণ করে কায করিতে হয়। গীতায় যে আছে কর্ম্মযোগ, সে এই। তবে কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। অনেক দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন না করিলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা যায় না। কোন্ দিক্ থেকে আসক্তি আসিয়া পড়ে, ইহা জানিতে পারা যায় না। মনে করিতেছি, আমি অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া দানাদি কার্য্য করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি লোকমান্ত হইবার জন্য করিতেছি, নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ পরিজন আত্মীয় কুটুম্ব আমার বলিবার আছে, তাহাকে দেখিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু মহাপুরুষ যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া দেখান, তাহা হইলে লোকে সহজে বুঝিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাক বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিজে কায করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৺ কাশীধামে ও মান্দ্রাজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে নানা স্থানে—দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিশেনগড, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতানার অন্তর্গত কিশেনগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, এ আশ্রমে ইংরেজ Commissioner নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম

চলিতেছে। স্বামী হরিদ্বার নিকটস্থ কখলে পীড়িত সাধুদিগের জন্ম সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সেবা শুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন! আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, "হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই!"

তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার এ সকল কর্ম্মের কি প্রয়োজন *? কেবল লোকশিক্ষার জন্য। লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এ সকল কর্ম্ম করাইলেন। এখন সংসারী লোকে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছু দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌লে আঠা লাগ্‌বে না।" অর্থাৎ নির্জ্জনে সাধনের পর ভক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর কার্য্যে হাত দিলে, যথার্থ নির্লিপ্ত ভাবে করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জ্জনে সাধন কাহাকে বলে,তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম্ম কেবল লোক শিক্ষার জন্য।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ অতিশয় কঠিন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া সংসার কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর সাধন করেন। তবে বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বীর পুরুষ কেবল এই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবানকে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোক শিক্ষার জন্য সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়টী? ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা, কামিনী কাঞ্চনের দাগ একটীও লাগে নাই, অথচ

---

* "Who sows must reap" they say, and "cause must bring
The sure effect. Good good, bad, bad; and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain" Too true, but far beyond
Both name and form is Atman, ever free
Know thou art that, Sanyasin bold! say
"Om tat sat, om!"

Song of the Sanyasin (by Vivekananda)

জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য্য কয়টী দেখা যায়?

স্বামীজী লণ্ডনে ১০ই নবেম্বর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বেদান্তের কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিবার সময় গীতার কথা বলিলেন—

"Curiously enough the scene is laid on the battle-field, where Krishna teaches this philosophy to Arjuna, and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta."

Practical Vedanta, (London).

বক্তৃতায় স্বামীজী কর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাবের ("Calmness in the midst of activity") কথা বলিয়াছেন। স্বামী "রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত" হইয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তাঁর তপস্যার গুণে। তিনি কিরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেলুড় মঠে দিন কাটাইতেন, তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করিবার দিনের ঘটনাগুলি স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে।

"বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে শুনিলাম, প্রায় মাসাবধি স্বামী বেশী বেশী ধ্যান জপ করিতেছিলেন। আর এই কয়দিন যেন শরীরে রোগ ছিল না। শুক্রবার সকালেও ঐরূপ ঠাকুর ঘরে বসিয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। ধ্যান শেষ হইলে ঠাকুর ঘরে থাকিতে থাকিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গান মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে নাচিতে গাইতেন, সেই গানটী গাহিয়াছিলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপা দিগম্বরী,
হৃৎপদ্ম করে আলো রে।

মঠের সাধুরা নীচে ছিলেন। তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া এই মধুর গান শুনিতে লাগিলেন—স্বামীর কণ্ঠ দেবদুর্ল্লভ গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত! তাহাতে ভক্তিমাখা! খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা শিষ্যদের লইয়া তিনি অন্ততঃ তিন ঘণ্টা কাল পাণিনীয় লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ পাঠ শুনিলেন ও নিজে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কেবল একটী গুরুভাইয়ের সঙ্গে আমোদ করিতে করিতে

বিলাতের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া কহিয়াছিলেন। ৫।০ টার পর সেই গুরুভাইটীর সঙ্গে বেলুড়ের বড়রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ আমার শরীর খুব ভাল আছে।

"সন্ধ্যার পর তিনি উপরের ঘরে ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলেন। ডাক্তার সাণ্ডার্স ইত্যাদি অনেকে সতর্ক করিয়া দেওয়াতে তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেওয়া হইত না। সন্ধ্যার পর একটী শিষ্য ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবার্থ তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, আমি একটু জপ করিব, তুমিও ঘরের বাহিরে গিয়া জপ তপ করগে। ব্রহ্মচারী নিকটস্থ ছাদে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আন্দাজ এক ঘণ্টা কাল পরে স্বামী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার জপ হইয়াছে, এখন আমি একটু শুইব। তুমি সব জানালা খুলিয়া দাও, আমার গরম বোধ হচ্চে—আমার মাথায় হাওয়া কর। এই বলিয়া মেজেতে যে বিছানা পাতা ছিল, তাহার উপর শয়ন করিলেন। হাতে জপমালা। মাথায় অল্পকাল বাতাস দেওয়ার পর তিনি বলিলেন, আচ্ছা আর এখন বাতাস করিতে হবে না। তুমি আমার পাটা একটু টিপে দাও। এই বলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইলেন, এবং মাঝে মাঝে নাক ডাকিতে লাগিল। নিদ্রা একঘণ্টা কাল ছিল। শিষ্যটী সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামী বাম পার্শ্বে শুইয়া ছিলেন। মাঝে একবার পাশ ফিরিয়া শুলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেরূপ দ্যায়লা করে ও হাসে কাঁদে, সেইরূপ একবার কাঁদিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারী শিষ্যটী তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখেন যে, স্বামীজী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বালিসের নীচে মাথা পড়িয়া গেল। আবার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

"তখন ব্রহ্মচারী অতিশয় চিন্তিত হইয়া নীচে গিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, স্বামীজীকে ডাকিলে কথা কন না। তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি হয়ত সমাধিস্থ।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যদের মধ্যে প্রধান আসন দিয়া গিয়াছেন। স্বামীও তাঁহার প্রধান শিষ্যের কাজ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র জগৎ সমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। এই হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় পতাকা

স্বামী বিবেকানন্দ, দেশ বিদেশে স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

এখন ত্রিতাপে তাপিত নরনারী মাত্রেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিতে পারিবে ও শান্তি লাভ করিবে।

সাধন—প্রাণায়াম।

(স্বামী শিবানন্দ)

সাধন শব্দে ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌বার উপায়। ভক্তি পথের পথিক হউন বা জ্ঞানপথের পথিকই হউন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত কেহ ইষ্ট লাভ কর্ত্তে সক্ষম হন না। ভক্তি পথের পথিক, যাঁদের কেবল দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন, যাঁরা বিশ্বাস করেন, ভগবান বিভিন্ন মূর্ত্তিতে গোলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোকাদিতে বাস করেন আর যাঁদের লক্ষ্য—দেহান্তে ভগবৎকৃপায় নিজ নিজ ইষ্টলোকে গমন, সাধন তাঁদেরও অবশ্যই কর্ত্তে হয়। তাঁদের অবশ্যই পূজা, অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, ভগবৎকথা পাঠ, ভগবৎ প্রসঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই কর্ত্তে হয়। তাঁরা একটু সাধনে অগ্রসর হইলেই নির্জ্জনবাসপ্রিয় হন এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয়াদি রোধ করে আপনাপন ইষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হন। তাঁরা কেবল একেবারে ভগবানে লয় প্রাপ্ত হতে চান না, সেব্যসেবক ভাব বজায় রাখ্‌তে চান। কিন্তু তাঁরা তাঁর ধ্যানে আনন্দ, তাঁর নাম জপে আনন্দ, তাঁর নাম গানে আনন্দ, অপর ভক্তের সহিত সৎপ্রসঙ্গে আনন্দ ও ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজ কচ্ছেন দর্শন করে সর্ব্বভূতের সেবায় আনন্দ উপভোগ করেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, সাধনের পূর্ব্বে ভগবান বিশেষ বিশেষ রূপে বিশেষ বিশেষ লোকে বাস করেন এবং সে সমস্ত এ জগৎ ছাড়া, এ ধারণা তাঁদের ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হয়ে শেষে এই মনুষ্যহৃদয়ই যে তাঁর আবাস স্থান ও উহাই যে বাস্তবিক স্বর্গ, গোলোক, শিবলোক ইত্যাদি, ইহা উপলব্ধি হয়। সাধন দ্বারা

চিত্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ হলে ভাগ্যবান সাধক হৃদয়েই ভগবানকে দর্শন করেন এবং তখনই দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর অপরিপক্ক বুদ্ধিপ্রসূত সব বাদাম্বুবাদ মিটে যায় ও শান্তিলাভ হয়।

জ্ঞানপথের পথিক, যিনি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বা 'নেতি নেতি' বলে থাকেন, এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই উপলব্ধি যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি 'গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস,' 'ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ কর্ম্মফলভোগেচ্ছা না রাখা' এবং 'শম,' 'দম,' 'তিতিক্ষা,' 'উপরতি' প্রভৃতি সাধন করেন। উপরোক্ত ভগবানের আবাসস্থান স্বর্গাদিতে গমন এবং সুখভোগ ইত্যাদি তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাঁর মতে ঐ সকলও অনিত্য এবং মনোরাজ্যের অন্ত-র্গত। জ্ঞানী চান মনেরও বাহিরে যেতে, 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' অবস্থা লাভ কত্তে। তিনি 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকম্ বিশন্তি,' এ অবস্থা চান না। তিনি জানেন, 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি,' অর্থাৎ 'এই জন্মে এই শরীরে যিনি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দর্শন না করেন, তিনি বার বার জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন।' এই জীবন্মুক্ত পুরুষ আবার আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করে তাদের সেবায়ও রত হন। তাঁর দ্বারা জগতে মহা মহা কল্যাণকর কার্য্যও সাধিত হয়।

এখন বোঝা গেল, যিনি যে পথেই ভগবান লাভের জন্য যান না কেন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। শাস্ত্রেও নানাবিধ উপায় কথিত আছে। প্রাণায়াম এই উপায় সকলের মধ্যে অন্যতম। আমি ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে প্রাণায়ামরূপ সাধন, তাহাই বলিব। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্য সিদ্ধ করি-বার জন্যও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং শুনিতে পাই নাকি এরূপ উপ-দেষ্টা বা শিক্ষকও আছেন। আমার মতে ঐরূপ শুষ্ক প্রাণায়াম মহা অনিষ্টজনক এবং অনেকে 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' হয়ে প্রতারিত হয়ে-ছেন, এবং কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন।

প্রাণায়াম শব্দ বুঝা অতি সহজ,—এত সহজ যে, বুঝাইয়া দিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা প্রত্যহ সকলেই অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম করিয়া থাকি আর ইহা অভ্যাস করাও অতি সহজ। যখন তুমি কোন অদ্ভুতঘটনাপূর্ণ গল্পের পুস্তক পাঠ কর, বা আগ্রহের সহিত কোন নূতন দেশের ইতিহাস অধ্যয়নে নিযুক্ত হও অথবা নিবিষ্টচিত্তে গণিত শাস্ত্রের কোন দুরূহ সমস্যা বুঝিবানে

নিযুক্ত থাক, তখন তুমি এমনি মেতে যাও যে, গল্পটা শেষ না হলে বা গণিত সমস্যাটার মীমাংসা না হলে তোমার কোন মতে সে গুলি ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না। এই সকল সময়ে যদি তুমি তোমার শ্বাসের গতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখ, তুমি দেখ্‌বে, শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক বেগ অনেক কমে গেছে, উহা খুব আস্তে আস্তে চল্‌ছে, যেন হৃদয়ের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস অনেকটা বদ্ধ রয়েছে। দুঃখসূচক ঘটনা পাঠ কর্ত্তে কর্ত্তে দেখা যায়, দুঃখেতে হৃদয়টা যেন ভারি হয়েছে আর আনন্দসূচক ঘটনায় হৃদয়টা যেন স্ফীত হয়ে উঠে। এই উভয় অবস্থাতেই শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হয়। যদি অধিক দুঃখজনক ব্যাপার পড়, তখন হয়ত কখন হৃদয়ের ভার অশ্রুপাতে অনেকটা লঘু করে দাও বা অত্যন্ত আনন্দের উদ্রেক হইলে হাস্য বা আনন্দাশ্রু মোচন দ্বারা উহা বার করে দাও। কিন্তু এইটী বিশেষ করে নজর কোরো যে, উভয় ব্যাপারেই শ্বাস প্রশ্বাস (যাহা প্রাণবায়ুর কার্য্য) অনেকটা রুদ্ধভাবে থাকে। এই সকল উদাহরণ থেকে বেশ বুঝা গেল যে, কোন এক বিশেষ বিষয়ে মন সংযত হলে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য স্বভাবতই রুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয় বা প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়। আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা দরকার,—যখনি ঐরূপ নিবিষ্টচিত্তে পাঠের সময় বা গণিত সমস্যা সমাধানের সময় শ্বাস ধীরে ধীরে বইছে কি না, লক্ষ্য কর্‌তে থাক, যখন সেই পাঠ বা অঙ্কের দিকে মন থাক্‌বে না, শ্বাসের দিকে মন আস্‌বে, তখনি দেখ্‌বে, উহা আবার ক্রমশঃ সহজ ভাব ধারণ কর্ব্বে। কিন্তু তুমি বেশ বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে, শ্বাস রুদ্ধভাবে বইছিল, এখন সহজ ভাব ধারণ করে। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত এই তত্ত্বটীর আলোচনা কর্‌লে দেখা যায় এই যে, মন কোন একটা ভাবে একেবারে মগ্ন হলে প্রাণবায়ু আপনা হতেই কতকটা রুদ্ধভাব ধারণ করে, আর ভাবই মুখ্য, প্রাণনিরোধ গৌণ। এইরূপে প্রাণায়াম আমরা নিত্যই অজ্ঞাতসারে করে থাকি।

এখন দেখ্‌তে হবে, সাধন পথের প্রাণায়াম কি? এও কি ঐরূপ স্বাভাবিক, না, কৃত্রিম কোন রকম কিছু কর্ত্তে হয়? এবং সাধন নিজেও স্বাভাবিক কি না?

ইহার উত্তর এই, সাধন স্বাভাবিক এবং যত প্রকার সাধনের উপায় শাস্ত্রে উক্ত আছে, তৎসমুদয়ই স্বাভাবিক। যেমন ক্ষুৎপিপাসা শরীরের

স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাদের নিবারণের উপায়ও মানুষ যা করে থাকে, নানারূপ বটে, কিন্তু স্বাভাবিক। সকলেরই সময়ানুসারে ক্ষুধা হয়ে থাকে। একজন আহার কচ্চে দেখে যাহার উদর পূর্ণ, তাহার কখনই ক্ষুধার উদ্রেক হতে পারে না। যদি কারও হয়, তবে বুঝ্তে হবে, তাঁরও উদর পূর্ণ নাই, তাঁরও আহারের সময় হয়েছে, অতএব তাঁর কর্ত্তব্য, তিনি সাধ্যানুসারে আহারের চেষ্টা করেন ও আহার করেন। যদি কাহাকেও আহার কর্ত্তে দেখে ক্ষুধা না থাক্লেও কেউ খেতে চান, তাঁকে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষুধার উদ্রেক কর্ত্তে হয়, সুতরাং তিনি ক্রমে পীড়াগ্রস্ত হন। জোলাপ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন কল্লে অবশ্য শেষে প্রায় তাই ঘটে। আবার কোন লোকের যদি ক্ষুধার উদ্রেক মোটেই না হয়, তবে জান্তে হবে যে, তাঁর কোন রোগ হয়েছে, তাঁর কোন ঔষধ সেবনের দরকার। ঔষধ সেবায় তাঁর উপকারও হতে দেখা যায়।

দৈহিক রাজ্যে যেরূপ, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ঠিক তদ্রূপ। মানবদেহ প্রাপ্ত হয়ে যাঁরা কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে অর্থাৎ কেবল নিজের সুখভোগে, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ কত্তেই রত, তাঁরা মনুষ্য দেহ মাত্র পেয়েছেন, কিন্তু ভিতরে তাঁদের পশুভাব এখনও বর্ত্তমান। যাঁদের ভগবচ্চিন্তা বা ভজন, সাধন, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, দয়া, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি নাই, তাঁরা এখনও মনুষ্যপদবাচ্য হন নাই। সুতরাং তাঁরা মনুষ্য সমাজের নিয়মে নিয়মিত হতে কষ্ট বোধ করেন এবং পারেনও না।

প্রাশন, মোচন, বিহার, পাঠ্যাভ্যাস, পিতামাতা গুরুজনের সেবা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার, মনুষ্যপদবাচ্য মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং যেমন সকলে করেও থাকেন, তেমনি ধর্ম্মসাধনও মনুষ্যের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং সকল মনুষ্যপদবাচ্য মানবই কোন না কোনরূপে ধর্ম্ম সাধন করে থাকেন। কেহ স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্ম সাধন কচ্চেন। অপর কেহ তাঁর আচরণ দেখে নিজেরও সময় উপস্থিত নিশ্চিত জেনে সরলভাবে সাধন আরম্ভ করেন। কেহ বা অপরের দেখাদেখি অসময়ে ধর্ম্মসাধনে ইচ্ছা করেন এবং শরীরে কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্রেকের চেষ্টার ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সাধন সম্বন্ধীয় নানা উপায়, যথা, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, প্রাণায়ামাদি কত্তে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাণের প্রকৃত ইচ্ছা না থাকা প্রযুক্ত অদৃষ্টক্রমে ভণ্ড গুরু জুটে। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম জান্তে না পেরে গুরু প্রাণায়ামাদি করে শারীরিক রোগগ্রস্ত এবং ধর্ম্মের উপর সর্ব্ব-

নাশক বিতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এ জীবনটা বৃথা যায়। ধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণার ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যে কঠিন রোগ আর নাই। বিশেষ যাঁদের দেখে শুনে বেঁটে ঘুঁটে এ অবস্থা হয়, তাঁদের রোগ অসাধ্য বল্লেও বলা যায়। শেষ, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁদের এমনি আধ্যাত্মিক-বদহজমি যে, হাজার হাজার লোককে ধর্ম্ম সাধন কত্তে দেখেও ধর্ম্মসাধনেচ্ছার নামগন্ধও হয় না। ভবরোগবৈদ্যস্বরূপ "শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ। তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ ন হেতুনাহন্যানপি তারয়ন্তঃ" কোন মহাত্মা যদি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক অজীর্ণতা রূপ ভবরোগের ঔষধ সেবন করান, তবে তাহা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই কল্যাণকর হয়ে থাকে। তাঁদের তখন স্বাভাবিক ধর্ম্মক্ষুধার উদ্রেক হয়।

এখন সাধনের অঙ্গ প্রধানতঃ গুরূপদিষ্ট নাম জপ ও ধ্যান। গুরু বা আচার্য্য সেবা, সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি দ্বারা ঐ গুরূপদিষ্ট নাম জপ ধ্যানাদিতে অধিক প্রেম হয়, সুতরাং মনঃসংযমও অধিক হয়ে থাকে। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ, জপ ধ্যান সকল মার্গের সাধকেরই অবলম্বনীয়। জ্ঞানীর প্রণবজপ, ভক্তের শিব, তারা, হরি ইত্যাদি বহুবিধ নাম জপ। ভগবানের স্মরণ মনন প্রত্যেক সাধক সর্ব্বদাই করেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ মননের প্রধান উপায়—নাম জপ, প্রেমের সহিত।

এখন সাধনপথের প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম কল্লেই কি ভগবান লাভ বা আত্মানুভূতি হয়? না, কখনই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, মায়ের শিশুসন্তানের উপর যেরূপ টান, সতী স্ত্রীর পতির উপর যেরূপ টান, কৃপণের ধনের উপর যেরূপ টান, ঐরূপ টান ভগবানের জন্য যখন কাহারো ভাগ্যক্রমে ঘটে, তখন তাহার অতি অল্প সময়ের মধ্যে বস্তুলাভ হয়। যখনই কারু হৃদয়ে ঐ ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়, তখনই তার প্রাণবায়ুর অবস্থা রুদ্ধভাব ধারণ করে। ঐ অবস্থাতে সাধক জপ, ধ্যান, গান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি যা করেন, তাই অতি সংযম ও বিশেষ অনুরাগ ও প্রেমের সহিত সাধিত হয় এবং প্রাণবায়ুর ঐরূপ অবস্থাকেই প্রাণায়াম বলে। নতুবা অনুরাগ নাই, টান নাই, প্রেম নাই, শুষ্ক শ্বাসরোধ এবং অতি ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ কল্লে জ্ঞান ভক্তিলাভের কোন সুবিধা হয় না। যোগ দর্শনে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এবং 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' সূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং সেই নিরোধ সময়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ

আত্মার স্বীয়রূপে অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান হয় বলা হয়েছে এবং এই অবস্থা লাভ করবার নানা উপায় ক্রমে ক্রমে বলা হয়েছে। যাঁরা স্বস্বরূপ অনুসন্ধানে অনুরাগী, কেবল তাঁদের জন্যই ঐ সকল উপায় বলা হয়েছে। যাঁরা সদ্‌গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুমুখবিনিঃসৃত শাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ এবং মনন দ্বারা চিত্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন, তাঁদের স্বরূপের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাঁরা তখন ক্রমশঃ ধ্যানে নিমগ্ন হতে থাকেন এবং তাঁদের প্রাণায়াম আপনা হইতে হয়। নতুবা অশুদ্ধ চিত্তে স্বরূপ কি পদার্থ ও স্বরূপের জ্ঞানই বা কিরূপ, ইত্যাকার সংশয় সদাকাল থাকে। স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সমাধি হয়—উহা প্রাণায়ামের পরাকাষ্ঠা—তখন আর ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা এ তিনের পার্থক্যবোধ থাকে না।

এখন সারকথা এই যে, হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নাম জপ ও স্মরণ মনন কল্লে প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়। ফল আধ্যাত্মিক জীবনে অপরিমেয়। ব্যবহারিক জীবনে (Practical life) মনঃশক্তিবৃদ্ধি, চরিত্রের শুদ্ধতা, চিত্তের প্রসাদ, দয়া, দৃঢ়ব্রতত্ত্বা অর্থাৎ ঈশ্বরকৃপায় তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তাঁর ভক্তে সঞ্চারিত হয়, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সহজ উপায় এপথে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ পাওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সৎসঙ্গ পাওয়া ভগবানের বিশেষ কৃপা। শ্রুতিও বলছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।' তাঁকে বিশেষরূপে জানবার জন্য সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে বেদপারদর্শী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবাশ্রম, কনখল।
১লা মার্চ্চ, ১৩০৯।

মান্যবর উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র অদ্য পাইলাম। এক্ষণে এখানে কুম্ভমেলার তুমুল আয়োজন হইতেছে, কারণ, এইবারে মেলা হরিদ্বারে হইবে। আমি এই সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব।

প্রায় ৬ মাস হইতে এই মেলার জন্য সকল সম্প্রদায়ের সাধুরা এখানে আসিয়া আপন আপন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের থাকিবার জন্য বড় বড় কুটীরাদির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এখন অধিকাংশের কুটীরাদি নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে আর কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ বাকী আছে, তাহাও ১০।১৫ দিনের মধ্যে হইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যায়। হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যস্থলে "নির্ব্বাণী"দের প্রকাণ্ড লম্বা কুটীর ঐ সম্প্রদায়ের সাধুদিগের জন্য তৈয়ার হইয়া গিয়াছে এবং গত একাদশীর দিন বেলা ২॥০ টার সময় তাঁহাদের জমায়ৎ আসিয়া গিয়াছে। এই জমায়ৎ আসিবার সময় বড় সুন্দর দেখাইয়াছিল। প্রথমে ১২ জন নাগা সাধু উষ্ট্রের উপর চড়িয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে আসিলেন। তারপর প্রায় ২০ জন সাধু সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া রামশিঙ্গা ও হরেক রকমের ছোট ছোট পতাকা লইয়া আসিলেন। ক্রমে ১৪ টী মূল্যবান বস্ত্রাবৃত হস্তী ও হস্তিনী—তাহাদের উপর সাধু ও গৃহস্থ উভয়বিধ লোক বড় বড় পতাকা লইয়া আরূঢ়। তাহার পর একদল ইংরাজী বাজনদার ও একটী ডাণ্ডী (dandee) কপিল মুনির প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি লইয়া। তারপর দুইখানি পাল্কি—প্রথম খানিতে বিভূতি ও দ্বিতীয় খানিতে একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। ক্রমে একদল দেশী বাজনদার ও আর এক দল ইংরাজী বাজনদার এবং লাঠিখেলোয়াড়গণ।

তৎপরে আশাসোঁটা লইয়া, প্রায় ২০ জন বালক ও যুবা পাইক দুইজন দুইজন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিলেন। ইঁহাদের পরে প্রায় ৫০ জন সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত জটাজূটধারী নাগা নির্ব্বাণী সাধু হর হর করিতে করিতে দুইজন দুইজন করিয়া আসিয়া গেলেন। তাঁহাদের পরে প্রায় ৩০ খানি একা গাড়ি সাধু ও গৃহস্থ উভয়কে লইয়া আসিল। অবশেষে আবার প্রায় ১০টী উষ্ট্র আসবাবাদি লইয়া উপস্থিত হইল। শিবরাত্রির দিনে আবার এই জমায়েৎ কনখলের দক্ষেশ্বর মহাদেব (যেখানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল, সেখানে একটি মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাঁহাকেই দক্ষেশ্বর বলিয়া থাকে—এই মহাদেবের মন্দির এখন নির্ব্বাণীদের হস্তে আছে) দর্শন করিতে প্রায় পূর্ব্বোক্ত সমারোহের সহিত আসিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা এই দিনের বিশেষত্ব এই যে, নগ্ন সাধুরা চলিবার সময় যখন জয় জয় ধ্বনি করিতেছিলেন, তখন সে শব্দটা শুনিতে অতি মধুর লাগিয়াছিল।

ওদিকে আবার হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী মায়াপুর নামক স্থানে গঙ্গার উপর "নিরঞ্জনী"দের প্রকাণ্ড কুটীর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদেরও জমায়েৎ গত অষ্টমীর দিন আসিয়া গিয়াছে। যখন কুম্ভমেলা হরিদ্বারে হয়, তখন ইঁহারাই প্রথমে স্নান করেন। ইঁহাদের স্নান হইয়া গেলে তবে অন্য পন্থীরা স্নান করিতে পান। ইঁহাদেরও জমায়েৎ আকা দেখিতে বড় সুন্দর। তবে নির্ব্বাণীদের অপেক্ষা ইঁহাদের হস্তী ইত্যাদি কম ছিল। শুনিলাম, যে দিন নির্ব্বাণীদের জমায়েৎ আসিয়াছিল, সেদিন তাঁহাদের কেবল জ্বালাপুর (কনখল হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত) হইতে পূর্ব্বোক্ত আখড়ায় আসিতে ১০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে।

"জুনা" আখড়ার জমায়েৎও গত পঞ্চমীর দিন আসিয়া গিয়াছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুর সংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা এক্ষণে নিরঞ্জনী আখড়ার আশ্রিত। ইঁহাদের থাকিবার স্থান হরিদ্বারে আছে—উহাকে ভৈরব আখাড়া বলে। ইঁহাদের আসিবার কালীন, নিরঞ্জনী আখড়ার যে কয়েকটী সাধু পূর্ব্ব হইতে কুম্ভমেলা বন্দোবস্তে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য হস্তী আদি লইয়া গিয়াছিলেন ও সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন।

আরও একটি আখড়ার জমায়েৎ গত বাদশীতে আসিয়া গিয়াছে—

সেটী "অটল" আখাড়ার। ইঁহাদেরও সংখ্যা জুনা আখাড়ার ন্যায় এক্ষণে কম হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা এক্ষণে নির্ব্বাণী আখাড়ার আশ্রিত। ইঁহারাও নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনাদিগের ন্যায় দশনামান্তর্গত নাগা সাধু। ইঁহাদের আখড়া কনখলে। ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য নির্ব্বাণীরা গিয়াছিলেন ও সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন।

এই তো গেল শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দশনামী নাগা সাধুদিগের জমায়েতের কথা। "উদাসী" (গুরু নানকের পন্থা—ইহাতে দুইটী আখড়া আছে, একটী "বড় আখাড়া" ও অপরটী "ছোট আখাড়া" নামে অভিহিত) ও "নির্ম্মলা" (ইঁহারাও গুরু নানককে মানেন) পন্থের জমায়েৎ এখনও আইসে নাই, শীঘ্রই আসিবে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক ছোট ছোট পন্থের কুটীরাদি নির্ম্মাণ হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই কুটীর গঙ্গার অপর পারে চড়ার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ওদিকে ইংরাজ সরকার হইতেও এই মেলার জন্য খুব বন্দোবস্ত হইতেছে।

(২) ১৩ই মার্চ্চ, ১৯০৩।

সকল আখাড়ার মধ্যে একটী রীতি এই যে, জমায়েৎ আসিবার কালীন কিংবা কুম্ভের সময় স্নানার্থে যাইবার কালীন যাঁহারা অপর সকল অপেক্ষা বেশী ধুমধামের সহিত হস্তী ও বাদ্যাদি সহকারে যাইবেন, তাঁহাদেরই জয়জয়কার ও মান্য—নতুবা এত নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদাসী বড আখাড়ার ও ছোট আখাড়ার এবং নির্ম্মলা আখাড়ার জমায়েৎ আসিতে বাকী ছিল। গত ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে ৫।২০ মিনিটের সময় বড আখাড়ার, ৯ই মার্চ্চ অপরাহ্ন ৫ টার সময় ছোট আখাড়ার, এবং ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্ন ৩ টার সময় নির্ম্মলা আখাড়ার জমায়েৎ আসে। ইহাদেরও জমায়েৎ পূর্ব্বকথিত নাগাদিগের ন্যায় এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে সজ্জিত হইয়া আসিতে লাগিল। বড় আখাড়ার জমায়েতের মধ্যে ঘোড়া ও হস্তী কিছু বেশী ছিল ও জমায়েতের সর্ব্বপূর্ব্বে দুইটী লোক একটী বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাতে "বড় আখাড়া" বলিয়া হিন্দি অক্ষরে লিখিত। ইহাদের পাল্কিতে "গ্রন্থ সাহেব" (গুরু নানকের উক্তি পুস্তকাকারে সংগৃহীত) ছিলেন ও জমায়েতের মধ্যে ২৩০ জন সাধু দুইটী দুইটী করিয়া ক্রমান্বয়ে "ওয়া গুরু কি ফত্তে" এবং গ্রন্থ সাহেবের শ্লোকবিশেষ কহিয়া ও কাষ্ঠনির্ম্মিত কোদালী লইয়া

যাইতেছিলেন। একটী বিশেষ ইহাদের মধ্যে দেখা গেল যে, একটী উদাসিনী ও ৩।৪টী ৫।৬ বৎসরের কৌপীনধারী বালকও এই জমায়েতের মধ্যে ছিল।

ইহার পর দিন একটী সাধু আসিয়া কহিলেন—"স্বামীজী, হমারে জমায়েৎ আগয়া হ্যায়—নাহি দেখেঙ্গে ক্যা? দেখিয়েতো জলদী আইয়ে"—আওয়াজ শুনিয়া দেখা গেল, ইনি ছোট আখাড়ার মোহন্ত। আজ ইঁহাদেরই জমায়েৎ আসিবার কথা। তখন তাড়াতাড়ি পূর্ব্বের ন্যায় পাঠশালার ছাদে যাইয়া দেখা গেল যে, জমায়েৎ অতি নিকটেই আসিয়াছে। ইঁহাদের procession পূর্ব্বদিনের ন্যায়, তবে হস্তী ও ঘোড়া বড় আখাড়ার অপেক্ষা দুইটী একটী কম। কিন্তু ঐ হস্তীগুলি উত্তম রূপে সুসজ্জিত ছিল আর একটী হস্তিনীর সঙ্গে একটি হস্তিশাবক ছিল, সেটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইঁহাদের দুইটী সংও ছিল—একটি তুলার উষ্ট্র, তাহার উপর একটি বালক ঢাক বাজাইতেছিল, অপরটি, একটি লোকের দুইটি, বিস্তৃত হস্তোপরি দুইটি বালক ও দুই স্কন্ধে দুইটি বালক লাঠি খেলিতেছিল। সম্মুখে ও পিছনে পাইক দ্বারা সুরক্ষিত ডাণ্ডি—তাহার উপর গ্রন্থ সাহেব—দুই পার্শ্বে সাধুরা চামর ব্যজন করিতেছেন। পাতিয়ালার রাজ দরবার হইতে প্রেরিত সুন্দর ইংরাজী বাদ্যকারেরা মনোহর সুরে আপনাদের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত করিতেছে। ২৫০ জন সাধু দুইটি দুইটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে যাইলেন। ওদিকে সকল "হাবেলির" (প্রস্তরনির্ম্মিত ও কারুকার্য্যশোভিত বড় বাটির) উপর হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা সকলেই দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে জমায়েৎ দেখিতেছে। বৃদ্ধেরা আপনাদের দৃষ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুম্ভের সহিত এই কুম্ভের তুলনা করিতেছে আর কেহ বা কোন পন্থবিশেষকে স্বর্গে উঠাইতেছে, আর কেহ বা তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে।

নির্ম্মলা আখাড়ার হস্তী ও ঘোড়া বড় আখাড়ার ন্যায়। প্রথম হস্তীর উপর শ্রীহনুমানের মূর্ত্ত্যাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা রহিয়াছে। একটি হস্তীর উপর এস্রাজ, হারমোনিয়ম ও তবলা সংযোগে গায়ক গুরু গোবিন্দ সিংএর গীত গাহিতেছেন। একদল কীর্ত্তনও আছে। একটি ডাণ্ডীর উপরে গ্রন্থ সাহেব ও অপরটির উপর গুরুগোবিন্দ সিংহের পুঁথি রক্ষিত আছে। বলা বাহুল্য যে, নির্ম্মলা সাধুরা গুরুগোবিন্দ সিংকে বেশী মানেন।

(ক্রমশঃ। ইতি সত্যকাম।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের

সপ্ততিতম জন্মোৎসব।

যাঁহার বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রভাব আজ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, যাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মধুর বাণী আজ সমগ্র জগৎকে দ্বেষ হিংসা ভুলাইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর করিতেছে, যাঁহার অপূর্ব্ব কাম কাঞ্চন ত্যাগ, আধুনিক বিজ্ঞানদর্পিত ইহজীবনসর্ব্বস্ব ইউরোপ আমেরিকাকেও চমকিত করিয়াছে এবং সমগ্র জগতেরই যেন হাওয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, যাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশ শুনিবার জন্য আজ সমগ্র জগৎ আগ্রহান্বিত, সেই ভগবান শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের শুভ সপ্ততিতম জন্মোৎসব গত ২৪শে ফাল্গুন বেলুড় মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। আজ আবার বিভিন্ন-প্রকৃতিসম্পন্ন নরনারী,—সাধু, অসাধু, সাধক, লম্পট, ধর্ম্মাত্মা, পাপী সকলেই প্রাণ ভরিয়া এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। যাঁহাদের অন্য সময় পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অল্প, সেই সকল ভক্তবৃন্দের পরস্পর সাক্ষাৎ ও সাদর সম্ভাষণ হইল। মধুর মাতৃনামের সঙ্গীতে দিগ্‌দিগন্ত পুরিল। হরিনামের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রমাগত প্রসাদ বিতরণে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিল।

এক দিনের জন্য আমরা আবার তাঁহার নাম ও গুণাবলী প্রাণ ভরিয়া সকলে একত্র স্মরণ করিবার অধিকার পাইলাম। এখন তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা, যেন দিন দিন আমরা তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতে পারি।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে বিগত ১৭ই ফাল্গুন রবিবার দিবস ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনগৃহে উৎসব হইয়া গিয়াছে। আসনোপরি পরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র, জন্মকথা ও উপদেশ পাঠ করা হয়। পরে অযোধ্যানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শঙ্কর দাসজী একটী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে হরি সংকীর্ত্তন ও হিন্দী ভজন হয়। শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হইয়াছে।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

গত ২৪ শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ রবিবারের আনন্দ এখনও হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। সে দিন প্রাতঃকাল হইতে পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। পাঠশালার * ছাত্রেরা অতি আনন্দিত হইয়া প্রাণপণে জিনিষ পত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। ওদিকে ব্রহ্মচারীজী গঙ্গা স্নান করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বেলা ৮॥ টা বাজিল—ঠাকুরের পূজা আরম্ভ হইল। ৯ টা হইতে নিমন্ত্রিত সাধুরা আসিতে লাগিলেন। বেলা ১১ টার পূজা সমাপ্ত হইলে গান হইতে লাগিল—"একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ। আজি মোর ঘরে আইলা হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল। বল ওহে প্রেমময় হৃদয়েরি স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার—মন প্রাণ লহ, লহ তুমি কি বলিব, যাহা কিছু আছে মম সকলি তোমারি" ইত্যাদি। ক্রমে ২টা বাজিল—ভোগ হইল। তৎপরে আরাত্রিক—ইহাই দেখিবার জিনিষ—এ সময়ের জন্ম কি আশ্রমস্থ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী, কি নিমন্ত্রিত সাধুগণ, কি ছাত্রেরা, সকলেই যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল ও আরাত্রিকের পরে যখন "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, * * * * * ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ, পূজামূলং গুরোঃ পদং, মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং, মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপাঃ" ইত্যাদি স্তব হইতে লাগিল, তখন নিমন্ত্রিত বাহিরের সাধুদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইবার সাধুভোজন হইতে লাগিল—সকলেই পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন—ছাত্রেরাও প্রসাদ পাইল। একটু পরেই সন্ধ্যা আগতপ্রায়—পুনঃ আরাত্রিকের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল—আরাত্রিকও হইল। আবার সেই স্তব পাঠ করিয়া শ্রীজগদ্‌গুরুর প্রণাম। এবার প্রার্থনা করা হইল—"হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যং" ইত্যাদি। পুনরায় গান চলিতে লাগিল—স্বামীজীর সেই ভালবাসার গান—"তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল" ইত্যাদি। রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় ভোগ হইল। তৎপরে প্রসাদ পাইয়া পুনরায় গান। ১২ টা বাজিল—"ওঁজোঽসি ওজোমে দেহি, বলমসি

* কনখলে বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সবিশেষ কার্য্য বিবরণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বলং মে দেহি, বীর্য্যমসি বীর্য্যং মে দেহি” এই প্রার্থনা করিয়া সকলে আরাম করিতে গেলেন।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে জন্মতিথি পূজার দিন পূজা হোম প্রভৃতি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০।৫০ জন ছাত্র ও ১৫।২০ জন অন্যান্য ভদ্রলোক সমবেত হন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়ই ছিলেন। পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হয়। পূজান্তে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরিত হয়। পরে আশ্রম ও ইহারই অঙ্গস্বরূপ রামকৃষ্ণসেবাশ্রম (যাহা পূর্ব্বে দরিদ্রদুঃখপ্রতীকারসমিতি নামে অভিহিত ছিল) উভয়ে মিলিয়া প্রায় ৮০।৯০ জন যথার্থ দরিদ্র লোককে লুচি, আলুর দম ও মিহিদানা উত্তমরূপে ভোজন করান। সন্ধ্যার সময় খুব ভজন গান হয়।

গত ১লা মার্চ্চ রবিবার ভাবদা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নানাবিধ পাতা লতা ও ফুল প্রভৃতি দিয়া একটী ফুল বাঙ্গলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়, পরে অনাথাশ্রমের সকল বালকগণের সহিত অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবনস্বরূপ স্বামী অখণ্ডানন্দ হোম করেন, পরে নানাবিধ সামগ্রী দিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক গুলি ভক্ত আসিয়া ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করেন, পরে সকলে মিলিয়া ভজন ও কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত ঠাকুরের প্রসাদ পান।

বিগত ২৯ শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটিয়া গ্রামের ধর্ম্মাশ্রমে অষ্টম বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রায় ৩০০ নর নারী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয় সায়াহ্নে নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন।

(নিউ ইয়র্ক।)

নিউ ইয়র্ক বেদান্তসমিতির কার্য্য স্বামী অভেদানন্দের তত্ত্বাবধানে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। গ্রীষ্মের ছয়মাস এই সমিতির নিয়মিত বক্তৃতাদি বন্ধ থাকে। কিন্তু এই বন্ধের সময় এবার সমিতির নিয়মাবলী প্রভৃতি রীতিমত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সমিতির গঠন যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দ গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে নিউ ইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড অনেক দিন ধরিয়া ভ্রমণ করেন। পরে সুইজর্লণ্ডের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়া পারিস নগরে দশদিন বাস করেন। এইরূপে তিনি তাঁহার অবকাশের দুইমাস কাল ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বেদান্তসমিতির প্রথম অধিবেশন কার্ণেগি লিসিয়ম নামক স্থানে নবেম্বরের প্রথম রবিবারে হয়। তাহাতে এত জনতা হয় যে, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, নিউইয়র্কে বেদান্তের শিক্ষা ও উপদেশ লোকের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বামীজী পূর্ব্বেকার ন্যায় যোগশিক্ষার্থিগণকে রীতিমত যোগধ্যান ধারণাদি শিখাইতেছেন। প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় লোকে এত উপকার ও আলোক পাইতেছে যে, সর্ব্বসাধারণ উঁহার প্রতি আকৃষ্ট। রবিবাসরীয় প্রকাশ্য বক্তৃতা গুলিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। যদিও ঐ সকল বক্তৃতার বিষয় দুরূহ, তথাপি লোকে অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল বক্তৃতা শুনিয়া থাকে। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এই বক্তৃতাগুলি হইয়া গিয়াছে।

১ম,—সত্য ধর্ম্মের লক্ষ্য।
২য়,—ক্রমবিকাশবাদ ও ধর্ম্ম।
৩য়,—দর্শন ও ধর্ম্ম।
৪র্থ,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব।
৫ম,—ঈশ্বরের রূপ আছে কি না?
৬ষ্ঠ,—প্রতীকের আবশ্যকতা।
৭ম,—সত্যের উপাসনা।
৮ম,—নরের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি।
৯ম,—ঈশ্বরতনয়।

নিভৃতচিন্তা।

এ কোথা এসেছি ? এ যে বিদেশ আমার।
কারু পরিচিত নহি, কেহ বা আমার !
একি কুহেলিকাময় ? তাই কেহ মোরে
ছেলে বলে বন্ধু বলে সম্ভাষণ করে ?
কিবা কাজ হেথা ? দেখি মন মোরে বলে,
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি চেষ্টা কর হে কুশলে।
কেন ? সে ত জ্বালাময়—ধর্ম্মপথে যাই,
নানা ধর্ম্মবিদে ধর্ম্ম সুধিয়া বেড়াই।
একি ! তবু মন শান্তি কোথাও মিলে না,
কি করিব ? হইল কি বিষম যন্ত্রণা !
ওই জ্ঞানী মহাসাধু ত্যাগী যোগিবর—
হব কি উঁহার দাস ? কিন্তু তার পর ?
ওঁর উপদেশে এই লভিলাম জ্ঞান,
আত্মদৃষ্টি, আত্মচিন্তা কর হে ধীমান !
তবে করিলাম ত্যাগ সঙ্গ সদসৎ,
নিভৃতে বসিয়ে চিন্তা করি, এ জগৎ
কিবা ? হেথা কেবা আমি ? কারা এরা সব ?
কি সম্বন্ধ ইহাদের সনে ? এই ভব
কোথা হতে আসিয়াছে ? কি গতি ইহার ?
কেবা সেই প্রাণারাম সর্ব্বমূলাধার ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

শ্রীম—কথিত।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মধ্যে)

আজ বৈশাখ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সোমবার ইংরাজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম ভাগ মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত শান্তিরাম ঘোষ, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ শীঘ্র ছাপা হইবে অর্থাৎ Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna এইপুস্তক সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীম—কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

Dehra Dun

24th November, 1897.

My dear M—

Many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never the life of a great teacher was brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing.

The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed and withal so plain and easy.

I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange is'nt it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you this great work. He is with you evidently.

With all love and namaskar,

(Sd) Vivekananda.

Socratic dialogues are Plato all over, you are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it here or in the West.

মাষ্টার পূর্ব্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর দেখিলেন, ঠাকুর নাটমন্দিরে পাদচারণ করিতেছেন। ঐ রাত্রে কাত্যায়নী পূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী।"

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য মা, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা। ঐ অবস্থায় নিজের ঘরে চৌকির উপর আসিয়া বসিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঐ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল। সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটী ভক্ত আসিলেন। কাত্যায়নী পূজা উপলক্ষে বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন।

এখন বেলা ৯টা হইবে। ঠাকুর সহাস্যবদন—গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটীতে বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটী কোলে লইয়াছেন। রাখাল শুইয়া আছেন। ঠাকুর কয়েক দিন ধরিয়া রাখালকে সাক্ষাৎ গোপালের ন্যায় সেবা করিতেছেন।

ত্রৈলোক্য বাবু সম্মুখ দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, সঙ্গে অনুচর। ঠাকুর রাখালকে বল্লেন, ওরে ওঠ্, ওঠ্।

ত্রৈলোক্য বাবু নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)। হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নি?

ত্রৈলোক্য। হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা, এবার যা হয়েছে, তা হয়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়। যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল।

ঠাকুর বালকের ন্যায় এই কথা বলিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন,—

রাম! ত্রৈলোক্যকে বল্লুম, যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরূপ আর না হয়। তা, এ কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে?

রাম চাটুয্যে। মশায়, তা আর কি হয়েছে। বেশই বলেছেন। যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)। ওগো, তুমি আজ এখানে খেও।

আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। বলরাম, মাষ্টার, রাখাল, রামলাল এবং আরও দু একটী ভক্ত বসিয়াছিলেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো। বলরামের বাড়ী গাড়ী করে যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। বল্লুম, মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্যে আমি অত ভাবি কেন; সে বলে, তুমি ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের চিন্তা কচ্চো কেন, এই কথা বল্‌তে বল্‌তে একেবারে দেখালে যে, তিনি মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গ্‌লো, তখন হাজরার উপর রাগ কর্ত্তে লাগ্‌লুম। বল্লুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিচ্ছলো। আবার ভাব্‌লুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জান্‌বে কেমন করে।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রের সহিত প্রথম দেখা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। দেখ্‌লুম, দেহ বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল। হুঁস হলে বলে উঠ্‌লো, ওগো তুমি আমার কি কর্‌লে; আমার যে মা বাপ আছে। যদু মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুলতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, প্রাণ আটু পাটু কর্‌তে লাগ্‌লো। তখন ভোলানাথকে* বল্লুম হাঁগা,

* তখন ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

আমার এমন হচ্ছে কেন; নরেন্দ্র বলে একটী কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার এমন হচ্ছে কেন, তখন ভোলানাথ বল্লে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, তখন সত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্বগুণী লোক দেখ্‌লে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হোলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখ্‌বো বলে বসে বসে কাঁদ্‌তুম।

— —

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন চরিত]

[প্রেমোন্মাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। উঃ, কি অবস্থাই গেছে। প্রথম যখন এই অবস্থা হলো, দিন রাত কোথা দিয়ে যেত, বল্‌তে পারিনা। সকলে বলে, পাগল হল। তাই ত এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা—প্রথম চিন্তা হোলো, পরিবারও এইরূপ থাক্‌বে, খাবে দাবে। শ্বশুর বাড়ী গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্ত্তন। দিগম্বর বাঁড়ুয্যের বাপ টাপ এলো, খুব সংকীর্ত্তন। এক একবার ভাব্‌তুম, কি হবে। আবার বল্‌তুম, মা, দেশের জমীদার যদি আদর করে, তা হলে বুঝ্‌বো সত্যি। তারাও সেধে এসে কথা কইতো।

"কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা কল্লুম। চোদ্দ বছরের মেয়ে। দেখ্‌লুম সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লুম।

"রামলীলা দেখ্‌তে গেলুম। একেবারে দেখ্‌লুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজো কর্‌তে লাগ্‌লুম।

"কুমারীদের এনে এনে পূজো কর্‌তুম। দেখ্‌তুম, সাক্ষাৎ মা।

"একদিন বকুলতলায় দেখ্‌লুম, নীল বসন পরে একটী মেয়ে দাঁড়িয়ে।

দপ্ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম, কিন্তু দেখ্লুম, সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেক ক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।

"আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছ্লুম। বেলুন উঠ্‌বে—অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজর পোড়্‌লো, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

"শিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জলপান দিলুম। দেখ্লুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগ্লুম।

"প্রায় হুঁস থাক্‌তো না। মথুর বাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে দিন কতক রাখ্‌লে। সাক্ষাৎ দেখ্‌তে লাগ্লুম, মার দাসী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা কোর্‌তো না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখ্‌লে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে—বাবুর মেয়েকে জামাইএর কাছে শোয়াতে যেতুম।

"একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল তাঁর নাম জপ কর্ত্তে কর্ত্তে বিড়্ বিড়্ কোর্‌তো। আমি দেখে আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্ত্তুম না। একেবারে তাঁর উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।"

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর বল্লেন, আমি একজন কীর্ত্তনিয়াকে মেয়ে কীর্ত্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। সে বল্লে, আপনার এ সব ঠিক ঠিক। আপনি এ সব জান্‌লেন কেমন করে? এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্ত্তনিয়ার ঢঙ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ন্যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন। মণিলাল এক একটি কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণ অবস্থা। এক একবার উত্তর দিতেছেন।

মণিলাল। শিবনাথ নি—কে সুখ্যাত করে।

ঠাকুর তখনও শুইয়া—চক্ষে নিদ্রা আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, হাজরাকে ওরা কি বলে?

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। মণিলাল ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি)। আহা, তার কি ভাব! গান না কর্ত্তে কর্ত্তে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না। (মাষ্টারের প্রতি)। রাম, মনমোহন, এদের এখন আর ভাব টাব হয় না।

"আচ্ছা, ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ, এ সব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান? মানুষগুলি সব এক রকম দেখ্‌তে, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, যেমন পুলির ভিতর কড়াইএর ডালের পোরও থাক্‌তে পারে, ক্ষীরের পোরও থাক্‌তে পারে, কিন্তু দেখ্‌তে এক রকম। ঈশ্বর জান্‌বার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে একটা বাঘ পড়েছিল। এমন সময়ে লাফ দিতে গিয়ে তার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল। কিন্তু ছানাটি ছাগলদের সঙ্গে মানুষ হতে লাগ্‌লো। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাটাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, বাঘের ছানাটাও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হ'লো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বড় বাঘ এসে পোড়্‌লো। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্‌। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধল্লে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কর্ত্তে লাগ্‌লো। তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বল্লে, দেখ্‌, জলের ভেতর তোর মুখ দেখ্‌—ঠিক আমার মতন দেখ্‌। আর এই নে—খানিকটে

মাংস—এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে কোন মতে খাবে না,—ভ্যা ভ্যা কচ্ছিল; কিন্তু রক্তের আস্বাদ পেয়ে তখন খেতে আরম্ভ কল্লে। নতুন বাঘটা বল্লে, এখন বুঝিচিস, আমিও যা, তুইও তা, এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।

“তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনিই জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

(গুরুর কৃপা ও সাধন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু সাধন কল্লেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝ্‌তে পারবে, কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বর সত্য, এ সংসার অনিত্য।

“একজন জেলে রাত্রে একজনদের বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরী কচ্ছিল। গেরস্ত জান্‌তে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেল্লে। আর মশাল টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজ্‌তে এলো। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। তার পর দিন পাড়ায় খবর হল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ আর আর মিষ্টান্ন নিয়ে সাধুকে প্রণাম কর্ত্তে এল। অনেক টাকা পয়সাও সাধুর সাম্‌নে পড়্‌তে লাগ্‌লো। দু দিন পরে এই ব্যাপার চল্‌তে লাগ্‌লো। তখন জেলেটা ভাব্‌লে, কি আশ্চর্য্য, আমি সত্যিকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যিকার সাধু হলে আমি নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

“কপট সাধনেতেই এতদূর চৈতন্য হলো। সত্যি সাধন হলে ত কথা নাই। কোন্‌টা সৎ, কোনটা অসৎ, বুঝ্‌তে পার্ব্বে। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য।

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য, জেলে ত সংসার ত্যাগ করে গেল। তবে কি হবে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অহেতুককৃপাসিন্ধু—অমনি বলিতেছেন,—

যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল

থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে নেয়, সেই আগে-কার কাযই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ।)

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আহ্নিক কর্‌বার সময় তাঁকে কোন্ খানে ধ্যান কোর্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, হৃদয় ত বেশ ডঙ্কামারা জায়গা। সেই খানে ধ্যান কোরো।

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

কবীর বোল্‌তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ।

কাকো নিন্দি কাকো বন্দি দোনো পাল্লা ভারী।

"হলধারী দিনে সাকারে থাক্‌তো, আর রাতে নিরাকারে থাক্‌তো। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। তা সাকারেতেই বিশ্বাস কর আর নিরাকারেতেই বিশ্বাস কর। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

"শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে আস্‌তো। কেউ বলেছিল, অত রাস্তা, কেন গাড়ী করে আস না, বিপদ হতে পারে। তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আবার বিপদ!

"বিশ্বাসেতেই সব হয়। আমি বল্‌তুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্যি। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। তা যেটা মনে কর্ত্তুম, সেইটেই মিলে যেত।"

মাষ্টার ইংরাজী (Logic) ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল বেলার স্বপন মিলিয়া যায় (Coincidence of dreams with actual events) এটি কু-সংস্কার হইতে উৎপন্ন, একথা পড়িয়াছিলেন। (Chapter on Fallacies) তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নি, এমন কি হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, সে সময় সব মিল্‌তো। তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস কর্ত্তুম, তাই মিলে যেত। (মণিলালের প্রতি) তবে কি জান, সরল উদার না হলে এ বিশ্বাস হয় না।

"* * * হাড়পেকে, কোটরচোখ, এ রকম অনেক সব লক্ষণ আছে তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না।

দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই
একলা কালো বেরাল কি করব মুই।

(সকলের হাস্য।)

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সতীত্ব ধর্ম্ম।)

সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল আদি চলিয়া যাবার পর দু একজন ভক্ত এখনও আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ধুনার গন্ধ—ঠাকুর ছোট খাটটীতে উপবিষ্ট—মার চিন্তা করিতেছেন। মাষ্টার মেজেতে বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না, কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর, তাহার সঙ্গে অনেক পুরাণো কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার কল্লি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত?

ভগবতী। তা আর কি করে বোল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশী বৃন্দাবন এ সব হয়েছে?

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত)। তা আর কি করে বোল্‌বো? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে নাকি রে?

ভগবতী। হাঁ, নাম লেখা আছে, "শ্রীমতী ভগবতী দাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ, বেশ।

এই সময় ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটী জালা ছিল—এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন ও গঙ্গাজল লইয়া পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল, সেই স্থান ধুইতে লাগিলেন।

দু একটী ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহারা অবাক্, স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দাসী জীবন্মৃত হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিতপাবন ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিলেন, "তোরা অমনি প্রণাম করবি।" এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিলেন ও দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, একটু গান শোন্। এই বলিয়া তাহাকে গান শুনাইতে লাগিলেন।

গান

(১)

মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
শ্যামাপদ নীলকমলে,—কালীপদ নীলকমলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
তায় পঞ্চ তত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দসাগর উথলে।

(২)

শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়ী খান উড়্‌তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।
মায়াকান্নি হোলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই সে, আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌লো ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।

(৩)

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন এই পরশমণি যা চা চাবি তাই দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

কাশ্মীরে অমরনাথ।

মানুষ নিত্য নূতন চায়—প্রকৃতির নব নব লীলাভূমি সন্দর্শন করিয়া প্রাণ মন চরিতার্থ করিতে বাসনা করে, অন্তর্জ্জগতের নব নব ভাব উপলব্ধি করিতে সতত যত্নবান হয়। আজ যে স্থান অতীব নয়নপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, কাল তাহা পুরাতন হইয়া যায়। আজ যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া লোক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে, কাল তাহার তত আকর্ষণ থাকে না। ইহাই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। এই মানবপ্রকৃতির বশীভূত হইয়া যথায় প্রাকৃতিক যাবতীয় সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ, ভূস্বর্গ সেই কাশ্মীর এবং বিশেষতঃ কাশ্মীরস্থ নিখিল সৌন্দর্য্যের খনিস্বরূপ অমরনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে ১৩০৮ সালের ১০ই চৈত্র রাওলপিণ্ডি উপস্থিত হইলাম। রাওলপিণ্ডি নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের একটী বড় ষ্টেশন। বহু পূর্ব্বে ইহাই সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া গণ্য ছিল, পরে পেশওয়ার এবং কোহাট পর্য্যন্ত রেল যাওয়াতে সীমান্ত প্রদেশ অনেক পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

যদিও নানাদেশ ভ্রমণ ও তীর্থাদি গমন বাসনা দ্বারা সাধক জীবনের [illegible] স্তরে বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, যাহা লক্ষ্য করিয়া সাধক [illegible]য়াছেন, "তীর্থভ্রমণ দুঃখগমন, মন উচাটন করো না রে," যদিও উদ্দেশ্যবিহীন ভবঘুরে হইয়া জীব ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যায়, তথাপি ইহার বিশেষ উপকারিতা

আছে, এক অবস্থায় ইহা অতীব আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দেশাদি ভ্রমণচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক বহুদর্শিতা জন্মে এবং আজন্ম বদ্ধমূল ভ্রমসংস্কার সকল হৃদয় হইতে অপসারিত হয়। তীর্থাদি স্থানে সাধুসঙ্গলাভ অনেক সময় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া মন উন্নত হয়। পদব্রজে তীর্থাদি ভ্রমণে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। তীর্থাদিগমনকে কায়িক তপস্যা বলে। এই সমস্ত কারণে সাধুদিগের চারি-ধাম করিবার বিধি আছে। গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দে বেষ্টিত থাকিয়া আলস্য বশতঃ অনেকেই ঘরের বাহির হইতে চাহেন না। মৃত্যুতুল্য সঙ্কীর্ণতাকে হৃদয়ে লইয়া জড়ভরত হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া আমাদের দেশ ত অবনতির আবর্ত্তে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন দেশের শিল্পাদি, কার্য্যকারিতা, একতা প্রভৃতি সদ্গুণ শিক্ষা করিতে পারে। আজ বোধ হয় আমাদের এ অবস্থা হইত না।

কাশ্মীরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। (১) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গুজরাট ষ্টেশন হইতে রাজাওরী হইয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৮২০০ ফিট উচ্চ রতন পীর নামক পাশ এবং ১১৫০০ ফিট উচ্চ পীর পঞ্জাল পাশ পার হইয়া ইসলামাবাদ (Islamabad) হইয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়।

(২) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের ঝিলাম ষ্টেশন হইতে কাশ্মীরের করদ পুঞ্চ রাজ্যের মধ্য দিয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৮৫০০ ফিট উচ্চ হাজিপীর পাশ পার হইয়া বরামুলা দিয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়।

(৩) উক্ত রেলওয়ের লাহোর হইতে যে শাখা লাইন শিয়ালকোট হইয়া জম্মু পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা দিয়া জম্মু যাইতে হয়। এই জম্মু রাজ্যও কাশ্মীর মহারাজের অধীন এবং জম্মু সহর মহারাজের শীতাবাস ও কাশ্মীর গ্রীষ্মাবাস। এই জম্মু হইতে পাহাড়ীয় পথ দিয়া সমুদ্র সমতল হইতে ৯২০০ ফিট উচ্চ বানিহাল পাশ দিয়া ইসলামাবাদ হইয়া একা করিয়া কিম্বা উহার অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ খান্নাবল হইতে নৌকাযোগে শ্রীনগর যাওয়া যায়।

(৪) জম্মু হইতে আকনুর ও রাজাওরি হইয়া প্রথমোক্ত রতনপীর এবং পীর পঞ্জাল পাশ পার হইয়া কাশ্মীরে যাওয়া যায়।

(৫) এই পথ নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের হাসন আবদাল ষ্টেশন হইতে এবোটাবাদ ও মজফ্‌ফরাবাদ (Mujaffarabad) হইয়া ঝিলাম ভ্যালি রোডে আসিয়া মিশিয়াছে।

(৬ রাওলপিণ্ডি হইতে ব্রিটিশ ষ্টেশন মরি পাহাড়ের নীচে দিয়া ঝিলাম নদীর ধার দিয়া বরাবর গিয়াছে। ইহাকে ঝিলাম * ভ্যালি রোড (Jhelum Valley Road) বলে।

উপরোক্ত প্রথম চারিটী পথ বর্ষার পর ৩।৪ মাস খোলা থাকে মাত্র। অন্য সময় বরফের জন্য দুর্গম হয়। কুলি, ঘোড়া, ঝাঁপান, পাল্কি পাওয়া যায়। এবোটাবাদে ব্রিটিশ ষ্টেশন বলিয়া উক্ত পথে টঙ্গা, একা প্রভৃতি পাওয়া যায়। রাওলপিণ্ডির পথ দূর হইলেও অন্যান্য পথ অপেক্ষা অনেক সহজ। এই পথ দিয়াই মহারাজ ও তাঁহার রাজ্যের কর্ম্মচারী সকল যাতায়াত করেন। সাহেব মেম প্রভৃতি যাঁহারা কাশ্মীর দেখিতে যান, তাঁহারাও সাধারণতঃ এই পথ দিয়াই গমনাগমন করেন এ পথে টঙ্গা একা প্রভৃতি সমস্ত পাওয়া যায়। ধাঞ্জীভাই এবং তাঁহার পুত্রেরা টঙ্গার কণ্ট্রাক্ট লইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। পুরো টঙ্গার ভাড়া ১০০৲ টাকা, কখন কখন ১১০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ে। একটী লোকের স্থানের জন্য ভাড়া ৩৩৲ টাকা। একার ষ্টেট হইতে ধার্য্য ভাড়া ২২॥০ সাড়ে বাইশ টাকা। ইহারও ভাড়া কখন কখন ৩০।৩২ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ে। একটী লোকের সেখানে ভাড়া ৬।৭ টাকা।

অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব আছে বলিয়া রাওলপিণ্ডী কালী বাড়ীতে আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কালীবাড়ী ষ্টেশনের খুব নিকট। একটী সদাশয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উৎসাহে অম্বালা, রাওলপিণ্ডী প্রভৃতি স্থানে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালীগণ বিদেশে যাইয়া স্থানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান। তাঁহাদের পক্ষে কালীবাড়ী ২।১ দিন থাকিবার বেশ সুবিধা-জনক স্থান। যে সমস্ত বাঙ্গালীকে চাকরী উপলক্ষে বিদেশে থাকিতে হয়, তাঁহাদের পূজাদি ও বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম কালীবাড়ীর বাঙ্গালী পূজারি দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন আফিস পাহাড় হইতে দেশে এবং দেশ হইতে পাহাড় যায়, তখন আফিসের কোন কোন কর্ম্মচারী কালীবাড়ীতে ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইবার সময় কালী মাতাকে কিছু প্রণামী দিয়া যান। কালী বাড়ীর ব্যয়াদি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। কালীবাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ প্রায় কিছুই বাদ যায় না। রাওলপিণ্ডির কালীবাড়ীতে একটী রিডিং রুমও আছে। সাধু

* বিতস্তা—পঞ্জাবের ৫টী নদীর অন্যতম।

সন্ন্যাসিগণ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। আমাকে ইঁহারা খুব যত্ন করিয়াছিলেন।

স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক কাশ্মীর যাইবার জন্য আমাকে একা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ৮৯ মাইল। টঙ্গায় ২॥ দিনে শ্রীনগর পৌছান যায়। টঙ্গার জন্য ৪।৫ মাইল অন্তর ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একা এক ঘোড়াতেই বরাবর যায়। তজ্জন্য একা ৬ দিনে শ্রীনগর পৌঁছায়। একায় যিনি কিছুক্ষণ চড়িয়াছেন, তিনিই ইহার কষ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন। অন্ততঃ দুই খানি গাড়ী একত্র না হইলে একার ঘোড়া প্রায় চলিতে চায় না; যখন জোরে চলিতে থাকে, নাড়ী ভুঁড়ী একেবারে ওলট পালট হইবার যোগাড়। ২রা জ্যৈষ্ঠ বৈকাল ৫টার সময় আমাদের একা ছাড়িল। প্রায় ১৭।১৮ মাইল পরে, আমরা রীতিমত পাহাড়ের ভিতর পড়িলাম। রাত্রি ১০ টার সময় সত্র নামক স্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইয়াছিলাম। একা সমস্ত রাত্রি চড়াই করিয়া পরদিন প্রাতে মরি পাহাড়ের দুই মাইল নীচে রাওলপিণ্ডী হইতে প্রায় ৩৯ মাইল দূরবর্ত্তী ঘোড়াগলি নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এ পথে টঙ্গা একা প্রভৃতির সুবিধা হইলেও রাত্রে থাকিবার অত্যন্ত স্থানাভাব। বেশী ভাড়া দিলে দুই একটী ঘর পাওয়া যায়। কোন পাহাড়েতে তাহা পাওয়াও দুষ্কর। ডুমেল, কোহালা, রামপুর, উড়ী, চকোটী, বরাহমূলা প্রভৃতি স্থানে সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে। দোকানদারদের নিকট রাত্রে শুইবার জন্য খাটিয়া লইলে দুই পয়সা খাটিয়ার ভাড়া দিতে হয়। ঝিমর নামে এক ছোট জাত আছে, তাহারা রুটি, ভাত, ডাল, তরকারী বিক্রয় করে। ছোট জাত বলিয়া সকলে তাহাদের হাতে খায় না। পুরী, ফুলুরী, দুগ্ধ, মিছরী, বাতাসা ও জিলীপী, গজা প্রভৃতি সামান্য মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। ডাল চাল প্রায় পাওয়া যায় না। আস্ত মসুর ও কলাই-ডাল, আটা, আলু, মসলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় একা চলিতে লাগিল।

বেলা ১২টার সময় ডুমেল পৌঁছিলাম। ইহার অপর পারে মজঃফরাবাদ। এখানে কৃষ্ণগঙ্গা ঝিলমের সহিত মিশিয়াছে। সঙ্গমে স্নান করিয়া দোকান হইতে কিঞ্চিৎ পুরী ও হালুয়া কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় এক পাহাড়ী বর বিবাহ করিয়া গৃহে যাইতেছে

দেখিলাম। সঙ্গিগণ বাজনার তালে তালে তরবারী খেলিতেছে। বরের কোমরে কোষবদ্ধ অসি রহিয়াছে। প্রায় ৩ টার সময় একা ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় কোহালার নিকট পুল পার হইয়া দুই মাইল দূরে বর্ষালা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। পুলের ওপার হইতে কাশ্মীর মহারাজের এলাকা। টঙ্গা ও একা পিছু যথাক্রমে একটাকা ও আট আনা পোল ট্যাক্স দিতে হয়। পুল পার হইয়া মহারাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলে ব্যবহার্য্য বস্ত্র ও শয্যাদি ব্যতীত নূতন জিনিষ পত্রের কিম্বা ব্যবসাদির জন্য মাল পত্রের উপর কিছু কিছু কর দিতে হয়। কাশ্মীর রাজ্যে প্লেগ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কোহালা, উড়ী ও বরাহমূলাতে প্লেগ পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। বর্ষালায় একটী মাত্র দোকান আছে। তথায় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। প্রাতে একা ছাড়িয়া মধ্যে এক স্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা ৫টার সময় ঘেড়ী পৌঁছিলাম। এখানে ভাল চাল পাওয়া গেল। রাওলপিণ্ডি ছাড়িয়া আর অন্নাহার হয় নাই। একাতে গাড়ওয়ান ছাড়া আর তিন জন বসিতে পারে। আমার সঙ্গে একটি বাঙ্গালী যুবক কাশ্মীরে চাকরী অন্বেষণে যাইতেছিলেন। আর একটী পঞ্জাবী ছিলেন। পঞ্জাবী ভদ্রলোকটী গুলমর্গ পাহাড়ে টেলিগ্রাফ মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীনগর হইতে দক্ষিণ দিকে তুষারাচ্ছন্ন গুলমর্গ পাহাড় অতি সুন্দর দেখায়। এখানে বসন্তে গোলাপ ফুল ফোটে বলিয়া ইহার নাম গুলমর্গ হইয়াছে। শ্রীনগরে গরম পড়িলে অনেক সাহেব মেম এইখানে যান। পঞ্জাবী ভদ্রলোকটীর নিকট অনেক বড়ী ছিল। আজ ভাত ও আলু বড়ীর ঝোল প্রস্তুত করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। এ স্থানে একটী সরাই ছিল। তথায় রাত্রি যাপন করতঃ প্রাতে ৪ টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া মধ্যে একস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈকালে প্রায় সন্ধ্যার সময় উড়ী পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে মরী পাহাড়ের নিকট বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল। মধ্যে বেশী ঠাণ্ডা পাওয়া যায় নাই। এখানে আজ বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। চারি পার্শ্বের পাহাড়ে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। আমাদের আসিতে কিঞ্চিৎ দেরি হওয়াতে দোকানে আমরা স্থান পাইলাম না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনেক লোক স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখানে একে অত্যন্ত শীত, তার উপর স্থানাভাব, একাদিগের ঘোড়া রাখিবার স্থানে কিঞ্চিৎ যায়গা পাওয়া গেল। দোকান হইতে খাটিয়া লইয়া কোনরূপে রাত্রি যাপন

করা হইল। এখানে দুগ্ধ ও গরম জিলীপী পাওয়ায় জলযোগের কষ্ট হয় নাই। এখানে প্লেগ পরীক্ষার জন্য একা ছাড়িতে প্রায় বেলা ৭ টা হইল। ১২ টার সময় বরাহমূলা পৌঁছিলাম। এখান হইতে রাস্তা সমতল ও ঝিলামের স্রোতও কম। অনেকে এস্থান হইতে নৌকা করিয়া শ্রীনগর যায়। বরাহমূলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে লম্বালম্বা সফেদা (Poplars) গাছের সার অতি সুন্দর দেখায়। বরাহমূলা হইতে শ্রীনগর ৩২ মাইল। বরাহমূলা ছাড়িয়া চারিদিকে পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকে তুষারবলিত অভ্রভেদী পাহাড় সকল বহুদূর বিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকাকে বৃত্তাকারে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। রাত্রে পত্তন নামক স্থানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে ৭টার সময় শ্রীনগর পৌঁছিলাম।

কাশ্মীর উপত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ মাইল। উত্তরে সমুদ্র সমতল হইতে ১১৫০০ ফিট উচ্চ ব্রাজিল ও ১১২০০ ফিট উচ্চ কাম্রী পাশ পার হইয়া গিলগিট দিয়া রুশিয়া সীমানায় যাওয়া যায়। উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থিত সমুদ্র সমতল হইতে ১১৩০০ ফিট উচ্চ জোজিলা পাশ হইয়া তিব্বত রাজের অধীন লাডাক যাইবার পথ। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীনগরে ঝিলমের উপর ৭টী পুল আছে। শ্রীনগর সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ৫৪০০ ফিট উচ্চ। মহারাজের প্রাসাদ ঝিলমের উপর অবস্থিত। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতাপ সিংহের এক্ষণে বিশেষ ক্ষমতা নাই। রেসিডেন্টই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ইঁহার পিতা মহাতেজস্বী বীরেন্দ্রকেশরী মহারাজ রনবীর সিংহের সময়ে কাশ্মীর স্বাধীন ছিল।

এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য ভূরি ভূরি লিখিত হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ আমেরিকা হইতে সাহেবগণ ইহার মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে আইসে। সহরের ১॥ মাইল পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বা তক্ত সুলেমান নামে এক অতি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ইহার উপর একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিলে শ্রীনগর একখানি ছবির মতন দেখায়। সহর খানি যেন জলের উপর ভাসিতেছে বোধ হয়। কারণ উত্তরে ডাল নামক ক্ষুদ্র হ্রদ এবং অন্য কয়েক ধারে নদী ও খাল। নদী, হ্রদ, খাল ইত্যাদির একত্র সমাবেশে ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইয়াছে। নানাবর্ণের ক্ষেৎগুলি

ও ময়দান সকল দেখিয়া বোধ হয়, যেন বিভিন্ন বর্ণের গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। জমী অত্যন্ত উর্ব্বর। প্রচুর পরিমাণে ধান্য এবং পটল ছাড়া প্রায় সর্ব্বপ্রকার তরকারী উৎপন্ন হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধান্য টাকায় ১৬ সের। মটর সরিষা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

বেগুণ পয়সায় ১৬টা, ওলকপি ১০।১১টা পাওয়া যায়। ঘৃত টাকায় ১॥০ সের, গ্রামে ২ সের, ২॥০ সের করিয়া পাওয়া যায়। সাহেব মেমদিগের অত্যধিক আগমনে এবং অন্যান্য দেশের সহিত সংযোগ বৃদ্ধি বশতঃ জিনিষপত্র সমস্ত মহার্ঘ হইতেছে। মাংসের সের ১৪ পয়সা হইয়াছে, দুগ্ধ টাকায় ১৬ সের হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মাংস আরও সস্তা ছিল ও দুগ্ধ টাকায় ৩২ সের করিয়া পাওয়া যাইত। আবার যাহা কখনও আশা করি নাই, কাশ্মীরে সেই ধান্যদুর্ভিক্ষ আজকাল শুনা যাইতেছে। জানি না, ভবিষ্যৎ গর্ভে আরও কত কি লুক্কায়িত আছে। এখানে নানাপ্রকারের আঙ্গুর, আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ, ববুগোষা, তুঁত, চেরী প্রভৃতি সুমিষ্ট নানাবিধ ফল এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, গরীব লোকেরা পর্য্যন্ত ফল সকল ফেলিয়া ছড়াইয়া খাইয়া থাকে। শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্বে ৮ মাইল দুরস্থ পাম্পুর নামক স্থানে জাফরাণ বা কেশর উৎপন্ন হয়। যখন উহার ফুল ফোটে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। অনেকে ইহা দেখিবার জন্য গিয়া থাকে। কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বস্থ কাষ্টওয়ার নামক পাহাড়েও জাফরাণ উৎপন্ন হয়।

শ্রীনগর সহরের ভিতর অতি অপরিষ্কার। কাশ্মীরীরা অনেক সময় পথের ধারেই মলাদি ত্যাগ করে। শুনা যায়, ইহাদের মধ্যে ধারণা, বাহিরে মলাদি ত্যাগ ধনী লোকের চিহ্ন স্বরূপ। ইংরাজেরা যে অংশে বাস করে, সেই অংশ বেশ পরিষ্কার ও তথাকার রাস্তাও বেশ বড় এবং রাস্তার দুধারে সবেদা গাছের সার থাকায় রাস্তার সৌন্দর্য্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

ডাল হ্রদ অত্যন্ত গভীর। ইহার জল অতি স্বচ্ছ, জলের নীচে গাছ সকল স্পষ্ট দেখা যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে কাশ্মীর উপত্যকা একটী হ্রদ ছিল; শ্রীনগর দেখিলে তাহার সার্থকতা কতক বুঝা যায়। ডালের উপর খুব পানিফল হয়। ডালে যখন পদ্ম ফোটে, তখন দেখিতে অতি মনোরম হয়। একদিন

চাঁদনী রাত্রে কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে ডালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে সময় খুব পদ্ম ফুটিয়াছিল। একদিকে সহর ও তিনদিকে পাহাড়। মৃদু মৃদু পবনে জল, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মপত্রসকল ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সহিত চন্দ্রপ্রতিবিম্ব শতধা বিভক্ত হইয়া খেলা করিতেছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বন্ধুগণ ভজন গাহিতেছিলেন। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ডালের পশ্চিমদিকে হরিপর্ব্বত। ইহা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়, ইহার উপর পুরাতন কেল্লা। কোয়ার্টার মাষ্টার জেনেরালের পাশ ব্যতীত ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। ইহার ভিতর কালী দেবীর একটী সুন্দর মন্দির আছে। ইহাতে বড় বড় কামান সযত্নে রক্ষিত আছে। বেলা ১২টা ও রাত্রি ১০টার সময় এখান হইতে দুইবার তোপ হয়।

ডালের ধারে ধারে নিষাদবাগ, পরীভবন, শালিমারবাগ প্রভৃতি কতকগুলি মোগলদিগের বিলাসকানন দেখিতে পাওয়া যায়।

ডালের উত্তরে হারবন নামক স্থানে জলের কারখানা। খুব বড় পুকুরের ন্যায় একটী গভীর স্থানে পাহাড় হইতে জল আসিয়া জমিতেছে এবং তথা হইতে শ্রীনগরে কলের জল আসিতেছে।

ডালে ভাসমান বাগান একটি দেখিবার জিনিষ। পদ্মের মৃণালের ন্যায় একপ্রকার ঘাসের উপর মাটি জমাইয়া ভাসমান বাগান প্রস্তুত হয়। ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে শশা, ফুটী, কাঁকুড় প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। এই বাগান কখন কখন চুরি হইয়া থাকে। ইহার কিয়দংশ ভাসাইয়া অপরস্থানে লইয়া যাওয়া যায়।

ডালের পূর্ব্ব তীরে রাস্তার উপর হইতে পাহাড়ে একটু চড়াই করিয়া চিসাম সাই নামক সুন্দর একটী ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনগর হইতে ২৫মাইল নীচে উলর নামক একটী সুন্দর হ্রদ আছে। ইহার চারিদিকে পাহাড়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৬।৭ মাইল হইবে। নৌকা হইতে ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার জল অতি গভীর। বেলা ৩টার সময় প্রায় ঝড় উঠে, অনেক সময় ঝড়ে নৌকা ডুবি হইয়া গিয়াছে। এই জন্য মাঝীরা সকালে হ্রদ পার হয়, কারণ, প্রাতে ঝড় হয় না ও জল স্থির থাকে।

শ্রীনগর হইতে ৭।৮ মাইল নীচে ক্ষীরভবানী নামে একটী কুণ্ড আছে।

নদী ও খাল দিয়া যাইতে হয়। মাটির নীচে হইতে জল উঠিতেছে! উহার বর্ণ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হয়। আমরা যাইয়া জলের গোলাপী বর্ণ দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে কাল রঙও দেখা গিয়াছিল। এই কুণ্ডে প্রত্যহ প্রায় ১ মনের অধিক ক্ষীর (পরমান্ন) ঢালা হয়। এখানে একটি রেশম কুটী আছে। বাষ্পীয় যন্ত্রে জল গরম হইয়া নলযোগে আসিতেছে। তাহাতে একজন গুটী সকল সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। একটী ছেলে ৩।৪ টী সিদ্ধ গুটি লইয়া উহার ছাল হইতে রেশম বাহির করিয়া ৩।৪ গাছি রেশম একত্র করিয়া দিতেছে। আর একটি ছেলে লাটাইএর মত একটি কল ঘুরাইয়া তাহাতে জড়াইয়া লইতেছে। আর এক স্থানে যন্ত্রদ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রেশম গাঁট বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। এই স্থানে রেশম প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তথা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮৭৫ সালে এখানে একটি কৌতুকাগার স্থাপিত হয়। কৌতুকাগারে ভাল ভাল কাশ্মীরী সাল, কার্পেট, গব্বা, পুরাতন মূল্যবান তরবারি বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রাদি; কস্তুরীমৃগ, তিব্বতীয় হরিণ, কৃষ্ণভল্লুক, ব্যাঘ্র, নানাজাতীয় পক্ষিসমূহ; কাশ্মীরী রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারাদি; চিলকী নামক কাশ্মীরী মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা সকল, প্রস্তরের হাঁড়ী, নানাজাতীয় প্রস্তর, ফসিল, কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাপ্রকার জিনিষ ইত্যাদি দেখিবার আছে। একখানি শালের উপর সমুদয় শ্রীনগর সহরটী অঙ্কিত আছে। পশমের কাপড়ের উপর সূচীর কার্য্য অতি সুন্দর। ইসলামাবাদ এবং অন্যান্য স্থানে অনেকে শাল, কম্বল, পট্টু, লুই প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহাই অনেকের জীবিকা। এস্থানে কাগজের সুন্দর বাক্স ও ছবির ফ্রেম প্রস্তুত করে, ইহাকে পেপিয়র মেসি কহে। তাম্রের সুন্দর পাত্রাদিও প্রস্তুত হয়।

ডালের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে গুপকার নামক স্থানে চেরী, আপেল প্রভৃতি হইতে মদ প্রস্তুত হইবার কল আছে। একজন ফরাসী দেশীয় সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইহা আছে।

কার্পেট, গব্বা প্রভৃতিরও একটী কুঠী আছে।

এখানে দুইটী হাঁসপাতাল আছে। একটী রাজসংক্রান্ত ও আর একটী কৃশ্চান মিশন দ্বারা চালিত। ঐরূপ একটী হিন্দুস্কুল ও আর একটী মিশন স্কুল আছে। এখানে মধ্য ইংরাজী পর্য্যন্ত পড়ান হয়। কাশ্মীরে প্রবেশিকা পরী-

ক্কার বিদ্যালয় নাই। শুনা যায়, পূর্ব্বে এখানে খুব বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। এখানে সারদা দেবীর মন্দির আছে। যত বড় বড় পণ্ডিতকে একবার এখানে আসিতে হইত। শুনা যায়, শঙ্করাচার্য্য এখানে আসিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সমস্ত বিদ্যা লোপ পাইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে কাশ্মীরে বিদ্যার চর্চ্চা বাড়িতেছে। রাজ সরকার হইতে খরচ পাইয়া ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী বা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া পুনরায় রাজ সরকারে কর্ম্ম করিতে হইবে, এক্ষণে এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত সহকারী অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াছেন। ৩।৪ জন পণ্ডিত সহকারী জজ ও উকিল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখানে উকিল হইতে ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

এস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক। মুসলমান রাজত্বের সময়ে বোধ হয় অধিকাংশই মুসলমান হইয়াছিল। অনেক মুসলমানের নাম হিন্দু ও মুসলমান নামের একত্র মিলনে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের আচার ব্যবহারে এত মিল যে, এক কাশ্মীরী হিন্দু অন্নাদি রন্ধন করিয়া কম্বলের ভিতরে বাঁধিয়া কাশ্মীরী মুসলমানের মাথায় দিয়া অপর হিন্দুকে প্রেরণ করিলে উহা গ্রহণে তাহার আপত্তি হইবে না। স্পর্শ না করিলেই হইল। কপালে কেশর ও চন্দনের চিহ্ন ব্যতীত মুসলমান হইতে হিন্দু বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। ইহাদিগের ভাষা পঞ্জাবী, হিন্দী ও সিন্ধি ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ছত্রী (শূদ্র) দুই জাতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের দুইটী মসজিদ আছে। হিন্দুদের শিবমন্দিরই অধিক। ইহাদিগের অধিকাংশই শৈব। শক্তি পূজাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের পদবী কোল দেখিয়া তান্ত্রিক কৌলের কথা মনে পড়ে। কাশ্মীরী স্ত্রী ও পুরুষের ঝলঝলে আলখাল্লার ন্যায় প্রায় এক সাধারণ পোষাক দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা চাদর ও পাগড়ী পরে। স্ত্রী-লোকেরা মাথায় ও পিঠে একটি ছোট চাদর দেয়। স্ত্রী পুরুষের রঙ্গ খুব সুন্দর হইলেও সেরূপ গঠন বা মুখশ্রী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি এখানে উচ্চপদস্থ একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাটিতে ছিলাম। এখানে ১৬।১৭ জন বাঙ্গালী আছেন। ইঁহাদের অধিকাংশ গ্রীষ্মকালে

কাশ্মীরে থাকেন এবং শীতকালে জম্মু নামিয়া যান। প্রধান জজ, প্রধান চিকিৎসক, রিসেপ্‌সন ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ বাঙ্গালী অধিকার করিয়া আছেন।

আমি যখন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম, তখন অমরনাথ যাত্রার বিলম্ব থাকিলেও সাধু সন্ন্যাসিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীনগরের প্রায় ১॥ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ গোলাপ সিংহের সমাধি মন্দির রামবাগ নামক স্থানে সাধু সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার বিশেষ সুবিধা। স্থানটিও নির্জ্জন ও দুধগঙ্গা নামক একটি নদী উহার পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আরও ২।৪টি বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের মঠ আছে। সাধু সন্ন্যাসী ও অসহায় যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মার্থ ডিপার্টমেন্টে অনেক টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত আছে। বোধ হয়, বিশেষ তত্ত্বাবধানের অভাবে সাধুদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। নাম লিখাইলে প্রত্যেকে এককালীন ১ টাকা ও প্রত্যহ কিছু বোকড়া চাল ও ১ পয়সা করিয়া পাইয়া থাকে।

অমৃতসহর হইতে দশনামী সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। ইঁহারাই অমরনাথের পূজারী। অমরনাথের প্রতিভূ স্বরূপ ছড়ী, (আসাসোঁটা) মহারাজ পূজা করিয়া দক্ষিণাদি দিলে প্রায় পঞ্চমীর দিন ছড়ী শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন দর্শন হয়। ২৩শে শ্রাবণ শুক্রবার পঞ্চমীর দিন শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া ছড়ী পাসপুর, বিজবেয়ারা ও ইসলামাবাদ হইয়া শনিবার সন্ধ্যার সময় মটন উপস্থিত হইল। শ্রীনগর হইতে দুইটি পথ আছে। একটী স্থলপথে পাসপুর ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, অপরটীতে গেলে ঝিলাম নদীতে উজান বাহিয়া খান্নাবল পর্য্যন্ত নৌকা যোগে যাওয়া যায়। খান্নাবল হইতে ইসলামাবাদ প্রায় অর্দ্ধ মাইল।

এদেশে স্ত্রীলোকেরাও মাঝীগিরী করিয়া থাকে। নৌকায় প্রায় মাঝী ও তাহার স্ত্রী থাকে। মাঝীদিগের ঘরবাড়ী ইত্যাদি প্রায় নৌকার উপর। উহারা জন্মাবধি নৌকাতেই বসবাস করে। সাহেব কিম্বা বিদেশীয় ভদ্রলোকগণ কাশ্মীর দেখিতে আসিয়া প্রায় হাউসবোটে কিম্বা বড় বড় ডোঙ্গায় বাস করে। শ্রীনগরে অধিকাংশই কাঠের বাড়ী। ভাল বাড়ী ভাড়া প্রায় পাওয়া যায় না। বিদেশীর পক্ষে নৌকাতে থাকাই বিশেষ সুবিধা। বড় বড় হাউসবোটে পাশাপাশী ৪।৫ টি ঘর থাকে। উহার ঘর সকল বৈটকখানা, শয়নাগার, আহারের ঘর ইত্যাদি হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আগুন

জ্বালাইবার জন্ত চিমনী পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত আছে। বড় বড় বোটের সঙ্গে রাঁধিবার জন্য একটি বিভিন্ন ডোঙ্গা এবং বেড়াইবার জন্য ছোট এক খানি শিকারা থাকে। বড় বোটের মাসিক ভাড়া ৩০।৪০ টাকা। ১৫।১৬ টাকাতে ছোট ডোঙ্গা বোট পাওয়া যায়। এদেশে নৌকায় হাল থাকে না। গঙ্গাতে জেলে ডিঙ্গীর দাঁড়ের ন্যায় উহাই হালের কার্য্য করে।

আমি তৃতীয়ার দিন শুক্রবার ১২ টার সময় নৌকাযোগে ইস্‌লামাবাদ পৌঁছিলাম। এস্থানে অনেকে অনন্তনাগ ও এস্থান হইতে কিছুদূরবর্ত্তী অচ্ছেদ সরোবর ও বৈরীনাগ (মাটির ভিতর হইতে জল উঠিতেছে) দেখিতে যায়। একটি কুলী করিয়া বেলা ৩ টার সময় এস্থান হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত মটন পৌঁছিলাম। মার্ত্তণ্ড হইতে ইহার নাম মটন হইয়াছে। ইহার অপর একটি নাম ববন (Bawan)। এখানে মার্ত্তণ্ডের একটী মন্দির আছে। এখানে সুন্দর দুইটি কুণ্ড আছে। ইহাদের জল অতি স্বচ্ছ। নেটা মাছের ন্যায় ছোট ছোট অসংখ্য মৎস্য ইহাতে খেলা করিতেছে। যাত্রিগণ পাহাড়ীদিগের নিকট ভুট্টার খই কিনিয়া মৎস্যদিগকে দিলে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া খাইতে ও লাফালাফি করিতে থাকে। এখানে একটী খুব বড় গুহা আছে। আলো জ্বালিয়া এক দিন আমরা ভিতরে গিয়াছিলাম। কিছু দূর যাইয়া বাম পার্শ্বে আর একটি গর্ত্ত দেখিলাম। তাহাতে একটি আসনের মত বড় পাথর ও চারি পার্শ্বে হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। শুনা যায়, কোন মহাপুরুষ উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আর বাহির হন নাই; তিনি সমাধিস্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ইহা ৬০।৭০ হাত লম্বা। এখানে বিনোদ বিহারী দে নামক একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন। ইনি লিডার নদী হইতে যে মার্ত্তণ্ড খাল কাটা হইতেছে, তাহারই জন্ত সব ডিভিজন অফিসার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বাঙ্গালী যাত্রিগণকে ইনি অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এখানে ২ দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে আর দুইটি বাঙ্গালী যুবক ছিলেন। প্রায় ১১ টার সময় মটন হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী আয়াসমোকাম নামক পড়ওয়ায় পৌঁছিলাম।

ইহার আর একটী নাম জনক মহল। এইখানে পাহাড়ের উপর একটি সমাধিমন্দির আছে। ইহাকে হিন্দুরা জনক রাজার সমাধিস্থান বলে এবং মুসল-

মানেরা ইহাকে জনক সাহ নামক কোন মুসলমান সিদ্ধপুরুষের কবর বলিয়া থাকে। এক্ষণে ইহা মুসলমানদিগের অধীন। এস্থানের অদূরে গণেশ-পুরা নামক স্থানে বিনোদবাবুদিগের হেড্ কোয়ার্টার। তজ্জন্য বিনোদ বাবুকে কার্য্যোপলক্ষে প্রায় এখানে আসিতে হয়। এখানে বিনোদ বাবুর তাঁবু ছিল। সেই দিন বিনোদ বাবুর তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করিলাম। তাঁহার লোকেরাই আমাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। পর দিন আর দুইটি বাঙ্গালী আসিয়া জুটিলেন। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, অপরটী যুবক, তাঁহার শিষ্য। তাঁহারা ঘোঁড়ায় আসিতেছিলেন। একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মটনেই অমরনাথের পাণ্ডাগণের বাস। উহারা শ্রীনগরে যাইয়া যাত্রী অন্বেষণ করে। মটনে অমরনাথের জন্য কুলী, পালকী, ঝাঁপান, ডাণ্ডী, ঘোঁড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। যাতায়াতের কুলী ও মালের জন্য ঘোঁড়ার ভাড়া ২৷৷০ টাকা লাগে। চড়িবার জন্য ঘোঁড়ার যাতায়াতের ভাড়া প্রায় ৫৷৶ টাকা। ঝাঁপান, ডাণ্ডী প্রভৃতির যাতায়াতের খরচ প্রায় ৫০৷৶০ টাকা লাগে।

কেদারবদ্রীর পথে যেরূপ চটি বা ধর্ম্মশালা আছে, এ পথে সেরূপ কিছুই বন্দোবস্ত নাই। যাত্রীদিগকে তাঁবু লইয়া যাইতে হয়। দোকান সকল সঙ্গে সঙ্গে যায়। আমরা মটন হইতে কিছু চাউল, ঘৃত, আটা, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া লইয়াছিলাম। বৈকালে আগাসমোকাম হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী বটকোট নামক স্থানে পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গী কয়েক জন একটি তাঁবু লইয়া গিয়াছিল। এখানে এক পয়সায় ১২টা ন্যাসপাতি পাওয়া গেল। কিছু দুগ্ধ কিনিয়া ও ফল খাইয়া রাত্রি কাটান হইল। রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি ও ঝড় হওয়াতে অর্দ্ধ রাত্রে তাঁবু পড়িয়া গেল। কুলিদিগকে সেই রাত্রে উঠাইয়া পুনরায় ভাল করিয়া তাঁবু খাটান হইল। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আকাশের একধার পরিষ্কার হইতেছে দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে বৃষ্টি খুব বৃদ্ধি হইল। অত্যন্ত ভিজিয়া প্রায় ১১টার সময় ৮ মাইল দূরে পাহলগাম নামক স্থানে পৌঁছিলাম। ইহার আশপাশে দুই একখানি গ্রাম থাকিলেও তাহার পরে আর গ্রাম নাই বলিয়া ইহাকে পাহলগ্রাম অর্থাৎ প্রথম গ্রাম কহে। পাহলগামের ১ মাইল নীচে সাহেবদিগের অনেক তাঁবু দেখিলাম। শুনিলাম, প্রাকৃতিক সুন্দর দৃশ্য এবং জলবায়ু

দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রায় ১৫০ সাহেব মেম তাঁবু খাটাইয়া রহিয়াছে। এই স্থান পর্য্যন্ত যাত্রিগণ ছড়ী আসিবার পূর্ব্বে আসিতে পারে। ইহার উপর যাইবার আর হুকুম নাই। এবার অনেক গুলি বাঙ্গালী অমরনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। একটি উচ্চ ভূমির উপর বাঙ্গালীদিগের ৫টি তাঁবু পড়িয়াছিল। এখানে যাত্রিগণ একাদশী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এবারে দুই দিন একাদশী ছিল। ২৯ শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশীর দিন ৯।১০ টার সময় ছড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে দশনামী, বৈরাগী, উদাসী, নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ ও নানাদেশীয় গৃহস্থ যাত্রিগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। ক্রমশঃ দোকানদারগণ, ডাক্তার, নায়েব, তশীলদার এবং শ্রীনগরের সহকারী জজ, যাঁহাদের উপরে যাত্রিদিগের তত্ত্বাবধানের ভার, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক ঘণ্টা মধ্যে সে স্থান অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিল। কেহ বা কাপড়ে, কেহ বা কম্বলে, কেহ বা ছত্র দ্বারা তাঁবুর কার্য্য করিয়া লইল। কেহ বা ছাই মাখিয়া ধুনির আশ্রয়ে, কেহ বা অল্প মাত্র গায়ের কাপড়ে সেই অসহ্য শীত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিল। এ সাধু সন্ন্যাসীর মেলা এক দেখিবার জিনিষ। তার উপর এস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। চতুর্দ্দিকে তুষারধবলিত অত্যুচ্চ পাহাড় সকল, নীচে লিডার নদী কলকল নাদে প্রস্তর খণ্ড সমূহের বাধা তুচ্ছ করিয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সে শব্দ এত মধুর অথচ গভীর যে, শুনিতে শুনিতে চিত্ত আপনি স্থির হইয়া যায়। প্রাণকে যেন সবেগে প্রাণায়ামের দিকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। সন্ধ্যার পর সাধুদিগের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল, ভক্তগণ কেহ স্তোত্র পাঠ, কেহ ভজন গাহিতে লাগিল, তাহার উপর চন্দ্রমা আপনার শুভ্র কিরণ ছড়াইয়া যাত্রিগণকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে লাগিল। দ্বাদশীর দিন প্রত্যূষে ছাড়িয়া পথিমধ্যে যাত্রিগণ নীলধারা নামক স্থানে স্নানাদি করিয়া বেলা ১০ টার সময় ১০ মাইল দূরে চন্দনবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হইল। আজ পথ তত ভাল ছিল না। অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় একটি স্ত্রীলোক ঘোড়ায় করিয়া এই পথে আসিতেছিল। পাথরে ঘোড়ার পা লাগিযা পড়িয়া গিয়াছিল। এস্থানেও নদী ও তীরবৃক্ষের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। এস্থানে অনেক ভূর্জ্জপত্রের গাছ আছে। এখানে বরফের একটি সুন্দর পুল হইয়াছে দেখিলাম। চন্দনবাড়ী হইতে

পঞ্চতরণী যাইবার দুইটি পথ আছে। একটী পথ দুই দিনে যাওয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত সহজ। অপরটী এক দিনে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু খাস ঘাটী নামে ভীষণ খাড়া এক চড়াই আছে। তজ্জন্য যাত্রিগণ যাইবার সময় প্রথম পথে যায় ও শেষ পথটী দিয়া ফিরিয়া আসে। আসিবার সময় ঐ ওৎরাই করিতে আমাদের প্রায় ৪ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ঐ খাসঘাটীর পথে হত্যারা তলাও নামে এক যায়গা আছে। কোন সময়ে এক দল বৈরাগী শঙ্খধ্বনি ও উচ্চৈঃস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বরফের পাহাড় ভাঙ্গিয়া উহাদের উপর পড়িয়া উহারা মারা যায়। এই জন্য উহার নাম হত্যারা তলাও হইয়াছে।

আমরা প্রথমোক্ত পথটী ধরিয়া চলিলাম। ইহাতেও দুইটি ভয়ানক চড়াই আছে। একটির নাম পিস্সুঘাটি। লাটি ভিন্ন চড়িতে বড় কষ্ট হয়। স্থানে স্থানে এত খাড়া যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দম লওয়া দুষ্কর। পথের দুই পার্শ্বে নানা রঙ্গের সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; এক প্রকার ফুলের এত তীব্র গন্ধ যে, পাণ্ডারা বলিতে লাগিল, কোন কোন সময়ে তীব্র গন্ধে যাত্রীদিগের মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য মুখে আমসি কি নেবুর আচার রাখিতে হয়। আমরা কাহাকেও মূর্চ্ছা যাইতে দেখি নাই। বোধ হয়, অত্যন্ত চড়াই করিয়া মুখ শুকাইয়া যাইলে কোন প্রকার অম্ল দ্রব্য মুখে রাখিলে কতকটা পিপাসা শান্তি হয়। এই দুইটি চড়াই এর পর ছোট কাঁটা গাছ ব্যতীত বড় বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কাষ্ঠের ভারী কষ্ট। কাঁটা গাছ জ্বালাইয়া কাষ সারিতে হয়। তসীলদারের কুলিরা যাত্রীদিগের জন্য কাষ্ঠ লইয়া যায়, কিন্তু হাজার যাত্রীর জন্য কাষ্ঠ যোগাড় করা সহজ ব্যাপার নয়। এবার শ্রীনগরে বরফ পড়ে নাই, তজ্জন্য ঠাণ্ডা কম ছিল এবং পাহল গামের পর হইতে বৃষ্টিও হয় নাই, তজ্জন্য রাস্তায় কাদা হয় নাই। একে এই চড়াই, তার উপর কাদা হইয়া রাস্তা খারাপ হইলে যাত্রীদিগের কষ্টের অবধি থাকিত না। শুনা যায়, সাধারণতঃ চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত বরফ থাকে। চন্দন বাড়ী হইতে ১০।১১ মাইল চলিবার পর পথ হইতে প্রায় ৫০০ ফিট নীচে শেষনাগ নামে সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইলাম। এই স্থান হইতে লিডার নদী উৎপন্ন হইয়াছে। একটি পথ দিয়া যাত্রিগণ স্নান করিতে যাইতেছে ও অপর দিকে আর একটি পথ দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। এই স্থানের তিন দিকে

যে সব পাহাড় দেখা যাইতেছিল, সে সমুদয়ই বরফে আচ্ছন্ন। এই স্থান হইতে ২ মাইল দূরে বায়ুবর্জ্জম নামে পড়াও। সেই স্থানে আজ যাত্রীদিগকে থাকিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র নদী পাইয়া প্রায় ১২ টার সময় আমরা গন্তব্য স্থানে পেঁছিলাম। আজ চড়াই করিয়া যাত্রিগণ একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উপস্থিত হইয়াই দোকান হইতে গরম গরম পুরী কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল।

এখানে বৃক্ষাদির নামগন্ধও নাই। আজ ত্রয়োদশীর চন্দ্রকিরণ তুষার-শুভ্র পর্ব্বতের উপর পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ নদীর আর সে শব্দ নাই। আমাদের অনেক নীচে নদী ছাড়াইয়া আসিয়াছি।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রীদিগকে কতকগুলি বেগবতী নদী পার হইতে হইয়াছিল। কেহ বা কুলীপৃষ্ঠে কেহ বা জলের যেখানে অল্প স্রোত, সেখানে পার হইতেছিল। যাইতে যাইতে রাস্তার আশে পাশে বরফ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। প্রকৃতি দেবীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছিল। আমরা কখন বরফের উপর গিয়া দাঁড়াইতেছিলাম, কখন বা পথ হইতে খুব নীচে নদীর ধার দিয়া যাইতেছিলাম। স্থানে স্থানে জলের উপর কাচের ন্যায় জমিয়া গিয়াছে দেখিতেছিলাম। তাহার উপর আবার কত কায করা। স্বভাব শিল্পে প্রভেদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দূর হইতে অমরনাথ পাহাড়ের তুষারধবলিত চূড়া দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা দূর হইতে উচ্চ ভূমির উপর তাঁবু পড়িয়াছে, দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে সমতল উপত্যকায় ৪টি ছোট ও একটি বড় নদী। যাত্রিগণ এই ৫টী নদীতে স্নান করিতেছে। এই ৫টি নদী হইতে ইহার নাম পঞ্চতরঙ্গিণী বা পঞ্চতরণী হইয়াছে।

এই আমাদের শেষ পড়াও। প্রায় ১২ টার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পেঁছিলাম ও স্নানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এ স্থানটির দৃশ্য অতি মনোহর। সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে নদী, তিন দিকে বরফের পাহাড়। এ কয়েক দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। আজ বৈকালে হঠাৎ মেঘ করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং পাহাড়ের উপর বরফ পড়িতে লাগিল। পাণ্ডাগণ ও যাত্রিগণ সকলে বাবা অমরনাথকে স্মরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় আমরা তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব

দিক হইতে পাহাড়ের অন্তরালে চন্দ্র উঠিতেছে। একটি পাহাড়ের শৃঙ্গ দেশ হইতে যখন চন্দ্র বাহির হইল, সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য না দেখিলে লিখিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আমার ঠিক মনে হইতে লাগিল, 'শশধর তিলক ভালে গঙ্গা জটা মাঝে,' তুষারধবলিত পাহাড় যেন মহাদেব, আর তাঁহার ভালে শশীশিশু খেলা করিতেছে। যেন সাক্ষাৎ অমরনাথ দর্শন করিলাম। অন্যান্য বন্ধুগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন।

এখান হইতে অমরনাথ গুহায় যাইবার ৩টি পথ আছে। একটি পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া তসীলদার হুকুম দিয়াছিল, সে পথে যেন কেহ না যায়। ২য়টীতে নদীর ধার দিয়া কিছুদূর গিয়া একটী চড়াই ও ওৎরাই করিয়া নদীর ধারে পৌঁছান যায়। নীচে নদী চলিতেছে, কিন্তু উপরে বরফ অত্যন্ত কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়াছে। উহার উপর দিয়া প্রায় ১মাইল যাইয়া অমরনাথ গুহায় পৌঁছান যায়। অনেকে এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন। এ পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা ৩য় পথ দিয়া যাইয়া এই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। ২য় পথটি প্রায় ৭।৮ মাইল হইবে। আজ ৩রা ভাদ্র পূর্ণিমা—দর্শনের দিন। ছড়ী প্রায় রাত্রি ৩টার সময় ৩য় পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরাও প্রত্যুষে ঐ পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রথম ৪মাইল একেবারে খাড়া চড়াই, একবার পা পিছলাইলে নিঃসন্দেহ মৃত্যু। ইহাকে ভৈরব ঘাটির চড়াই কহে। মাঝে মাঝে বরফের উপর দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইতেছিল। একটি ২৫।৩০ ফিট উচ্চ পাহাড়কে ভৈরব কহে। সেখান হইতে অমরনাথ গুহা দেখা যায়। এস্থান হইতে উত্তর দিকে সাদা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এখান হইতে ৪মাইল ওৎরাই করিয়া আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব। যাহারা পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল, এত উচ্চ হইতে তাহাদিগকে পিপীলিকার ন্যায় দেখাইতেছিল। এই ওৎরাই অতি ভীষণ, স্থানে স্থানে বসিয়া নামিতে হয়। এক এক জন বৃদ্ধাকে ৩।৪ জন কুলি বুকে বাঁধিয়া পশ্চাৎ হইতে টানিয়া আছে, বৃদ্ধা সম্মুখে ভর দিয়া যাইতেছে। মধ্যে পাহাড়ের একটী গর্ত্তের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, উহাকে গর্ভযোনি কহে। আমরা যত নীচে নামিতে লাগিলাম, পথ তত ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। এক এক স্থানে কেবল পা রাখিবার যায়গা আছে মাত্র। এক জনের ঘটি পড়িয়া

যাওয়াতে গড়াইয়া একেবারে বরফের নদীর উপর পড়িল। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাত্রিগণ অমরগঙ্গায় স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি * লেপন করত বম বম শব্দে গুহার ভিতর দেবদর্শনে যাইতেছে। সে ব্যাকুলতা, সে আগ্রহ, সে আনন্দে বিহ্বল ভাব, শত শত লোকের মুখে বমবম রব এবং গুহার ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি না শুনিলে বা না দেখিলে বুঝা যায় না। সেই অমরগঙ্গাজলে স্নানপূত হইয়া শুভ্র বিভূতি গাত্রে লেপন করাতে যেন বোধ হইতে লাগিল, অমরধামে অমরনাথ আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বহুরূপে প্রকাশিত করিয়া বম বম রবে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই সময় একটু বৃষ্টি হওয়াতে মনে হইতে লাগিল, যেন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্প বরিষণ করিতেছেন।

আমরা গঙ্গা জলে স্নান করিয়া অমরনাথ দর্শনাভিলাষে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ গুহার মুখ প্রায় ৪০।৫০ ফিট উচ্চ এবং ২০।২৫ ফিট বিস্তৃত হইবে। গুহাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫।৩৬ ফিট হইবে। উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘুঘুর ন্যায় এক প্রকার পক্ষী উড়িয়া গেল। যাত্রিগণ দেখিয়া আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহাই অমরনাথ দর্শন ও তাঁহার কৃপা দৃষ্টির রাহুনিদর্শন বলিয়া পাণ্ডাগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। গুহার ভিতর পূর্ব্বে উলঙ্গ যাইবার নিয়ম ছিল। এখনও ভূর্জ্জ পত্রের কৌপীন পরিয়া অনেকে যায়। উপরে খিলানের ন্যায় এবং তিন পাশে সোজা পাহাড় তিন দিকে দেয়ালের কার্য্য করিতেছে। গুহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে স্বয়ম্ভু অমরনাথ বিরাজিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়াল কতকটা জুড়িয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যস্থলে কোণে উপরে ঠিক বরফের শিব লিঙ্গের ন্যায়। তাঁহার পার্শ্বে উত্তর দিকে একটী বরফের বেদীর ন্যায় রহিয়াছে, উহাকে পাণ্ডারা গণেশ বলে এবং তাহার পর উত্তর পশ্চিম কোণে বরফের স্তম্ভের ন্যায় রহিয়াছে। উহাকে পাণ্ডাগণ ভগবতী বলে।

ভক্তগণ ভক্তিভরে পূজা, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে Stalagmite † বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ভক্তের চক্ষু স্বতন্ত্র,

---

* এই পাহাড়টী খড়ির পাহাড়। যাত্রিগণ একটু পাহাড় ভাঙ্গিয়া লইয়া গাত্রে মাখিতেছে।

† খড়িমাটির পাহাড়ে জলের সহিত খড়িমাটি মিশ্রিত থাকে। গুহার মেজেতে জলের সহিত খড়িমাটি জমিয়া জ্যামিতির কোণের (Cone) এর ন্যায় হয়। উহাকে Stalagmite কহে।

ভক্তের ভাব ও হৃদয় স্বতন্ত্র। শুনা যায়, কোন ব্যক্তি পুঁইশাক ভাবিয়া জগন্নাথে যাইয়া পুঁইশাক দেখিয়াছিল। সত্য বটে, সর্ব্বস্থানে বায়ু আছে, কিন্তু পাখা নাড়িলে যেরূপ বায়ুর বিশেষ প্রকাশ হয়, সেইরূপ বহুকাল হইতে হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী ভক্তগণ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য এস্থানেও ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। বাস্তবিক গুহার ভিতর যাইলে এবং সেই হাজার হাজার যাত্রীর আগ্রহ ও ভক্তিভাবে পূজা সন্দর্শন করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্বভাব ও আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়। বর্ত্তমান লেখকেরও সে অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় হৃদয় হইতে কেবল একটি গীত উঠিতেছিল,—

"এ কি এ সুন্দর শোভা—
বল ওহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী
কি ধন তোমারে দিব উপহার
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি কি বলিব
যাহা কিছু আছে মম সকলই লওহে নাথ।"

প্রকাশানন্দ

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কনখল,
৩০ শে মার্চ্চ, ১৯০৩।

আজ হরিদ্বারের ৪ মাইল উত্তরস্থ "সপ্তস্রোত" হইতে আরম্ভ হইয়া উহার ২ মাইল দক্ষিণে কনখল, এবং গঙ্গাবক্ষে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ গৈরিকবসনধারীতে পরিপূরিত হইয়া যেন হাসিতেছে! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এরূপ দৃশ্য, নানা পন্থের এত সাধু একসঙ্গে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এ সব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারত এখনও ধর্ম্মশূন্য হয় নাই। যে ধর্ম্মাগ্নি অতিপূর্ব্বে সাধু মহাত্মাদের দ্বারা এ দেশে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সে অগ্নি এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। যাঁহারা বলেন

যে, ভারতে ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, তাঁহারা যদি একবার এই মেলা দেখিতেন ও প্রত্যেক পন্থীর সেই গূঢ় মূল মন্ত্র জানিতেন, যাহার বলে এই সব পন্থীরা বলীয়ান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচারে রত, তাহা হইলে কদাচ তাঁহাদের মুখ হইতে এইরূপ নাস্তিকতাময় শব্দ বিনিঃসৃত হইত না।

এই কুম্ভমেলা ৩টী স্নানের দিনে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমটী শিব-রাত্রির দিনে হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে কয়েকটী নাগা সম্প্রদায় ব্যতীত উদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা আসিয়া পৌছেন নাই। আরও উক্ত দিবস তত যোগের দিন ছিল না। অতএব কেবল মাত্র নাগারাই স্নান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টী ১৪ই চৈত্র ইংরাজী ২৮শে মার্চ্চ অমাবস্যার দিন। এই অমাবস্যার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই আসিয়া গিয়াছিলেন—কেবল মাত্র ১২০০ বৈরাগী আসিবার কথা ছিল, তাহার মধ্যে ২০০ মাত্র আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। আরও এই দিবস প্রথম দিবসাপেক্ষা অধিক যোগের দিবস ছিল। অমাবস্যার পূর্ব্ব দিবস বৈকালে ইংরাজ সরকার হইতে হুকুম প্রচার হইল যে, যাঁহারা কল্য হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে চাহেন, সকলেই প্রাতে ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে যেন স্নান করেন। ইহার পর হইতে সব জমায়ৎ স্নান করিবেন। অতএব বাহিরের অপর কাহাকেও উক্ত ৯ ঘটিকার পরে স্নান করিতে দেওয়া যাইবে না।

রাত্রি ৪টা বাজিল, বসন্ত কালের প্রাতঃ সমীরণ বহিতে আরম্ভ হইল। ওদিকে প্রত্যেক আখাড়ায় অতি মনোহর সুরে প্রাতর্বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। এ সময় অন্ধকার সত্ত্বেও মেলাভূমি জনস্রোতের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যাত্রীরা ও স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলে অতি ব্যগ্রতা সহকারে শীঘ্র স্নান করিতে যাইতেছেন, কেহ বা চিন্তাশূন্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন। এইরূপে ক্রমে বেলা ৯টা বাজিল। প্রথমে "নিরঞ্জনী" ও তাঁহাদের সঙ্গে জুনারা স্নান করিবেন। অতএব তাঁহারা সজ্জিত হইতে লাগিলেন। "নিরঞ্জনী" আখাড়ার বিশেষ অনুরোধ যে, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে স্নানে যাই, অতএব আমরাও এই সময়ে আখাড়ায় গেলাম। যে প্রকারে জমায়ৎ আসিয়াছিল, সেই প্রকারেই অর্থাৎ প্রথমে উষ্ট্র আরোহী সাধু বাদ্যকার, তৎপরে ইংরাজী বাদ্য ও হস্তী এবং আসাসোঁটা লইয়া ভাণ্ডারিগণ, ক্রমে লাঠীখেলওয়াড়েরা, "গুরু

মহারাজকী ভেলা” ও পাল্কী, ডাণ্ডী এবং বিভূতিভূষিত নগ্ন সাধুগণ “হর হর” “হর গঙ্গে” ইত্যাদি গগনভেদী শব্দ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তহ-সীলদার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী কেহ বা তলবার লইয়া কেহ বা লাঠী হস্তে চলিলেন। প্রথমে পুল দ্বারা দ্বীপে পেঁছান গেল। ক্রমে উত্তরা-ভিমুখে ১।৷০ মাইল চলিয়া অপর একটী পুল। এই পুল পার হইয়া হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে আসিতে হইবে। এই পুলের উপর সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইল, আখাড়ার এবং আখাড়ার জানিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ আছেন কি না। ক্রমে পুল পার হইয়া পুনরায় হরিদ্বারে আসা গেল। ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া প্রথমে “কার্ত্তিক” স্বামী (নিরঞ্জনীদিগের ইষ্টমূর্ত্তি) ও “গণপতি” (জুনাদিগের ইষ্টমূর্ত্তি) এবং উভয় সম্প্রদায়ের “গুরু মহারাজকী ভেলার” স্নান হইল। তৎপরে সাধুগণ স্নান করিলেন। স্নান হইয়া গেলে অপর একটী পুল দিয়া দ্বীপে এবং পুনরায় প্রথম পুল দিয়া আখাড়ায় প্রত্যাগমন হইল। এইবার নির্ব্বাণী ও ইহার সঙ্গে অটল আখাড়ার স্নান। ইঁহারাও নিরঞ্জনীদের ন্যায় বাদ্যাদি সহকারে দ্বীপ হইয়া যাইলেন। ইঁহাদের প্রথমে “কপিল মুনি” (নির্ব্বাণীদের ইষ্ট মূর্ত্তি) ও “দত্তাত্রেয়” (অটল আখাড়ার ইষ্টমূর্ত্তি) এবং উভয় আখাড়ার “গুরু মহারাজকী ভেলার” স্নান হইলে পরে নগ্ন সাধুগণের স্নান হইল। ইঁহারাও প্রত্যাগমন করিলে বৈরাগীরা আসিলেন। তাঁহাদের স্নান হইলে উদাসী (বড় আখাড়া) গুরু নানকের কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা লইয়া ক্রমে উদাসী (ছোট আখাড়া) তৎপরে নির্ম্মলা সন্ধ্যা ৫ টার সময় স্নান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ইতি সত্যকাম।

মান্দ্রাজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে লিখিতেছেন,

গত পরশ্ব এখানে পরমানন্দের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার দরিদ্রকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রায় ৬০০ জন ভক্ত ও বন্ধুবর্গ অতি আনন্দের সহিত সমস্ত দিন ধরিয়া পরিবেশন, সংকীর্ত্তন, সাদর সম্ভাষণ, প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি আমোদজনক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বেলা ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্মুখে সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ময়লাপুর (মান্দ্রাজের এক পাড়া) হইতে একদল ও ত্রিপ্লিকেন হইতে আর একদল সংকীর্ত্তন আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুরাগ ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য অনেক গায়ক আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মধুর গীত গাহিয়া স্ব স্ব গুণপণার পরিচয় দিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন ও দরিদ্র ভোজন হইতে লাগিল। এই প্রকার উৎসবে প্রায় বেলা তিনটা হইয়া গেল।

তৎপরে বেঙ্কটাচলম্ নামক একজন কথক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে সুন্দর কথা কহিতে লাগিলেন। জনতার পরিসীমা ছিল না। তাঁহার কথা ৬২টার সময় শেষ হইল। দরিদ্র ভোজনও সেই সময়ে শেষ হইল। পরে বেঙ্কটরঙ্গ রাও নামক একজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দররূপে সন্ন্যাসীর আবশক্যতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিগ্রহবান সনাতন ধর্ম্ম। পরে রাত্রি আট ঘটিকার সময় আরাত্রিক ও প্রসাদবিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হইল। জনতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধনী নাম্নী বীণবাদিকা বীণহস্তে উপস্থিত হইলেন এবং বীণা বাজাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, যে কয়জন সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রায় ১ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাড়া রাগ (যাহা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ শুনিতে ভাল বাসিতেন) বাজাইয়া তিনি সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বর্ষের ন্যায় আমরা এবারেও জ্যৈষ্ঠ মাসে ছুটি লইলাম। গ্রাহক মহাশয়গণ একেবারে আষাঢ় মাসের কাগজ প্রাপ্ত হইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

এই পত্রখানি মহীশুরের তদানীন্তন মহারাজকে লিখিত হইয়াছিল।

চিকাগো,

২৩শে জুন, ১৮৯৪।

মহারাজ,

শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। এখানে আসার পর আমাকে এদেশে সকলে বিশেষ রূপ জানিতে পারিয়াছে। আর এদেশের আতিথেয় ব্যক্তিবর্গ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য্য দেশ—এ এক অদ্ভুত জাতি। প্রথমতঃ, জগতের মধ্যে কল কারখানার উন্নতি বিষয়ে এ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানা প্রকার শক্তিকে যেমন কাযে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে—এখানে কেবল কল আর কল। আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা এক ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্য্য বিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিষই এখানে অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এখানে পরিশ্রমের মাহিনা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তার পর, আমেরিকান মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে

শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চ-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্য্যন্ত ইহাদের ভাল দিক্ বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ, মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে এদেশের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের ভিতর জোর ১ কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল খাওয়া দাওয়া ও টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানেরা বলে, সর্ব্বশক্তি-মান ডলার এখানে সব করিতে পারে ; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নাই। নিগ্রোদের (যাহারা অধিকাংশ দক্ষিণবিভাগে বাস করে) উপর তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে ইহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যত আইন কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রাখিয়া চলে, আর কোন দেশেই তত নয়।

মোটের উপর, আমাদের দরিদ্র হিন্দু লোক এই পাশ্চাত্যগণ হইতে অধিক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম্ম হয় ভণ্ডামী না হয় গোঁড়ামী। পণ্ডিতেরা নাস্তিক আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্ম্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তা রাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান ধর্ম্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছেন, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের শূন্য হইতে সৃষ্টির মতে, আত্মা সৃষ্ট পদার্থ এই মতে, আর—স্বর্গনামক স্থানে সিংহা-সনে উপবিষ্ট একজন মহাক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্বরের মতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মার অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশ সকল কোন না

কোন আকারে গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান হইবেন আর ঈশ্বরকে প্রকৃতিরই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এক্ষণে ইহাদের সকল বিদ্বান পুরোহিতগণই এই ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরো ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন আর আমাদের আরো ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জন সাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর আমাদের—দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সর্ব্বসাধারণ এবং রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতগণ, বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে যে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহার ফলস্বরূপ আপনা আপনিই আসিবে। আমাদের কেবল উপাদানগুলি জোগান দরকার, সেইগুলি মিলিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইবে—আপনা আপনি, প্রকৃতির নিয়মে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া; বাকি যা কিছু, তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাযটী করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে

আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেই জন্য আমি এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই, মনে করুন, মহারাজ গ্রামে গ্রামে গরিবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবেনা, কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাঁহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে অথবা অন্য কোন রূপে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে, সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, * সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকেও সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যা সমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটী গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তার পর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট করা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক এইরূপ মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটী দলগঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এই জন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়,

* প্রবাদ আছে, মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি পর্ব্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্ব্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে। তদবধি ইহা একটী প্রবাদ বাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উঃ সঃ

টাকা নাই। একটী চক্রকে গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট। এক বার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। এখন আমি মহারাজের সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকানদের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। কেনই বা থাকিবে? আমাদের দেশের লোকেই যখন কিছুই ভাবে না, কেবল নিজেদের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত!

হে মহামনা রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধনমান ঐশ্বর্য্য এ সকলি ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহৎ, উচ্চমনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ইহাকে আবার ইহার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে চিরকালের জন্য জগতের লোক আপনার সুনাম গাহিবে ও আপনাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ।

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়।

(গত ২৯শে পৌষ বালি হরিসভায় স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি প্রকৃত ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই।" যখনই ভক্তি ও জ্ঞান

শিক্ষার জন্য আচার্য্যের প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি আচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই যথার্থ গুরু এবং জগৎও তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ ফুটাইয়া দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগৎরূপে বিরাজিত, স্থাবর, জঙ্গম, যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই তাঁহার প্রতিকৃতি; অন্যভাবে তিনিই সমস্ত জীবজন্তুতে চৈতন্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। আবার প্রকৃত ধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপন করিবার জন্য তিনিই জগদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি মনুষ্য শরীরে মায়ার অধীশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবশ জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন। যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন হইলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই। তিনিই প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়া বহুভাব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই ভারতবর্ষ সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ ছিল। যখনই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি হাত ধরিয়া এই ভারতবর্ষকে তুলিয়াছেন। সেই জন্যই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে কত কত ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সেই জন্য আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত ধর্ম্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মেতেই আমাদের উন্নতি। আমাদের দেশ ধর্ম্মগতপ্রাণ, ধর্ম্মেতেই যেন বাঁচিয়া আছে। এখানে নিত্য ক্রিয়া শৌচাদি হইতে বিবাহ পদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক নিয়ম সকলও ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করিতে পারি আর নাই পারি, আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহার, চাল চলন সমস্তই যে ধর্ম্মলাভের জন্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অবশ্য অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হইয়াছে। অন্যান্য দেশ রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঐহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, ধর্ম্ম বলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারই সূচনা স্বরূপ আজকাল চতুর্দ্দিকে নামে রুচি,

সাধন ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাইতেছি। চতুর্দ্দিকেই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জ্ঞান বলিলেই লোকে কিম্ভূতকিমাকার ভাবিত, জ্ঞানী বলিলেই নাস্তিক ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষে চাহিত। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিলে ভক্ত কাণে হাত দিত। আবার জ্ঞানীও ভক্তকে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উড়াইয়া দিত। এইরূপে বহুকাল ধরিয়া ভক্তি ও জ্ঞান পথের সাধকদিগের ভিতর এইরূপ বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক, তাঁহাদের মধ্যে এ ভাবের বিরোধ কোনও কালে ছিল না।

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে শিবের চেলা ভূত ও রামের চেলা বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তার পরে শিব ও রামের মিলন হইল, উভয়ে একপ্রাণ, এক আত্মা হইলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামিল না। আচার্য্যগণের কোন বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহদের অনুবর্ত্তিগণ চিরকালই বিবাদ করিয়া মরিতেছে। আজকাল বোধ হয়, সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমেই কমিতেছে। সে হাওয়া যেন ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছে। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ভাবই এক ভগবান হইতে প্রসূত। এই চারিটি পথ অবলম্বন করিয়াই মানবের ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, সর্ব্বত্রই যেন লোকের এই ভাব, এই ধারণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্তে বাস্তবিক বিরোধ নাই। শাস্ত্রপাঠে দেখিতে পাই, পূর্ব্বে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্য হইতে নির্ম্মল ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া জগৎকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছে। আবার যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই জ্ঞানের আলোক বিস্তারে মানবকে সমদৃষ্টির পথে অগ্রসর করিয়াছেন। এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না এবং যদি থাকে, তবে কোথায় আছে, ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। শিবাবতার জ্ঞানাচার্য্য গুরু শঙ্কর প্রণীত গ্রন্থ পাঠে আমরা কি দেখিতে পাই? তৎপ্রণীত গঙ্গা, শিব, অন্নপূর্ণা ও বিষ্ণুর স্তব পাঠ করিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি ভক্তিশূন্য কঠোর জ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন? শারীরক ভাষ্য ও তৎপ্রণীত অশেষ দেবদেবীর স্তবাদি পাঠ করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সেই রূপ ভক্তাবতার আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যেও আবার অদ্বৈত জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তিনি জ্ঞানের বিরোধী হইবেন, তবে কেন তিনি পূজ্যপাদ কেশব ভারতীর নিকটে স্বয়ং সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন? উভয় পথের আচার্য্যদের জীবনে ও শিক্ষায় তো কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ কথায় ও বাক্যবিন্যাসে। বিরোধ অনুবর্ত্তীদের স্বার্থ পরিচালনে। ভক্তি ও জ্ঞানের চরম লক্ষ্য একই। একই লক্ষ্যে উপনীত হইবার ভিন্ন দুইটি পন্থা মাত্র। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই উদ্দেশ্য কাঁচা "আমি-ত্বের" বিনাশ করা। যে 'আমি' সংসার ও বিষয় বাসনায় জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই তুচ্ছ মিথ্যা আমিত্বের স্থানে শ্রীভগবানের দাস বা তাঁহার অংশ আমি, এই মহান্ আমিত্বের বিকাশ করা। ভক্তি ও জ্ঞান এই কাঁচা আমি বিনাশ করিবার দুটী উপায় মাত্র। ভক্ত চান, তাঁহার সমস্ত ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করিতে। সমস্ত কার্য্য ও চিন্তা, অর্থ স্ত্রী বা পুত্র, আপনার বলিতে তাঁহার যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার নয়, ভগবানের—এই ভাবটি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে প্রাণে রাখা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীর-ধারণোপযোগী আহারাদি ব্যাপারও ভক্ত নিজের জন্য না করিয়া ভগ-বানের সেবার জন্য করেন। জীবনধারণও তাঁহার প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নয়। ভক্ত চান, আমিত্বকে তুমিত্ব রূপ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে। আমি অমুকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমান প্রসূত আমিত্বকে ঠাকুরের পাদপদ্মে চিরকালের মত ফেলিয়া দিয়া বিশ্বতোমুখ ভগবানের সেবা করিতে। ভক্তের চক্ষে তাঁহার প্রিয়তমই জড় চেতন নানারূপে খেলা করিতেছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই কুমার কুমারী, তিনিই দাসদাসী, সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত পদ চক্ষুঃ। এ সংসার তাঁহারই মূর্ত্তি এই জ্ঞানে যথার্থ ভক্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি রূপে বিরাজিত তাঁহার আরাধ্য প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ভক্তের বাঁচিয়া থাকা সেবার জন্য। কিছুতেই আসক্তি নাই। স্বার্থপরতা চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে। মরণেও আপত্তি বা কষ্ট নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়া ভক্ত ইহ জীবনেই

সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভক্তির আচার্য্য নারদ ঋষি ভক্তি-সূত্রে ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন, 'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'—'ভগবানে যে ঐকান্তিক প্রেমভাব, তারই নাম ভক্তি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ঐ রকম ভক্তের কথা বলিয়াছেন, যথা, 'আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।' যে রোগে বিপদে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে, নিতান্ত নিরাশ্রয়, সে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ইহারই নাম আর্ত্তভক্তি।

মনে নানাপ্রকার সন্দেহ আসিয়াছে। এই জগতের কেহ কর্ত্তা আছেন কিনা, এই শরীরই বা কোথা হইতে হইল, কেনই বা জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে, কে করিতেছে, ইহার কারণ কি, এই সকল জানিবার জন্য প্রাণে বিশেষ আগ্রহ, বিষয়সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ আর ভাল লাগে না; কোন সৎপুরুষ বা জ্ঞানী পুরুষ দেখিলেই জিজ্ঞাসার জন্য ছুটিয়া তাঁহার কাছে যায়, এই সব তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলভাবে নির্জ্জনে চিন্তা করে; এই সব লক্ষণ হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায়।

তৃতীয় অর্থার্থী। বিশেষ কোন কামনায় প্রাণ ব্যাকুল, আবার তৎকামনা পূরণের নিজের শক্তিও নাই, এজন্য যে ভগবানকে উপাসনা করে, সে অর্থার্থী ভক্ত। চতুর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলিয়াছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহম্ স চ মম প্রিয়ঃ"—"সর্ব্বদা যাঁহার মন ভগবানে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" জ্ঞানীর মন সর্ব্বদাই কামকাঞ্চন, বিষয়ানুরাগ, শরীরানুরাগ প্রভৃতির পারে বর্ত্তমান। জ্ঞানীর সম্বন্ধে একভক্তি বিশেষণ এই নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। অবিশ্রান্ত নদীর স্রোতের ন্যায় একভক্তির বিরাম নাই, সর্ব্বদা ভগবৎপাদপদ্মে প্রবাহিত। একভক্তির বিশেষ লক্ষণ দেবীগীতায় সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পাত্র হইতে পাত্রান্তরে তৈল ঢালিলে যেমন অখণ্ডিত ঘনধারে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এক প্রকার ভক্তিধারা বিষয়বায়ুতাড়িত হইয়া কখন খণ্ডিত বা তরঙ্গায়িত হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ"—"সমস্তই ভগবানময় এইরূপ যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্মাই জ্ঞানী, এই প্রকার লোক অতি দুর্ল্লভ।" এই প্রকার জ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র আমিত্ব চির-

কালের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, "আমি সকলের অন্তরে বাহিরে, আমি সকলের সাক্ষিস্বরূপ, আমারই শক্তিতে মনবুদ্ধি ক্রিয়াশীল, আমিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষি-স্বরূপ, আমি সর্ব্বভূতে আছি ও সর্ব্বভূত আমাতে আছে।" এইরূপ জ্ঞান অনেক সাধনা ও চেষ্টার ফলে উপস্থিত হয়। এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে ভগবানে টান হওয়া দরকার; যেমন বিষয়ীর বিষয়ে, সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে টান, সেই রকম টান হওয়া চাই। যেমন মাতাল মদে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"; বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে যেমন তাহাতে অত্যাসক্তি আসিয়া জীবকে ধীরে ধীরে বিনাশের পথে লইয়া যায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ আসক্তির দরকার, ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ঐরূপ আসক্তি উপস্থিত হইলে মানব বিনষ্ট না হইয়া মুক্তির দিকে সত্বর অগ্রসর হয়।

প্রথমতঃ, যাঁহারা ভক্ত, ভগবৎপ্রেম যাঁহাদের জীবনকে পবিত্র করিয়াছে, তাঁহাদের অপূর্ব্বভাব দেখিয়া সাধারণ মানবের মন আকৃষ্ট হইয়া সেইরূপ হওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়। বিষয়ে যেমন আসক্তি হয়, ইহাও সেই প্রকার আসক্তি। প্রভেদ এই, ইহা উচ্চ বিষয় অবলম্বনে হওয়াতে ভগবানের দিকে লইয়া যায়। সেই হেতু দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, কামাদি রিপু তত দিন, যতদিন উহারা রূপ রসাদি বিষয়ালম্বনে মনে উদিত হয়, কিন্তু একবার উহাদের মোড় ফিরাইয়া দিতে পারিলে উহারাই ভগবান লাভের সহায় হয়। কোন কামনা পূরণ করার জন্য লোকে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে ডাকে। কেন না, তাঁহাতেই সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি বর্ত্তমান। সকাম মনে ডাকিতে ডাকিতে মানব যখন একবার তাঁহাকে ভালবেসে ফেলে, তখন আর তাহার পালাবার পথ থাকে না। সকাম ভালবাসা হইতেই ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নিষ্কাম প্রেম হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শাণ্ডিল্য ঋষি এই প্রেমের লক্ষণ করিয়াছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে,"—"ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ, তাহাই প্রেম, তাহাই পরাভক্তি।" ভক্তরাজ প্রহ্লাদও একস্থলে বলিয়াছেন, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু"॥—"হে ভগবান, বিষয়ীর

বিষয়ে যেমন টান, তোমাতে আমার যেন তদ্রূপ টান হয়। মনে হয়, যেন প্রহ্লাদ অতি সামান্য কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখিলে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। সাংসারিক ভাব হইতে উচ্চ কল্পনা সাধারণ মানবের আসে না। সংসারে পিতা মাতাকে, বন্ধুকে ও স্বামী প্রভৃতিকে যেমন ভালবাসা যায়, তেমন ভালবাসা বা মনের টান ভগবানে হইলে ভগবান লাভ অতি সন্নিকট হয়।

বৈষ্ণবগণ এই জন্য ভক্তির পাঁচ ভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে এক একটী পার্থিব সম্বন্ধ অতি মধুর বলিয়া উপলব্ধ হয়। মহাভারতে দেখিতে পাই, ভীষ্ম, উদ্ধব, বিদুর, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নানালোকে এক শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেছেন। কিন্তু সকলে তাঁহার সহিত একই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। বিদুরের দাস্যভাব, অর্জ্জুনের সখ্যভাব। ভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক একজন আবার এক এক কর্ম্মে নিযুক্ত। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার পাদুকা লইয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতে চলিলেন। বিদুর নানারূপে সেবা ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরে পরমহংস-পরবীলব্ধ অদ্বৈত জ্ঞানে শরীর ত্যাগ করিলেন, অর্জ্জুন আবার সেই গীতোক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অলৌকিক উদ্যমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীদের আবার অন্য ভাব। শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা গৃহকর্ম্ম, স্বামী, পুত্র, কন্যা, এমন কি, তাঁহাদের দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। একজন গোপিকা তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। ফল এই হইল যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া সমাধিতে শরীর পরিত্যাগ করিলেন। একথা ভাগবতে লিপিবদ্ধ। আবার রাসলীলার কথা মনে হইলে এই তন্ময়ত্বের ভাব আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হন, তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে এমন তন্ময় হন যে, আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" এই ভাবে ভগবানের লীলানুকরণ করিয়াছিলেন। ভক্তির চরমে এমন তন্ময় হয় যে, উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়। শ্রীমতী রাধাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখ"? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "নাসৌ রমণ, নাহম রমণী' আমি একেবারে ভুলি-

যাচ্ছি যে, আমি রমণী ও তিনি পুরুষ এবং আমার স্বামী এবং এই জন্ম আমি তাঁহাকে ভাল বাসি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম সাধারণ স্ত্রীর প্রেমের স্থায় শরীরানুরাগ বা গুণানুরাগ অবলম্বনে প্রবাহিত নয়। কিন্তু হেতুশূন্য হইয়া স্বতঃই সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকে"। আমরা দেখিলাম যে, ভক্তির চরমে দেহাত্মবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র আমিত্ব একেবারে চলিয়া যায়। এখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহা কতদূর সত্য, দেখা যাউক। জ্ঞানী বলেন, এই আমি ঠিক নয়, মায়া; তবে কোন্‌টী প্রকৃত আমি? প্রকৃত আমি শরীর, মন প্রভৃতি সকলের অতীত ও ইহাদের সাক্ষিস্বরূপ; সকল অবস্থায়ই একরূপে বর্ত্তমান, হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এই আমি সকলেতে, আমাদের এই ক্ষুদ্র আমি সেই মহান্ আমিত্বের অংশ মাত্র। সেই মহান্ আমিত্ব হইতে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের উদ্ভব। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য, এই মহান্ আমিত্বের সর্ব্বদা উপলব্ধি করা, এই ক্ষুদ্র আমিকে সেই মহান্ আমিত্বে ডুবাইয়া দেওয়া।

অতএব দেখা গেল, ভক্তের তন্ময়ত্ব ও জ্ঞানীর মহান্ আমিত্ব একই। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডুবাইতে চাহিতেছেন। হনুমান্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি কি ভাবে রামচন্দ্রকে উপাসনা কর"। তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "যখন আমার মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে নিবদ্ধ থাকে, তখন দেখি, তিনি প্রভু ও আমি তাঁহার দাস। যখন আপনাকে জীবাত্মা বলিয়া অনুভব করি, তখন দেখি, তিনি পূর্ণ ও আমি তাঁহার অংশ। তিনি সূর্য্য স্বরূপ এবং আমি সেই সূর্য্যের বহু কিরণের একটি মাত্র। আবার যখন আমার মন সমাধি অবলম্বনে সকল উপাধির বাহিরে যায়, তখন দেখি, তিনি ও আমি এক"। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, স্থূল শরীরে ও স্বার্থপরতার মধ্যে মন থাকিলে সোঽহং বলা নিরর্থক। জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিলে মানব আপনাকে ভগবানের অংশ মাত্র বলিয়া বোধ করিবে। আর যখন সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া মানব আপনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তখনই তাহার উপাস্যের সহিত অভিন্ন ভাব আসিবে।

মনের অবস্থাভেদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ও অদ্বৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্ম ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী এই তিন প্রকার মতই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। আমরা দেখিলাম, ভক্ত চায় সব ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ

করিতে, আর জ্ঞানীও বলেন, "মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে" আমিত্বই অজ্ঞান। অতএব উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল কথার প্রভেদ, লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ঠিক ভক্ত ও ঠিক জ্ঞানী কথায় ভুলে না। তাহারা চায় যথার্থ সত্য অনুভব করিতে। উত্তরগীতায় আছে, "মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈব হি। সারং তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং *পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥"—"সার বস্তু অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানকে* ছাড়িয়া পণ্ডিতগণ কেবল মাত্র বাগাড়ম্বর রূপ ঘোল খাইয়া থাকেন। জ্ঞানী পুরুষই দুগ্ধের সার বস্তু মাখনের ন্যায় শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া থাকেন।" উত্তর গীতায় এ সম্বন্ধে আর এক শ্লোক আছে।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

চন্দন কাষ্ঠের ভারবাহী গর্দ্দভ তার বহিয়াই মরে, চন্দনের গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। পণ্ডিতাভিমানীর এই দশা।

কার্য্যে না পরিণত করিলে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনা আর না শুনা উভয়ই সমান। সত্য অনুভব করিতে হইবে, জ্ঞান ও ভক্তি জীবনে পরিণত করিতে হইবে। উন্নত হইতে হইলে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ তিনটিরই প্রয়োজন। দুটি পাখা ও একটী পুচ্ছ না হইলে পাখী উড়িতে পারে না। এই রূপ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এ তিনটি না থাকিলে যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানবিচারবিবর্হিত ভক্তের মন কীর্ত্তনের সময় যেমন উচ্চে উঠিয়া থাকে, কীর্ত্তনান্তে তেমনি আবার বিষয়ের প্রলোভনে পড়িয়া যায়। বিচারবিবেকবিরহিত মনকে তখন ধরিয়া রাখা অসম্ভব। জ্ঞান, বিচার ও যোগই সে সময় সমতা রক্ষার সহায়ক। মনকে আয়ত্ত করিতে হইবে। সে শক্তিও আমাদের ভিতরেই আছে।

মন মুখ এক করাই এই বিষয়ের প্রধান সাধন। পরমহংসদেব বলিতেন, মন মুখ এক করার নামই প্রকৃত সাধন। যদি কেউ মন মুখ এক করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি কি তাহা পূর্ণ করিবেন না? ধ্রুবের গল্প স্মরণ কর। সে মন মুখ এক করিয়া বনে ভগবানকে ডাকিতেছিল। কোন সহায় ছিল না, এমন কি, গুরুর সহায়তা পর্য্যন্ত ছিল না। মন মুখ এক কোরেছিল, তাই ভগবান গুরু জুটিয়ে দিলেন ও তাকে দর্শন দিলেন। মন মুখ এক হইলে যাহা কিছু দরকার, তিনি এনে

দিবেন। গীতাতেও আমাদিগকে বলিতেছে, "মন মুখ এক কর"। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মনে মোহ ও ভয় আসিয়াছিল। মোহ—আত্মীয় স্বজনের জন্য, যাঁহারা যুদ্ধার্থী হইয়া কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। ভয়,—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, সমকক্ষ কর্ণ, শস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ, শিবপ্রদবরদর্পী জয়দ্রথকে বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া। ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সোজা নয়। মায়ার অপূর্ব্ব প্রভাব! অর্জ্জুনের ন্যায় মহাপুরুষেরও সাময়িক মোহ ও ভয় আসিয়াছিল। এই রূপ মোহ ও ভয় মানবের স্বাভাবিক। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভিতরে শোক, ভয় ও মোহের নিমিত্ত যুদ্ধ ত্যাগের সংকল্প ও মুখে ধর্ম্মের ভানে যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিবার কথা বলিয়াছিলেন। ভগবান অন্তর্যামী, তিনি বলিয়াছেন ;—

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।'

'তুমি পণ্ডিতদের মত, ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কথা বলিতেছ, আবার আত্মীয়স্বজনের জন্য শোক করিতেছ।' যথার্থ জ্ঞানী নিজের বা অপরের শরীর নাশেও শোক করেন না। তোমার কথায় ও কাজে মিল নাই। পরমহংসদেবও আমাদের ঐ কথা বলিতেন, "মন মুখ এক কর"। মন মুখ এক হইলে উন্নতি কে রোধ করে? এক সাধন প্রভাবে যাহা কিছু দরকার, আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্লোকটি এবং নিম্নোক্ত এই শ্লোকটি মনে রাখিয়া জীবনে পরিণত করিতে পারিলেই ধর্ম্মলাভের বাকী থাকে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

'মন মুখ এক করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর।' আর একটি কথা আমরা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি—সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান। পরমহংসদেব বলিতেন,—সংসারে ধনী লোকের বাটির চাকরাণীর মত থাকবি। চাকরাণী নিজের সন্তানের মত প্রভুর ছেলেদের মানুষ করে, কিন্তু জানে যে, যখন তাহাকে বিদায় দিবে, তখনই যাইতে হইবে। এই প্রকারে সংসারে থাক। স্ত্রী পুত্র তিনিই ন্যাস স্বরূপ তোমার কাছে রাখিয়াছেন। ন্যাস স্বরূপই বা কেন, তিনিই স্ত্রী পুত্র নানা মূর্ত্তিতে তোমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন। যাহা কিছু করিতেছ, তাঁহারই সেবা করিতেছ। কাঙ্গালীকে খাওয়াইতেছ, কি ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিতেছ, তিনিই ভিক্ষুক ও কাঙ্গালী রূপে তোমার সেবা নিতেছেন। এই ভাব মনে

রাখিয়া কায করিও। অহঙ্কার ত্যাগ কর। অহঙ্কারেই সর্ব্বনাশ। এই ভাব পেলে আর ভয় নাই, কিছুতেই আর বাঁধ্‌তে পারবে না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা, যেন এই ভাবটি সর্ব্বতোভাবে আমাদের সকলের মনে অদ্য হইতে উদিত থাকে।

ওঁ হরিঃ ওঁ। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

(স্বামী সারদানন্দ।)

হে পাঠক! জীবন ও মৃত্যুর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা লইয়া উদ্বোধন অনেকবার তোমাদের সম্মুখীন হইয়াছে। ধ্যাননিষ্ঠ ভারতের সৌম্যদর্শন ঋষি, অন্তর্দৃষ্টি-অণুবীক্ষণ-সহায়ে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারাদির পরিবর্ত্তনশীল আপাতভিন্ন স্তরসমূহ ভেদ করিয়া দেখিয়াছিলেন—আপনার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের একতা, বুঝিয়াছিলেন—এক হইতেই বহুর পরিণতি এবং সেই একেই উহার অন্তিম পর্য্যবসান, অনুভূতি করিয়াছিলেন—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অনন্ত দেহ এক বিরাট দেহের অন্তর্ভূত, একই ভাবে একই জীবনপ্রবাহে স্পন্দিত, একই প্রাণে অনুপ্রাণিত, একই নিয়মে গঠিত এবং অগ্নি ও বায়ুর ভিন্নাবস্থায় ভিন্ন প্রকাশের ন্যায় স্থূলে ভিন্ন প্রকাশ হইলেও এক কারণ-কেন্দ্র-প্রসূত অদ্বিতীয় বস্তুমাত্র। আজ ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের মতামত লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে অগ্রসর। বহুজনদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায়, বহুপথে উপনীত গ্রাম্য স্থানের ন্যায় ইহাতে ঐ বিষয়ের তত্ত্ব দৃঢ়তর প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। উদ্বোধনের আর এক উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত এবং জাতিগত সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া। একের উচ্ছেদে অপরাঙ্গের উন্নতি, অবনতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যক্তি-

বিশেষের সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়া কেবলমাত্র দক্ষিণ বাহুর পুষ্টি সাধন হইলে উহা উক্তব্যক্তির স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে গণিত না হইয়া রোগবিশেষ বলিয়া নির্ণীত হওয়া ও তদুপশমের নিমিত্ত চিকিৎসিত হওয়াই উপযুক্ত। ঐ প্রকার জাতিগত অঙ্গবিশেষের উন্নতি অপরাঙ্গের ব্যয়ে হইলে উহাও পরিত্যাজ্য বুঝিতে হইবে। এজন্যই শাস্ত্রকারের মুক্তিকাম পুরুষ ভিন্ন অপর সাধারণকে ধর্ম্ম অর্থ কাম তিনের দিকে যুগপৎদৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিবার উপদেশ। আবার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাযথ পুষ্টি জ্ঞানে—জ্ঞানে সত্য এবং সত্যেই ভগবান প্রতিষ্ঠিত।

গত দুই শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি ইউরোপের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অশেষ উন্নতির কারণ হইয়াছে। ইউরোপের সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার, যুদ্ধনীতি, স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিজ্ঞান সহায়ে। বিজ্ঞান আবার মোটে আর কিছুই নহে, কেবল বহুর এক হইতে পরিণতি এবং একের সহিত চিরসম্বন্ধে গ্রথিত এই তত্ত্বই মানব মনের বুঝিবার ও অনুভব করিবার ধারা মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মও তাহাই।

বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে হওয়ার পরিচয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। এমন কি, অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এদেশ হইতেই অন্যদেশে নীত হইয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সেকাল নাই। কয়েক শতাব্দী যাবৎ মোক্ষ'বিদ্যা ছাড়া অন্য সকল বিদ্যার চর্চ্চা ও উন্নতি ভারতগগন হইতে অন্তর্হিত।

কিন্তু আবার বায়ু ফিরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রিত ভারত পুনরায় সচেতন হইবে, লক্ষণে বোধ হইতেছে। মদোন্মত্ত মধুকৈটভ নাশের জন্য ব্রহ্মস্তবনপ্রসন্না ভগবতী নিদ্রাদেবী বিষ্ণুর শরীরাভ্যন্তর হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইলে বিষ্ণুশরীর যেমন জাগরিত হইয়া উৎসাহ উদ্যমে নিযুক্ত হইয়াছিল, ভারতশরীরেও বুঝি পুনরায় সেই লীলা হইবে; কিন্তু কাহার তপস্যায়, কাহার উপাসনা স্তুতি সহায়ে?

বিজ্ঞান জগতে আবার ভারত অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র বসু গত ২৭শে মার্চ্চ শুক্রবারে জমীদার-সমিতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আবিষ্কৃত সত্য প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়াছিলেন। আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ

বৈজ্ঞানিক কিরূপ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বলিয়াছিলেন।

সার জন বর্ডন সাণ্ডার্সন বিলাতের একজন খ্যাতনামা শরীর-তত্ত্ববিৎ। ১৯০১ খৃঃ ৬ই জুন তারিখে রয়েল সোসাইটি সমিতির সম্মুখে ইনিই জগদীশ বাবুর উদ্ভিজ্জ জীবনের প্রাণ প্রতিঘাত সম্বন্ধীয় আবিষ্কৃত তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহা একবারে অসম্ভব। বিলাতে তাঁহার কথার অনেক দর। কাজেই জগদীশ বাবুর আবিষ্কৃত তত্ত্ব উক্ত সভার সম্মুখে সত্য বলিয়া গৃহীত হইল না। লিনিয়ান সোসাইটি নামক অন্য বিজ্ঞান সমিতি উহার প্রথম গ্রহণ এবং প্রচার করিল, পরে বৈজ্ঞানিক জগতে উহা এরূপ সাদরে গৃহীত হয় যে, ঐ তত্ত্বের অনেক প্রধান বিরুদ্ধ প্রতিবাদীই কয়েক মাস পরে প্রমাণ প্রয়োগ সহায়ে ঐ বিষয়ে পুস্তক মুদ্রণ করেন।

সাধারণ মানবের স্থূল দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত,—চেতন ও জড় বা অচেতন ও সচেতন। বিজ্ঞানও অদ্যাবধি এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল এবং প্রত্যেক চেতন পদার্থই শরীর সম্বন্ধে অবস্থিত দেখিয়া চেতনের অন্য নাম দিয়াছিল শারীর। অতএব শারীর এবং জড় এই দুই শ্রেণীর পদার্থ। শারীর অবয়বের প্রত্যেক পরমাণুই চেতন এবং প্রত্যেকটি সমস্ত শরীরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। জড়ের অবয়ব ওরূপ সম্বন্ধে অবস্থিত না হইয়া কেবল কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অসম্বদ্ধ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। শারীর অবয়বের একাংশে আঘাত করিলে সমস্ত অবয়বই ব্যথিত হয়—জড়ের তাহা হয় না। আবার শারীর অবয়ব আঘাতের প্রতিঘাত দিয়া আপনার সপ্রাণত্ব প্রমাণিত করে; জড়, আঘাতের প্রতিঘাত দানে অসমর্থ। আলোক অন্ধকার, জীবন মৃত্যুর ন্যায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব এইরূপে শারীর জড়ের মধ্যে চির বর্ত্তমান এবং এই ভেদভিত্তির উপরেই মানবের জ্ঞানপ্রাসাদের গগনবিধৃত উচ্চশির অবস্থিত। অস্তিত্ব মাত্র সমান ধর্ম্ম ছাড়া জড়, শারীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। এক মাত্র বেদান্তই কেবল আপ্তপুরুষের উপলব্ধি রূপ উপনিষৎ সহায়ে স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষে প্রতিবাদ করিয়া এই ভেদভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সতত নিযুক্ত। সে কথা পরে বলিব।

পদার্থবিশেষ শারীর বা জড়, ইহা জানিতে হইলে উহা সপ্রাণ বা অপ্রাণ জানিতে পারিলেই হইল। দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র যতদিন না হস্তগত হয়, ততদিন মানবকে পদার্থনিচয়ের একটা মোটামুটি সপ্রাণতা অপ্রাণতার পরিচয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। পদার্থের জ্ঞানও তদ্রূপ অগ্রসর হইযাছিল। যাহা নড়ে চড়ে, নিশ্বাস ফেলে, তাহাই সপ্রাণ, বাকি সব অপ্রাণ বা জড। বিজ্ঞান বলিল, ওরূপ মোটামুটি বিভাগ করিলে চলিবেনা। তোমার স্থূলদৃষ্টি অনেক সময় অনেক পদার্থের সপ্রাণতা ধরিতে পারেনা। যন্ত্র সাহায্যে দেখ, অনেক পদার্থ যাহা এত দিন অপ্রাণ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা এখন সপ্রাণ শারীর পদার্থ বলিয়া তোমায় নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। এই সপ্রাণতা সিদ্ধ হইবার অনেক সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাণিবিশেষের সপ্রাণতা স্থির করিবার এক সাধারণোপায়,—তাহার নাড়ীস্পন্দন দৃষ্টি করা। এই স্পন্দন আবার সকল সময়ে একভাবে থাকেনা। মদ্য বা অন্য কোন উত্তেজক বস্তু পান করাইলে সেই স্পন্দন দ্রুত হইবে। অবসাদক পদার্থবিশেষ, যথা ক্লোরোফর্ম, ফেমিসিটিন প্রভৃতির প্রয়োগে আবার নাড়ীবেগ মন্দীভূত হইবে। মৃত্যু হইলে নাড়ীস্পন্দন একবারে নিরুদ্ধ হয়। এই প্রকারে নাড়ীস্পন্দন প্রাণিবিশেষের শারীরিক অবস্থানিচয় এবং তদুপরি অন্যান্য বহিঃপদার্থের আধিপত্য সম্বন্ধে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে। নিঃশ্বাস বায়ু সহায়ে হৃদয় যন্ত্রের উত্তেজনা এবং সমান্তরাল সঙ্কোচ ও প্রসার এই সমান্তরাল নাডী স্পন্দনের কারণ। এই নাডী স্পন্দন বা আঘাত খালি যে হস্তদ্বারাই অনুভূত হইতে পারে, এমন নহে, কিন্তু এই নাড়ীস্পন্দন আপন দৃঢ় বা লঘু আঘাতের অনুরূপ চিত্র স্বয়ং কাগজোপরি অঙ্কিত করিবে, এরূপ কৌশল করা যাইতে পারে। গল্প আছে, অবরোধনিরুদ্ধা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা নবাব বেগমদের জ্বরাদি হইলে একটা লম্বা সূতা বা দড়ির একপ্রান্ত অন্তঃপুরে তাহাদের হস্তে বাঁধিয়া দিয়া অপর প্রান্ত বহির্বাটিতে চিকিৎসকের হস্তে দেওয়া হইত। চিকিৎসক নাড়ীসংযুক্ত সেই দড়ির স্পন্দনেই রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিতেন। অসম্ভব গল্প-কথা বুদ্ধিবলে সত্য করা যাইতে পারে, ইহাও এখন দেখা গেল!

শরীরের ভিতরের উত্তেজনা যেরূপ নাড়ীস্পন্দন উৎপন্ন করে, সেই

রূপ স্পন্দন বাহিরের উত্তেজনা দ্বারাও উৎপন্ন করা যাইতে পারে। যথা, একখণ্ড মাংসপেশীকে তাড়িতশক্তিযোগে উত্তেজিত করিলে ঐ প্রকার স্পন্দন হইতে থাকে। যতদিন ঐ পেশী জীবিত থাকে, তত দিন ঐ শক্তি সহায়ে ঐ স্পন্দন উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ পেশীর মৃত্যু হইলে ঐ শক্তি প্রয়োগেও ঐরূপ স্পন্দন আর উৎপন্ন হয় না। অতএব সর্ব্বশরীরের সপ্রাণতা সম্বন্ধে নাড়ীবেগের ন্যায় ঐ স্পন্দনও উক্ত মাংসপেশীর সপ্রাণতা সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় বা সাক্ষ্য প্রদান করে। এই প্রকার স্পন্দনের নাম কৃত্রিম বা যান্ত্রিক স্পন্দন। অথবা ইহা যান্ত্রিক নাড়ী নামে অভিহিত হইতে পারে। শারীর অবয়বের সপ্রাণতার আর এক প্রমাণ আছে। কোন এক শক্তি বা পদার্থবিশেষের দ্বারা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে উক্ত অবয়বে ব্যথা বা কষ্ট উপস্থিত করে। এই ব্যথা বা কষ্ট উপস্থিত হইতে তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন। যথা ১ম, অবয়বের উত্তেজিত অংশ অথবা যে অংশের বৈষম্যে কষ্ট হইতেছে, ২য়, যে স্নায়ু বা স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত স্থান হইতে বৈষম্যের বার্ত্তা বহন করিতেছে এবং ৩য়, মস্তিষ্ক, যাহার দ্বারা ঐ বৈষম্যবার্ত্তা পঠিত হইতেছে বা যথায় ঐ বার্ত্তা—কষ্ট বা ব্যথানুভব রূপে অঙ্কিত হইতেছে।

শারীরের অবয়বাংশের উত্তেজনায় যে বেদনানুভব হয়, তাহা যে কেবল স্নায়ুসহায়ে মস্তিষ্ক দ্বারাই পঠিত হইতে পারে, এমন নহে, কিন্তু স্নায়ুর পরিবর্ত্তে রেসমমণ্ডিত পিত্তলের তার এবং মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে গ্যাল্‌ভানোমিটার বা তাড়িতাস্তিত্বজ্ঞাপক যন্ত্র রাখিয়াও বেদনানুভব হইতেছে জানা এবং চক্ষে দেখা যাইতে পারে। জগদীশ বাবু ইহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইলেন। জনৈক শ্রোতার বাহুতে ঐ প্রকার তার সংযুক্ত করিয়া তারের অপর প্রান্তভাগ তাড়িতাস্তিত্বজ্ঞাপক যন্ত্রে সংযুক্ত করা হইল। পরে ঐ বাহুতে চিমটি কাটিবামাত্র যন্ত্রের সূচী স্পন্দিত ও ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। আবার, চিমটি কাটিবামাত্র যেমন তৎক্ষণাৎ বেদনানুভব হয় এবং সেই বেদনা অল্পে অল্পে উপশমিত এবং শেষে বিলুপ্ত হয় তাড়িতসূচীও তদ্রূপ চিমটি কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অনেক দূর গমন করিয়া বেদনা উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। ইহাতে আরও সিদ্ধান্ত হইল যে, শারীর অবয়বে সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বানুভব, অবয়বাভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক তাড়িত

প্রবাহের বৈষম্যসম্ভূত স্পন্দন হইতে অনুভূত হয়, এবং এই স্পন্দন বহির্জগতের শক্তি সংযোগেই উৎপন্ন হয়।

সম্পূর্ণ শারীর অবয়বের ন্যায় এক খণ্ড জীবিত মাংসপেশী লইয়া এই প্রকারে চিমটি কাটিলে অথবা সূচীবিদ্ধ করিলে উক্ত প্রকার তাড়িত প্রবাহের বিষমতা এবং স্পন্দন লক্ষিত হইয়া থাকে; এবং এই প্রকার স্পন্দনকে শারীর অবয়বের তাড়িত নাড়ী বলা যাইতে পারে।

পদার্থবিশেষের সপ্রাণতা সিদ্ধান্ত করিবার অতএব এই তিন উপায় নির্দ্ধারিত হইল। যথা, ১ম স্বাভাবিক নাড়ী, ২য় যান্ত্রিক নাড়ী, ৩য় তাড়িত নাড়ী। মৃত পদার্থে এই তিন প্রকারের কোন প্রকার নাড়ীই লক্ষিত হয় না। এই তিন প্রকার উপায়ের শেষোক্তটি বা তাড়িত নাড়ীই সকল শারীর অবয়বে সমান ভাবে প্রযুক্ত হইয়া সপ্রাণতার পরিচয় দিতে সক্ষম।

বহির্জগতের শক্তি সংঘাতে উত্তেজিত হইয়া প্রতিঘাতে বেদনানুভব শারীরাবয়বে কোথা হইতে হয়? এতদিন বিশ্বাস ছিল, জীবনী শক্তি নামক কোন এক অজ্ঞাত শক্তি সম্বন্ধেই এইরূপ হইয়া থাকে। জড়ে সেই শক্তি সম্বন্ধ নাই, সে জন্য জড় আঘাতের প্রতিঘাতে এবং বেদনানুভবে অক্ষম। সমগ্র উদ্ভিদ্ জগৎ শরীরবিশিষ্ট হইলেও বেদনানুভবে অসমর্থ, মানবের এই ধারণা এবং ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি শরীরবান আদৌ নহে, অতএব উদ্ভিদ্ হইতেও যে এ বিষয়ে নিকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ জড়-স্বভাব, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক সাধারণ মানবের ধারণাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রমাণ প্রয়োগে যতদিন না ঐ ধারণা পরীক্ষিত হয়, ততদিন উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করিতে পারেন না। জগদীশ বাবু সে জন্য উদ্ভিজ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ধাতু প্রভৃতির ভিতর আঘাতের কোনরূপ প্রতিঘাত পাওয়া যায় কি না, নানা কৌশলে অনুসন্ধানে মগ্ন হইলেন। ফলে সাধারণ মানবের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী অদ্ভুত সত্য আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল, মানব এবং অন্যান্য প্রাণী আহত হইলে তাহাদের শরীরোৎপন্ন তাড়িতপ্রবাহের বিষমতা যেমন বেদনানুভব জন্মায়, উদ্ভিদ্ ও ধাতু প্রভৃতিরও ঠিক সেইরূপ হয়; তাহাদের মধ্যেও তাড়িত নাড়ী ঠিক সেই ভাবে বিদ্যমান। ধাতু প্রভৃতিও মানবের ন্যায় অধিক শ্রমে শ্রান্ত হয় এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের

পুনরায় স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। ক্লোরোফরম প্রয়োগে মানবের ন্যায় ধাতুর তাড়িত নাড়ীও মন্দীভূত হইয়া আসে এবং অত্যধিক মাত্রায় বিষ-প্রয়োগে মানবের ন্যায় উদ্ভিদ্ এবং ধাতুও মরিয়া যায়। মানুষের ন্যায় উদ্ভিদাদিরও উত্তাপে সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত হয়, মদ্য বা অল্প মাত্রায় বিষ-প্রয়োগে মানবের ন্যায় উদ্ভিদাদিরও উত্তেজনা এবং নাড়ীবেগ দ্রুত হইয়া আসে; মাত্রা চড়াইলে নেশাও হয় এবং অত্যধিক মাত্রা চড়াইলে কোন্ সময়ে ঠিক মৃত্যু হইল, তাহাও ধরিতে পারা যায়। আবার মূর্চ্ছাগ্রস্ত মানবের ন্যায় মূর্চ্ছিত উদ্ভিদাদিও ঔষধ প্রয়োগে পুনর্জীবিত হইয়া উঠে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এ অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া আমাদের কোন উপকারে আসিবে কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে, কোন উপকারে না আসিলেও সমগ্র জগৎ একসূত্রে গ্রথিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত, একই নিয়মে চালিত, এ জ্ঞান ত নিঃসন্দেহ হইল—ইহা কি লাভ নহে এবং জ্ঞানই কি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং অপূর্ব্ব শক্তিপ্রকাশ আনিয়া দেয় না? লাভ আরো আছে। এই আবিষ্ক্রিয়ায় ফটোগ্রাফির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে; কৃত্রিম চক্ষু নামক এমন এক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহাতে মনুষ্য চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম আলোকরশ্মির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রাদি শ্রমক্লিষ্ট যাহাতে না হয়, এরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের দ্বারা অধিক কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়, এ কথাও জানা গিয়াছে; এরূপ আরও কত লাভ হইয়াছে ও হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

জ্ঞানের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল জ্ঞান। অবান্তর ফল অনেক থাকিলেও যে ব্যক্তি বা জাতি এ বিষয় না বোঝে, তাহারা কখনও সভ্যতা, সত্য বা মনুষ্যত্বের উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে না। আবার সাধারণ মানবের কামকাঞ্চননিবদ্ধস্থূলদৃষ্টিবিরোধী যখনই যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখনই উহা সমাজের ভিত্তিস্থানীয় অত্যাবশ্যকীয় প্রচলিত ব্যবস্থা সমূহের মর্ম্মে আঘাত করিয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে, এই ধারণায় সমাজ শরীর হইতে ঐ আবিষ্ক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। প্রথম তীব্র প্রতিবাদ পরে উদাসীনতা এবং শেষে সত্য বলিয়া স্বীকার ও সমাজাঙ্গে গ্রহণ, সকল সত্যকেই সমাজের

এই তিন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। প্রথমে মানুষ বলে, উহা সত্য বলিয়া প্রচার হইলে আমাদের যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার আর কিছুই থাকিবে না, অতএব উহা কখনও সত্য হইতে পারে না; এ বিরুদ্ধ প্রতিবাদেও আবিষ্কৃত সত্যের আধিপত্যের কিছু মাত্র হ্রাস হইল না দেখিলে সেই মানুষই বলিতে থাকে, ও সত্য আজ যে নূতন জানা গেল, তাহা নহে, বহুকাল হইতেই উহা আমরা জানি, এই দেখ, আমাদের বাইবেল পুরাণাদি গ্রন্থে উহার আভাস বর্ত্তমান, তবে উহাতে আমাদের যে বিশেষ কিছু লাভ হইবে, সেটা ভুল কথা; এইরূপ উদাসীনতাতেও যখন আবিষ্কৃত সত্যের অটুট আধিপত্য বর্ত্তমান থাকে, তখন আর কোন কথাই উঠে না—মানুষ উক্ত আবিষ্ক্রিয়ার অধীনে আপন জীবন ও সমাজ পরিচালিত করে এবং যে কেহ উহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহাকেই মূর্খ বলিয়া থাকে।

সাধারণ মানব যাহাই বলুক, অদ্বিতীয়সৎবস্তুমাত্রবাদী ভারতের ঋষি-কুল জগদীশ বাবুর এ সত্যাবিষ্কারে যে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান' ভারতের ঋষি এই কথাই চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন এবং যে কেহ এই এক জ্ঞানের সহায় স্বরূপ যে কোন যথার্থ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহা-কেই তাঁহারা নির্ব্বিশেষে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। জড় চেতনে যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই, এ আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁহারা যে কত আন-ন্দিত হইতেন, এ কথা, অর্থকরী বিদ্যায় উৎসর্গীকৃতমন, অথচ পেটের ভাতের জন্য সদা লালায়িত, দাসত্বপ্রাণ, দুর্ব্বলহৃদয় আমরা কি বুঝিব? কিন্তু ঋষিদের অনেক বাক্য এখনও প্রমাণিত হইতে বাকি। আর কিছু অগ্রসর হইলে বিজ্ঞান দেখিবে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও কোন জাতি-গত পার্থক্য নাই। প্রত্যেক স্থূলাবয়বের পশ্চাতেই মনের বিদ্যমানতা, মনের সূক্ষ্ম জড়মাত্রস্বরূপতা, সূক্ষ্মজড়সমষ্টি মন হইতেই প্রত্যেক স্থূলজড়া-বয়বের অভিব্যক্তি, প্রত্যেক স্থূলাবয়বের পশ্চাতে মানসিক প্রকাশ ভিন্ন মাত্রায় হইলেও মানসিক অপার্থক্য এবং স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যেক অভিব্যক্তির পশ্চাতে কারণ স্বরূপ আত্মার নিয়তাবস্থান এবং পরিশেষে সেই আত্মার অভিব্যক্তি নানা হইলেও উহা একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ—ঋষিদিগের এ সকল সিদ্ধান্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধেও বিজ্ঞান এখন বহুকাল অন-

ভিজ্ঞ থাকিবে। কালে এ সকল নিশ্চয় প্রমাণিত হইবে। ভগবান করুন, যেন জগদীশ বাবুর ন্যায় ব্যক্তির সংখ্যা ভারতে বৃদ্ধি হয় এবং ঋষিদিগের বংশধরেরাই যেন ঐ সকল বিষয় বিজ্ঞান সহায়ে জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করেন।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কনখল,
১৬ই এপ্রেল, ১৯০৩।

তৃতীয় অর্থাৎ সর্ব্ব শেষ স্নানের দিন ৩০শে চৈত্র ইংরাজী ১৩ই এপ্রেল। এই দিনই সর্ব্ব প্রধান যোগের দিন। দূর হইতে সকল যাত্রীরাই ২৯শে চৈত্র রবিবারে আসিয়া গেলেন। হরিদ্বার ও কনখলের রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে এত ভিড় হইয়া পড়িল যে, প্রতি পাদবিক্ষেপে বিনা ধাক্কা খাইয়া চলা অতি কঠিন হইয়াছিল। কনখলে অবস্থিত যাত্রীরা এবং নিকটস্থ গ্রামবাসীরা উক্ত দিবস রাত্রি হইতেই হরিদ্বারে আসিতে লাগিলেন। কারণ, পরদিন প্রাতে ৯ ঘটিকার মধ্যে ইহাদের স্নান করিবার অধিকার। ইহার পর হইতে আখাড়া সমূহের স্নান হইবে। ক্রমে আখাড়াসমূহের স্নানের সময় আসিল। স্নানের দ্বিতীয় দিবসের ন্যায় সকল আখাড়া ক্রমান্বয়ে আসিয়া এই শুভক্ষণে স্নান করিলেন। এই স্থানে সেই মহাপুরুষের বিষয় উল্লেখ করা উচিত, যিনি যেন এই শুভক্ষণে গঙ্গাসলিলে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া শরীর ত্যাগ করিবার মানসেই এত দিন এই দেহভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল। ধ্যানাবস্থায় শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈরাগীরা এ সময়ের মধ্যে সকলেই আসিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার হইতে স্নানের সময় সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক আখাড়ায় যে এক একটি অতি উচ্চ পতাকা পত পত শব্দে উড়িতেছিল—আজ স্নানের পর সে সবই একটু আলগা করিয়া দেওয়া হইল। কতদিনের আয়োজন, কত দিনের আগ্রহ—সবই এই

এক দিনেই শেষপ্রায় হইয়া গেল। যে মেলা স্থানে প্রায় তিনলক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, আজ স্নানের পর সেই স্থান শূন্যপ্রায় দেখা গেল!

এই মেলায় কত শত বড় বড় শেঠেরা, কত রাজারা আসিয়া ভাণ্ডারাদি দিয়া সাধুদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং ছাতি ও বস্ত্রাদি দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। এমন কি, গরীব গৃহস্থেরা পর্য্যন্তও এই সদুদ্দেশ্যে আপনাদের সামর্থ্যানুসারে ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কাতর হইল না। ধন্য সেই রাজপুতানার নগণ্য গরীব মজুর, যিনি নিজের নিত্য যৎকিঞ্চিৎ আয় হইতে একটি দুইটী পয়সা বাঁচাইয়া ক্রমে একশত মুদ্রা পূরণ করিয়া এই অবসরে আসিয়া সাধু ভোজনের নিমিত্ত ঢালিয়া দিলেন।—এই প্রকার লোকদিগের আবাসস্থান বৈকুণ্ঠধাম ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

এই মেলায় আখাড়ায় আখাড়ায় মণ্ডলিতে মণ্ডলিতে কোথাও বা পাঠ ও ভজন, কোথাও বা বক্তৃতাদি কিংবা ধর্ম্মচর্চ্চা হইল। সকল সাধুরাই ঐশ্বরিক শক্তিতে তেজীয়ান ও উৎসাহিত হইয়া কোন না কোন উপায়ে শ্রীজগদ্‌গুরুর মহিমা কীর্ত্তনে কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। বহুদিবস হইতে শ্রীমৎ স্বামী ফণীন্দ্র জ্যোতিজীর অসাধারণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনা ছিল। তিনি হরিদ্বারে আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনাভিলাষে যাওয়া গেল। যাইয়া দেখিলাম—বৃদ্ধ শরীর—আত্মপুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া সাধুগণকে শুনাইতেছেন। মোহন্ত যশোবন্ত গিরিজী পরিচয় করাইয়া দেওয়াতে আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবেকানন্দ স্বামী এক্ষণে কোথায়?" উত্তরে তাঁহার মহাসমাধির কথা শুনিয়া অতি চমকিত হইয়া ২।৩ মিনিট পর্য্যন্ত স্তব্ধভাবে রহিলেন। পরে বলিলেন—"বাবা! কি বলিব—এই একজন ভারতোদ্ধারের নিমিত্ত প্রকৃতই জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন—আর আমরা এখনও বসিয়া আছি, কিছুই করিতে পারিলাম না।" আরও অনেক কথাবার্ত্তার পর সে দিন বিদায় গ্রহণ করা গেল। অপর এক দিবস যাইয়া দেখিলাম যে, সেই প্রকাণ্ড ঘরটি লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কয়েকটি বিখ্যাত পণ্ডিত জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতেছেন। জ্যোতিজী কখনও উত্তর পক্ষদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া এমন উত্তর দিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষদিগের আর বলিবার সামর্থ্য হইতেছে না, কখনও বা পূর্ব্বপক্ষদিগের

সেই প্রশ্ন লইয়াই উত্তরপক্ষদিগকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিতেছেন। আবার কখনও বা মীমাংসা দ্বারা দুই পক্ষকে সামঞ্জস্য করিয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, জ্যোতিজী এইরূপ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিবার শক্তিতে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই তো গেল কুম্ভমেলার কথা। এক্ষণে কতকগুলি বড় বড় আখাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্য্যবিবরণ এবং মোটামুটি নিয়মাদি, যদ্দারা এই সব আখাড়া চালিত হয়, অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

ইতি সত্যকাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা।

—:*:—

প্রতিষ্ঠা——এই পাঠশালা গত ২রা জানুয়ারী সন ১৯০২ তে "রামকৃষ্ণ মিশন" দ্বারা মহাতীর্থ হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কনখল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য——হিন্দুবালকদিগকে বিদ্যা (সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দু) ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, নীতি ও শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এক কথায় যাহাতে আজকালকার বালকেরা মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে, তাহারই শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য।

সাধারণ নিয়ম——(১) প্রত্যেক বালককে সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) অবিবাহিত বালককেই কেবল পাঠশালা ভুক্ত করা যায়,—কারণ, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়াই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

(৩) পাঠশালাভুক্ত প্রত্যেক বালকের অভিভাবকদিগকে লিখিয়া দিতে হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে বিবাহ দিবেন না।

(৪) প্রত্যেক বালকের বয়ঃক্রম পাঠশালাভুক্ত হইবার সময় ১০ ও ১৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া আবশ্যক।

(৫) প্রত্যেক বালককে অন্ততঃ পক্ষে ৬ বৎসর পাঠশালায় থাকিতে হইবে।

(৬) বাহিরের বালকদিগের পাঠশালাতে থাকিবার জন্য তাহাদিগের নিজেদের ব্যয়ে সব রকম বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে—কারণ, এক্ষণে ব্যয়ভার লইতে অসমর্থ বালকদিগের জন্য ব্যয়ভার বহন করিতে পাঠশালা অসমর্থ। পরে শ্রীভগবদিচ্ছায় পাঠশালা এই ব্যয়ে সমর্থ হইলে উহাদিগকে লওয়া যাইবে।

(৭) বাহিরের বালকগণ, যাঁহারা পাঠশালাভুক্ত হইতে ইচ্ছুক, পত্র লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারেন।

পাঠশালার কার্য্যপ্রণালী——প্রথমে ১টী বালক লইয়া এই পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রমে এক্ষণে ১৯টী ছাত্র হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই এখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য। সম্প্রতি ১টী ব্রাহ্মণবালক নৈনিতালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর নামক স্থান হইতে আসিয়াছে।

(ক) বালকদিগের কার্য্যতালিকা—

প্রত্যূষে——৫ ঘটিকা	হইতে	৬টা	পর্য্যন্ত	—স্নানাদি
,,	৬ টা	,,	৭টা	,,	ধ্যান
প্রাতে	৭ টা	,,	৮টা	,,	পূজা ও প্রাতর্ভোজন
,,	৮ টা	,,	১১টা	,,	অধ্যয়ন
,,	১১ টা	,,	১২টা	,,	ভোজন
দ্বিপ্রহরে	১২ টা	,,	২টা	,,	আরাম, লিখন ও পাঠশালার কার্য্যাদি
বৈকালে	২ টা	,,	৩টা	,,	অঙ্কশিক্ষা
,,	৩ টা	,,	৫টা	,,	অধ্যয়ন
,,	৫ টা	,,	৬টা	,,	ব্যায়াম
সন্ধ্যা	৬ টা	,,	৭টা	,,	আরাত্রিক, ধ্যান, ভজন
রাত্রি	৭ টা	,,	৮টা	,,	ভোজন ও আরাম

,,	৮ টা	,,	১০টা	,,	অধ্যয়ন
,,	১০ টা	,,	৫টা	,,	শয়ন

(খ) বালকদিগের অধ্যয়ন—উপরোক্ত অধ্যয়নের সময় ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ব্যাকরণ, ইংরাজী অনুবাদ, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অনুবাদ ও সকলের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রাইমারি পুস্তকাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে বালকেরা ভাব সংগ্রহ না করিয়া পুস্তক কণ্ঠস্থ না করে, তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, আর এই জন্যই প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া পরীক্ষা লওয়া হয়।

(গ) বালকদিগের জন্য নিয়ম—(১) প্রত্যেক বালককে কায়মনোবাক্যে "সত্য" অভ্যাস করিতে হয়।

(২) প্রত্যেক বালককে সৎস্বভাবাপন্ন, নম্র ও ধীর হইতে হয়। তাহাদিগের চাল চলনে কোনরূপ বেআদবী না দেখা যায়।

(৩) সকল অবস্থাতে গুরুজনের আজ্ঞা পালন করা চাই।

(৪) সকলের পরিষ্কার ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ, নির্ম্মল জল পান, নির্ম্মল বায়ু সেবন ও পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করা আবশ্যক।

(৫) সুস্থ অবস্থায় প্রত্যেককে প্রত্যহ নির্ম্মল জলে স্নান করিতে হয়।

(৬) কার্য্য তালিকা অনুসারে প্রত্যহ স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(৭) পাঠশালায় যত বালক আছে, সকলকে পরস্পর আপনার ভ্রাতার মত দেখিতে হইবে। কাহারও সহিত যাহাতে এই ভ্রাতৃত্ব ভাবের বিঘ্ন হয়, এরূপ কার্য্য করা উচিত নয়। একের সুখে অন্যে সুখী, একের দুঃখে অন্যে দুঃখী, এইরূপ ভাবাপন্ন হওয়া চাই।

(৮) প্রত্যহ যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

(৯) প্রতি মাসে একটী সভা অধিবেশন হইবে। তাহাতে বালকদিগের স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচিত একটী বালক সভাপতি হইয়া সকলকে আহ্বান করিবে। এই সভাতে এক মাসের মধ্যে ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি বিষয়ে যাহা শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা হইবে এবং এই সভাতে সর্ব্বসাধারণে যোগদান করিতে পারেন।

(১০) প্রত্যেক রবিবার কেবল সাধারণ অধ্যয়ন হইতে অবসর থাকিবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে দিন নিম্নলিখিত কার্য্য হইবে—মহাপুরুষাদির জীবনচরিত পাঠ, মহাভারতাদি পাঠ, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ধর্ম্ম বিষয়িক সংবাদ পত্র পাঠ ও ভজনাদি।

কনখলের জল বায়ু—এখানকার জলবায়ু অতি উত্তম। যাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্থান গ্রীষ্মে অতি আরামের স্থান; কারণ, গ্রীষ্মের সময় এখানে ঐ সব দেশের ন্যায় গরম হয় না, আবার গঙ্গাজল অতি শীতল, যেন বরফ। আর যাঁহারা পর্ব্বতাদি শীতপ্রধান স্থানে থাকেন, তাঁহাদেরও পক্ষে এই স্থান অতি ভাল, কারণ, শীত কালে এখানে পর্ব্বতাদির ন্যায় শীত হয়।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাঠশালা সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

অধ্যক্ষ—শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালা,
কনখল পোঃ অঃ
জেলা সাহারাণপুর,
(ইউ পিঃ)

স্বামীজির কথা।

১। জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদ পাঠও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি অবস্থা লাভ কল্লে তবে সেই পরম পুরুষকে জানা যায়।

২। জ্ঞানলাভ হইলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না, তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। তিনি অবশ্য সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জেনে সব সম্প্রদায়ের অতীত হইয়াছেন। তিনি কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেল্‌তে চেষ্টা করেন না, বরং সকলকে উন্নতির

পথে সহায়তাই করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়, সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মত ভেদ থাকে না।

৩। জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ কত্তে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্চে, সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

৪। মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণে দেহ মনের বিকাশ হবার সুবিধা হয় আর ভিতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

৫। বেদান্ত মানুষের বিচার শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার ইহাও বলেন যে, যুক্তি বিচারের চেয়েও বড় জিনিষ আছে। কিন্তু যুক্তি বিচার করেই তার বাইরে যেতে হবে।

সংবাদ।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য কলিকাতার কোন সহৃদয় মহাত্মা ১৫০০ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্টের হস্তে দিয়াছেন। এই টাকায় উক্ত সেবাশ্রমের জন্য প্রায় সাত বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ জমিতে কুটীর নির্ম্মিত হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য চলিতেছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে গীতা পড়াইতেছেন। তাঁহার সহজ ও মধুর ব্যাখ্যায় ছাত্রগণ প্রভূত উপকার পাইতেছেন। পুনর্জ্জন্মবাদ, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তিনি ঐ সকল তত্ত্বসম্বন্ধে ভারতীয় বেদান্তের মত অতি সুন্দর রূপে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তদ্ব্যতীত, যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত রূপে বেদান্তের তত্ত্ব সকল জীবনে পরিণত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জপধ্যানও শিখাইতেছেন।

কটকে আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত উদ্বোধনপাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জমি ক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ কল্পে কলিকাতা এঁটালি-নিবাসী সহৃদয় উপেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় এককালীন চার হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আশা করি, দেশের অন্যান্য ধনিগণ এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দরিদ্র অনাথগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

গত ২৯শে চৈত্র তারিখে কলিকাতা এঁটালির ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

এই প্রবন্ধটী প্রথম উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির যত্নে ইহা অতি সুন্দর কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূমির আহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া কোন্‌টীতে কতটুকু ভাল, কোন্‌টীর কি দোষ, তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মৌলিক চিন্তাপ্রসূত এরূপ কোন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

বিতৃষ্ণা।

—•—

কত কোরে বাঁধি বুক পুনঃ ভেঙ্গে যায়,
স্বপনে স্বরগ শোভা আঁধারে মিশায় ;
এ দেশে এদের গান
অবশ কোরেছে প্রাণ
আর যে লাগেনা ভাল এদেশে থাকিতে ;
প্রাণে নাহি সহা যায়
এদের যাতনা হায় !
পারিনা এভাবে আর বাঁচিয়া রহিতে।
পড়িলে তুলেনা কেহ,
নাই দয়া, নাই স্নেহ,
অপূর্ব্ব সংসার এ যে স্বার্থের আগার ;
ধবাব পিশাচী হাস,
আমাবে কোরেছে গ্রাস,
আশার স্বপন হায় ! ভেঙ্গেছে আমার।
বিতৃষ্ণা হয়েছে প্রাণে
সংসাবের নিষ্পেষণে,
চাহি (এবে)—বৈরাগ্যের ঝুলি করিয়া গ্রহণ
জীবনের শেষ টুকু করিব যাপন।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

———

আমার গান।

জীবন-সন্ধ্যায় আকুল পিয়াসা
আঁধিয়া মাঝারে ডুবিল,
জনমের তরে তোমারি লাগিয়ে
মরমে বেদনা রহিল।

এ জনমে নাথ, হোলনা সাধনা,
আইলে জনম ফিরিয়া,
হৃদয়-শোণিতে করিব তর্পণ,
পূজিব হৃদয় ভরিয়া।

নিঝুম বিজনে, বাঁধিব কুটীর,
বিজনতা কোলে ঘুমাব,
পিক-কল-কণ্ঠে মিশাইয়া স্বর,
তব নাম গান গাহিব।

কোলাহলপূর্ণ নগর ভিতর
আসিব না কভু ফিরিয়া,
মোহ-অন্ধকার দ্বেষাদ্বেষী-ভাব,
ফেলাইব পায়ে ঠেলিয়া।

কুসুমের মৌন সৌম্য নভঃমূর্ত্তি
হেরিব নয়ন ভরিয়া
ভৌতিক এ দেহ দাসত্ব শৃঙ্খলে
রাখিবনা আর বাঁধিয়া।

প্রাণারাধ্য দেব, জগতের গুরু—
পাই যদি জন্ম ফিরিয়া,
দিও কাণে মন্ত্র সাজিতে সন্ন্যাসী,
থাকিব সংসার ভুলিয়া।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

অন্যান্য বারের মত এবারেও জ্যৈষ্ঠ মাসে ছুটি লওয়াতে ১লা আষাঢ়ের উদ্বোধন নবম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

গীতাতত্ত্ব।

(২০ শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা আছে, আজ সেই বিষয়ে বোল্‌বো। আমরা সকলেই জানি, আমাদের দেশে গীতার কত আদর, কারণ, হিন্দু-ধর্ম্মের সার কথা গীতায় আছে। গীতামাহাত্ম্যে এই বিষয়ে একটী সুন্দর শ্লোক আছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

উপনিষদ্‌ সকল যেন গাভীস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুধ দুইতেছেন, অর্জ্জুন সেই গাভীর বাছুরের মত হইয়াছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, সেই রকম অর্জ্জুনের প্রশ্নেই শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ দুগ্ধের উৎপত্তি। এই দুধ পান করিবে কে? সুধী অর্থাৎ পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত মানে বিবেকী লোক। আমাদের দেশে আজকাল যাঁরা দুচার খানা বই পড়েছেন, দুচারটে কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারেন, তাঁদেরই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু গীতা বলেন, যাঁরা মুখে কেবল লম্বা চোড়া বলেন, তাঁরা পণ্ডিত নন। যাঁরা সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁদের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে, অসৎ হইতে সৎ যাঁরা বুঝিয়া লইতে পারেন, তাঁরাই পণ্ডিত। শুনা যায়, এক শ্রেণীর হাঁস আছে, যাহারা দুধে জলে মিশ্রিত থাকিলে শুধু দুধ টুকু খাইতে পারে। তেমনি এই সত্য মিথ্যা মিশ্রিত সংসারে যিনি অসৎ বাদ দিয়া সৎ লইতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। তিনিই গীতা বুঝিতে ও বুঝাইয়া দিতে পারেন।

গীতার টীকা অনেকে অনেক রকম করেছেন। আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর আচার্য্য আপনাপন পক্ষ সমর্থন করে গীতার অর্থ করেছেন।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈত মত সমর্থন করে গীতার টীকা করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যও সেইরূপ আপনাপন মতানুযায়ী টীকা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের অত টীকা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের মন এখনও কোন বিশেষ মতের দিকে না চলিয়া এক ভাবেই আছে। আপনাপন সহজ জ্ঞানে যে অর্থ উপলব্ধি করিবে, তাহাই যথেষ্ট। আর ঐ উপায়ে যে যে স্থলে অর্থ বোধ না হইবে, সেই সেই স্থল বুঝিবার জন্য আর একটী উপায় আছে। যাঁরা মহাভারত পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনই এই গীতা শাস্ত্রের প্রধান টীকাস্বরূপ। আপনি এবং অপর সকলে শরীরবান হইলেও জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, এই জ্ঞান সর্ব্বদা মনে রাখা, আপনার লাভ লোক্‌সানের দিকে না চাহিয়া সতত কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া, মনুষ্য জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখে অবিচলিত থাকা প্রভৃতি যে সমুদয় শিক্ষা গীতায় নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজজীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অনুষ্ঠিত, দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব গীতার কোন কথা যদি বুঝিতে না পার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিবে।

আর এক কথা,—বেদের উপনিষদ্ভাগে আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎসম্বন্ধে যে সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে, এই অল্প পরিমাণ গীতার মধ্যে ঠিক সেই সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উপনিষদের ভাষা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। সেই জন্য গীতা উপনিষৎমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে এবং গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। গীতামাহাত্ম্যে গীতাপাঠের বিশেষ ফল লিখিত আছে। একটী শ্লোকার্দ্ধ বলিতেছি।

"গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।"

যে নিয়ত গীতা পাঠ করে, সে পর জন্মে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন হীনযোনিতে তাহার জন্ম হয় না। এটী বড় সহজ কথা নয়। মনুষ্যত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। যাহার মনুষ্যত্ব আছে, তাহার জ্ঞান বল, ভক্তি বল, অপর কোন বিষয় বল, লাভ করিতে কতক্ষণ লাগে? শঙ্করাচার্য্য বলেছেন,

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

জগতে এই তিনটী জিনিষ এক সঙ্গে পাওয়া দেবতার অনুগ্রহ না

থাকলে হয় না। যথা, ১ম—মনুষ্যত্ব, ২য় মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হইবার ইচ্ছা। শরীরের সুখ, মনের সুখ না চাহিয়া একটা উচ্চ উদ্দেশ্য স্থির ভাবে জীবনে রাখা। স্থির, অবিচলিত একটা উদ্দেশ্য থাকিলে উহাই ক্রমে ভগবানের দিকে নিশ্চিত লইয়া যাইবে। সাধারণ লোকে আত্মসুখ লইয়াই ব্যস্ত। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য জীবনে রাখিয়া চলে কে? ৩য়.—মহাপুরুষসংশ্রয়। যে পুরুষ আপন জীবন সুমহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, এমন পুরুষের সঙ্গলাভ করা এবং তাঁহার মুখ হইতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শোনা। ইহা এত দুর্লভ কেন? ধর্ম্মকথা, সৎকথা তোমরাও বোল্‌ছো, আমিও বল্‌ছি। কিন্তু তাহাদ্বারা কোন কার্য্য হয় না কেন? আমাদের কথায় জোর নাই। কারণ, তাহা প্রাণের কথা নয়। আমাদের মন মুখ এক নয়। আমরা সংসারের সুখের জন্য লালায়িত, অথচ মুখে ত্যাগের কথা বলি। আমাদের কথায় কাযা হবেই বা কেন? যে পুরুষ আপনার জীবন মহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন, মন মুখ এক করেছেন, তাঁহার প্রতি কথায় যেন ভিতরের একটা দোর খুলে দেয়, মোহের আবরণ কাটিয়ে দেয়। মহাপুরুষদের কথায় বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। পরমহংসদেবের কথায় কত শক্তি! ক্রাইষ্ট বা বুদ্ধদেবের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন কথা পড়, এখনও সেই কথার কত শক্তি। কিন্তু তুমি আমি সেই কথা বলিলেও কাহারও প্রাণে ঘা লাগিবে না। আবার যেই তুমি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন গঠন কর্ব্বে, অমনি তোমারও কথার শক্তি বাড়্‌বে। তখন একটা কথা বল্লে লোকের প্রাণে লাগ্‌বে। যে জিনিষেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর্ব্বে, সেইটেরই শক্তি বাড়্‌বে। মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, মানসিক শক্তি বাড়্‌বে। সেইরূপ বাক্যের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা কর, কোন বিষয় বিশেষ রূপে বল্‌বার ক্ষমতা বাড়্‌বে। বেদান্ত বলেন, এই মনই জগতের সৃষ্টি করেছেন। মনের অদ্ভুত শক্তি। ইউরোপের জড়বাদীরাও একথা স্বীকার করেন। ইতিহাস পাঠেও মনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী দেশের রাণী মেরি এণ্টইনেট অপূর্ব্ব রূপসী ছিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে পারি নগরের লোকেরা একদিন খেপে উঠে জেলে পুরে দিলে। পরদিন প্রাণ দণ্ড কর্ব্বে স্থির কল্লে। প্রাতঃকালে দেখা গেল, রাণীর মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে। একরাত্রের দারুণ ভাবনায় তিনি একেবারে

বুড়ী হয়ে গেছেন। মনের এতদূর ক্ষমতা। মন যদি তীব্র ভাবে একটা জিনিষ চায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই পাবে। আমরা সম্পূর্ণ মনের সহিত কোন জিনিষ চাইতে পারি না, তাই উহা পাই না। আমাদের মন, পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, সর্ষের পুঁটুলির মত। সর্ষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে দানাগুলি যদি একবার ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই সকল গুলিকে আবার একত্র করা অসম্ভব। ঘরের আসবাবের কোণে, দেয়ালের ফাটালে এমন গিয়ে পড়্‌বে যে, হাজার চেষ্টা কল্লেও আর সকল দানাগুলি পাওয়া যাবে না। মনও সেইরূপ একবার কতক রূপে, কতক রসে, কতক ধন মান ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে ছড়িয়ে পড়্‌লে আর তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে একত্র করা অসম্ভব। তাই পরমহংসদেব ছেলেদের এত ভাল বাস্‌তেন। কারণ, তাদের মন এক জায়গায় আছে। সত্যের বীজ ঐ সব মনে দিলে শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হবে।

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটী যোগ নাম দেওয়া হয়েছে। যোগ অর্থ এক করে দেওয়া—ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। যথা, ১ম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। বিষাদযোগ কেন বলা হল? কারণ, অর্জ্জুনের বিষাদই তাঁহাকে ভগবানে লইয়া যাইবার উপায় হল। তাই বিষাদযোগ। এইরূপ সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি।

আমরা বলিতে পারি, গীতা কেবল অর্জ্জুনের জন্য বলা হইয়াছিল। তাতে আমাদের কি হবে? আমরা ত আর যুদ্ধে যাচ্ছি না অথবা মহাবীর অর্জ্জুনের জীবনের সহিত আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশে উপদিষ্ট শাস্ত্র আমাদের উপকারে কিরূপে লাগ্‌বে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, অর্জ্জুন আমাদের চাইতে শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও মানুষ। তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখন কখন হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁহার ন্যায় সত্যের জন্য নানা বিঘ্নবাধার বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়। আমাদেরও তাঁহার ন্যায় ভিতরে বাহিরে জীবনসংগ্রাম চলেছে। তাই আমরাও গীতা পড়্‌লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবনসমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান পাই। দেখা গিয়াছে, কত পাপী তাপীর গীতা পাঠ করে অনুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চ দিকে জীবনপ্রবাহ চালিত হয়েছে।

আর এক কথা। গীতা কি মহাভারতাতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলছেন, গীতা প্রক্ষিপ্ত। আমাদের দেশেও অনেক লোক তাই শুনছে। তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাকালের কোন ইতিহাস নাই, কখন ছিলও না। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ঐ রূপ একটা প্রকাণ্ড দর্শন সংগ্রহ বাস্তবিক উপদিষ্ট হয়েছিল, একথা একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা বিষয় বিশ্বাস করিবার আগে উহা সম্ভব বা অসম্ভব, বুঝিতে ত হবে। তার উত্তর এই যে, আগে ভারতবর্ষের মত পুরাতন তাঁদের দেশ হক। তখন দেখা যাবে, তাঁদেরও কত ইতিহাস থাকে। ভারত কত দিনের। কত বিপ্লব হয়ে গেছে। কতবার সব ভেঙ্গে গেছে আবার কতবার সব গড়েছে। ইউরোপ তার কি জানবে? ইউরোপ ত সে দিনের। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, কত যুগ পূর্ব্বে ভারত হতে সময়ে সময়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ হয়েছিল, ইউরোপে এখন সেই সব প্রকাশ হচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এক সময়ে কত উচ্চে উঠেছিল। এই ভারতের ন্যায় উদারতা কোথায় ছিল? আমাদের নীতিশাস্ত্র বলেন, সত্য চণ্ডালের নিকটেও শিক্ষা করবে, কারণ, জ্ঞানই ভগবান অতএব পবিত্র। যেখানেই জ্ঞান, সেইখানেই ঋষিত্ব। সেইখান থেকেই সেই জ্ঞান নেবে। গীতাও বলেন,

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।'

'জ্ঞান সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।'

একবার সেই জ্ঞান এলে আর কিছুই কু থাকে না। পরমহংসদেব বলতেন, একবার যে মিছ্‌রি খেয়েছে, তার কাছে কি আর চিটেগুড়ের আদর আছে?

তার পর ধর্ম্ম ও দর্শন ভারতের প্রাণস্বরূপ। আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে মজ্জাতে, প্রতি কার্য্যেতে এই প্রাণপ্রতিঘাত এখনও পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধোদ্যোগের পূর্ব্বে এরূপ শাস্ত্র যে উপদিষ্ট হইতে পারে না, এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ যতক্ষণ না পাইব, ততক্ষণ কেন আমাদের বহু পুরাতন জাতীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তোমার কথা লব? আবার গীতাবক্তা স্বয়ং ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ। তোমার আমার মত সাধারণ পুরুষের পক্ষে যে কার্য্য সম্ভবে না, তাহা তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষে নিশ্চিত সম্ভবে। ইহাও বুঝিতে হবে এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশের ভাষার

সহিত গীতার ভাবার এমন কিছু বিষমতাও দেখিতে পাই না, যাহাতে তোমার কথা লইতে পারি। যাঁহারা সাধুসঙ্গ করেছেন, তাঁরা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন, সংসারে আমরা যাকে মহা মহা বিপদ্ বলি, সাধু তাহারই ভিতর অবিচলিত থেকে মহাতত্ত্বকথা সকল বলেন। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ। পরমহংসদেব ভয়ানক রোগে ভুগিতেছেন। ছয় মাস থেকে আহারাদি প্রায় বন্ধ। কিন্তু সমীপস্থ লোকের ভিতর মহা আনন্দের ব্যাপার চলেছে। অতি গূঢ়সাধন, জগতের কূটপ্রশ্ন সমূহের মীমাংসা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানে সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন। রোগ, দুঃখ বা কষ্টের নামটী মাত্রও নাই। অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবানের কাছে রয়েছেন। জ্ঞানের কথা বোঝাতে তাঁহার কতক্ষণই বা লেগেছিল? অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত নয়। যদি বল, ওসব ছাড়া গীতার একটী আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, সেটী হচ্চে এই,—সংসারক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সহিত লড়াই, খাবার সংগ্রহের লড়াই, এইরূপ কতই না সংগ্রাম মানুষকে দিন রাত কর্ত্তে হচ্ছে, বিরাম নাই, শান্তি নাই। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে মানব কিরূপে জীবনের সার উদ্দেশ্য লাভ করিবে, এই বিষয়ের বিশেষ সমাধান করাই গীতার ভাব। বেশ কথা, এরূপ বিশ্বাস করিতে চাও, আপত্তি নাই।

পূর্ব্বে বলেছি, গীতাকে উপনিষদ্ মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অনেকে স্নান করে প্রতিদিন অন্ততঃ এক অধ্যায়ও গীতা পড়েন। তাঁরা গীতার প্রত্যেক শ্লোককে মন্ত্রস্বরূপ পবিত্র মনে করেন। যেমন মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, ছন্দাদি আছে, ইহারও সেই রকম আছে। গীতার ঋষি বেদব্যাস, কারণ, তিনিই মন্ত্র দর্শন কচ্ছেন। (ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয়দর্শী)। তিনি দেখেছেন, তার পর সাধারণের জন্যে সেই বিষয়টা শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁহার কাছেই মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, অতএব ঋষিশব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাহাকে Author বলা হয়, তাহাই। প্রত্যেক মন্ত্রের যেমন ঋষি অর্থাৎ রচয়িতা, দেবতা অর্থাৎ যে বিশেষ বিষয় লইয়া মন্ত্র রচিত হইয়াছে, ছন্দ অর্থাৎ যেরূপ পদবিন্যাসে মন্ত্রের ভাবা লিপিবদ্ধ হয়েছে, থাকে, তেমনি বীজও থাকে, গীতারও আছে। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, তেমনি গ্রন্থের মধ্যে এমন একটা বিষয় থাকে, যেটা অবলম্বনে বা যেটাকে ফলিয়ে বাকিটা লেখা হয়। গীতার বীজ স্বরূপ সে বিষয়টী কি?

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।'

অর্থাৎ যার জন্যে শোক করা উচিত নয়, তার জন্যে শোক কচ্চ আবার পণ্ডিতের মত কথা বোল্‌ছো। ইহার অর্থ এই যে, তোমার মুখে এক, মনে আর এক এবং তুমি সরল নও। যার মুখে একখানা, মনে আর একখানা, তাকে ধাক্কা খেতে হবে। তার সত্য বা ভগবান লাভের ঢের দেরি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মন মুখ এক কর্ত্তে হবে, উহাই প্রধান সাধন। গীতাও সেই কথা বল্‌ছেন। ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের বীজ সরলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তার পর যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে, তেমনি গীতার বিশেষ শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

সব ছেড়ে দিয়ে আমার শরণাপন্ন হতে পার, সব হয়ে যাবে। আমরা কত রকম Plan বা মতলব করে থাকি। এইটা কোর্ব্বো, ঐটা কোর্ব্বো। অনেক সময় কিন্তু সব যেন এক ঘায়ে ভেঙ্গে যায়, একটা মহাশক্তি যেন সব ভেঙ্গে দেয়। তার হাতের ভিতর যেন রয়েছি, তার অনুমতিতে নড়্‌চি চড়্‌চি। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, Free will বা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টের মধ্যস্থলে পড়ে রয়েছে। যেন কেমন একটা আলো আঁধার, একটা ঠিক করে বল্‌বার যো নাই, আলো বল আলো, আঁধার বল আঁধার। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই মানুষ এই অতীন্দ্রিয় জিনিষটা জান্‌বার চেষ্টা কচ্ছে। ইউরোপে সক্রেটিস থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই জগৎটা কি, কোন্ শক্তি অবলম্বনেই বা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, স্বাধীন বা পরাধীন ইত্যাদি বিষয় জান্‌বার চেষ্টা কচ্ছে, কিন্তু কিছুই করে উঠ্‌তে পারেনি। কারণ, মনের দ্বারা ও বিষয়টা জানা যায় না, মনের সীমা আছে। অন্তবিশিষ্ট জিনিষ অনন্তকে কি করে জান্‌বে? ইন্দ্রিয়াদির পারে না গেলে যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, সে সকল প্রশ্নের সমাধান মন কেমন করে করবে? একটা গল্প আছে, একজন পণ্ডিত এই সকল তত্ত্ব বোঝ্‌বার ও বোঝাবার চেষ্টা অনেক দিন ধরে করেছিলেন। কিছুই না পেয়ে সমুদ্রে ডুবে মর্‌তে যান। সেখানে দেখেন, এক বালক অদ্ভুত খেলা খেল্‌ছে। সমুদ্রের কিনারায় বালিতে একটা গর্ত্ত খুঁড়েছে এবং ছোট ছোট হাতে সমুদ্র হতে অঞ্জলি

অঞ্জলি জল এনে ঐ গর্ত্তটা পোরাবার চেষ্টা কচ্ছে। অশেষ আয়াস এবং অনেকক্ষণ ছুটোছুটি চল্‌তে লাগ্‌লো, পণ্ডিতের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হলো এবং বালক কি কর্‌ছে, সেই বিষয় জান্‌বার কৌতূহল হল। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক, একি কোরছো? বালক কহিল, সমুদ্রের সব জলটা এই গর্ত্তে আন্‌ছি। পণ্ডিত কথা শুনে না হেঁসে থাক্‌তে পাল্লেন না, কিন্তু পরক্ষণেই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, মনের দ্বারা মনাতীত বস্তু ধর্‌বার প্রয়াস আমারও কি এরূপ হচ্ছে না? বিবেকানন্দ স্বামীজি বল্‌তেন, আমরা যেন সব গজ নিয়ে বেরিয়েছি। ভগবানকে ছেঁটে ছুঁটে মেপে বার করে বুঝে নেব। তা হয় না। মন জড়। আমাদের ঋষিরা জান্‌তেন,—মন সূক্ষ্ম জড়—এই স্থূল জড়টাকে চালাচ্ছে, কিন্তু উহার আপনার শক্তি নাই, আত্মার শক্তিতে শক্তিমান, তিনিই সব চালাচ্ছেন। ইউরোপের অনেকের বিশ্বাস, মনই আত্মা। তা নয়। গীতা বলেন, এ সকল প্রশ্ন সমাধান কর্‌বার আগে উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কি রূপে তা হওয়া যায়? বিশ্ব মনের বিশ্ব ইচ্ছার সহিত আপন ক্ষুদ্র মন ও ইচ্ছা এক তানে যোগ কর্‌তে হবে। একটীতে যেমন ভাব, যেমন স্পন্দন হতে থাক্‌বে, অপরটীতেও সেইরূপ ভাব ও স্পন্দন উত্থিত হবে। তবেই ক্ষুদ্র মনে বাসনাপ্রসূত জ্ঞানের বিঘ্নবাধাসকল দূরীভূত হয়ে বিশ্বের শক্তি প্রকাশিত হবে। সেই জন্যই গীতোক্ত ধর্ম্মের সমস্ত শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

তিনি জগতের নিয়ন্তা। তাঁর যা ইচ্ছা, আমারও সেই ইচ্ছা হোক, আমি আর কিছু চাই না। এই ভাবটা যিনি মনে দৃঢ় রাখেন, তিনি এই মহাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলেন। তাঁরই অহঙ্কার দূর হয়, জ্ঞান আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের ভিতর ইহার ঠিক বিপরীত ভাবই থাকে। বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত যুক্ত না হয়ে লড়ালড়ি করেই মরি কেবল বাসনার জন্যে। দেখ না, পরিবর্ত্তন হচ্ছে জগতের নিয়ম, ইহা সকলেই জানে, কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা হচ্ছে, যাহাতে অনিত্য শরীরটা চিরকাল থাকে। আমাদের ভালবাসাটাতেও কি এই ব্যাপার হয় না? যাহাকে ভালবাসি, তাহার শরীর মনটাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা ভালবাসার পাত্রের অনিত্য শরীর মনকে আপনার করিয়া চির-

কাল রাখিতে চাই। সেই জন্ম আমাদের ভালবাসায় মোহ হয়। নতুবা ঠিক ভালবাসা ভগবানের অংশ, তাহাতে মোহ আসেনা। প্রকৃত ভালবাসা হলে ভালবাসার পাত্রকে অনন্ত স্বাধীনতা দেয়, আমার করিতে চায় না। এইরূপে মানুষ বাসনার বশীভূত হয়ে বিশ্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিত্যকে নিত্যকাল ধরে রাখ্‌তে চায়। ইহা মনে রেখো। ঈসপের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এক গরিব বৃদ্ধ একদিন একটা কাটের বোঝা মাথায় করে অতি কষ্টে যাচ্ছিল। একে গরমিকাল, তাতে বোঝাটা অত্যন্ত ভারী, বৃদ্ধেরও অল্প শক্তি, বৃদ্ধ কিছুদূর গিয়ে ঘর্ম্মাক্ত-দেহে শ্রান্ত হযে এক যায়গায় বসে পড়্‌লো আর আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, মৃত্যুও কি আমায় ভুলেছে! বল্‌তে বল্‌তে বিকটাকার মৃত্যু এসে উপস্থিত, বৃদ্ধকে বল্লে, বৃদ্ধ, আমায় ডাক্‌ছিস কেন? বৃদ্ধের বাঁচিবার ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে। আম্‌তা আম্‌তা করে সভয়ে বল্লে, মহাশয়, বোঝাটি বড় ভারী। একলা তুল্‌তে পার্‌ছিলুম না। তাই তুলে দিতে আপনাকে ডেকেছি। আমাদেরও অনিত্য বিষয় ছাড়্‌তে ঠিক এইরূপ হয়।

গীতার আরম্ভটী বড় সুন্দর বলে বোধ হয়। দুই দল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, উভয় পক্ষে মহা মহা বীর রয়েছেন—সকলের এক এক শাঁক ছিল, শাঁকের আওয়াজে তখন যোদ্ধা চেনা যেত। চারিদিকে শাঁক বেজে উঠ্‌লো। এমন সময় অর্জ্জুন বল্লেন, দুই দলের মাঝখানে আমার রথ রাখ, দেখি, আমার সহিত যুদ্ধ কর্ব্বে কে। তখনও তাঁহার মোহ আসে নাই, সম্পূর্ণ সাহস ছিল। শ্রীকৃষ্ণ রথ রাখ্‌লেন। অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, বিপক্ষ দলে ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীষ্ম এসেছেন; যাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন, সেই আচার্য্য দ্রোণ, অমর কৃপাচার্য্য, সমযোদ্ধা কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এসেছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, এই সব দেখে তাঁর একটু ভয় হয়েছিল। কারণ, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুবর ও পরশুরামকে যুদ্ধে জয়ের কথা, সিন্ধুরাজতনয় জযদ্রথের উপর শিবের বিশেষ বরের কথা এবং কর্ণের পরাক্রমাদি [illegible]হার অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্ম বিচিত্র নয়, তাঁর ভয় হয়েছিল। তাঁরা একথার প্রমাণ স্বরূপ আরও বলেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেন, তখন বিশেষ করে দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে মৃত দেখেছিলেন। তাতেই অর্জ্জুন সংগ্রামে নিজে জয়ী হবেন এবং জয় পরাজয় প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা

ও কার্য্যের পশ্চাতে কাহার শক্তি বিদ্যমান, তাহা বুঝ্‌তে পারেন। এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে। সমগ্র গীতাশাস্ত্র শুনে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরের ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিশ্চিন্তমনে কল্লেন ও দেখ্‌লেন। এতে তাঁর ধর্ম্মভাব বা তদ্বিপরীত ভাব, কিসের পরিচয় পাওয়া গেল? অতএব গীতাগ্রন্থ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য কতকগুলি প্ররোচনাবাক্য মাত্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞাতিবধরূপ এই নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত কর্ত্তে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হন নাই। মানুষ খুন করা, বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ করা কি বড় একটা সৎকার্য্য? উত্তরে বলা যেতে পারে, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তবে এই মানুষ খুন করাতেই সত্য, ধর্ম্ম ও যশলাভ হয়। উদ্দেশ্য বুঝেই ভাল মন্দ। স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে নরহত্যা, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য অত্যাচারী পিশাচের প্রাণদণ্ড প্রভৃতি স্থলে নরহত্যাও মহৎ কায। চিতোর অবরোধের সময় স্ত্রীলোকেরা চুল কেটে দিয়েছিল, শত্রুদের মারবার জন্য ধনুকের গুণ হবে বলে। নরহত্যা উদ্দেশ্য হলেও ইহাদের দেবী বলে পূজা কর্ত্তে ইচ্ছা কি স্বতই হয় না? কিন্তু নিজের সুখের জন্য হত্যা কল্লে হত্যাকারীর মনই নীচু হয়ে নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় হয়। অতএব ছোট বড়, ভাল মন্দ, কর্ম্মে বিদ্যমান নাই, কিন্তু কর্ত্তার উদ্দেশ্য লইয়া বিচারিত হয়।

মনের আশ্চর্য্য গতি! একে বারে বিপরীত তিন চারটে ভাবও এক কালে মিশ্রিত হয়ে মানবমনে উঠে থাকে। আমরা ধরতে পারি না। অর্জ্জুনেরও তাই হয়েছিল। দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, আত্মীয়স্বজনদিগকে যুদ্ধে হত্যা কর্ত্তে হবে দেখে তাঁর মোহ এসছিল। ভালবাসা থেকেও বটে এবং পরাজয়ের ভয়েও বটে। হয়ত ভয়টুকু তিনি ধর্ত্তে পারেন নি। ভালবাসায় মোহ এনে দেয় এবং মোহ অনেক সময় দুর্ব্বলতা এনে মানুষকে কর্ত্তব্য ও সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুন সত্যের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, স্বার্থের জন্য নয়, তিনি পাঁচখানা গ্রাম মাত্র লইয়াই সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিলেন। যাহাতে যুদ্ধ না বাধে, তাহার জন্য কত যত্নচেষ্ট ছিলেন। যখন দেখ্‌লেন, যুদ্ধ না করলে অন্যায়, অবিচার ও অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখনই তিনি সত্যের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে দাঁড়িয়েছিলেন। অত্যাচার নিবারণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যেখানে অন্যায় অত্যাচার দেখ্‌বে, সেখানে তার প্রতিকার কর্ব্বে। এ সংসারে সব এক সূত্রে বাঁধা।

তোমাকে লাগ্‌লে আমাকে লাগ্‌বে। আমার উপর অত্যাচার দেখেও তুমি যদি চুপ করে থাক আর মনে কর, হয় হোক, আমার উপর ত হয়নি, আমার অপরের কথায় কায কি, তা হলে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত। আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপরও অত্যাচার করা হল, বুঝ্‌তে হবে। তোমার মনের সদ্‌বৃত্তির উপর অত্যাচার করা হল। আজ স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় অন্যায়ের প্রতিকার কল্লে না, কাল তোমার উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন তোমার আর প্রতিকার কর্ব্বার সামর্থ্য থাক্‌বে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অবনতি এবং দাসত্বের পথে অগ্রসর হবে।

যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনেরও মোহ আসিল। বল্লেন, এ সুখের আর দরকার নাই। আত্মীয় স্বজনই যদি সব মরে গেল, ত রাজত্ব নিয়ে কোর্ব্বো কি। শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌লেন, অর্জ্জুন ভয়টুকু লুকুচ্চেন আর আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলেছেন। মনে করেছেন, নিজের জন্যে লড়াই কত্তে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, অন্যের উপর অত্যাচার প্রতিবিধান কত্তে, কর্ত্তব্য পালন কত্তে দাঁড়িয়েছেন, তা ভুলেছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বকরাক্ষস বধ ইত্যাদি স্থলে যেখানে যেখানে অন্যায় অবিচার দেখেছেন, সেখানেই ধর্ম্ম বোধে তার প্রতিবিধান করে এসেছেন। এখানে তা ভুলে গেছেন—মনে করেছেন, রাজ্য পাবার জন্যেই বুঝি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সংসারে আমরা অনেক সময় এরূপ দেখ্‌তে পাই, রূপের মোহে, কাঞ্চনের মোহে ব্যস্ত হয়ে উদ্দেশ্য হারিয়ে বসে থাকি। যদি সাধনা থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য আবার ফিরে আসে বটে, তা না হলে কেবল ছুটোছুটিই সার হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখেই প্রথম দুটী শ্লোকে তাঁহাকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে বল্‌ছেন,

> "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
> অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

'হে অর্জ্জুন, এই সময়ে তোমার মোহ কোথা থেকে এল? তোমার মত শ্রেষ্ঠ লোকের স্বর্গের পথে বাধা দিতে এমন মোহ কেনই বা এল? হে অর্জ্জুন, এ ক্লীবতা ত্যাগ কর। এ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তোমার মতন শক্তিমান পুরুষে শোভা পায় না। দূর করে দিয়ে ওঠ, লড়াই কর।' ওই থেকে একটা বিশেষ উপদেশ আমরা পাই,—যেটা মোহ আনে, দুর্ব্বলতা আনে

সেইটাই মহাপাপ। মনের সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সম্বন্ধেও তেমনি। শারীরিক দুর্ব্বলতা যাতে আনে, সেটা করাও পাপ। আজকাল ছেলেদের পাশের পড়ার ঝোঁকে শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না। এটা যে একটা পাপ, সে ধারণা আমাদের নাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা বেরবার পর আর তাদের শরীর বয় না। তারা হাত পাব ব্যবহার একেবারে ভুলে যায়। ফল, অনেক কার্য্যে অক্ষমতা। শরীর সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। না রাখ্‌লে দুর্ব্বলতা আনে। শরীর ও মনের সম্বন্ধে যা অত্যাচার কর্ব্বে, তার ফল ভুগ্‌তে হবেই হবে।

অর্জ্জুন তারপর বল্‌ছেন, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌বো কি করে? গুরু দ্রোণকে মার্‌বো কি করে? তার পরই দেখ্‌তে পেয়েছেন, মুখে যে ধর্ম্মভানটা কচ্চেন, মনে তা নাই। (মন টের পায় কি না।) আর বল্‌ছেন,

'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং॥'

'আমার কার্পণ্য দোষ এসেছে, আমি দয়ার পাত্র হয়েছি। (কৃপণ শব্দ দয়ার পাত্র, এ অর্থে ব্যবহৃত হতো।) মনের আঁট গেছে। সব গুলিয়ে গিয়ে একটা দয়ার পাত্র হয়েছি। তাই প্রার্থনা কচ্ছি, অনুনয় কচ্ছি, আমি তোমার শিষ্য, শিক্ষা দাও।' তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনে গোলমাল কোথা হতে হয়েছে, তাই ধরে বল্‌ছেন,

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।'

'তুমি পণ্ডিতের মত কথা বোল্‌ছো, কিন্তু পণ্ডিত যে জন্য শোক করেন না, তুমি তাহারই জন্য শোক কোর্‌ছো।' এই দুই কথায় অর্জ্জুনকে খুব ঘা দেওয়া হলো। পণ্ডিতেরা কি বলেন? কোন্‌টা নিত্য? শরীর ত পরিবর্ত্তনশীল। পণ্ডিত লোক এই অনিত্য শরীরের জন্য কখনই শোক করেন না। তুমি শোক কোচ্ছো। অতএব তোমার মন মুখ এক নয়, তুমি পণ্ডিত নও। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কয়টী কথায় ধর্ম্মরাজ্যের আবশ্যকীয় প্রধান দুটো জিনিষ দেখ্‌লুম। প্রথম, কোনরূপ দুর্ব্বলতা আস্‌তে দেওয়া হবে না। তা হলে উদ্দেশ্য লাভ বহুদূর। দ্বিতীয়, মন মুখ এক কর্ত্তে হবে। এই দুটো উপদেশ যদি জীবনে পালন কর্ত্তে পারি, তা হলেই উন্নতির দ্বার মুক্ত হবে। যে যে পরিমাণে এই দুটো পালন করেছে, সে যেখানেই থাক্‌, সংসারে বা সংসারের বাইরে, সেই পরিমাণে যথার্থ কায তার দ্বারাই হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

(অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে)

আজ নবমীপূজা। সোমবার ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। এই মাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে রসুনচৌকি প্রভাতী রাগ রাগিণী আলাপ করিতেছে। চাঙ্গারি হস্তে মালিরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছে। মার পূজা হইবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। গতরাত্রি হইতে ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাষ্টার, ইঁহারা রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের ঘরের বারাণ্ডায় শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বলিতেছেন,—

জয় জয় দুর্গে
জয় জয় দুর্গে।

ঠিক একটী বালক। কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—

সহজানন্দ, সহজানন্দ।

শেষে গোবিন্দের নাম। বার বার বলিতেছেন,—

প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন।

ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন। একদৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। ঐ সময়ে হাজরাও কালীবাড়ীতে থাকিতেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপূর্ব্ব

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা। শ্রীশান্তিরাম ঘোষ, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

বারাণ্ডায় তাঁহার আসন ছিল। লাটুও এই সময়ে ঠাকুরের কাছে থাকিতেন ও তাঁহার সেবা করিতেন। রাখাল এ সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করিতেন। আজ নরেন্দ্র আসিবেন।

ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারাণ্ডাটীতে ভক্তেরা শুইয়াছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখটুথ ধোয়ার পরে এই উত্তর বারাণ্ডাটীতে ঠাকুর একটী মাছুরে আসিয়া বসিলেন। ভবনাথ, মাষ্টার কাছে বসিয়া। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছেন।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সংশয়াত্মা (sceptic)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)। কি জানিস্, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' লিখ্‌তে একেবারে কান্না—কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। জীবের স্বভাব সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে, হাঁ, বটে, কিন্তু—।

"হাজরা কোনরকমে বিশ্বাস কোর্‌বে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বল্লে দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়; দাহিকাশক্তি বল্লে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা কর্‌বার যো নেই।

"তখন প্রার্থনা কল্লুম, মা, হাজরা এখানকার মত উল্‌টে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পরদিন সে আবার এসে বল্লে, হাঁ, মানি। তখন বলে যে, বিভু সব যায়গায় আছেন।"

একজন ভক্ত। হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট বোধ হয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার অবস্থা বদ্‌লে গেছে। এখন লোকের সঙ্গে হাঁক ডাক কত্তে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে তর্ক ঝগড়া কোর্‌বো, এ রকম অবস্থা এখন আমার নয়। যদু মল্লিকের বাগানে হৃদে * বল্লে,

* হৃদয়ের তখন বাগানে আসিবার হুকুম ছিল না। বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর বলিয়া কহিয়া আবার তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিত, কিন্তু কটু-কাটব্যও বলিত। ঠাকুর অনেক সহ্য করিতেন, আবার মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন।

মাঝা আমাকে রাখ্‌বার কি তোমার ইচ্ছা নাই? আমি বল্লুম, না, সে অবস্থা এখন আমার নাই, এখন তোর সঙ্গে হাঁক ডাক কর্‌বার যো নাই।

(চৈতন্যময় জগৎ—বালকের বিশ্বাস)

"জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ, ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।

"যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিষ চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি শিবুর * সঙ্গে আলাপ কর্ত্তুম। শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে। ও দেশে তখন আছি। মেঘ ডাক্‌ছে, বিদ্যুৎ হচ্চে। শিবু বল্‌ছে, খুড়ো, ঐ চক্‌মকি ঝাড়্‌চে। একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধত্তে যাচ্চে। কাছে গাছে পাতা নড়্‌ছিল। তখন পাতাকে বল্‌ছে, চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধোর্ব্বো। বালক সব চৈতন্যময় দেখ্‌ছে।

"সরল বিশ্বাস না হলে, বালকের বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। উঃ, আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাস বনেতে কি কাম্‌ড়েছে। তা ভয় হোলো, যদি সাপে কাম্‌ড়ে থাকে। তখন কি করি! শুনেছিলাম, আবার যদি কাম্‌ড়ায়, তা হলে বিষ তুলে নেয়। অমনি সেইখানে বসে গর্ত্ত খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, যাতে আবার কাম্‌ড়ায়। আমি ঐ রকম কচ্চি, এমন সময় একজন বল্লে, কি কচ্চেন। সব শুনে সে বল্লে, ঠিক ঐখানে কাম্‌ড়ান চাই, যেখানটীতে আগে কাম্‌ড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয়, বিছে টিছে কাম্‌ড়েছিল।

"আর একদিন, রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটা রামলাল বলেছিল। আমি কল্‌কেতা থেকে গাড়ী করে আস্‌বার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিমটুকু লাগে। তার পর অসুখ।"

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ঔষধ]

এইবারে ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাঁর পা দুটী একটু ফুলো ফুলো হয়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখ্‌তে বল্লেন, আঙ্গুল দিলে ডোব হয় কি না। একটু একটু ডোব হতে লাগ্‌লো। কিন্তু সকলেই বল্‌তে লাগ্‌লেন, ও কিছুই নয়।

* ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)। তুই সিঁত্থির মহিন্দরকে * ডেকে দিস্। সে বল্লে তবে আমার মনটা ভাল হবে।

একজন ভক্ত। আপনার ঔষধে খুব বিশ্বাস ! আমাদের অত নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঔষধ তাঁরই। তিনিই একরূপে চিকিৎসক। গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সমাধিমন্দিরে।)

হাজরা আসিয়া বসিলেন। একথা ও কথার পর হাজরাকে বল্লেন, দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, কেদার এরা বসেছিল, তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হলো কেন ? কেদার আমি দেখেছি কারণানন্দের ঘর।

ঠাকুর পূর্ব্বদিনে, মহাষ্টমীর দিনে কলিকাতায় প্রতিমাদর্শনে গিয়াছিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে ঠাকুর রামের বাড়ী হইয়া যান। সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুর উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সমাধি হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত—ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করিতে লাগিলেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া। ঐ ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র ভবনাথের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের হঠাৎ সমাধি হইল—তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন। সমাধিস্থ।

* ইনি ঠাকুরের ভক্ত মহেন্দ্র কবিরাজ। আগে সিঁতিতে ছিলেন, এখন উত্তর বরানগরে থাকেন।

ভবনাথ গান গাইতে লাগিলেন,—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও দুটী চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না।
তপনতনয় আমায় মন্দ কয় কি দোষে তাও বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা।
অকুল পাথারে ডুবাবে আমারে স্বপনে তাও জানি না।
অহরহর্নিশি দুর্গানামে ভাসি দুখরাশি তবু গেল না।
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী দুর্গানাম আর কেউ লবে না।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন,—

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী॥

ঠাকুর আবার গাইলেন,—

বল রে শ্রীদুর্গা নাম।
ওরে আমার আমার আমার মন।
নমো নমো নমো গৌরি, নমো নারায়ণি,
দুঃখী দাসে কর দয়া (মা) তবে গুণ জানি।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা, তুমি গো যামিনী,
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী।
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণ রূপে বাঁশী,
ভুলালে শিবের মন মা, হয়ে এলোকেশী।
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার,
কোনরূপে এইবার মা, আমারে কর মা পার।
যশোদা পূজিয়েছিল মা, জবা বিল্বদলে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি মা, কৃষ্ণ দিয়ে কোলে।
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে,
নিশি দিন মন থাকে যেন, ওরাঙ্গা চরণে।

যেখানে সেখানে মরি মা, মরিগো বিপাকে,
অন্তকালে জিহ্বা যেন, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে।
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে,
সুধামাখা তারা নাম মা, আর কার আছে?
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব,
বাজন নুপুর হয়ে মা, তোর চরণে বাজিব।
যখন বসিবে মাগো, শিবসন্নিধানে,
জয় শিব জয় শিব বলে, বাজিব চরণে।
চরণে লিখিতে নাম, আঁচড় যদি যায়,
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায়।
শঙ্করী হইয়ে মাগো, গগনে উড়িবে,
মীন হয়ে জলে রব মা, নখে তুলে লবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী, যখন যাবে গো পরাণী
সে সময়ে দিও মাগো, রাঙ্গা চরণ দুখানি।
পার কর ওমা কালী, কালের কামিনী,
তরাবারে দুটী পদ করেছ তরণী।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি গো পাতাল,
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।
গোলোকে সর্ব্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিনী।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, যেবা পথে চলে যায়,
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(অন্তরঙ্গ সঙ্গে)

হাজরা উত্তরপূর্ব্ব বারাণ্ডায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে লইলেন। মাষ্টার, ভবনাথ সঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) দেখ, আমার জপ হয় না——না, না, হয়েছে! ——বাঁহাতে পারি,—কিন্তু উদিক * হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে গিয়া একে বারে সমাধি।

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। হাতে মালা গাছাটী এখনও রহিয়াছে। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা নিজের আসনে বসিয়া—তিনিও অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে হুঁস হইল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, খিদে পেয়েছে। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য এই কথাগুলি প্রায় বলিতেন।

মাষ্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, আগে কালীঘরে যাব।

ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্তের মন্দির। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার পাদপদ্মে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন। চলিয়া আসিবার সময় ভবনাথকে বলিলেন, এই গুলি নিয়ে চল্—মার প্রসাদী ভাব আর শ্রীচরণামৃত।

ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাষ্টার। আসিয়াই হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম। হাজরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল যে, এ অন্যায়।

হাজরা তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের ভিতরেই আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কত্তে পারে।

বেলা হইয়াছে। ভোগ আরতির ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল সকলে যাইতেছে। মার প্রসাদ, রাধাকান্তের প্রসাদ সকলে পাইবে। ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাবেন। অতিথিশালার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তেরা বসিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর বলিলেন, সব্বাই গিয়ে ওখানে খা—কেমন?—(নরেন্দ্রের

* উদিক—অর্থাৎ নাম জপ।

প্রতি) না, তুই এখানে খাবি ? আচ্ছা, নরেন্দ্র আর আমি এইখানে খাব। ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ভক্তেরা বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বসিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলে উত্তরপূর্ব্ব বারাণ্ডায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপূর্ব্ব বারাণ্ডা হইতে ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি। ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওর মনের ভাব ঐ কিনা, তাই ঐ সেজেছে।

নরেন্দ্র। ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, তবে আমি বামাচারী সাজি (সকলের হাস্য)

হাজরা। তাতে পঞ্চমকার, চক্র, এ সব কত্তে হয়।

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন, ও কথায় সায় দিলেন না। কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গাইতে লাগিলেন,

আর ভুলালে, ভুল্‌বো না মা,
(এখন) দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, আহা, রাজনারাণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার! ঐ রকম করে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচায্যির গান। আহা কি নৃত্য, কি গান!

পঞ্চবটীতে একটী সাধু আসিয়াছে। সেটী বড় রাগী সাধু। যাকে তাকে গালাগাল দেয়, শাপ দেয়। খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত।

সাধু বলিল, হিঁয়া আগ মিলে গা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া সাধুকে নমস্কার করিলেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটী রহিল, ততক্ষণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাধুটী চলিয়া গেলে একজন ভক্ত বলিতেছেন, আপনার কি ভক্তি সাধুর উপর!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ওরে, তমোমুখ নারায়ণ। যাদের তমোগুণ, তাদের এই রকম করে প্রসন্ন কত্তে হয়। এ যে সাধু!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(গোলোকধাম খেলা)

গোলোকধাম খেলা হইতেছে। ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছে। ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর দুই জনকে নমস্কার করিলেন, বলিলেন, ধন্য তোমরা দুভাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে একান্তে)। আর খেলো না।

ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন। হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল। ঠাকুর বলিলেন, হাজরার কি হল!—আবার!

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে। এই সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

লাটুর ঘুটি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাত চিৎ (মুক্তি)। লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন, নোটোর যে আহ্লাদ দেখ। ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হত।

(ভক্তদের প্রতি একান্তে) এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহঙ্কার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমন আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অন্তরঙ্গ সঙ্গে।]

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সন্তান ভাব)

ঠাকুর ঘরে ছোট তক্তপোষটীতে বসিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার মেজেতে বসিয়া। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী এই সব মতের কথা নরেন্দ্র তুলিলেন। ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। বলিলেন ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের

নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। (নরেন্দ্রের প্রতি)। তোমার আর এ সব শুনে কায নেই।

"ভৈরব ভৈরবী, এদেরও ঐ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান কত্তে বল্লে। আমি বল্লাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগ্‌লো। আমি মনে কল্লাম, এইবার বুঝি জপধ্যান কর্ব্বে। তা নয়, নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে। আমার ভয় হতে লাগ্‌লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটী গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

"স্বামী স্ত্রী যদি ভৈরব ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)। "কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ্ নাই। ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব, বীরভাব বড় কঠিন।

"তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন কোত্তো। বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না।

"নানাপথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

"অনেক মত অনেক পথ দেখ্‌লুম। এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নেই। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বল্‌ছি, শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ, তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস, আবার এক এক বার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাসা)

(Love of Mankind)

ভবনাথ (বিনীতভাবে)। লোকের সঙ্গে মনান্তর থাক্‌লে মন কেমন করে। তা হলে সকলকে ত ভালবাস্‌তে পাল্লুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথমে একবার কথা বার্ত্তা কইতে, ভাব কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। চেষ্টা করেও যদি না হয়, তার পর আর ও সব ভাব্‌বে না।

তাঁর শরণাগত হও, তাঁর চিন্তা কর, তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নেই।

ভবনাথ। ক্রাইষ্ট, চৈতন্য, এঁরা সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাল ত বাসবে, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু যেখানে দুষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম কর্ব্বে। কি, চৈতন্যদেব! তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সম্বরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল।

ভবনাথ। সে অন্য লোক বার করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সম্মতি না থাকলে পারে?

"কি করা যায়? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ঐ ভাবতে হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ কোর্ব্বো? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায় চাই! মানুষ নিয়ে কি কোর্ব্বো?

"ঘরে আসবেন চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী।

"তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা, সোনা মাটি, মাটিই সোনা বলে ত্যাগ কল্লুম, গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হলো যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য অবজ্ঞা কল্লুম বলে যদি খাঁটি বন্ধ করেন। তখন বল্লুম, মা, তোমায় চাই, আর কিছু চাই না, তা হলে সব পাব।

ভবনাথ (হাসিতে হাসিতে)। এ পাটোয়ারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি।

"ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বল্লেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হইছি। এখন একটী বর নাও। সাধক বল্লে, ঠাকুর যদি বর দেবেন, ত এই বর দিন, যেন সোণার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই। একবরেতে অনেকগুলি হল। ঐশ্বর্য্য হল, ছেলে হল, নাতি হল।" (সকলের হাস্য)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বর অভিভাবক।)

ভক্তেরা বসিয়া আছেন। হাজরা বারাণ্ডাতেই বসিয়া আছেন। হাজরার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হাজরা কি চাইছে জান? কিছু টাকা চায়, বাড়ীতে কষ্ট, দেনা কর্জ্জ। তা, জপ ধ্যান করে, বলে তিনি টাকা দেবেন।

একজন ভক্ত। তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছে। তবে প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার নেন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়। বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা করে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখন ঈশ্বরই ভার নেন। *

"নিজে বাড়ীর খবর নেবে না। হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে, 'বাবাকে আস্‌তে বোলো, আমরা কিছু চাইবো না!' আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেলে।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মাতৃভক্তি)

"হাজরার মা বলেছে রামলালকে, প্রতাপকে এক বার আস্‌তে বোলো। তোমার খুড়ো মশায়কে আমার নাম করে বোলো, যেন তিনি হাজরাকে আস্‌তে বলেন। আমি বল্লুম, তা শুন্‌লে না।

"মা কি কম জিনিষ গা? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আসতে পাল্লেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাট্‌বো। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বল্লেন, মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না। আর মা, যখন তুমি মনে কর্‌বে, আমাকে দেখ্‌তে পাবে। আমি কাছেই থাক্‌ব, মাঝে মাঝে তোমায় দেখা দিয়ে যাব। তবে শচী অনুমতি দিলেন।

---

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
গীতা।

"নারদের মা যতদিন ছিল, ততদিন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা কত্তে হয়েছিল কি না। মার দেহত্যাগ হলে তবে হরিসাধন কত্তে বেরুলেন।

"বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আস্তে ইচ্ছে হলো না। গঙ্গা মার কাছে থাক্‌বার কথা হলো। সব ঠিক ঠাক। এদিকে আমাব বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গা মার বিছানা হবে। আর কল্‌কাতায় যাব না। কৈবর্ত্তর ভাত আর কত দিন খাব? তখন হৃদে বলে, না, তুমি কল্‌কেতা চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গা মা আর এক দিকে টানে। আমার খুব থাক্‌বার ইচ্ছে। এমন সময়ে মাকে মনে পড়্‌লো। অমনি সব বদ্‌লে গেল। মা বুড় হয়েছেন! ভাব্‌লুম, মার চিন্তা থাক্‌লে ঈশ্বর ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেই খানে ঈশ্বরচিন্তা কোর্‌বো নিশ্চিন্ত হয়ে। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি একটু তাকে বোলো না। আমায় সে দিন বল্লে, হাঁ, দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাক্‌বো। তার পর যে সেই।

(ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে)

(ভক্তদের প্রতি)। "আজ ঘোষপাড়া ক্ষোষপাড়া কি সব কথা হল! গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়েস মুণ্ডি হয়ে যাক।

নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন।

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে;
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে;
জ্ঞানপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত মুরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে;
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে, দীন হীন বলে দয়া করে।
চিরক্ষমাশীল, কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে,

পরম ন্যায়বান্, করেন কল্যাণ, পাপপুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে।
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে।
ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।

(২)

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে,
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।
চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।

স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দলহরি তুলি,
নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)

ভবসিন্ধু জলে, বিধান কমলে,
আনন্দময়ী বিরাজে ;
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল,
পিয়ে সুধা তার মাঝে।
(যোগানন্দভরে)

দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন,
ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ,
নাচে গায় তারা হইয়ে মগন ;

কিবা অপরূপ আহা মরি মরি,
জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায় ধরি,
গাও ভাই মায়ের জয়।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)

ঠাকুর নাচিতে লাগিলেন। বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন; সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর নাচিতে লাগিলেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন।

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীতরতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলপারা, লজ্জা ভয় ত মানে না॥

মাষ্টার সঙ্গে গাইয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুসী। গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্যে বলিলেন, বেশ খুলি হোতো, তা হলে আরও জমাট হোতো। তাক্ তাক্ তা ধিনা, দাক্ দাক্ দা ধিনা এই সব বোল বাজ্‌বে।

কীর্ত্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

১৯শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

হে বীরহৃদয় বালকগণ!

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৪ এর পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং ইহার উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে কোন রূপেই হউক, সম্প্রদায়ের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। নিশ্চয়ই! 'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ, হে বালকগণ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত প্রেত বই আর কি? হে বালকগণ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে! গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি, এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি, এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইওনা। উপরে অনন্তভারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয় —চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্তা এই,—স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইবেন। আমাদের সমাজ, দুচার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও!

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

আমরা মূর্খের স্থায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি? ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নর নারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতাব অভাব। মুসলমানেরা হিন্দুগণকে দরজির শেলাইকরা কাপড় চোপড় পরিতে শিখাইয়াছিল। যদি হিন্দুগণ আপনাদের আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে রাস্তার ধূলি না মিশাইতে দিয়া মুসলমানগণের নিকট পরিষ্কাররূপে আহারেব প্রণালী শিখিত, ত কত ভাল হইত! বাহ্য সভ্যতার আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে, বিলাসিতারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্ত নূতন নূতন কাযের সৃষ্টি হয়। অন্ন—অন্ন! বল কি, যে ভগবান আমাকে এখানে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে,

তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা-লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। মনে কর, ইংরাজেরা তোমাদের হস্তে সব শক্তি দিলেন—তাতে কি হবে? রাজপুতেরা উঠিয়া সব লোকের নিকট হইতে সব শক্তি কাড়িয়া লইবে আর পুরোহিতগণকে ঘুষ দিয়া লোককে চাপিয়া ধরিতে বলিবে, ও নিজেরা উহাদের গলা কাটিবে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, পূর্ব্বে যে উন্নতি করিবার পথ বলিয়াছি, সেই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস, ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব আর ইহা হইবেই হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটী উপনিবেশস্থাপন। যে ব্যক্তি তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, তাহাকেই কেবল সেখানে রাখা হইবে। তার পর এই অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত জগতে সেই ভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটী কেন্দ্রসমিতি করিয়া সমুদায় ভারতে তাহার শাখাসমাজ স্থাপন করিয়া যাও। কেবল ধর্ম্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। কোনরূপ ভয়ঙ্কর সামাজিক সংস্কার প্রচার করিওনা। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞলোকের কুসংস্কারের প্রশ্রয় যেন না দেওয়া হয়। রামানুজ যেমন সকলের প্রতি সমভাব দেখাইয়া ও মুক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন রামানুজের ন্যায় প্রচার করিতে হইবে। রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন

নামের মধ্য দিয়া এসকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসংকীর্ত্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটা মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরকীর্ত্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বার বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগ। নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও আর একজন বন্ধু অপরবন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিওনা। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ বা কোন ঠিকানা আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেখানেই কায করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কায কর। কায কর, কায কর; পরের হিতের জন্য কায করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দন পত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া, অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্ব্বোধ হইতেই পার না। তথাপি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সব সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। যেন আমায় বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া মরিতে না হয় যে, আমি নাম লইবার জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, একবিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্য্যন্ত যেন না থাকে।

শুধু বদমায়েসি, লুকোনো চুরাচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে ; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না, গুরুগিরিও চলিবে না। বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা নাই থাক্, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার ত প্রেম আছে? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

গোড়া হইতেই সাবধান, আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছু মাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কায করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাযে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাযের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কায করিয়া যাও। ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এ স্থানে প্রচারেরও যেমন সুবিধা, সাহায্যপ্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা আছে। ভারতে আমার খুব জোর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ এক পয়সা দিতে রাজি নয়। পাবেই বা কোথায়? নিজেরাই যে ভিক্ষুক! তার পর, ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা জাতি (Nation) সাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং আমার তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ।

ইতি বিবেকানন্দ।

গাই গীত শুনাতে তোমায়।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

এই কবিতাটী আমেরিকা হইতে মঠে প্রেরিত স্বামীজির চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, করি না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপতপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।
চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়,
কেন বা দেখিবে?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে।
ছেলে খেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,

নির্ব্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র সূর্য্য তোমার বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।
কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,
ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলায়
বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,
জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ দুখ দ্বন্দ্ব ভরা
কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
ভুজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্য্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,

মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশুপক্ষী ক্রিমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ
কেশ যথা শিবঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্ব্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার,
অভ্রভেদী নিবন্দ আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি প্রকাশ।
উত্তর অয়নে বিবস্বান
একীভূত সহস্র কিরণ
কোটি বজ্র সম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্চ্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন

শান্ত ধাতু; মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর।
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

'আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে,
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
ত্রিগুণ্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার

বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু;
লম্ফঝম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস
চলে কেন্দ্র প্রতি দূর অতি দূর হতে;
চেতন পবন তোলে উর্ম্মিমালা,
মহাভূত সিন্ধু পরে,
পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি।
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে।
ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস।

"আমি আদি কবি
মম শক্তি বিকাশরচনা,
জড়জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি নিনাদ,
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে,
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু,
তোলে মুখ শিশিরমজ্জিত
ফুল্লফুল রবি পানে।"

অহংতত্ত্ব।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

সাধারণতঃ আমাদের তিনটি অবস্থা হয়। জাগৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনন্ত দেশকালব্যাপী এই বিশ্ব-সংসার উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখন বিশ্বের সহিত পৃথিবীর তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব, পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের সুবৃহৎ পৃথিবীকে একটি বিন্দু-স্বরূপে কল্পনা করেন। অন্যান্য জ্যোতির্মণ্ডল সমূহের সহিত তুলনায় ইহাকে বিন্দুতুল্য বলিয়া স্বীকার করিলে গণনায় কোনও ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হয় না। এইরূপ গণনা দ্বারাই তাঁহারা অন্যান্য অনেক জ্যোতি-র্মণ্ডলের যথাযথ দূরত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্রের মতে শূন্য একটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যাবিশেষ। শূন্যদ্বারা পরিমাণাদির সর্ব্বাঙ্গীন অভাব বুঝায় না। যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যা আর হইতে পারে না, তাহাই শূন্য। ইহা স্বীকার করিলে পৃথিবীকে শূন্য বলা অযৌক্তিক নহে। কারণ, "ক্ষুদ্র" "বৃহৎ" প্রভৃতি কথাগুলি আপে-ক্ষিক, অর্থাৎ "ক্ষুদ্র" বলিলে আমরা অন্য কোনও পদার্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এরূপ বুঝিয়া থাকি। সুতরাং অনন্তদেশের সহিত যদি কোনও সান্ত দেশের তুলনা করা যায়, তাহা তদপেক্ষা যে অনন্ত গুণে বৃহৎ হইবে এবং সান্ত পদার্থটী যে অনন্তের অনন্ত ভাগের একভাগ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ সান্ত পদার্থটি অনন্তের তুলনায় শূন্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। অসংখ্যগিরিকন্দরনির্ঝরনদনদীবিভূষিতা, সমুদ্রমেখলা, অগণন জীবনি-বহের জননী, ধনধান্যময়ী, সুবিপুলা ধরিত্রী দেবীই যদি বিশ্বের মধ্যে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মানা হয়েন, তাহা হইলে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রতম জীবের সত্তাই উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। বিচার করিয়া দেখিলে, জাগ্রৎসময়ে আমাদের এই অবস্থা।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আত্মার প্রিয়কর নহে। কেহ আপনাকে নীচ বা ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া প্রীতি পান না। মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তাঁহার

বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি না। যদিও তিনি কোটিপতি হইতে পারেন, যদিও তাঁহার অসংখ্য অসংখ্য দাসদাসী থাকিতে পারে, যদিও সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান হয়, যদিও স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, আজ্ঞাকারী, বিনয়নম্র, রূপগুণ-সম্পন্ন, সুস্থকায়, যুবক পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি আপনাকে সময়ে সময়ে কৃতার্থ মনে করিতে পারেন, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তাঁহার আশার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন কি না। অমনি শুনিবে যে, তিনি আরও কত কি আকাঙ্ক্ষা করেন। এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে, আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব। মানুষের এ বাসনার, এ আকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায়? সমগ্র পৃথিবী যদি তোমার করতলগত হয়, তাহা হইলেই কি তুমি সুখী ও শান্ত হইতে পার? না। অমনি তোমার চন্দ্রমণ্ডল আক্রমণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা লাভ হইলে সূর্য্য-মণ্ডল, এইরূপ এক এক করিয়া তুমি প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রকে স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যখন এমন কিছুই থাকিবে না, যাহা তোমার না হইবে, তখনই তুমি শান্তি লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ যখন তুমি অনন্তের সহিত এক হইয়া যাইবে, তখনই তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে, অন্য কোন উপায়ে নহে।

এটি মানুষের ভিতরকার কথা হইলেও তাঁহাকে সচরাচর সন্তুষ্ট থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত আত্মতুলনা। যখন মনুষ্য আপনাকে সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, নামরূপবিশিষ্ট, জন্মমরণশীল, ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্রমনা, ক্ষুদ্রশক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখনই তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র বলিতে বাধ্য হয়েন এবং ক্ষুদ্রভাবে থাকিয়া যে কোন উপায়ে জীবন যাপন করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু এ বিশ্বাস যে তাঁহার অন্তরাত্মার রুচিকর নহে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তবে কেন তিনি দেহে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন? ইহার আর এক কারণ আছে। মানুষ সুখ চাহেন এবং সুখাভাব ও দুঃখ এ দুইই ঘৃণা করেন। এ সুখ পাইতে গেলে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতেই হইবে। পরম রমণীয় মনোহর রূপ, মধুর সঙ্গীতধ্বনি, সুখ-স্পর্শ মৃদুমন্দবায়ু, অমৃতোপম নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী, চিত্তবিনোদন কুসুমাদির সৌরভ, আত্মপ্রশংসাবাদ, স্বীয় গৌরবব্যঞ্জক কার্য্যকলাপ,

প্রণয়ালাপ প্রভৃতি যাহা কিছু মানব মনে প্রীতি আনয়ন করে, তাহা ইন্দ্রিয় সাহায্যেই তদ্রূপ করিতে পারে বলিয়া এই ইন্দ্রিয়সমষ্টীভূত দেহে তাঁহার এতাদৃশ আস্থা ও ভালবাসা। যতকাল পর্যন্ত তিনি দেহকে সুখের কারণ বলিয়া জানিবেন, ততকাল তাহার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা থাকিবেই। কিন্তু একরূপ জ্ঞান অসম্যক্, একরূপ দর্শন একদেশ-দর্শনমাত্র। স্নায়ুময় ইন্দ্রিয়গণ যে কেবল সুখের কারণ, তাহা নহে, তাহারা দুঃখেরও কারণ। এজগৎ কেবল সুন্দর, স্নায়ুতৃপ্তিকর পদার্থে গঠিত নহে। ইহাতে সুরূপ অপেক্ষা কুরূপের, সুস্বর অপেক্ষা কুস্বরের, সুস্বাদ-জনক অপেক্ষা বিস্বাদজনক পদার্থের, সুখস্পর্শ অপেক্ষা দুঃখস্পর্শের, সুগন্ধ অপেক্ষা দুর্গন্ধের, সংখ্যাই অধিক। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের সুখদান অপেক্ষা দুঃখদানের শক্তিই অধিক। শুদ্ধ তাহাই নহে। যদিও মানব এই দেহকে অতি আদর যত্ন করেন, যদিও ইহার সেবাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়, যদিও তিনি ইহাকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, যদিও তিনি অনন্তকাল ইহার সহবাস আকাঙ্ক্ষা করেন, তথাপি পরিশেষে ইহা তাঁহাকে নির্ম্মমের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাঁহার আজীবন সেবার এই লাভ। যাহাকে এত আত্মীয় জ্ঞান করিলেন, এত যত্ন করিলেন, তাহা তাঁহার জন্য একদণ্ডও অপেক্ষা করিল না, একবার ফিরিয়াও চাহিল না। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়?

মনুষ্য পরসেবা করেন লাভের জন্য। যাহাতে আনন্দ লাভ হয়, জীবন লাভ হয়, তাহারই জন্য সেবা করা। যদি সেই সেবা দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা তখনই ত্যাগ করা উচিত। দেহসেবা কি সেইরূপ নয়? বলিতে পার, ইহাতে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু সুখও হয়। কিন্তু বল দেখি, তুমি দুঃখবহুল বা দুঃখলেশশূন্য সুখ চাও? বলিতে পার, দুঃখস্পর্শশূন্য সুখ পৃথিবীতে অসম্ভব, সুতরাং নিষ্কলঙ্ক সুপক্ক ও সুমিষ্ট ফলের অভাবে কাকভক্ষিত বিস্বাদু ফল খাওয়াও ভাল, কারণ, না খাইলে ক্ষুধা শান্তি হয় না। অতএব অনন্যগতি হইয়াই ইহা গ্রহণ করিতেছ। অন্যগতি থাকিলে অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক, সুমিষ্ট ফল পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা কখন গ্রহণ করিতে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে, একরূপ ফল পাওয়া যায় কি না, এবং যদি যায়, বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কি তাহা লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাওয়া উচিত নয়? মানব

কত পরিশ্রম করিলে, তবে এই দুঃখবহুল সুখলব লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং যদি তিনি পরমানন্দ লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কি বিনা পরিশ্রমে তাহা লাভ হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই তল্লাভে বিশেষ যত্নের আবশ্যক।

দেখা যাউক, এরূপ সুখসম্ভাবনা কোথায় আছে। ইহা সত্য যে, দেহে নাই। যাবতীয় দৈহিক সুখ, দুঃখাদি ও দুঃখান্ত। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" অতএব দেহে বা দেহজন্য জগতে সে সুখ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, দেহ ছাড়া আত্মা আছেন কি না। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান ও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল সংসারে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত না হইতেছে। এখানে কোনও বস্তুর স্থিরতা হওয়া অসম্ভব। পৃথিবী কখনও একস্থানে থাকেন না। উত্তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস, বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম। এবং উত্তাপের পরিমাণ প্রতি মুহূর্ত্তেই ভিন্নরূপ। সুতরাং কোনও বস্তু এ জগতে কখনও একভাবে থাকে না। এই নিত্য পরিবর্ত্তনই কালজ্ঞানের উৎপাদক। যেখানে কোনও পরিবর্ত্তন নাই, সকলই একাকার, সেখানে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানাত্মক কাল কখনই থাকিতে পারেন না, কারণ, ভিন্নতা উপলব্ধি না হইলে কিরূপে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান হইবে? অতএব কাল পরিবর্ত্তনশীল। বলিতে পার, দেশ অপরিবর্ত্তনীয়। দেশের উপরেই কালের ক্রীড়া চলিতেছে। যেমন পরিবর্ত্তনশীল নাট্যাভিনয়, স্থির একভাবাপন্ন রঙ্গমঞ্চের উপর অনুষ্ঠিত হয়। সেই শূন্যাত্মক এক অদ্বিতীয় অনন্ত আকাশের মধ্যেই এই বিশ্বলীলার মহানুষ্ঠান অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ আকাশটি কি? যেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে, সেই খানেই আকাশ জ্ঞান হয়, যেখানে এ গুলি নাই, সেখানে আকাশ কিরূপে থাকিবে? অতএব আদ্যন্তহীন দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধবিশিষ্ট শূন্যাত্মক দেশই আকাশ। কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এ তিনটি পরিমাণ। যাহা পরিমাণ, তাহা অপরিমেয় হইতে পারে না। সুতরাং আদ্যন্তহীন দৈর্ঘ্যাদির অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহারা চিরকালই আদ্যন্তবান্ অর্থাৎ ইহারা সীমাবিশিষ্ট বস্তুসমূহেরই পরিমাপক। অতএব দৈর্ঘ্যাদিশূন্য আকাশের উপলব্ধি যদি অসম্ভব হয়, এবং দৈর্ঘ্যাদি যদ্যপি চিরকালই আদ্যন্তবান্ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে যে, বস্তুসত্তাই আকাশসত্তা উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বস্তুমাত্রই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। যাহার সত্তা ঐ সকল পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সমূহের উপর নির্ভর করে, তাহাও যে পরিবর্ত্তনশীল হইবে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব আকাশ পরিবর্ত্তনশীল। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বাহ্ জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত না হইতেছে।

আকাশের পরিবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যখন "অহং" "ত্বং" অর্থাৎ "আমি" "তুমি" অথবা "তৎ" "ইদম্" অর্থাৎ "সেই" "এই" ইত্যাকার জ্ঞান না হয়, তখন আকাশোপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। যখন দ্বৈতজ্ঞান না থাকে, যখন এক অভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বাতীত ভাব মাত্র বিরাজ করে, তখন দেশ কাল বা নিমিত্ত এ তিনের কিছুই থাকে না। অতএব স্থান, দেশ বা আকাশ উপলব্ধির জন্য বস্তুদ্বয়ের একান্ত আবশ্যক। "এই" "সেই" এই বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ই আকাশজ্ঞানের মূলভিত্তি বলিয়া, বলিতে হইবে যে, বস্তুসত্তায় আকাশের সত্তা, বস্তুর অসত্তায় আকাশেরও অসত্তা। বস্তু পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং আকাশও পরিবর্ত্তনশীল।

আর একটি কথা। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল, তাহা স্বাধীন নহে, পরাধীন। যদ্দ্বারা পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন হয়, পরিবর্ত্তনশীল বস্তু তাহারই অধীন। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহা স্বাধীন, তাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, কিন্তু নিত্যস্থির এবং একরস। এরূপ স্বাধীন নিত্যস্থির বস্তু এ জগতে কোথাও নাই, ইহা অতঃপর স্পষ্ট বুঝা গেল। এখন দেখা যাউক, এই পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট যে "আমি," আমার ভিতর এরূপ কোনও নিত্য বস্তু আছে কি না। আমি যদি দেহ হই, তাহা হইলে আমার জন্ম ও মরণ আছে, সুতরাং আমায় অনিত্য হইতেই হইবে। কিন্তু দেহাত্মভাবের সহিত আমার আর একটি স্বভাব আছে, যাহাতে "আমি দেহ" এই ভাবে সন্দেহ আনিয়া দেয়। "আমার হস্ত" "আমার পদ" "আমার দেহ" এরূপ ভাবও আমার স্বভাবসিদ্ধ। অতএব যাহা "আমার," তাহা "আমি" হইবে কিরূপে? আমার সহিত দেহের কতিপয় দিবসের জন্য সম্বন্ধ মাত্র। আমি যদি মন হই, তাহা হইলে আমি যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, ইহা স্পষ্ট। কিন্তু "আমার মন"

এরূপ স্বাভাবিক ভাব থাকাতে, তাহা মন হইতে আমার পৃথক্ করিয়া দেয়। যদিও এক স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি দেহ ও মনের সহিত এক হইয়া যাই, তথাপি অন্য এক স্বভাব বলে দেহ ও মন হইতে আমি পৃথক্ হইয়া পড়ি। যদি আমি দেহ বা মন হইতাম, তাহা হইলে কখনই আপনাকে দেহ বা মন হইতে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। শর্করা যেরূপ মিষ্টতা, লবণ যেরূপ লবণত্ব ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ দেহও কখন দেহত্ব, চিত্তও কখন চিত্তত্ব ত্যাগ করিতে পারে না। আমি ও দেহ এক হইলে, আমার আমিত্ব ত্যাগ করার ন্যায় দেহত্ব ত্যাগ করাও অসম্ভব হইত। কিন্তু যখন আমি অনায়াসে দেহ ও মন হইতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করিতে পারি, তখন নিশ্চয়ই আমি এ দুইটি হইতে ভিন্ন। পুনশ্চ, দেহ ও মনের প্রকৃতির সহিত আমার প্রকৃতির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতির সহিত আমার দেহ ও মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু যে আমি এক সময়ে শিশু, বালক, যুবা ছিলাম, সেই আমি এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি, আমার দেহ মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি সেই আমিই আছি। আমার পরিবর্ত্তন নাই। সর্ব্বাবস্থাতেই আমার একরূপ। স্বপ্নাবস্থাতেও আমি স্বাপ্নিক দেহমনের সাক্ষী। বলিতে পার, সুষুপ্ত্যবস্থায় তোমার সত্তা কোথায়? তখন তোমার আমি জ্ঞান কিছুই থাকে না। এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সুষুপ্তিকালে যদি আমার নাশ হইত, তাহা হইলে আমায় আর জাগিতে হইত না, কারণ, যাহার নাশ হয়, তাহার আর সত্তা থাকে না। বলিতে পার, সুষুপ্তির পর আর এক নূতন আমির সৃষ্টি হইল। তাহা হইলে এ আমির সহিত পূর্ব্ব আমির কোন সম্বন্ধ না থাকায়, ইহা পূর্ব্ব-আমি সম্বন্ধীয় সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ থাকিত। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ, জাগরিত ব্যক্তি আজন্ম যাহা কিছু করিয়াছেন, সকলই তৎকৃত বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং সুষুপ্তির পর আর নূতন আমির সৃষ্টি হয় না। ইহাতে বুঝা গেল যে, নিদ্রাবস্থায় আমি ছিলাম। আর একটি প্রমাণ এই, জাগিবার পরই আমি স্মরণ করি যে, আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম। যাহা পূর্ব্বদৃষ্ট, তাহারই স্মরণ হয়, যাহা কখনও পূর্ব্বে দেখি নাই বা শুনি নাই, তাহা কখনও স্মৃতিপথে আরূঢ়

হয় না। সুতরাং "আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই বোধটি নিদ্রাবস্থায় আমার ছিল, সেই জন্যই জাগ্রদবস্থায় তাহার স্মরণ হয়। যাহা পূর্ব্বে বোধে আরূঢ় হইয়াছে, তাহারই পুনরুপলব্ধির নাম স্মৃতি। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার ন্যায় নিদ্রাবস্থাতেও আমি বোধ-স্বরূপে বর্ত্তমান ছিলাম। আমি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, একরস এবং নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ। পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত না হওয়াই আমার স্বভাব, অতএব আমি পরিবর্ত্তনশীলদিগের ন্যায় পরাধীন নহি, কিন্তু স্বাধীন। স্বাধীন বলিয়া নিত্য। মরণে আমার একান্ত অনিচ্ছা, সুতরাং আমার উপর যদি কেহ শাস্তা না থাকে, যদি আমি সর্ব্বতোভাবে স্বইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে অতীব হেয় মৃত্যুকে কখনও নিকটে আসিতে দিব না। সত্তানাশ বা না থাকার নামই মৃত্যু। সুতরাং আমি যদি মৃত্যুর অধিপতি হই, তাহা হইলে কখনই আমার সত্তার নাশ নাই। আমি দেহ প্রাপ্তির পূর্ব্বেও ছিলাম, দেহ ত্যাগের পরেও থাকিব। আমি শাশ্বত ও সর্ব্বগত, কারণ, যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল, তাহা এক অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইবে। আমি ভিন্ন সকলই পরিবর্ত্তনশীল বা বিকারী। সুতরাং একমাত্র নির্ব্বিকার আমার উপরেই বিকারাত্মক সমগ্র জগৎ অধিষ্ঠিত। আমি সর্ব্বগত।

আমার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আর এক প্রমাণ এই,—

অস্তীত্যেবং অস্মিন্নর্থে কস্যাস্তি সংশয়ঃ পুংসঃ।
তত্রাপি সংশয়শ্চেৎ সংশয়িতা যঃ স এব ভবসি ত্বম্॥ শ্রীশঙ্কর।

অর্থাৎ "আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন্ পুরুষের সংশয় উপস্থিত হয়? তাহাতেও যদি তোমার সংশয় হয়, তাহা হইলে যিনি সংশয়কর্ত্তা, তিনিই তুমি।" অতএব আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সংশয় হওয়া উচিত নয়। পুরুষমাত্রেই সৎ পদার্থ। যাহা সৎ, তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না, অর্থাৎ "না" হইয়া যাইতে পারে না। অতএব আমি নিত্য, সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এবং স্বাধীন বলিয়া পরমানন্দময়।

কিন্তু এ আমি সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত নহে। যে আমির নাম ও রূপ আছে, সে আমি ও এ আমিতে আকাশ পাতাল ভেদ। এক আমি জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিষড়্‌বিকারদোষগ্রস্ত, অন্য আমি "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং

সনাতনঃ।" এক আমি আপনাকে মনুষ্য, দেব, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু বলিয়া মনে করিতেছেন, অন্য আমি সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য, আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট, নিত্য বোধ্ স্বরূপে বর্ত্তমান। এক আমি সর্ব্বদাই বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত, ও সঙ্কুচিত, অন্য আমি আপনার স্বরূপ জানিয়া "ন বিভেতি কুতশ্চন" এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত। এক আমি কর্ম্মের ভার মস্তকে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, অন্য আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের পারে অবস্থিত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এক আমি নিত্যবিকার-গ্রস্তা, অনির্ব্বচনীয়া, মায়াবিনী প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার করিয়া ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন, অন্য আমি সেই প্রকৃতির অধীশ্বর হইয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা লীলার অবতারণা করতঃ নিরতিশয় সুখভোগ করিতেছেন। এক আমি সত্ত্বরজস্তমোরূপ রজ্জুত্রয়ে বদ্ধ, অন্য আমি গুণাতীত বলিয়া নিত্যমুক্ত। এক আমি সংসাররূপ কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যন্ত্রণায় আত্মহারা হইয়াছেন, অন্য আমি সেই সর্পকে ভূষণ রূপে ধারণ করিয়া পরমশোভার আস্পদ হইয়াছেন। এক আমি অপক্ক ও অশিবময়, অন্য আমি পক্ক ও শিবময়।

হে দেহাত্মাভিমানিন্, তোমার আমি অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা। এই কাঁচা আমিকে যদি গুরুভক্তিরূপ রসায়ন যোগে সুপক্ক করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ॥" যাঁহার দেব ও গুরুর প্রতি পরাভক্তি আছে, তিনিই মহাত্মাগণের হৃদয়ের মর্ম্ম অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহ নহে। সুতরাং গুরুভক্তি ভিন্ন কাঁচা আমি পাকাইবার আর উপায় নাই। যদি দেহ ও মনের পরপারে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে গুরুকে হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া নিরন্তর তাঁহার পদসেবায় নিরত হও। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সাধনা ও সিদ্ধি।

(কোন্নগর হরিসভায় স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

আমরা একটু স্থির চিত্তে আলোচনা কল্লে দেখ্‌তে পাই যে, সমস্ত শাস্ত্রই এক কথা ও একই লক্ষ্য বলেছে। সব শাস্ত্রেই একই কথা বটে, তবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্লে লোকের রুচিকর হয়। সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে সেই শাস্ত্রেরই ২।৪ টী কথা আজ আমরা একটু অন্য-ভাবে আলোচনা কোর্‌বো। সাধারণতঃ লোকে বলে, "যেমন সাধন, তেমন সিদ্ধি।' শাস্ত্রেও আছে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যার যেমন ভাবনা, তার তেমি সিদ্ধি হয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে কার্য্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। যিনি যে বিষয়ে চেষ্টা কোর্‌বেন, তিনি তাতেই সিদ্ধ হবেন। আমাদের ধর্ম্ম, বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জিনিষ নহে; অনুভূতির জিনিষ। অধিকারিভেদে ও মনের অবস্থানুসারে সাধনপ্রণালী অনেক হতে পারে এবং ইহাই ধর্ম্মরাজ্যে নানা সম্প্রদায় হওয়ার কারণ।

আমাদের দেশে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে বিশ্লেষণ কোরে দেখ্‌লে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত ও যোগী। যাঁরা সমস্ত বিষয় ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কোরে কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁরা জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। আর যাঁরা সংসারে বিষয় ও বৈষয়িক কর্ম্মের মধ্যে থেকে নিজেদের অল্প শক্তি প্রত্যক্ষ কোরে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁরা ভক্ত। যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁরা কর্ম্মী। আর এক দল লোক আছেন, যাঁরা একা-গ্রতা সহায়ে মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান কোরে সমস্ত বাসনা বীজ দূর কোরে দিতে চেষ্টা করেন, তাঁরা যোগী।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে ভক্তির চর্চ্চাই অধিক। অন্যগুলি আমরা বুঝি না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে কোরে থাকি, এটী আমাদের মহাদোষ। নিজেকে যতই দুর্ব্বল ও পাপী মনে কোর্‌বো,

ততই আমরা দুর্ব্বল হতে থাকবো। অহঙ্কার যেমন লোকের পতনের কারণ হয়, সেইরূপ "আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী" এ বিশ্বাসও মানবকে ধীরে ধীরে উত্থানশক্তিরহিত করে উন্নতি পথের অন্তরায় হয়; অত-এব দুটীই পরিত্যাজ্য, একথা পরমহংসদেব বলতেন। কোন সময়ে তাঁকে একখানা বাইবেল পড়ে শুনান হয়েছিল। তাতে প্রথম হতেই কেবল পাপবাদের কথা। কতকটা শুনে উহাতে কেবল পাপের কথা দেখে আর শুনতে অস্বীকার করলেন। তিনি বলতেন, "যেমন সাপে কামড়ালে বার বার বিষ নেই বিষ নেই বোলে রোগীর বিশ্বাস জন্মাতে পারলে সত্যই বিষ থাকে না, সেই রকম আমি ভগবানের নাম নিইছি, আমার পাপ নেই, বার বার একথা আপনাকে বলতে বলতে সত্যই পাপ থাকে না।" "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল" এইরূপ ভাব আমাদের ভিতর থেকে যত যাবে, ততই ভাল। সকল মানুষের মধ্যেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বিদ্য-মান। আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানের ছেলে, আমরা আবার দুর্ব্বল? সেই অনন্ত শক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের শক্তি আসছে, আমরা আবার পাপী? অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ হচ্ছে, নিজেকে পাপী ও দুর্ব্বল মনে করা। ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কার্য্য। যদি কিছু বিশ্বাস কত্তে হয়, তবে এই বিশ্বাস কর যে, তোমরা তাঁর ছেলে, তাঁর অংশ, তাঁর অনন্ত শক্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী। বিশ্বাস কর যে, তোমার শরীর ও মন হচ্ছে পবিত্র দেবমন্দির, যথায় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ভগবান চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক নর নারীর মধ্যে তিনি, বৃক্ষলতায় তিনি—জড় চেতনে তিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, নারীর মুখচ্ছায়ায়, বালকের সরলতায়, শ্মশানের করালতায় এবং যোগীর নিস্পন্দ-তায় তাঁরই প্রকাশ দেখতে চেষ্টা কর। এই চেষ্টাই যে এক প্রকার সাধন।

গীতায় ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই ভাবটী স্পষ্ট দেখতে পাই। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়াদি কামকাঞ্চনমোহিত, তাদের আকর্ষণে মানুষ রূপরসাদির পশ্চাৎ গমন কচ্ছে, অথচ আমরা মানবকে, জগতের ব্যাপার নিয়েই থাকতে হবে; অতএব তার বাঁচবার উপায় কি? ভগবান উত্তর করেন,—

যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥

যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, তাহা আমারই তেজের অংশ। চন্দ্র, সূর্য্য, পশু, পক্ষী ও জগদ্‌বিমোহিনী স্ত্রী মূর্ত্তিতে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য দেখতে পাও, সমস্তই তাঁর তেজের অংশ। তাঁর জ্যোতি এই সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে। মানুষ বাস্তবিক এদের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ কত্তে পারে না বলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভগবান গীতায় আবার বল্‌ছেন,

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির বিষয় আর কত বোল্‌বো, আমিই একাংশে এই ব্রহ্মাণ্ড হয়ে রয়েছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময়ী বাণীই কি আমাদের বল্‌ছে না যে, আপনাকে এবং অপরকে পাপী বোলে ধারণা কত্তে নেই? এতেই কি আমাদের শেখাচ্ছে না যে, মানুষকে দেবতা বোলে, ভগবানের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বোলে ধারণা কর? নিজেরা এইটী শেখ এবং সন্তান সন্ততি ও প্রতিবেশী সকলকে শেখাও।

আমরা মুখে বল্‌ছি এক, কাযে কর্‌ছি আর এক। মন মুখে এক না কর্ত্তে পাল্লে সমস্ত রাত্রি হরি হরিই কর অথবা সমিতিই কর, কিছুতেই কিছু হবে না। এই ত দেখ্‌ছি, ঘরে ঘরে হরিসভার ধুম অথচ কিছু দিন পরে আর কেউ আস্‌তে চায় না।

এর কারণ কি? কারণ এই, আমাদের মন মুখ এক নাই। ধর্ম্মের প্রথম সাধন হচ্ছে, মন মুখ এক করা। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন"। মন মুখ এক করেছে, এরূপ লোক কোথায়? হাজারটা খুঁজ্‌লে কটা পাওয়া যায়? প্রত্যেক কাযেই দেখ্‌ছি মনে এক, মুখে আর। অতি সামান্য একটী কায কত্তে পারিনি, বড় কায কত্তে দৌড়ুই। সম্মুখে পিপাসার্ত্তকে একটু জল দিতে পারিনি, অথচ সমিতি কোরে সকলকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা কত্তে অথবা সমস্ত অভাব দূর কোরে দেশোদ্ধার কত্তে যাই। মন ও মুখের বিপরীত গতির দৃষ্টান্ত দেখুন। চণ্ডীতে আছে,

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

হে দেবি! যত কিছু বিদ্যা আছে, তা তোমারই শক্তি প্রকাশ মাত্র আর জগতে যত স্ত্রী মূর্ত্তি আছে, তোমারই মূর্ত্তি। আমরা সকলে চণ্ডী পাঠ কচ্ছি,

কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জন আছেন, যিনি স্ত্রীলোককে দেবীর প্রতিমা বোলে দেখ্ছেন? কত লোক এক দিকে চণ্ডী পাঠ করেন, আবার পাঠান্তে সামান্য কারণে স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত কোত্তে সঙ্কুচিত হন না। স্ত্রীলোককে দেবীর মূর্ত্তি বোলে সম্মান ও পূজা করার পরিবর্ত্তে তাহা-দিগকে সন্তান প্রসব ও রন্ধনাদি কর্ব্বার যন্ত্র বিশেষ মাত্র ধারণা কোরে রেখেছেন।

বৈদিক যুগে কত স্ত্রীলোক ঋষি ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখ্তে পাই, জনক রাজার সভায় গার্গী নাম্নী জনৈক সন্ন্যাসিনী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কত গভীর প্রশ্ন কচ্ছেন! লীলা, খনা প্রভৃতি আরও কত বিদুষী স্ত্রীর কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

অল্প দিনের কথা, অহল্যা বাইএর অদ্ভুত জীবন অনেকেই জানেন। তিনি নিজেই রাজ্য শাসন কত্তেন। প্রত্যেক বড় বড় তীর্থে তাঁর কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান। এমন কি, পাহাড়ের বিজন প্রদেশে পর্য্যন্ত তীর্থ-যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাঁর নির্ম্মিত রাস্তা অদ্যাপি তার পরিচয় দিচ্ছে। যাদের মধ্যে জগজ্জননীর অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত, তাদের আমরা দাসী মাত্র করে রেখেছি। কেবল পূজাদির সময় দুই এক বার বোলে থাকি মাত্র যে, সমস্ত স্ত্রীলোকই মা ভগবতীর মূর্ত্তি!

আরও দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং আমরা বলেও থাকি যে, সকল মানুষই নারায়ণের মূর্ত্তি। কিন্তু কার্য্যতঃ কি করি? এক জন মেথর বা নীচজাতীয় ব্যক্তিকে দেখ্লে অমনি তাকে ছাগল গরু অপেক্ষাও ঘৃণা কত্তে সঙ্কুচিত হই না। মানুষের চেয়ে গরুর সম্মান যারা অধিক কোরে থাকে, তাদের বুদ্ধি ধারণা আর কত দূর অগ্রসর হবে? শাস্ত্রে বিশ্বাস কল্লে আমাদের কর্ত্তব্য, নিজেকে কখনও দুর্ব্বল মনে না করা এবং অপরকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করা। আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা তাঁর অংশ, তাঁর ছেলে, আমাদের এই শরীর এবং সমস্ত শরীরই তাঁর মন্দির। যেমন হিমালয় থেকে গঙ্গার সমস্ত জল রাশি আস্ছে, তেমনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের সমস্ত শক্তি আস্ছে। এইটী দৃঢ় বিশ্বাস থাক্লে ক্রমে উঠ্তে পার্ব্বো। জগতে যেখানেই জ্ঞানের চর্চ্চা হয়েছে, সেখানেই লোকে বুঝেছে যে, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। অনেক সময় সৎকার্য্যের উদ্যম কবে বা পরোপকারের

কোনরূপ চেষ্টা কর্ত্তে বল্লে উত্তর পাওয়া যায়, আমাদের টাকা কোথায়, টাকা না থাকলে কি কোন কায হয়? আরে নির্ব্বোধ! বল যে, আমাদের মনুষ্যত্ব নাই, মানুষ হলে টাকা যে তার পায়ের কাছে আপনি এসে পড়বে। টাকায় কখনও মানুষ করে না, কিন্তু মানুষই টাকা উপার্জ্জন করে। আজ থেকে সমস্ত দুর্ব্বলতা ফেলে দিয়ে মানুষ হতে চেষ্টা কর। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবলে অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তি বিকাশ না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সুকর্ম্ম ও সুচিন্তা দ্বারা সেই শক্তির বিকাশ কর।

অতএব আমাদের প্রথম সাধন, নিজেকে দুর্ব্বল না ভাবা এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার হাত থেকে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। দ্বিতীয় সাধনা মন মুখ এক করা। গীতায়ও বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার উপদেশ করবার পূর্ব্বে সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই প্রয়োজনীয় এই দুই সাধনার উপদেশ দেখতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্যদলে আত্মীয় স্বজন ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে অর্জ্জুনের মনে যুগপৎ শোক, দুঃখ, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভয় মোহ প্রভৃতি ভাব লুকিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বল্‌ছেন যে, সামান্য রাজ্যের জন্য আত্মীয় স্বজনদিগকে হিংসা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণও শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ও মহাবীরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে মোহ ও ভয় বশতঃ সেই কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে মুখে ধর্ম্ম ভানে নানা প্রকার অসম্বদ্ধ বাক্য বল্‌ছেন। কিন্তু কার কাছে মনের ভাব লুকুবেন? ভগবান অন্তর্য্যামী। তিনি বল্লেন,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

"হে অর্জ্জুন, তোমার মত লোকের ত এরূপ দুর্ব্বলতা সাজে না। তুমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কোরে উঠ"। দুর্ব্বলতা হতে যত নীচতা আসে; ইহাই পাপের খনি। কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা কি হবে? যাতে আবালবৃদ্ধবনিতার শরীর ও মন সবল হয়, তার যত্ন করাই প্রকৃত শিক্ষা।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ধর্ম্মলাভ করবার ৪টী পন্থা। বিচার কোরে দেখলে

দেখা যায় যে, এই ৪টী মানবকে এক স্থানেই নিয়ে যায়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পড়্‌লে ইহাই দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উহা লাভ কর্‌বার নানা পথ এবং যত পথ, তত মত। আমাদের প্রতিদিন পাঠ্য মহিম্নস্তবে এই ভাব শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।'

"হে ভগবান! বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি মতগুলি বিভিন্ন হলেও তোমাতে যাবার এক একটী পথ মাত্র। লোকের রুচি অনুসারে সরল কি জটিল যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, তুমিই সকলের গম্যস্থান"। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "যেমন কালীঘাট যাওয়ার বহু পথ, সেইরূপ নানামত ভগবানে যাওয়ার এক একটী পথ মাত্র"। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারাপন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও সাধন প্রণালী শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত, আপাততঃ বিরোধী হলেও বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, গম্যস্থান বা লক্ষ্য একই।

সাধনা শব্দের অর্থ ভগবৎপাদপদ্ম দর্শনে পূর্ণমনস্কাম মহাপুরুষগণের যে প্রকার অবস্থা বা অনুভূতি হয়, তাহাই আপনাতে আন্‌বার বা তাঁহাদের মত হবার জন্য চেষ্টা করা। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ ভগবান গীতায় বলেছেন,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

"মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ কোরে যিনি আত্মা বা ভগবান মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেন, সুখ দুঃখ বা শরীর মনের নানাপ্রকার নিত্য পরিবর্ত্তন যাঁকে বিচলিত কর্‌তে পারে না, তিনিই স্থিরবুদ্ধি ও মুক্ত।" যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌তে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁদের কাম কাঞ্চন ত্যাগ স্বতঃই হয়ে থাকে। তাঁদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন ভাবে গঠিত হয়ে গেছে যে, তাঁহাদিগকে আর বিপথে চল্‌তে দেয় না। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ বা সিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের অধিক বল্‌বার দরকার নেই, কারণ, এখনও আমরা সিদ্ধি লাভের অনেক দূরে রয়েছি। আমাদের

প্রয়োজন এখন, যত প্রকার সাধনা বা উপায়ে ভগবান লাভ করা যায়, তাহা জানা এবং উহার মধ্যে বিশেষ একটী নিয়ে নিজ জীবন গঠন করা।

পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় সত্য যাতে সাধারণে না পড়্তে পায়, এইভাবে লুকিয়ে রাখা হতো। এতে পুরোহিতের আধিপত্য অটুট রইল, কিন্তু জাতীয় জীবন বিদ্যাহীন হয়ে অনেক নিম্নে পড়ে গেল। পুরোহিত তাঁর ঈদৃশ কার্য্যের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী হবার পূর্ব্বে মানুষকে সকল সত্য বল্‌লে অনেক সময় না বুঝে উল্টো উৎপত্তি হয়ে থাকে, যেমন, বেদান্ত ঠিক না বুঝ্‌লে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মানুষকে অধিক বিষয়-পরায়ণ কোরে থাকে। একথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেন্‌বার শক্তি নাই, তখন সকলকেই পড়্‌বার ও আলোচনা কর্‌বার ক্ষমতা দেও। সে নিজেই তার উপযোগী পথ বেচে নেবে। আজ কাল সমস্ত শাস্ত্রই মুদ্রিত হচ্ছে, এসময় লুকোবার চেষ্টাই বৃথা।

আমরা এখন দেখ্‌বো, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মী এই ৪ প্রকার সাধকেরা কোন্ কোন্ প্রধান সাধন সহায়ে চরমে একই স্থানে উপস্থিত হন। জ্ঞানী সদসৎ বিচার কোরে অনিত্য বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ভিতর নিত্য বস্তু কোন্‌টী, ইহার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই বস্তুকেই প্রকৃত আমি বলে নির্দ্দেশ করেন। শরীর মনে আবদ্ধ, বিষয় বাসনা যুক্ত ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ কোরে এই মহান্ আমি হয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। জ্ঞানীর সাধন "নেতি নেতি" বিচার এবং স্বস্বরূপের ধ্যান। জ্ঞানী বলেন, বিচারে অনিত্য বলে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে, তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। এইরূপে দেখ্‌বে, শরীর মন প্রভৃতি কোনটীই নিত্য নহে, এই সকলের চিন্তা, বাসনা দূর কোরে দিতে পাল্লেই নিত্য বস্তু আত্মার সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাতে অবস্থান। আবার এক বার তাঁতে অবস্থান কত্তে পাল্লেই দেখ্‌বে, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নিত্যের সহিত অনিত্য চির সম্বন্ধে গ্রথিত। সেই জন্যই জ্ঞানী বলেন, জগতে যা কিছু দেখ্‌তে পাই, সমস্তই আত্মার বিকাশ, আত্মা মাত্র এবং আমি সেই আত্মা। এইটী সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখাই জ্ঞানীর প্রধান সাধন।

যোগী বলেন যে, মনুষ্য জন্ম জন্ম বিষয়ের সহিত আপনাকে একীভূত কোরে কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কতই না

কষ্ট পেয়ে থাকে। কিছুতেই আর আপনাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতে পারেনা। যোগী ছাড়াবার উপায় সম্বন্ধে বলেন, স্থির হয়ে বস, আপনাকে ভুলে কোন চিন্তার পশ্চাৎ যেও না, মনকে চিন্তা কত্তে দেও এবং তুমি সাক্ষী স্বরূপ হয়ে স্থিরভাবে মনের তরঙ্গভঙ্গ দেখতে থাক। পরে মনকে কোন এক বস্তুবিশেষে নিবদ্ধ কোরে তাতেই একাগ্র কর। এই একাগ্রতাই সংস্কারবীজ দগ্ধ কোরে সত্য প্রকাশ কোরে দেবে। যথার্থ একাগ্রতা আস্‌লেই তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন। অতএব দেখা গেল, যোগীর প্রধান সাধন, সর্ব্বাবস্থায় আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ ধারণা করা এবং মনকে কোন এক বিষয়ে সম্পূর্ণ একাগ্র করা।

ভক্ত বলেন, ভগবানে আপনাকে সম্পূর্ণ ফেলে দেও ও তাঁর সঙ্গে কোনও এক বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন কর। পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি যে কোন সম্বন্ধ তোমার ভাল লাগে, সেই সম্বন্ধ স্থাপন কর। শরীর, মন, স্ত্রী, পুত্র যা কিছু তোমার আছে, সমস্ত তাঁকে অর্পণ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যাঁকে দেখতে পাই না, তাঁর সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন কোর্‌বো? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যাঁর কাছে গেলে তুমি প্রাণে শান্তি পাও, তাঁকেই মানুষ বোধে না কোরে ভগবান বোধে পূজা কর। তা হলেই ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হবে।

পরমহংসদেবকে একদা জনৈক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করেন যে, মন কিছুতেই স্থির হয় না, কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রের চিন্তা মনে পড়ে। তিনি উত্তরে বলেন, "তাকেই ভগবান বোধে চিন্তা ও সেবা কর"। কিছু দিন এইরূপ করাতে স্ত্রীলোকটীর মন সমাধিস্থ হয়। তাঁর সঙ্গে যত দিন না কোন বিশেষ সম্বন্ধ হবে, ততদিন তাঁকে আপনার বলে বোধ হবে না এবং ভাল বাসা জন্মবে না। রাম প্রসাদ বলেছেন,—

সে যে ভাবের বিষয় ভাবব্যতীত অভাবে কে ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কল্লে, একেবারে তাঁর হয়ে গেলে স্বার্থপূর্ণ আমিত্ব বিনষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন আস্‌বে।

কর্ম্মী বলেন, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর, ফল তাঁতেই অর্পণ কর। স্বার্থের জন্য কর্ম্ম কোরো না, স্বার্থই মৃত্যু। সর্ব্বদা কর্ম্ম কর, কিন্তু

কর্ম্মফলে আসক্ত হয়ো না। পূজা ও সাধনা স্বরূপ কর্ম্ম কর। ধন, মান, যশের জন্য কোরো না। সেই বিরাট পুরুষের সেবার জন্য কর্ম্ম কর। তিনিই নানারূপে জগতে খেলা কচ্চেন। তোমাদ্বারা তাঁর একটু সেবা হলে আপনাকে ধন্য মনে কর। এই প্রকারে কর্ম্ম কল্লে যে ক্রমে স্বার্থ নাশ ও আত্ম প্রকাশ উপস্থিত হবে, একথা আর বল্‌তে হবে না।

চার শ্রেণীর লোকের জন্য চার রকম সাধনা নির্দ্দেশ করা হচ্ছে; কিন্তু উদ্দেশ্য একই, স্বার্থপর আমিত্বকে বিনাশ করা। তেবে দেখ্‌লে এদের মধ্যে বিবাদ কেবল কথায় মাত্র। বাস্তবিক কোন বিবাদ নেই, স্বার্থপর আমিত্ব গেলেই মুক্তি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে," "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব"। যখন অবিদ্যার আমি যাবে, তখনই শিবত্ব প্রাপ্তি ও মুক্তি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "যেমন জলকে নানা লোকে নানা নামে বলে, সেই রকম এক ভগবানকেই নানা নামে লোকে ডাকে"।

এইগুলিই প্রধান প্রধান সাধনার কথা। জীবন গঠনে এবং লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন। মন মুখ এক কোরে যার যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর এবং আজ থেকে নিজ জীবন গঠনে কৃতসংকল্প হও। আর যা কিছু দরকার, তিনিই সব এনে দেবেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

মন মুখ এক কোরে তাঁর শরণাপন্ন হোলে দুর্ব্বলতা, পাপ কিছুই থাক্‌তে পারে না। তিনিই সব থেকে রক্ষা করেন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তাঁর নামের জোরে আমাদের সকল দুর্ব্বলতা ও পাপ চির কালের মত দূর হয়েছে, এই বিশ্বাসটী যেন আজ থেকে আমাদের সকলের হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি)

"মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।"

স্বামী বিবেকানন্দ।

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—দেহধারী মাত্রেরই মরণ নিশ্চিত, তবে অগ্র পশ্চাৎ। শৈশব যৌবন বা বার্দ্ধক্য এক সময়ে মরিতেই হইবে। যখন মৃত্যু অপেক্ষা ধ্রুব কিছু নাই, তখন এ ভঙ্গুর দেহের রক্ষার জন্য মানুষের এত আড়ম্বর, মহতী চেষ্টা, নানা কৌশল, এ সকলের ফল কি? ব্যাধির হস্ত অতিক্রম করিয়া হয়ত জলে ডুবিয়া মরিবে, ওলাউঠায় মরিতেছিল, না হয় জ্বরে মরিবে, শৈশবে মরিতেছিল, না হয় বার্দ্ধক্যে মরিবে, মোট কথা, জমা খরচ সমান, বাকি থাকিবে না। তবে দেশ-বিশেষে "মরণাধিক্য," রোগবিশেষে "জীবন রক্ষা" এসকল কথার অর্থ কি? স্বাস্থ্যবিৎ বলেন, মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম, অতএব অনিবার্য্য সত্য বটে, কিন্তু ব্যাধি মাত্রেই অস্বাভাবিক, সুতরাং নিবার্য্য হওয়া উচিত। বার্দ্ধক্যই মৃত্যুর নির্দ্দিষ্টকাল। স্বাস্থ্যবিদের চেষ্টা অকাল মৃত্যু নিবারণ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ। তাঁহারা যে স্থানবিশেষে, মরণাধিক্য নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন বলেন, তাহার অর্থ, অনিবার্য্য মৃত্যু ব্যাপার, অকালের পরিবর্ত্তে কালে সংঘটিত হইতেছে। যে সকল ব্যাধি পিতৃপুরুষাগত বা স্বকীয় শারীরিক ও মানসিক অনিয়মে উৎপন্ন, তাহাদের নিবারণ সুচিকিৎসক ও সদুপদেষ্টার হস্তে। কিন্তু যে সকল রোগ সংক্রামক ও অস্বাস্থ্যকর কারণ বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও বিস্তৃত, অকাল মৃত্যুর আহুতি তাহারাই বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইহাদিগকে নিবার্য্য আখ্যা প্রদান করেন এবং তজ্জনিত মৃত্যু নিবারণে স্বাস্থ্যবিদের সমস্ত চেষ্টা প্রযুক্ত হয়। রাজশাসনে এবং সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষে, স্বাস্থ্য বিধি প্রবর্ত্তন দ্বারা কিরূপে স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইউরোপের পূর্ব্বাপর অবস্থা। সহস্রবর্ষব্যাপী মধ্যযুগের কথা ইউরোপের ইতিহাসে কি পাঠ কর নাই? তৎকালে যে মহামারীর বন্যা ইউরোপ প্লাবিত করে, তাহাতে অনেক দেশের চতুর্থাংশ মাত্র লোক রক্ষা পাইয়াছিল। মাঠের শস্য মাঠেই পাকিয়া শুষ্ক হইল, কাটিবার লোক ছিল না। বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র

পতিত ভূমিতে পরিণত; কৃষক নাই যে হল চালনা করে। বণিক অভাবে ব্যবসায় বন্ধ। দেশ চিকিৎসকশূন্য! বিনাচিকিৎসায় লোক মরিয়াছে। পুরোহিত অভাবে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। সে বিভীষিকা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হয়। সকল আশা নির্ব্বাপিত, ইউরোপে জাতীয় জীবন নিশ্চল হইয়াছিল।

ইউরোপ ছাড়িয়া একবার ইংলণ্ডের কথা স্মরণ কর—তখন কিরূপ দুর্ভিক্ষ ও মারিভয়ে মনুষ্যকুল ধ্বংস হইত। সুধুই কি মানুষ!—মেষ, গো, শূকরাদি পালিত জন্তু, যাহা তখনকার আহার ও অর্থের উপায়, মহামারীতে হাজার হাজার মরিয়া দেশ পশুশূন্য করিত। এক বৎসর ১০৬৯ অব্দে এরূপ মন্বন্তর ও মারীভয় উপস্থিত হয় যে, মানুষে মানুষ খাইয়াছিল এবং অশ্ব, কুকুর, বিড়াল মাংসে উদর পূর্ণ করিয়াছিল। জীবন রক্ষার জন্য কত লোক আপনাকে চিরদাস্যে বিক্রীত করিল, কত লোক জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইল না। পথিপার্শ্ব, গৃহপ্রাঙ্গনের অবস্থা কি বীভৎস। গলিত শবদেহ কৃমিকীটপরিব্যাপ্ত; প্রোথিত করিবার কেহ নাই। প্রায় নয় বৎসর যাবৎ স্থানে স্থানে বিস্তৃত ভূভাগ নিস্তব্ধ, লোকশূন্য। তাৎকালিক ইংরাজ পিশাচবৎ অনাচারী ছিল, শারীরিক শৌচ কি, জানিত না। পরিধানে চর্ম্মনির্ম্মিত বা অতি স্থূল পশমি বস্ত্র দিবারাত্র গাত্র পরিত্যাগ করিত না। আহার গুরুপাক মাংস রাশি, পানীয় অপর্য্যাপ্ত মদিরা, সর্ব্ববিধ অমিতাচার সেই মাধ্যকালিক ব্রিটনের অবস্থা। আবাসগৃহ ক্ষুদ্র পর্ণশালা, মেজে মৃত্তিকা-লিপ্ত, তৃণলতাসমাচ্ছাদিত, তন্নিম্নে বহুকালসঞ্চিত আবর্জ্জনা। রাজপথ অন্ধকার, অপ্রশস্ত, বক্র, জলমলাদিনির্গমরহিত। জঙ্গলময় পতিত ও জলাভূমি মধ্যে সামান্য কুটীরে সাধারণ লোকের বাস—ম্যালেরিয়া, বাত ও দুর্ভিক্ষ তাহাদের সহচর। দেশের রাজশক্তি প্রতিনিয়ত পরস্পর মধ্যে বা প্রজাকুল বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত। নগরাদি উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত, পথ দুর্দ্দান্তদস্যুদলে পূর্ণ, সকল শ্রেণীর মধ্যে জীবনের মূল্য অতিতুচ্ছ,—সমাজে দুর্ব্বলের স্থান ছিল না। আসুরিক বলশালী লৌহবৎ দৃঢ়াস্থিসম্পন্ন অকুতোভয় তাৎকালিক ব্রিটনের জাতীয় প্রকৃতি। দেশের সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কারণ বিদ্যমান। প্রাচীরবেষ্টিত নগরে লোক ঘনসন্নিবিষ্ট, বায়ু সঞ্চার

রহিত। যুদ্ধার্থ ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান বাহিনীদল সংক্রামক রোগ বিস্তারের মহা সহায়। প্রজাকুল ঘোর অমিতাচারী ও অশুচি। সুতরাং মহামারী যে, অকালমৃত্যুর দাবানল প্রজ্বলিত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য কি? একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ বার লোকক্ষয়কর মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রতি চতুর্দ্দশ বৎসর দুর্ভিক্ষ দেশব্যাপ্ত হইত। গলিতকুষ্ঠ, স্কার্ভি, প্লেগ, উপদংশ, ঘর্ম্মব্যাধি, বসন্ত, টাইফাস, ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুএন্‌জা শত সহস্রের জীবনাশা নির্ব্বাপিত করিত। কঠিনজীবনীশক্তিসম্পন্ন ব্যতীত কেহই রক্ষা পাইত না। লণ্ডনে সপ্তদশ শতাব্দীতে তিন বার প্লেগ মহামারী উপস্থিত হয়, শেষ বার (১৬৬৫) একবৎসরে ৬৮ হাজার লোক জীবনলীলা সংবরণ করে। এক সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা ৮৩০০। রাজধানীর দশ হাজার অট্টালিকা জনশূন্য, পরিত্যক্ত। রাজপথ জনসমাগমরহিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যানমানবসমাকুলপথে, কদাচ একখান শকট দেখা যাইত। একজন লিখিতেছেন—"২০ শে সেপ্‌টেম্বর ল্যাম্‌বেথে যাইলাম। হা ঈশ্বর! নদীতে এক খানিও নৌকা নাই—হোয়াইটহলের চারিদিক যে দূর্ব্বাদলে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে, রাজপথ জনশূন্য!" আর এক জন বর্ণনা করিতেছেন, "প্রতি পরিবারে কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিতেছিল, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। পীড়ার যন্ত্রণায় লোকে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পাগলের ন্যায় জানালা হইতে বাহিরে পতিত হইয়াছে। মা উন্মাদগ্রস্ত, নিজ শিশুকে হত্যা করিয়াছে। কেহ শোকে, কেহ ভয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। কেহ মহাভয়ে স্তম্ভীভূত, কেহ নিরাশায় দুর্দ্দান্ত পাগল। পথে প্রতি পাদবিক্ষেপে, বাটীর দ্বারে, জানালার নিকটে, স্ত্রী বালকের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিয়া অতি নিষ্ঠুর হৃদয়েরও অন্তর্ভেদ করিত। মহামারীর প্রথমাবস্থায় প্রতিগৃহ হইতে চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইত; কিন্তু যত মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোকের হৃদয় ততই কঠিন হইয়া গেল। চক্ষের সম্মুখে প্রিয়জনের মৃত্যু মনে শোকভাব উদ্দীপন করিত না। সকলেই স্থির করিয়াছে, পর মুহূর্ত্তে তাহাকেই ইহলোক পরিত্যাগে প্রস্তুত হইতে হইবে।"

ক্রমে সভ্যতার উন্নতি ও বিজ্ঞান অনুশীলনের সহিত, ব্যাধির উৎপত্তি ও নিবৃত্তির তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়া, অমরকীর্ত্তি হাউয়ার্ড, কুক, জেনার-

প্রমুখ স্বাস্থ্যসংস্কারকগণের প্রতিভাবলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইউরোপে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। টাইফাস, স্কার্ভি, প্লেগ, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী ইংলণ্ড হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত। বসন্ত, ওলাউঠা আর পূর্ব্ববৎ প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। ইহার ফল,—ইংলণ্ডে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮১০ অব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসী সংখ্যা এক-কোটি ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তিন কোটিরও অধিক। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে প্রতি সহস্র জীবিতের মধ্যে বৎসরে ৮০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শত বর্ষ পূর্ব্বে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৫০, এখন ১৮। অকালমৃত্যুর নিবারণ ও স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত লোক দীর্ঘজীবী হইতেছে। আজ ইংলণ্ডের সন্তান অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপ্ত।

কিন্তু বঙ্গে সেই ইউরোপের মাধ্যকালিক অবস্থা বর্ত্তমান। দুর্ভিক্ষ, বসন্ত, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিরাজিত। ১৫৭৫ অব্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরে যে মারীভয় উপস্থিত হইয়া শত সহস্র মৃতদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার লোকাভাবে, বৃহদায়তন জলাশয়, দুর্গপরিখা ও নদীগর্ভ পরিপূর্ণ করিয়া গৌড় জনশূন্য করিয়াছিল, শৃগালশার্দ্দূলবিচরিত নিবিড়জঙ্গলবেষ্টিত, সমৃদ্ধ দেবায়তন ও অট্টালিকার ধ্বংসরাশি এখনো তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মহানগরী কলিকাতার ইতিহাসে পাঠ করা যায়, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের তাৎকালিক রাজপুরুষগণ, হেমন্তাগমে গ্রীষ্ম ও বর্ষার করাল কবল অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, পরস্পর আনন্দ সম্ভাষণে সম্মিলিত হইতেন। ১৭০৭ অব্দে কলিকাতাবাসী ১২০০ শ্বেতকায়ের মধ্যে ৪৬০ জন কবরশায়িত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতি সহস্র জীবিতের মধ্যে ইঁহাদের বাৎসরিক গড় মৃত্যু সংখ্যা ৯৬৪। ১৭৬২ অব্দে যে মহামারী কলিকাতায় প্রাদুর্ভূত হয়, পঞ্চাশ সহস্র নরজীবন তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়াছিল। ইহার দশ বৎসর অতীত না হইতে যে লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ সমস্ত বঙ্গের জীবন স্রোত প্রায় রোধ করিয়াছিল, যাহার স্মৃতি বঙ্গের গৃহে গৃহে এখনো জাগরূক, সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই মহানগরীর রাজপথে রোগে ও অনাহারে, ৮সপ্তাহে ৭৬ হাজার নরনারী মানবলীলা সংবরণ করে। কিন্তু যে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড চিতানলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের কত ধনজনপূর্ণ নগর ভগ্ন অট্টালিকারাশিতে পরিণত হইয়াছে,

কতশত শস্যশ্যামল জনপদ লোকশূন্য হইয়াছে, এখনো যাহার অনন্ত শিখা দেশের অস্থিমজ্জা দগ্ধ করিতেছে, কত কোটি প্রাণী সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করে? অতীতের আলোচনায় প্রয়োজন কি? বঙ্গমাতার দশলক্ষাধিক সন্তান প্রতি বৎসর অকালে কালকবলিত হইতেছে। অন্যত্র ইহারা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত।

বিদেশী স্বাস্থ্যবিদের চক্ষে বঙ্গের বায়ুতে বসন্তের ঝটিকা, জলে ওলাউঠার খরস্রোত, স্থলে প্লেগের পূতিগন্ধ, বঙ্গ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি, মহামারীর ক্রীড়াস্থল। বঙ্গে প্রতি সহস্র নবজাত সন্তানের অর্দ্ধাংশ দশ বৎসর অতীত না হইতে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু স্বাস্থ্যপরায়ণ ইংলণ্ডে সেই অর্দ্ধভাগের জীবনাশা পঞ্চাশৎ বৎসর। প্রতি সহস্র জীবিতের মধ্যে ইংরাজের তুলনায় সমবয়স্ক বাঙ্গালীর মৃত্যুসংখ্যা তিন গুণ অধিক। এই ভীষণ অকালমৃত্যুর ফল,—বঙ্গে পঞ্চবর্ষের অনধিকবয়স্ক বালক এবং পঞ্চাশৎবর্ষাধিকবয়স্ক প্রবীণের সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় অর্দ্ধেক মাত্র। অনুধাবন করিলেই দেশের অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ, সমস্যা কিরূপ গুরুতর, সহজে অনুভব হইবে। কিন্তু কেবল মৃত্যুতেই কি এ কালানলের পর্য্যবসান হইতেছে? বিশজন পীড়িতের মধ্যে একজন মৃত্যু আশ্রয় করে—দশলক্ষ অকালমৃত্যুর পশ্চাৎ দুই কোটি ব্যাধিগ্রস্ত বিদ্যমান। ভগ্নদেহ, ক্ষীণশক্তি, উদ্যমরহিত, শ্রম-অসহিষ্ণু, বাল্যে ব্যথিতবলবীর্য্য, যৌবনে জরাগ্রস্ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা গৃহে গৃহে বর্ত্তমান। পীড়ার যন্ত্রণা, উপার্জ্জন অভাবে অর্থকষ্ট, আশার উচ্ছেদ, সংসারের আশ্রয় অন্নদাতার নাশে পারিবারিক দুঃখ দরিদ্রতা—মৃত্যুর মর্ম্মপীড়া চতুর্গুণ বৃদ্ধি করে। কি পাপে এই অকালমৃত্যু বঙ্গের জীবনীশক্তি গ্রাস করিতেছে? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? এ অন্তর্ভেদী প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

রামকৃষ্ণ মিশন।

(আমেরিকা)

স্বামী ত্রিগুণাতীত বিগত ২৯ শে এপ্রেল পর্য্যন্ত ক্যালিফোর্ণিয়ার রাজধানী সান্‌ফ্রানসিস্কো সহরে বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন। ৪০ নং ষ্টিনার ষ্ট্রীটে বেদান্তসমিতির অধিবেশন হয়। ইঁহার কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে হইয়াছিল। প্রতি সোমবার সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় ছাত্রগণের নিকট ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা। প্রতি রবিবার বেলা ২টার সময় প্রকাশ্য বক্তৃতা। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রি আটটার পর ধ্যানশিক্ষা। সর্ব্বপ্রকার বক্তৃতার পরই ছাত্রগণকে প্রশ্নোত্তর করিবার অবকাশ প্রদান করা হয়। ইঁহার কার্য্যতালিকা এইরূপ। ২৯ শে এপ্রেল পর্য্যন্ত সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে কার্য্য করিয়া মে, জুন ও জুলাই, লস এঞ্জেলস নামক স্থানে প্রচার। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে পুনরায় সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর কার্য্য। নবেম্বরে শান্তি আশ্রমে কার্য্য করিয়া ডিসেম্বরে প্রাচারিক ভ্রমণে বাহির হইবেন। বিগত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজার দিন সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্তসমিতির প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে একটী করিয়া সংস্কৃত নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

(মান্দ্রাজ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে মান্দ্রাজে প্রত্যাগত হইয়া নিয়মিত রূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

(কলিকাতা)

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির কথা উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগে কলিকাতা সহরের একটী গুরুতর অভাব মোচন হইবার আশা হইয়াছে। কলিকাতার ছাত্রাবাস সকলে আহারের বেবন্দোবস্ত ও স্বাস্থ্যকর নৈতিক শাসনের অভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ আশা স্বরূপ ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃ শারীরিক ও নৈতিক অধোগতি হইতেছে দেখিয়া এই সমিতির সভ্যগণ অনেক দিন হইতেই একটী আদর্শ ছাত্রাবাস স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ৬৮।১ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটী চতুস্তল, প্রশস্ত, অবাধবায়ুপ্রবাহিত, স্বাস্থ্যকর, মনোরম অট্টালিকায় বিগত ১৮ই জুন তারিখ হইতে 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'

(Vivekananda Memorial House) খোলা হইয়াছে। এই ছাত্রাবাসের সমুদয় কার্য্য রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। আমরা ইহার নিয়মাদি ও বিশেষ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। এক্ষণে যাঁহারা ইহার নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা করেন, উপরোক্ত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত নিয়মাবলি প্রেরিত হইবে।

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি।—উপরোক্ত বিবেকানন্দ সমিতির অনুকরণে বাগবাজার বসুপাড়ার ছাত্রবৃন্দ প্রায় ছয়মাস হইল, একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দ ও কার্য্যাধ্যক্ষ, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি। ৫০ নং বসুপাড়া লেনে (বাগবাজার) এই সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া যাহাতে ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির দ্বারা এই বাগবাজার অঞ্চলের লোকের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা বলা যায় না। গত প্লেগের সময় জনৈক সহৃদয় লোকের সাহায্যে প্রায় ৩৫০ খানি খোলার ঘর এবং ১৬ জন ভদ্রলোকের বাটী ৮ জন মেথর ও একজন ভিস্তি রাখিয়া রীতিমত পরিষ্কার করা হয়। প্রায় মাসাবধি ঐ কার্য্য হইয়াছিল। সমিতির সভ্যগণ যেরূপ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া নিজেরা মেথর ভিস্তিদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে দিন দিন স্বার্থত্যাগরূপ মহাব্রতের সাধনায় উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইঁহাদের আর একটী প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রতি রবিবার সমিতির যুবকবৃন্দ দলে দলে বহির্গত হইয়া ঝুলি লইয়া বাটী বাটী ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহ করেন ও প্রতিমাসে পাড়ার অসহায়, নিঃস্ব, ভদ্র পরিবারগণকে নিজেরা উহা পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। ইঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত কলিকাতার প্রতি পল্লীতে অনুকরণ করা হউক, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

(কনখল)

কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার অধ্যক্ষ আমাদিগকে লিখিতেছেন,—

"ছাত্রগণকে অন্যান্য বিষয় ব্যতীত বেদ, উপনিষদ, অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতিও পড়ান হইবে। একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত অনুগ্রহ করিয়া পড়াইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ উক্ত আশ্রমের এপ্রেল মাসের রিপোর্ট আমাদের নিকট প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, আশ্রমে এগার জনকে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। তন্মধ্যে ২জনের মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ২৭৮ জন সাধু ও ৪১ জন গৃহস্থ ঔষধ লইয়া গিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কেবল ২ জন সাধু পীড়িত অবস্থাতেই ঔষধ লওয়া বন্ধ করেন। এই মাসে বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি ১০৲ টাকা, এইচ, আর, শ্রীনিবাস রাও ৫৲ টাকা, বাবু বিপিন বিহারী দে, পার্ব্বতীপুর ৫৲ টাকা, বাবু গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ২৲ টাকা, রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথজী, আগরা, ১৫৲ টাকা, বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়, পাবনা, ২৫৲ টাকা ভি, সি, শেষাচারা, মান্দ্রাজ ৫৲ টাকা, একজন বন্ধু ১৷৷০. জি, সি, শেঠ, কলিকাতা ২০৲ এবং মান্দ্রাজের কতিপয় বন্ধু মিলিয়া ২৫৲ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এক মন ৩০ সের ময়দা, ২৭ সের ডাল, একমন ৩০ সের চাল, ২ সের লবণ, ৯৶০ আনার দুগ্ধ ও কুম্ভমেলার সময় সাধুগণকে ভোজন করাইবার জন্য ৩০৲ টাকা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিচারবিভাগের কোন বন্ধুর নিকট এবং আর একজন শেঠের নিকট ৫ মন চাল, ৫ মন গম ও ২ মন ডাল পাওয়া গিয়াছিল। এই চাল ডাল প্রভৃতি সব খরচ হইয়াছে। তৎসওয়ায় খাইখরচ ২০৲ টাকা, কাপড় ৭৷৷০, আলো ২।০, বাটীভাডা ৩৲ টাকা, গৃহসরঞ্জাম, ব্রাহ্মণ চাকরাদির মাহিনা ১২৴১০, ডাক খরচ ১৷৷০ ও ঔষধ বাবদ ৪৮৷৶১৫, সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫৶১৫ খরচ হইয়াছে।

১৭ই বৈশাখের উদ্বোধনে জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি এই সেবাশ্রমের জমিক্রয়ের জন্য ১৫০০, টাকা দিয়াছেন, লিখিত হইয়াছিল। তিনি এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে আরও ৮০০, শত টাকা প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা এই মহৎকার্য্যে সাহায্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, সাহারাণপুর, এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় তাঁহাদের টাকার নিয়মিত প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

(বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম।)

আশ্রম প্রতিষ্ঠা।—গত বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিনের জন্য বারাণসীধামে অবস্থান করেন। সেই সময় কাশীনিবাসী জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি কাশীধামে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন। স্বামীজির অনুমতি অনুসারে স্বামী শিবানন্দ ১৩০৯ সালের ১লা আষাঢ় তারিখ হইতে কাশীর লাক্সা নামক মহল্লায় খাজাঞ্চীর বাগান নামক একটী বাগানবাটী ভাড়া লইয়া কার্য্য করিতেছেন।

আশ্রমের উদ্দেশ্য।—দেশীয় যুবাগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবপ্রদর্শিত পথাবলম্বনে যাহাতে সকলে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া আপনার মুক্তিসাধন ও অপরকে সর্ব্ববিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারেন, ইহাই এই আশ্রমের বিশেষ লক্ষ্য।

কার্য্যপ্রণালী।—ব্রহ্মচারিগণকে রাখিয়া সাধন ভজন ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া যাইবে। শুদ্ধ সংস্কৃত নয়, যাহাতে আশ্রমবাসিগণ ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ভারতে ও ভারতবহির্ভূত প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাইতে পারেন, এ আশ্রম হইতে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশাবলী আশ্রমবাসিগণের বিশেষ আলোচনার বিষয় থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কাশী-বাসী অনাথ রোগী আতুরাদির সেবাকার্য্য আশ্রমবাসীদের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ হইবে। এই ব্রহ্মচারিগণ শিক্ষিত হইলে চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতও অবলম্বন করিতে পারেন অথবা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংযতভাবে গৃহধর্ম্ম পালনও করিতে পারেন। গৃহিগণও তাঁহাদের অবকাশমত এখানে কিছুদিন বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া আবার গৃহে গমন করিতে পারেন। আশ্রমে বাসকালীন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারিগণের প্রতিপাল্য সমুদয় নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের ভিতর ধর্ম্মভাব বিস্তারের জন্য সময়ে সময়ে আশ্রমে পাঠ বক্তৃতাদি হইবে।

গত একবৎসরের কার্য্য।—আশ্রম স্থাপনের সংবাদ স্থানীয় সংবাদপত্র ভারতজীবনে প্রকাশ করা হয়। প্রথমে প্রায় তিনমাস আশ্রমে

সাধারণের জন্য সপ্তাহে তিনদিন ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়, এবং দুইজন ব্রহ্মচারীকে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে পাঁচজন ব্রহ্মচারী আশ্রমভুক্ত হন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সাহায্যে সকল ব্রহ্মচারীকে ব্যাকরণ পড়ান হয় এবং ভগবদ্গীতা, বিবেকচূড়ামণি, ভারতান্তর্গত সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায় (শাঙ্করভাষ্য সহিত) পড়ান হয়। ধ্যান জপ পূজাদিও নিয়মিতরূপে হয়। ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাইয়া অনাথগণের সেবা করিয়াছেন। উপরোক্ত ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে একজন কলেজে পড়িতেন, তিনি এক্ষণে পুনরায় কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে গিয়াছেন। আর একজন সরকারী কর্ম্ম হইতে ছয়মাসের ছুটি লইয়া সাধন ভজন ও পাঠাদি করিতেন, তিনিও এক্ষণে অবকাশান্তে কর্ম্মস্থলে গিয়াছেন। উপস্থিত আশ্রমে দুইজন সন্ন্যাসী ও তিনজন ব্রহ্মচারী আছেন।

সাহায্য প্রার্থনা।—এইরূপ আশ্রম স্থায়ী হইলে তদ্দ্বারা দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই আশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে প্রাণপণে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি। আশ্রমের বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী এবং কি উপায়ে এই আশ্রমের স্থায়িত্বপথে সহায়তা করা যাইতে পারে, জানিবার জন্য আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, খাজাঞ্জির বাগান, লাক্সা, বেনারস সিটি ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রম কথা প্রসঙ্গে।]

আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী, শনিবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ভক্তেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়াছেন। অধর, মাষ্টার আসিয়াছেন; তাঁহারা দশহরা উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন। রাখালের বাপ ও রাখালের বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন। রাখালের বাপের শ্বশুর ঠাকুরের নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়াছেন। তিনি সাধক লোক, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন, ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন।

শ্বশুর। মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মত থাক। পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুস্‌কির মত থাক, সে ঘরকন্নার সব কায করে, কিন্তু উপপতির উপর মন পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কায সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রাহ্মদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারের রোগী, কেমন কোরে রোগ সার্‌বে? আবার তেঁতুল মনে কল্লে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বদাই লেগে আছে, ঐটী জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, একজালা জল খাব। বড় কঠিন। সংসারে নানান গোল। "এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম—কথিত। প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা। ৫৭ নং রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় বাবু শান্তিরাম ঘোষের নিকট পাওয়া যায়।

মারবো, ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারবো।” “এদিকে যাবি, জুতো ফেলে মারবো।” আর নির্জ্জন না হলে ভগবান চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গড়বো, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা হলে সোনা গলান কেমন কোরে হয়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে কোরে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হোলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, তা হলে ভাল কাঁড়া কেমন কোরে হয়?

একজন ভক্ত। মহাশয়, এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে। তীব্র বৈরাগ্য হয়, তা হলে হয়। যা মিথ্যা বলে জানছি, রোক্ কোরে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারি ব্যাম, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে, স্বর্ণ পটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না, বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে কল্লে, জল না খেয়ে কেমন কোরে আমি থাকবো। আমি রোক কল্লুম, আর জল খাব না, পরমহংস, আমি ত পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস—দুধ খাব।

“কিছুদিন নির্জ্জনে থাকতে হয়। বুড়ি ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নির্জ্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রতি)। তাই ত ছোকরাদের থাকতে বলি। কেন না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেস সংসারে গিয়ে থাকতে পার্ব্বে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর যদি সবই কচ্ছেন, তবে আর ভালমন্দ, পাপ পুণ্য এসব বলে কেন? পাপও তা হলে তাঁর ইচ্ছা।

রাখালের বাপের শ্বশুর। তাঁর ইচ্ছা আমরা কি কোরে বুঝবো?

“Thou great First Cause least understood.*

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টিই এই রকম, ভালমন্দ, সৎঅসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আমগাছ, কোনটা কাঁটালগাছ, কোনটা আমড়াগাছ। দেখ না, দুষ্টু লোকেরও

* Pope

প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দ্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়।

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কি জান, সংসার কল্লে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পুরোন হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। প্রথম জন্ম বাপ মা দেন, তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। * কামিনীকাঞ্চন, এই দুটী বিঘ্ন। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ কোরে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জান্‌তে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, তখন একটুও বুঝ্‌তে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌঁছুলে তখন দেখ্‌তে পেলুম, কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝ্‌তে দেয় না। কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী। ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, আমাকে ভূতে পেয়েছে। সে বলে, আমি বেশ আছি।

(গৃহস্থ ও ক্রোধ—সন্ন্যাসী ও ক্রোধ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়, আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়্‌লেই ক্রোধ।

মাষ্টার। আমার পাতের কাছে বেরাল মুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন! একবার মাল্লেই বা, তাতে দোষ কি? সংসারী ফোঁস কর্‌বে। বিষঢালা উচিত নয়। কাযে কারুর অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। তা না হলে শত্রুরা এসে চেপে ধর্‌বে, অনিষ্ট কর্‌বে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

একজন ভক্ত। মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখ্‌ছি। কটা লোক ওরকম হতে পারে? কৈ, দেখ্‌তে ত পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন হবে না? ও দেশে শুনিছি, একজন ডিপুটি খুব লোক, প্রতাপ সিং। দান, ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি এই সব নাকি অনেক

* Except ye be born again ye can not enter into the Kingdom of Heaven.
Christ

গুণ আছে। আমাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছিল। এই রকম সব অনেক লোক আছে বৈ কি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "সাধন বড দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হোলে আর বেশী খাটতে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

"ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন," এমন সময় গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বল্লে, ঠাকুর, এখন কি হবে। ব্যাসদেব বল্লেন, আচ্ছা, আমি তোদের পার কোরে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড খিদে পেয়েছে, কিছু আছে? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, উনি সমস্ত ভক্ষণ কল্লেন। গোপীরা বল্লেন, ঠাকুর, পারের কি হোলো। ব্যাসদেব তখন ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, বল্লেন, হে যমুনে, আমি যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তা হলে তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বল্তে না বল্তে জল দুধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক্; তারা ভাব্তে লাগ্লো, উনি এইমাত্র এত খেলেন আবার বল্ছেন, যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি। এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি খাই নাই, হৃদয় মধ্যে নারায়ণ আছেন, তিনি খেয়েছেন।

"শঙ্করাচার্য্য এ দিকে ব্রহ্মজ্ঞানী আবার ভেদবুদ্ধিও আছে। চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে আস্ছে, উনি গঙ্গাস্নান কোরে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। শঙ্করাচার্য্য বলে উঠ্লেন, এই, তুই আমায় ছুঁলি। চণ্ডাল বোল্লে, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর নন, পঞ্চভূত নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল।

"জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কী বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বল্তে লাগ্লো, রাজা রহুগণ তখন পাল্কী থেকে নীচে এসে বল্লে, তুমি কে গো? জডভরত বল্লেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও যোগ—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আমিই সেই,' 'আমিই শুদ্ধ আত্মা,' এটী জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এসব ভগবানের ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য না থাক্লে ধনীকে কে

জান্‌তে পার্‌তো। তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বল্‌বেন, আমিও যা, তুইও তা, তখন এক কথা। খানসামা যদি, রাজা বসে আছেন, আর রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, রাজা, তুমিও যা, আমিও তা, লোকে তাকে পাগ্‌ল বল্‌বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা যদি একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্‌, ওতে দোষ নেই, তুইও যা, আমিও তা,' তখন যদি খানসামা গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবরা যদি বলে, আমি সেই, আমি সেই, সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের কি জল হয়?

"কথাটা এই, মনস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়।

"মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়, ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী,' এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যখন ভাব হয়ে যায়, তখন আর সব কথাগুলো বল্‌তে পাবে না, কেবল বলে, হা। ভাব হলে বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"একজন ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় একজন লোক এসে বল্লে, 'ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে।' যে ঝাঁট দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক না হয়, তা হলে সে ঝাঁট দিতে থাকে আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা, তাইতো গা, লোকটা মারা গেল, বেশ ছিল।' এদিকে ঝাঁটও চল্‌ছে। আর যদি আপনাব লোক হয়, তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায় আর এঁ্যা বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে, তখন আর কোন কায বা চিন্তা কত্তে পারে না।

"মেয়েদের ভিতব দেখ নাই? যদি কেউ অবাক্‌ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, 'তোর ভাব নেগেছে নাকি লো।' এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক্‌ হয়ে হাঁ কোরে থাকে।

"সোঽহং, সোঽহং, কল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোক সুমুকঠেলা।"

ঠাকুর আর একজন ভক্তকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এরও লক্ষণ ভাল। কপাল ও চোকের লক্ষণ যেন যোগ কোরে উঠে এল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর সকলের এক অবস্থা নয়। জীব চার প্রকার বলেছে,—বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, আর নিত্যজীব। সকলেরি যে সাধন কোত্তে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন কোরে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদ। হোমা পাখী আকাশে থাকে, ডিম পাড়্‌লে ডিম পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তেই ডিম ফুটে যায়। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়্‌তে থাকে। এখনও এত উঁচু যে, পড়্‌তে পড়্‌তে পাখা ওঠে। যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে দেখ্‌তে পায়, তখন বুঝ্‌তে পারে যে, মাটীতে লাগ্‌লে চুরমার হয়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা, কোথায় মা।

"প্রহ্লাদাদির সাধন ভজন পরে, আগে ঈশ্বরলাভ। (রাখালের বাপের দিকে চাহিয়া)। নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, ত নিত্যসিদ্ধই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়্‌লে ছোলাগাছই হয়। এইরূপ নিত্যসিদ্ধের আগে ঈশ্বরলাভ, তার পরে সাধন, যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল তার পরে ফুল।

"তিনি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোন খানে যেন একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছে, কোন খানে যেন একটা মশাল জ্বল্‌ছে। বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনিছি, কত দূর তার বুদ্ধির দৌড়। যখন বল্লুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বল্লে, মহাশয়, তবে তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বল্লুম, তা দিয়েছেন বই কি। শক্তি কমবেশী না হলে তোমার নাম এত হবে কেন? আর আমরাই বা তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বো কেন? তোমার বিদ্যে, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো আর দুটো শিং বেরোয়নি। বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যে, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেল্লে, 'তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' কি জান, প্রথমে জালে বড় বড় মাছ পড়ে, রুই, কাতলা, তার পর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো, পুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়, একটু দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জান্‌লে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"

ভূতের গল্প।

গল্পটি মাদ্রাজি। তবে সাধারণতঃ ভূতের গল্প যেমন মিথ্যা হয়ে থাকে, আশা করা যায়, এটি তেমন হবে না।

ভূতের গল্প কয়ে অনেক লোকে, কিন্তু চাপাচাপি কোরে ধর্‌লে বলে থাকে যে, তারা স্বচক্ষে দেখেনি, অপরের মুখে শুনেছে। কদাচ কখন একজন লোক চখে পড়ে, যে বলে সে দেখেছে। যা হোক, আমার এ গল্পটি মিথ্যা যে নয়, হলপ্ কোরে বল্‌তে পারি না।

ভূত আছে অনেক জাতির। কিছু কাঠ খড় পুড়িয়ে একটি তালিকা সংগ্রহ করা গিয়েছিল, খোয়া গিয়েছে। ভয়ে বা ভূতেই নিয়ে গেল! উপনিষদে কোথাও আছে না যে, দেবতারা নিজনামে প্রকাশ হতে চান না? নাম বা জাতি প্রকাশ করা পরলোকের ফ্যাশন না হতে পারে। যাই হক, লোকসানটা সম্পাদক মহাশয়ের অদৃষ্ট বল্‌তে হবে, কারণ, এরূপ লোকসানের আর পূরণ হয় না।

এখন গল্প। মাদ্রাজে কোন গ্রামে পুরাকালাচারী নামে একজন বিখ্যাত ভূতের রোজা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাস কর্‌ত। রোজাগিরি কোরে ব্রাহ্মণ বেশ দুপয়সা জমিয়েছিল। সংসারের মধ্যে গৃহিণী ও নরসিমাচারী বলে একটি ছেলে। ছেলেটিকে লেখা পড়া শেখাবার বড় সুবিধা হয়নি, ব্রাহ্মণকে ঘর ছেড়ে বাহিরে বাহিরেই অনেক সময় থাকৃতে হত। গিন্নির হাতে ছিল ছেলের ভার, পয়সা কড়িরও টানাটানি ছিল না, সুতরাং 'অবুতবু গিরিসুতো'র বদলে নরসিমার বিদ্যা দাঁড়িয়েছিল 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে' ইত্যাদি।

তাড়াতাড়ি কোরে নরসিমার পৈতে হল, বিয়ে হবে বলে। মার সাধ, কচি বৌটি ঘরে আনেন, ঘট মট করে বেড়ায়, ঘরের শোভা হয়।

নরসিমাচারীর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসৎসঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক দোষগুলি ক্রমে তাকে অধিকার কর্‌লে। সাদাকথায় নরসিমা একটি প্রকৃত ইয়ার হয়ে উঠ্‌ল।

তার বুড়ো বাপ যতদিন পার্‌লে, দূর দূর দেশে গিয়ে আপনার বিদ্যার জোরে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌লে। পরে যখন কমজোর হয়ে পড়্‌ল, অসুখ বিসুখ এসে ধর্‌লে এবং ব্রাহ্মণকে অথর্ব্ব করে ফেল্‌লে, তখন বাহিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মরা হাতি লাখ টাকা। ব্রাহ্মণ না বেরুতে পার্‌লেও লোকে বাড়ীতে এসে ঝাড়, ফুঁক, জলপড়া প্রভৃতি করিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু ব্রাহ্মণের বড়ই মনকষ্ট যে, ছেলেটা মানুষ হল না। ব্রাহ্মণের বড় ইচ্ছা যে, নরসিমাকে আপনার বিদ্যা শিখিয়ে যায়। কিন্তু নরসিমার এমন হাল যে, চুলের টিকিটি দেখ্‌তে পাওয়া ভার। তার পর রোজাগিরি?—ফুঃ! বাপ রোজাগিরি কোরে রোজগার করেছে, তাই বলে কি তাকেও কর্‌তে হবে? ইয়ারদের চখে একেবারে পতিত হয়ে যাবে যে!

ওদিকে বৃদ্ধের আপনার ব্যবসায়ে অসামর্থ্য, লোকের অনুরোধ ও আবেদন ভূতের হাত থেকে ত্রাণ কর, আপনার বিদ্যা ছেলেকে দিয়ে যাও। একদিন সকালে বুড়োর বড় অসুখ, এখন তখন। লোক পাঠিয়ে অনেক কষ্টে নরসিমাকে বাড়ীতে ধরে এনেছে, অবস্থা তোয়ের। মা অনেক কোরে কেঁদে কেটে বোঝাচ্ছে, বুড়ো তো যায়, বিদ্যাটা শিখেনে। অন্যদিন গ্রাহ্যেও আসেনা, সেদিন কেমন নেশার ঝোঁকে বলে ফেল্‌লে যে, শিখ্‌বে। তখনি দীক্ষার উপকরণাদি সংগ্রহ হয়ে গেল, বাড়ীর চারদিকে গণ্ডি টেনে, ধুলপড়া দিয়ে গিরগিটির মাথা, বেঙের নাড়ি, উটের লেজ, খেঁকশিয়ালির পিত্তি, ডাইনির চুল, ভুতুড়ির শিকড় প্রভৃতি যাবতীয় মসলা যথাবিধি চাঁড়ালের খুলিতে মোযের মদে কচিছেলের হাড়ের আগুনে চড়িয়ে দেওয়া হল। পৃথিবীর ভূত, পেত্নি, শাঁখচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্য, মাম্‌দো, কন্ধকাটা, আলেয়া, ঘোড়াভূত, গোভূত ও আর আর উপরি দেবতারা ব্রাহ্মণের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে গিজ গিজ কিল কিল কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু গণ্ডির দশহাতের ভিতর আস্‌বার জোটি নাই। ব্রাহ্মণ তাদের সবাইকে আপনার বিদ্যার তেজে দেখ্‌তে পাচ্ছে ও পুনঃ পুনঃ ধুলপড়া, জলছড়া মেরে দাবিয়ে রেখেছে। আর কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছেনা, কিন্তু সকলের গা ছম ছম কর্‌ছে, আর একটা কেমন শব্দ, বিকট আর্ত্তনাদের মত, রাগ হিংসা ভয় মিশান ভুতুড়ে আওয়াজ, সবাই মানসিক কাণে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন এই ভাবে কাট্‌ল। নরসিমার নেশা ছেড়ে গেল। সন্ধ্যার

পর ঘরের ভিতর পড়া জলে স্নান করলে ও মন্ত্ররক্ষিত কাপড় পরলে। চারিদিকে মদের বোতল ও কাল পাঁঠা বেষ্টিত হয়ে ষোড়শ উপচারে ভৈরব ভৈরবীর পূজা করতে লাগল, অবশ্য বাপের শিক্ষানুসারে। পাঁঠার রক্ত ও মদের অঞ্জলিতে স্রোত বয়ে গেল এবং আর আর যা কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার (অত্যন্ত গোপনীয়, কেবল সদ্গুরুবক্তৃগম্য, তাও উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে) সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়ে গেল। নরসিমা রোজাগিরি শিখে নিলে, তার বাপ কিন্তু সেই রাত্রিশেষে ভূতের হাতে প্রাণত্যাগ করলে, যথা 'রোজার মরণ ভূতের হাতে' ইতি প্রবাদ।

বাপের মৃত্যুর পর নরসিমা নরসিংহাকার ধারণ কোরে পয়সা ওড়াতে লাগল আর কি। বুড়ো বাপ যতদিন ছিল, মার কাছে জুলুম জবরদস্তি করে টাকা হাত করতে হত, এখন তার নিজের কাছেই চাবি। তার বেচারি স্ত্রীর কথা না উল্লেখ করাই ভাল।

এই প্রকারে কয়েক মাস গেল। তার পর মেয়েদের গহনা, ভিটে মাটি সব বিক্রি সুরু হল। স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী থেকে এসে নিয়ে গেল, বুড়ো মা নিকটেই কোন কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়ে রইল।

এদিকে কাপ্তেনের হাতে কড়ি পাতির অত্যন্ত অভাব হওয়াতে ইয়ারেরা যে যার সরে দাঁড়াল, নরসিমাচারী বেশ্যাধারচারী হলেন, এখানে একবেলা কাটে ত, ওখানে আর একবেলা। একদিন একজন বেশ্যা অনেক ধিক্কারের সহিত বল্লে, 'রোজাগিরি বিদ্যা জানিস তো রোজাগিরি করে টাকা নিয়ে আয় না।' নরসিমা হারানিধি ফিরিয়ে পেলে। "তাও ত বটে। সে দিন থেকেই প্রচার করতে সুরু করলে যে, জগদ্বিখ্যাত ভূতের রোজা পুরাকালাচারীর পুত্র ও শিষ্য নরসিমাচারী রোজাগিরি আরম্ভ করেছে। দু এক দিনের মধ্যেই নজরলাগা, বোকসে খাওয়া প্রভৃতি রোগী আসতে লাগল, সেই বেশ্যার বাড়ী থেকেই কারবার চলতে লাগল। ক্রমে দূর দূর থেকে ডাক আসতে লাগল, আবার নরসিমাচারী দুটাকা দুপয়সার মুখ দেখতে লাগল।

বছরখানেক তো এই রকমে যায়, বুড়ো মা অনেক চেষ্টা পায়, নরসিমা একখানা ছোট খাট বাড়ী ভাড়া করে বৌ নিয়ে এসে ঘর সংসার করে। নরসিমা ওসব কথা খেয়ালেই আনে না। ওদিকে কিন্তু এক বড়ই সমস্যা উপস্থিত হল। এক বছর হয়ে গেল, নরসিমা রোজাগিরি

করছে, কিন্তু নিজের গ্রামে, কেবল নিজের গ্রামে কেন, তিনদিনের রাস্তার মধ্যে তার ঝাড় ফুঁক বড় কাজের হয় না। রোগী দু এক দিন থাকে ভাল, আবার বিষম হয়ে উঠে, যেন একটা ভূতের জায়গায় একগাড়ি ভূতে পায়। কিন্তু তিনদিনের রাস্তার পারে নরসিমার বিদ্যা তার বাপের চেয়ে কোন অংশেই নিচুদরের দাঁড়ায় না। ব্যাপারটা সহস্র শাখা হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌ল, নরসিমার রোজাগিরির এই এক অদ্ভুত কাণ্ড। ক্রমে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ জনরব. এই সমস্যার মীমাংসা কর্‌লেন, পুরাকালাচারী মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে, সেই নরসিমার মন্ত্র তন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। এক স্থানের ভূত সেখান থেকে তিনদিনের রাস্তার পারে আর কিছু করতে পারে না। সেটা সেখানকার ভূতের এলাকার মধ্যে পড়ে কি না। তাই নরসিমা নিজের বাড়ী থেকে তিন দিনের রাস্তার মধ্যে বড় কিছু একটা করে উঠ্‌তে পারে না, তার বাহিরে তার মন্ত্র তন্ত্র খাটে।

এ সব কথায় নরসিমা এতদিন বড় কাণ দিত না। লোকে বল্‌লে হেসে উড়িয়ে দিত, আর কিন্তু তা চল্‌লো না। কারণ, সেই গ্রামের একটী ধনী গৃহস্থের যুবতী পুত্রবধূকে একদিন শনিবার দুপুরবেলা বেল গাছের তলায় 'বাতাস লাগে', তারপর থেকেই তার রোজ রোজ ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা যাওয়া, আবল তাবল বকা, সেই অবস্থায় লোকে কাছে এলে তর্জ্জন কোরে মারতে ওঠা প্রভৃতি উপরিদেবতার অনুগ্রহের লক্ষণ সব দেখা দিতে লাগ্‌ল। কেউ বলে বাইয়ের ব্যামো, কেউ বলে ও কিছু নয়, কেমন উড়ো বাতাস লেগেছে, একটু জল পড়িয়ে দাও, সেরে যাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রমে নরসিমাকে ডাকান হল। সে জলপড়া, গাবন্ধ প্রভৃতি দিয়ে গেল, কিন্তু সেই রাত্রি থেকে রোগী তুমুল হাঙ্গাম সুরু কর্‌লে। তিনজন পুরুষে ধরে রাখ্‌তে পারে না এত জোর, আর কেবল বলে, সে ব্রহ্মদৈত্য, নরসিমার মাথা খাবে। সে কেন তার পাওনা জনের ঝাড় ফুঁক করতে আসে, কেন তাকে জলপড়ায় চুবিয়ে দমবন্ধ কোরে মারতে চায়, কেন সরশে পড়া মেরে জ্বালিয়ে দেয়, বাণ মেরে কেটে কেটে নুন ঘসে, ধুলো পড়া দিয়ে কাণা করে দেয়? ব্যাপার এমন হয়ে উঠ্‌ল যে, সেই ধনী গৃহস্থ ও প্রতিবাসীদের মধ্যে সন্দেহ কারো রইল না যে, বৌকে সত্যসত্যই পুরাকালাচারী পেয়েছে। এখন

ভরসা একমাত্র নরসিমাচারীর বিদ্যা।

এদিকে নরসিমা যত কিছু জান্‌তো ও আন্দাজ করতে পার্‌লে, সব প্রয়োগ কর্‌লে, কিছুতেই কিছু হল না। রোগী দিন দিন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতে লাগ্‌ল।

অগত্যা একদিন নরসিমা মার কাছে গেল এবং সব ব্যাপার খুলে বল্‌লে। দেশ ছেড়ে পালান ছাড়া পথ নাই। মা কোন উপায় বল্‌তে পারে ?

মা বল্লে, 'কর্ত্তা যখন ভূতকে জব্দ করতে পার্‌তেন না, তখন সংযম, উপবাস, তপস্যা, গায়ত্রী জপ প্রভৃতি কর্‌তেন, তারপর রোগী দেখ্‌তে যেতেন। তুমি যে অনাচারে থাক, তোমার মন্ত্র ভূত মান্‌বে কেন ?'

'তিনদিনের রাস্তার পারে আমার মন্ত্র খাটে কেমন করে ?'

'গ্রাম ছেড়ে তিন দিন চলে গেলে অনাচার অনেক কমে যায়। মদ খাওয়া, বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খাওয়া, অসৎসঙ্গ প্রভৃতি কিছু থাকে না। কাজে কাজেই মন্ত্রের শক্তি স্ফূর্ত্তি হবার অবসর হয়'।

কথাটা লাগ্‌ল। এমন ভাবে ইয়ারকির ব্যাপারটা কোন দিন তার সামনে আসেনি ত।

নরসিমা অনেকক্ষণ ভাব্‌লে। একদিকে এতদিনের বদ্ধমূল অভ্যাস, আর একদিকে বিদ্যার লাঘব, অপমানের চূড়ান্ত, দেশত্যাগ। সংগ্রামে বিদ্যাভিমানই জিৎলে।

নরসিমা বল্লে, 'মা, আমি তিনদিন শুদ্ধাচারে, সংযমে থেকে তপস্যা ও গায়ত্রী জপ করবো, আমাকে বলে দাও, কি কর্‌তে হবে'। তার মা আকাশের চাঁদ হাতে পেলে, তখনি সেই কুটুম্বের বাড়ীতেই সব বন্দোবস্ত করে দিলে। নরসিমা তিনদিন ব্রাহ্মণের আচারে রইল।

ওদিকে লোকমুখে রোগীর কাণে খবর গেছে, নরসিমা শুদ্ধাচারে তপস্যা করছে, এইবার এসে ভূত তাড়াবে। ভূত ধেই ধেই কর্‌তে লাগ্‌ল। গৃহস্থের বৌকে ধরে রাখা বিষম হয়ে উঠ্‌ল আর কি।

তিনদিন পরে নরসিমা রোগীর কাছে গেল, এবং ৩।৪ ঘণ্টা ঝাড় ফুঁক করার পর রোগী শান্ত হল। আবার গৃহস্থের বৌয়ের মত সলজ্জ হল, কিছু খেলে এবং ক্রমে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। মাসাবধি আহার নিদ্রা কিছুই নিয়ম পূর্ব্বক চলেনি, সবই ভূতের তাড়নে হয়েছে।

সে রাত্রে নরসিমা হৃষ্টচিত্তে মার কাছে ফিরে এল এবং সুখবর শোনালে। তারপর দিন আবার খবর এল, রোগী চাঙ্গাম করচে; নরসিমার মনটা উড়ু উড়ু করছিল, সময়ে বাধা পেলে। রোগীর কাছে যেতে একঘণ্টা যাবৎ আগেকার মত গোলমাল করলে, পরে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল।

দুদিনেই ভূত বন্ধ হয়েছে, আর পাঁচদিন নেশা ভাঙ হয়নি, দশ বৎসরের অভ্যাস; পরদিন যা কিছু কড়ি পাতি ছিল নিয়ে আবার দৌড়ুল, একবারে ৫।৭ দিন গায়েপ।

ওদিকে রোগী আবার যেমন তেমনি হয়ে বসেছে। নরসিমাকে গালাগালির স্রোতে নাওয়াচ্ছে আর যত ভূতুড়ে দুষ্টুমি করছে।

ধনী গৃহস্থের লোকেরা এদিকে নরসিমাকে এক বেশ্যাপল্লী থেকে আর এক পল্লীতে খুঁজে খুঁজে বার করলে এবং ধাতস্থ কোরে ঝাড়ানোর জন্য নিয়ে গেল। সে দিন নরসিমা কিছুই করতে পারলে না। ভূতে তাকে কেবল মারতে বাকি রাখলে। সেই গৃহস্থ ও প্রতিবাসী সকলে এসে নরসিমাকে যারপর নাই ভৎর্সনা করতে লাগল; নরসিমা নির্ব্বাক্ হয়ে, ঘাড়টি হেঁট কোরে মার কাছে ফিরে এল। উপায় কি?

মা বল্লে, 'তোমার নেশা বদখেয়ালি না ছাড়লে কিছুই করতে পার্ব্বে না। এত অশুদ্ধ মন হলে কি ভূতে তার কাছে জব্দ হয়? তোমার নিজের মনও ভূতের মনের চেয়ে বেশী জড় ও তামসিক, ভূত কেন তোমার বশ হবে?'

'তবে কি মন্ত্রের কোন শক্তি নাই?'

'মন্ত্রের শক্তি শুদ্ধ মন না হলে খুলবে কেমন করে? যে সে জমিতে বীজ ছড়ালেই কি শস্য হয়?'

নরসিমার এসব কথা ভাববার অবসর হয় নি। কথাগুলো নূতন ও পাকা বলে বোধ হল। কিন্তু করে কি, নেশা ইয়ারকি কি ছাড়া যায়? সে রাত্রে নরসিমা ঠিক করলে, আবার দিনতিনেক জপ তপ করা যাক, তারপর বৌছুঁড়ি দুএকদিন ভাল থাকলে ভেসে পড়ব।

তার পরদিন প্রাতে আবার সেই গৃহস্থের বাড়ী থেকে লোক এল, রোগীকে ত আর রাখা যায় না। অতি ক্ষীণ হয়েছে, অথচ যেন গায়ে দশ হস্তীর বল। দেওয়ালে মাথা ঠুকে অথবা দোতলার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে, নরসিমা একটা কিছু উপায় করুক।

নরসিমাকে ডেকে তার মা বল্লে, "কর্ত্তা অনেক সময় বল্‌তেন যে, ভূত প্রেত কতদূর কি সত্য, তা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌তেন না, কিন্তু তিনি অনেক সময় দেখ্‌তে পেতেন যে, ভূতে পাওয়া রোগী রোজার মনের অবস্থা দ্বারা কলঙ্কিত হত। রোগী ভূতের ভয়ে রোজার কথা ভেবে ভেবে তার দোষ গুণ সব পায়। রোজা গুণী ও শুদ্ধ লোক হলে রোগী অল্পেই সেরে উঠে, আর রোজা অনাচারী, দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোক হলে তার মনের ময়লা রোগীর মনকে অধিকার কোরে ভূতের মত উপদ্রব করে। কর্ত্তা বল্‌তেন, অধিকাংশ ভূতে পাওয়া রোগী কোন মানসিক দুর্ব্বলতা বা ভয়কে উৎকট চিন্তা দ্বারা ভূত করে তোলে, পরে রোজার মনের ছাপ পেয়ে, মনটিকে ঠিক একটি প্রেতে পরিণত করে। আমার বোধ হয়, এই রোগী তোমার মনের মালিন্যে এত কষ্ট পাচ্ছে। তুমি শুদ্ধ না হলে এর মরণের হেতু তুমিই হবে।"

নরসিমার জপ তপ ঘুরে গেল, সে ঐ কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার অনাচারেই রোগী এত কষ্ট পাচ্ছে? পুরো বিশ্বাসও হয় না, অথচ একবারে অবিশ্বাস কর্‌তেও পারে না। গতবার তিনদিন শুদ্ধাচারে থেকে ঝাড়াতে গিয়েছিল, বেশ ফল হয়েছিল ত। আবার সেও বেশ্যাবাড়ী গেল, নেশা ভাঙ কর্‌তে লাগ্‌ল, রোগীও বিগ্‌ড়াল। যাহোক এবার কি হয়, দেখা যাক। কিন্তু তিনদিন আর বড় আহার নিদ্রা হল না। ঐ উৎকট চিন্তাই তার মস্তিষ্ক অধিকার করে রইল।

তিনদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা আবার রোগীর কাছে গেল। নিজের মলিনতার চিন্তায় মন ভরা। রোগী চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ছাড়া পায় ত রোজাকে ছিঁড়ে খায়। নরসিমা বহু যত্নেও সে রাত্রে কিছুই কর্‌তে পাল্লে না। অতি কাতর হয়ে মার কাছে ফিরে এল।

মা বল্লে, "আমার কাছে এক শেষ উপায় আছে। কর্ত্তা আমাকে একটি যন্ত্র দিয়ে গেছেন, তোমার ভূতের কাছে পরাজয় হলে তোমাকে দিতে। যন্ত্রটি কাচের, আকার কতকটা আমড়ার আঁটির মত। যখন দেখা গেল, কোন রকমেই ভূত বাগ মানে না, তখন সমস্তদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যাবেলা ঘিয়ের প্রদীপের আলোতে রোগীর সাম্‌নে ঐ কাচের ভিতর দেখ্‌তে হয়। কাচটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে ভূত রোগীকে পেয়েছে, কাচের ভিতর তার ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভূত

দেখ্‌তে পেলে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে সে কে, এবং তার পর রোগীকে শুনিয়ে সেই ভূতের গয়ায় পিণ্ড দিতে পাঠাতে হয়। রোগীকে পুনঃ পুনঃ শোনাতে হয়, গয়ায় পিণ্ড দিতে লোক গেছে এবং পিণ্ড দিয়ে ফিরে এলে রোগীকে গয়াসুরের প্রসাদ খাওয়াতে হয়। তা হলেই রোগী সারে। এতে না সার্‌লে আর উপায় নাই। কর্ত্তা বলেছিলেন, এ যন্ত্র তাঁকে একবারও ব্যবহার কর্‌তে হয় নি। তাঁর গুরুর কাছে যন্ত্রটি পেয়েছিলেন।"

নরসিমা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল। পরদিন সমস্ত দিন উপবাসী রইল এবং সন্ধ্যাকালে বহুমোড়কের মধ্যবর্ত্তী যন্ত্রটি নিয়ে রোগীর কাছে গেল এবং একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে বল্‌লে।

সারাদিনের উপবাস, আগের কয়েক রাত্রি অনিদ্রা, তার মনের মলিনতার জন্য রোগীর এত কষ্ট ও আসন্ন মৃত্যু এবং সেজন্য তার দায়িত্বের উৎকট চিন্তা প্রভৃতি কারণে নরসিমার মস্তিষ্ক একান্ত দুর্ব্বল হয়েছিল ও ঘুরছিল। তার উপর সেই প্রদীপের আলোকে কাচের যন্ত্রটি অনেকক্ষণ অবধি আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তে হল। একবার মনে হল, আবছাওয়া গোছ একখানা মুখ দেখ্‌তে পেলে। আবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, খানিক ক্ষণ পরে একটি ছবি দেখ্‌তে পেলে, মুখখানা চড়ান লম্বা, যেন কুপ্রবৃত্তি কদাচার মোহর করা, আপনার মলিনতার ভারে আপনি শুষ্ক ও ত্রস্ত, বিকট, যেন মানুষের মত অথচ ভূত,—এঁ্যা, সেই যে, এ যে তার নিজেরি চেহারা, কেবল মানুষের ভাব ও লাবণ্য হীন, তারি প্রেতের চেহারা—নরসিমার হাত কেঁপে যন্ত্রটি পড়ে গেল ও চূর্ণ হয়ে গেল, নরসিমা একটা অস্ফুট শব্দ করে বাহিরে দৌড়ে গেল।

'ব্যাপার কি'বলে সকলে তার পিছু নিলে, নরসিমা হতভম্ব, বল্‌লে, 'কাল আবার আস্‌বো, আজ কিছু হবে না'।

মার কাছে গিয়ে সব বল্‌লে আর হাপুস নয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, "মা, এখন কি হবে, জীবন্ত মানুষের প্রেত হয়, জান্‌তুম না। উপায় কি, এ প্রেত কেমন করে যাবে?"

মা বল্লে, "বাবা, তুমি যদি আপনার কুপ্রবৃত্তি গুলি ছাড়্‌তে পার, তাহলে এ প্রেত আপনি যাবে। কুপ্রবৃত্তি গুলিকে পুষ্ট করে প্রেত তৈরি করেছ, সেগুলিকে ক্ষীণ কর, প্রেত সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হবে।'

সেই মুহূর্ত্ত অবধি নরসিমা কায়মনোবাক্যে তার বুড়ো মার শরণ নিলে ও প্রাণপণে নিজের কুপ্রবৃত্তি গুলিকে মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল এবং একবারও কোন কুপ্রবৃত্তিকে কার্য্যাকার ধারণ করতে দিলে না। দিন পনেরর মধ্যেই নরসিমার যত্নে সেই ধনী গৃহস্থের পুত্রবধূ আরোগ্য লাভ করেছিল।

পূর্ব্ব মীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত।)

মনুষ্যের পক্ষে কোন্ কার্য্য শ্রেয়স্কর ও কোন্ কার্য্য অনর্থকর, তাহা জানিবার জন্য যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণ আছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত কতকগুলি উপদেশ বাক্যও প্রমাণ রূপে এই দেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সেই উপদেশ বাক্য কোন পুরুষের বিরচিত নহে এবং এসকল বাক্যের দ্বারা আমরা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য। ঐ সকল বাক্য আমাদিগকে যে কার্য্যটী নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সে কার্য্য কিছুতেই আমাদের করা উচিত নহে। সেই সকল বাক্যই লোকে বেদ এই নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই বেদই নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়।

এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা এ দেশে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনকেই মীমাংসাদর্শন বলা যায়। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল এই চারিটী ও অন্যান্যকতিপয় আস্তিক দার্শনিকগণও যদ্যপি "আমাদের পারলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞানলাভ বেদের উপর নির্ভর করে" এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি তাঁহারা একমাত্র বেদকেই, পারলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞানের প্রতি উপায় বলিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে বেদব্যতিরিক্ত অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাও আমরা আমাদের পারলৌকিক মঙ্গল বা অমঙ্গল জানিতে সমর্থ হইয়া থাকি।

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা দর্শন দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম পূর্ব্বমীমাংসা, দ্বিতীয় উত্তর মীমাংসা।

উত্তর মীমাংসা একণে অধিকাংশ লোকের নিকট বেদান্তদর্শন এই নামে পরিচিত। এইরূপ পূর্ব্বমীমাংসাও একণে অনেকের কাছে মীমাংসা দর্শন বা জৈমিনিদর্শন এই নামে পরিচিত।

শাস্ত্রকারগণ পূর্ব্ব মীমাংসাকে কোনকোনস্থানে অধ্বরমীমাংসা কোথাও বা কর্ম্মমীমাংসা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং উত্তর মীমাংসার প্রতিপাদ্য স্বরূপ ও রীতিবিষয়ে কোন কথা না বলিয়া এইক্ষণে পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য, স্বরূপ ও প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব্ব মীমাংসার প্রয়োজন।

সমগ্রবেদ হইতে আমরা যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহাই বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বমীমাংসার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্য ব্যতিরেকে বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তাহা বলিয়া আমরা যেন ইহা না বুঝি যে, "পূর্ব্বমীমাংসা এক খানি বেদের টীকা অর্থাৎ বেদের প্রত্যেক বাক্যের অর্থ যে পুস্তকে লিখিত আছে, তাহারই নাম পূর্ব্বমীমাংসা," কারণ, পূর্ব্বমীমাংসা টীকা, ভাষ্য বা বার্ত্তিকের রীতিতে একটীও বেদবাক্যের, এমন কি, একটীও বৈদিক পদের ব্যাখ্যা করে নাই, সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা বেদের টীকা বা ভাষ্য নহে অথচ পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্য ব্যতিরেকে বেদার্থ বুঝিবার পথ নাই।

বেদের অর্থ কি? ইহার উত্তরে পূর্ব্ব মীমাংসকগণ বলেন যে, কার্য্যই বেদের অর্থ। যে কার্য্য দ্বারা কোনপ্রকার লৌকিক প্রয়োজন সাধিত হয় না, কোন রূপ লৌকিকপ্রমাণের সাহায্যে সেই কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। সেই কার্য্য প্রতিপাদনই বেদের মুখ্য প্রয়োজন।

সে কার্য্যকে আবার তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা, যাগ দান ও হোম।

পূর্ব্ব মীমাংসকগণ বলেন, যে বৈদিকবাক্যের যাগ দান বা হোম রূপ অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, তাহার প্রামাণ্যই নাই, অর্থাৎ তাহাকে বেদ বলা যাইতে পারেনা। ইহাই জৈমিনির কর্ম্মবাদ।

সেই যাগ হোম বা দান রূপ বেদবিহিতকার্য্যের ফল কি? ইহার

উত্তর,—স্বর্গই তাহার ফল। সে স্বর্গ—দুঃখমিশ্রিত সুখ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, দুঃখের সহিতঅমিশ্রিত সুখ লাভ করিবার জন্যই লৌকিক প্রমাণের অগোচর যে সকল কার্য্য আমরা করিয়া থাকি, সেই কার্য্য সকলই যে বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অর্থ, ইহা যুক্তি দ্বারা যে শাস্ত্র আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, সেই শাস্ত্রের নাম পূর্ব্বমীমাংসা বা জৈমিনীয়দর্শন।

বেদের বিভাগ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কার্য্যই বেদের অর্থ, বেদের যে অংশ কোন কার্য্য প্রতিপাদনকরে না, তাহার কোনপ্রকার প্রামাণ্যই নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বেদের মধ্যে এমন কতকগুলি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐসকল বাক্যের দ্বারা আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কোন প্রকার উপদেশ পাইনা।

যেমন—

"সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্"

"তিনি রোদন করিয়াছিলেন। যে কারণ তিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার রুদ্র এই নাম হইল।" এই প্রকারের যে সকল বাক্য আমরা বেদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাদ্বারা কোনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে না, সুতরাং বলিতে হইবে যে, ঐ বাক্যগুলি বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে, অথচ চিরকাল পণ্ডিতগণ ঐ বাক্য গুলিকেও বেদের মধ্যে ধরিয়া লইতেছেন; এই প্রকার আশংকার সমাধান করিতে যাইয়া জৈমিনি বলিয়াছেন যে, সত্য বটে, বেদ কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই বুঝায় না, কিন্তু সকলবেদবাক্যই যে সাক্ষাৎ ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে, তাহা নহে, কতকগুলি সাক্ষাৎ যাগ দান বা হোম রূপ কর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ করে, আর কতকগুলি যাগ দান বা হোম রূপ কর্ম্মের অপেক্ষিত পদার্থগুলিকে সাক্ষাৎ বুঝাইয়া, পরোক্ষ ভাবে সেই পদার্থ নিচয়ের সহিত সংসৃষ্ট যাগ দান বা হোম রূপ কার্য্যকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

যাগ করিতে হইলে ঘৃত চাই, অগ্নি চাই, হোমকুণ্ড চাই, দেবতা চাই, অধিকারী চাই, সময় চাই, এতগুলি পদার্থ না বুঝিলে যাগ হোম বা দান প্রভৃতি বৈদিক কার্য্য বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, যাগ ক্রিয়া হইলেও

ঘৃত অগ্নি হোমকুণ্ড দেবতা বা অধিকারী প্রভৃতি ত আর কার্য্য বা ক্রিয়া নহে, ঐ সকলই দ্রব্য, ঐসকল দ্রব্য না বুঝিলে আমরা কোন যাগেরই স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। সুতরাং কেবল ক্রিয়ার স্বরূপ মাত্র বোধ করাইলে চলিবে কেন? ক্রিয়ার সঙ্গে নিত্যসংবদ্ধ বস্তুগুলিও বেদ অবশ্যই বোধ করাইতে বাধ্য, অন্যথা ক্রিয়া স্বরূপ বোধ করান বৃথা হইয়া উঠে। এই জন্য বেদের কতকগুলি বাক্য সাক্ষাৎভাবে কোন ক্রিয়ার স্বরূপ বোধ না করাইয়া, বাক্যান্তর দ্বারা বোধিত ক্রিয়ার সহিত নিয়তসম্বদ্ধ দ্রব্য বা দেবতা, অথবা সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযোগি কোন বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে বোধ করাইয়া দেয় এবং ফলতঃ পরোক্ষভাবে কোন না কোন ক্রিয়ার স্বরূপই প্রতিপাদন করিয়া তাহার অনুষ্ঠানের পক্ষে আনুকূল্য করিয়া দেয়। এই প্রকার ভাবে বাক্যগুলি বাছিয়া লইতে গেলে বেদের বিভাগ আপনা আপনিই হইয়া উঠে। তাই আচার্য্য জৈমিনি বেদকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক বাক্যকে পাঁচভাগে বিভাগ করা গিয়া থাকে, যথা—

বিধি নামধেয় মন্ত্র অর্থবাদ ও নিষেধ।

১। বিধি।

বেদের যে অংশ দ্বারা কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল উপায়, কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয় অথচ ঐ উপায় তাদৃশ প্রয়োজনের সাধন, ইহা আমরা অন্য কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা জানিতে সমর্থ হই না, বেদের সেই অংশকে জৈমিনি বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উদাহরণ, যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"। ইহার অর্থ—"অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে।"

অগ্নিহোত্র নামে যে হোম আছে এবং ঐ হোম যে কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় সুতরাং কর্ত্তব্য, এই বিষয়টী আমরা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ এই বাক্যব্যতিরেকে অন্যকোন প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি না, সুতরাং এই বাক্যটীকে বিধিবাক্য বলা যাইতে পারে।

অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ এই বাক্যটীর মধ্যে জুহুয়াৎ এই অংশটীকে বিধি বলা যায়। কারণ, হোম করিবে, এই প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ কেবল "জুহুয়াৎ" এই অংশের দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ অংশটীকেই বিধি বলা যায়।

বিধির বিভাগ।

উৎপত্তিবিধি, নিয়মবিধি ও পরিসঙ্খ্যাবিধি।

১। উৎপত্তি বিধি।—যে কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বরূপ পূর্ব্বে অন্যকোন রূপ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই, সেই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া প্রথমে আমরা যে বাক্যের দ্বারা অবগত হইয়া থাকি, সেই বিধি বাক্যকেই উৎপত্তি বিধি বলা যায়। উদাহরণ ;—

অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ,

অর্থ।—"অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে।"

এই অগ্নিহোত্র নামক হোম এক প্রকার ক্রিয়া। এইক্রিয়াকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইলে আমরা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এই বাক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ দেখিতে পাইনা, সুতরাং এই বিধিবাক্যটীকে উৎপত্তি বিধি বলা যাইতে পারে।

২। নিয়মবিধি।—লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদে যে সকল বিধিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই নিয়মবিধি বলা যায়। উদাহরণ ;—

"ব্রীহীন্ অবহন্তি।"

অর্থ।—ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য) গুলিকে অবঘাত করিবে (কাঁড়াইয়া লইবে)।

চাল ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিতকরিয়া পরিপাককরিলে যে আহার্য্য বস্তু নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে চরু বলা যায়, দশপূর্ণমাসনামক যাগে দেবতা-বিশেষের জন্য এই প্রকার চরু নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই চরু নিষ্পা-দনের জন্য চাউলের আবশ্যকতা। সেই চাউল কেমন করিয়া সাধিত হইবে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধি বাক্যটী পঠিত হইয়াছে। এই ব্রীহির অবঘাত করিলে কি ফললাভ হইবে? তণ্ডুল নিষ্পত্তিই (অর্থাৎ চাউল নির্ম্মাণ করা) ইহার ফল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, অবঘাত দ্বারা ধান্যের তুষগুলি ছাঁটিয়া চাল বাহির করিতে হয়, ইহা আমরা বেদের উপদেশ না পাইলেও বুঝিয়া থাকি। তবে বেদে এই প্রকার উপদেশ করা হইল কেন, যে, ব্রীহি-

গুলির অবঘাত করিবে? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি অবঘাত না করিয়া (অর্থাৎ না কাঁড়াইয়া) নখের দ্বারা ছাঁটা প্রভৃতি অন্য কোনউপায়দ্বারা আমরা যজ্ঞকালে ধান্যের তুষগুলি ছাড়াইয়া চাউল বাহির করিয়া চরু প্রণয়ন করি, তাহাহইলে এই প্রকার চরু দ্বারা, যাগের ফল যে শুভাদৃষ্ট তাহা সিদ্ধ হইবে না. এই কারণে বেদের উপদেশ হইতেছে যে, ব্রীহিগুলির অবঘাত করিয়াই তণ্ডুল বাহির করিয়া লইবে।

ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, যদি কোন একটী কার্য্যের দুইটী বা তিনটী উপায় বিদ্যমান থাকে অথচ এমন হয় যে, ঐ দুইটী বা তিনটীর মধ্যে যে কোন একটী উপায় দ্বারাই কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, অন্য উপায়ের আর অপেক্ষা করিতে হয় না, এরূপ স্থলে কোন একটী উপায় দ্বারা ঐ কার্য্যটী সাধিত হইয়া গেলে অপর একটী বা দুইটী উপায়ের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্য করিবার জন্য অন্যটীর গ্রহণ না করাও যাইতে পারে, এই প্রকারে কোন উপায়ের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে মীমাংসকগণ পাক্ষিক অপ্রাপ্তি বলিয়া থাকেন। এই পাক্ষিক অপ্রাপ্তিকে নিরাকরণ করিবার জন্য শাস্ত্রে যে বিধি দৃষ্ট হয়, তাহাকে নিয়মবিধি বলা যায়। এই নিয়ম অনুসারে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এইটী নিয়মবিধি হইল। কারণ, ধান্যের ভিতরে যে তণ্ডুল আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য তুষ গুলিকে ছাড়াইবার আবশ্যকতা। সেই তুষ ছাড়ানরূপ কার্য্যটী যেমন অবঘাত অর্থাৎ কাঁড়ান দ্বারা হয়, সেই প্রকার নখের দ্বারা খুঁটিলেও হয়। যদি কেহ নখের দ্বারা খুঁটিয়া তুষ ছাড়াইয়া ফেলে, তাহা হইলে অবঘাতের আর আবশ্যকতা কি? সুতরাং তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে। এই অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে পরিহার করিবার জন্যই শাস্ত্র বলিতেছে যে, ব্রীহির অবঘাত করিবে, সুতরাং এই বিধিটী নিয়ম বিধি হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তণ্ডুল নিষ্পত্তি ইত্যাদি প্রয়োজন হইল, তণ্ডুল নিষ্পত্তি ত নখের দ্বারা তুষ ছাটিয়া ফেলিলেও হয়, তবে বিশেষ করিয়া অবঘাতের নিয়ম করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, এই নিয়ম বিধির একটী অদৃষ্ট ফলও আছে। অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপ দৃষ্ট ফলও যেমন সিদ্ধ হয় সেইরূপ

অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুল নিষ্পন্ন হইলেও ঐ তণ্ডুলের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে যজ্ঞের সম্পূর্ণতা হয় অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা অবিকলই হয়।

৩। পরিসংখ্যা বিধি।—যদি কোন কার্য্যের সাধক অনেকগুলি উপায় বিদ্যমান থাকে অথচ ঐ সকল উপায়ের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া যদি সকল গুলিরই গ্রহণ সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থলে ইতর উপায়ের গ্রহণকে নিরাকরণ করিবার জন্য যদি কোনএকটী উপায়ের গ্রহণ করিবার বিধি পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই বিধিটীকে পরিসংখ্যা বিধি কহা যায়।

ইহার উদাহরণ এই যে, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।"

অর্থ "যাহাদের পায়ে পাঁচটী করিয়া নখ আছে, সেই পশুগণকে পঞ্চনখ কহে। সেই পঞ্চনখ পশুগণের মধ্যে শশ (খরগোশ) প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পশুকে ভক্ষণ করিবে।" এই যে পাঁচপ্রকার পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধি, ইহাকেই পরিসংখ্যা বিধি বলে, কেন বলে?

মীমাংসকগণ বলেন যে, আমরা যে বস্তু অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝি না বা বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই, সেই বস্তুকেই যদি বেদ বুঝাইতে পারে, তাহা হইলেই ত বেদকে সার্থক বলা যায়, বেদবিধিদ্বারা যদি এমন কোন পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, যাহা আমরা বেদবিধি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দ্বারাও বুঝিতে পারি, তাহা হইলে সে পদার্থ কখনই বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ হইতে পারে না। যে স্থলে বেদের এই প্রকার অনর্থকতার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, সেই স্থলেই বাধ্য হইয়া মীমাংসকগণ বেদের অর্থ ঘুরাইয়া করেন। এখানেও সেই নিয়মানুসারে আমাদিগকে বেদ বা বেদমূলক স্মৃতির অর্থ ঘুরাইয়া না করিলে চলিতেছে না; কারণ, যে মাংস খায়, সে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ইচ্ছা হইলে সকল প্রকার পঞ্চনখপশুই ভক্ষণ করিতে পারে অথবা করিয়াও থাকে, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মাংসাশী মনুষ্যের পক্ষে "শশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ পশু ভক্ষণ করিতে হইবে" এই প্রকার শাস্ত্রীয় বিধান না থাকিলেও সে ব্যক্তি অন্যপ্রমাণের সাহায্যে পঞ্চনখ পশুর ভক্ষণকে নিজের বুভুক্ষা নিবৃত্তির উপায় স্থির করিয়া লইতে পারে এবং স্থির করিয়া বিনা বাধায় ভক্ষণও করিতে পারে। এরূপ স্থলে শাস্ত্র কেন বলিতেছে

যে, "তুমি পঞ্চনখ পশুগণের মধ্যে ঐ শশ প্রভৃতি পাঁচটী পঞ্চনখ ভক্ষণ করিও।" শাস্ত্র না থাকিলে কি সংসারী জীব ঐ শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ খাইত না? ইহাত সম্ভবপর নহে, তবে কেন শাস্ত্র এই প্রকার বিধান দিতেছে? এই প্রকার শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সম্ভাবনা দূর করিবার জন্ত মীমাংসকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, এইরূপ স্থলে শাস্ত্রের অর্থ এরূপ নহে অর্থাৎ শাস্ত্র আমাদিগকে পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধান দিতেছে, ইহা ঠিক্ নহে। এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, শশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ব্যতিরেকে অন্ত বিড়াল বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে না অর্থাৎ অন্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে পরকালে বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এইরূপ যদি শাস্ত্রের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত রূপে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ, এইরূপ তাৎপর্য্য হইলে, আমরা ঐ শাস্ত্র দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহা শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। বিড়াল বা বানরের মাংস খাইলে মৃত্যুর পর আমাদের বিশেষক্লেশ ভুগিতে হইবে, ইহা শাস্ত্র ছাড়া অন্ত কোন প্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝিনা, সুতরাং এই বিষয়টী শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত প্রমাণের অগম্য, ইহাকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" এই শাস্ত্রের প্রামাণ্যও অবাধিত রহিল। এই কারণে মীমাংসকগণ এই প্রকার বিধিবাক্য গুলিকে পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া থাকেন।

নামধেয়।

যাগ হোম ও দান এইতিন প্রকার কর্ম্মই প্রধানভাবে বেদে বোধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাগ হোম প্রভৃতি এক জাতীয় কতক গুলি কর্ম্মের বিশেষ বিশেষ পরিভাষা ব্যতিরেকে বার বার প্রত্যেক ক্রিয়ার নাম, করিয়া উহাদের সমষ্টিকে প্রতিপাদন করা বড়ই গৌরবাবহ হয়। এই প্রকার গৌরবদোষ পরিহার করিবার জন্ত কতকগুলি একফলেরজনক-কর্ম্মকে এক একটী বিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা হয়। সেই বিশেষ সংজ্ঞা গুলিকে মীমাংসকগণ নামধেয় কহিয়া থাকেন। উদাহরণ যেমন—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং জুহোতি"

অর্থ। "দর্শপূর্ণমাস হোম করিবে।"

এই উদাহরণে "দর্শপূর্ণমাস" এই শব্দটী অমাবাস্যা ও পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য

পৃথক্ পৃথক্ যাগরূপ ক্রিয়াকে বোধকরাইতেছে। তাহার মধ্যে পূর্ণিমাতে আগ্নের উপাংশু ও অগ্নীষোমীয়, এবং অমাবস্যাতে আগ্নেয় ঐন্দ্রদধি ও ঐন্দ্রপয়ঃ নামক তিন তিনটী করিয়া যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ছয়টী যাগের আবার অনেকগুলি সাধারণঅঙ্গযাগ আছে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, যদি এই ছয়টী যাগের "দর্শপূর্ণমাস" এই একটী সাধারণ পরিভাষা না করা যায়, তাহা হইলে ওই ছয়টী যাগের অঙ্গ স্বরূপে বিহিত যাবতীয়সাধারণকর্ম্মের বিধান করিবার সময় বার বার ঐ ছয়টী যাগের প্রত্যেকেরই নাম করিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি ঐ ছয়টী যাগের দর্শপূর্ণমাস এই একটী নাম করা যায়, তাহা হইলে সাধারণ অঙ্গ স্বরূপ ছোট ছোট কর্ম্মগুলির বিধান কালে দর্শ পূর্ণমাস যাগের সাধারণ অঙ্গ এই এই হইবে, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিলেই গৌরব পরিহৃত হয়, অর্থাৎ ঐ ছয়টী যাগের প্রত্যেকের নাম করিয়া ঐসকল সাধারণ অঙ্গের বিধান করিবার আর আবশ্যকতা থাকে না।

এই নিয়ম অনুসারে "অগ্নিহোত্র" "জ্যোতিষ্টোম" "চিত্রা" "কারীরি" "সোম" "অগ্নিষ্টোম" প্রভৃতি শব্দও নামধেয় মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

মন্ত্র।

যজ্ঞ করিবার সময় হোতা যখন কোন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে কোন দ্রব্য (যেমন ঘৃত দুগ্ধ বা দধি প্রভৃতি) ক্ষেপণ করে, সেই সময় ঐ দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করিয়া লইবার জন্য বেদের যেসকল ভাগ তৎকালে উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেই ভাগগুলিকে মন্ত্র কহা যায়। ঋগ্‌বেদসংহিতা বলিলে আমরা এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রকে বুঝিয়া থাকি।

এখানে বলিয়া রাখি যে, আমরা যে পাঁচ ভাগে (অর্থাৎ বিধি, নামধেয়, মন্ত্র, অর্থবাদ ও নিষেধ) বিভাগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এক মাত্র মন্ত্রভাগছাড়া আর যে কয়টী ভাগ (অর্থাৎ) নামধেয় নিষেধ অর্থবাদ ও বিধি এই চারিটী ভাগই প্রায়শঃ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্র ছাড়া বেদের অন্য অংশকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

মন্ত্রের উদাহরণ—(দেবতার স্মারক)।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে
নিহোতা সৎসি বর্হিষি।

এই মন্ত্র পাঠ করিলে অগ্নি দেবতার স্মরণ হইবে, এবং অগ্নিকে

স্মরণ করিয়া হোতা আহুতি প্রদান করিবে, সুতরাং ইহাতে মন্ত্রের লক্ষণ যাইতেছে।

অর্থবাদ।

কোন বিহিত কর্ম্ম বা কোন নিষিদ্ধাচরণের যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা করিয়া বিধি বা নিষেধ স্বরূপ বেদ ভাগের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করাই বেদের যে অংশের উদ্দেশ্য, সেই অংশকেই মীমাংসকগণ (বৈদিক) অর্থবাদ বলিয়া থাকেন।

অর্থবাদের উদাহরণ—

সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্।

তিনি রোদন করিয়াছিলেন। যে কারণে রোদন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার (রুদ্রের) রুদ্রত্ব।

এই অর্থবাদ বাক্য বর্হিঃনামে একটী যজ্ঞের প্রস্তাবে পঠিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে।

তিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নাম হইল রুদ্র, ইহা বুঝিয়া আমার লাভ কি? বর্হিঃ যাগের সম্বন্ধী কোনপদার্থকে ইহা বুঝাইতেছে না, ইহা যাগের অনুকূল দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে না, সুতরাং ইহাকে মন্ত্র বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

অন্বয়। অহং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ অহং স্বধা অহং ঔষধম্ অহং মন্ত্রঃ অহং এব আজ্যং অহং অগ্নিঃ অহং হুতম্। ১৬।

মূলানুবাদ। আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি ও আমি হোম।

ভাষ্য। যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথংত্বামেব উপাসতে ইত্যত আহ। অহং ক্রতুঃ শ্রৌতকর্ম্মভেদঃ অহমেব। অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ। কিঞ্চ স্বধা অন্নং অহং যৎ পিতৃভ্যো দীয়তে। অহমৌষধং সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তৎ ঔষধশব্দবাচ্যম্। অথবা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নমৌষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থং ভেষজম্। মন্ত্রোঽহং যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে। অহমেব আজ্যং হবিশ্চাহং অগ্নির্যস্মিন্ হূয়তে সোঽহমগ্নিরহমেব। অহং হুতং হবনকর্ম্ম চ। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। যদি অনেক প্রকারে (তাহারা) উপাসনা করে, তবে তোমাকেই উপাসনা করে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলা হইতেছে যে—আমি ক্রতু (অর্থাৎ) বেদবিহিত কর্ম্মবিশেষ সেই ক্রতু আমিই। আমি যজ্ঞ (অর্থাৎ) স্মৃতিবিহিত কর্ম্মবিশেষ। আরও আমি "স্বধা" অন্ন যাহা পিতৃগণের উদ্দেশে অর্পিত হয় (তাহাই স্বধা শব্দের অর্থ) আমিই 'ঔষধ' সকল প্রাণী যাহা ভক্ষণ করে তাহাই ঔষধ শব্দ বাচ্য অথবা স্বধা শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ অন্ন, ব্যাধির শান্তির জন্য যে ভৈষজ্য ব্যবহৃত হয়, তাহাই ঔষধ শব্দের অর্থ। যে বাক্যপাঠকরিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করে, সেইবাক্যকে মন্ত্রকহে, আমিই সেই মন্ত্র। আমিই "আজ্য" হবিঃ যাহাতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও আমিই, আর যে হোমক্রিয়া, আমিই তাহা। ১৬।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ১৭॥

অন্বয়। অহং অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ (চ) (তথা অহংএব) পবিত্রং বেদ্যং ওঙ্কারঃ, ঋক্, সাম, যজুরেবচ॥ ১৭।

মূলানুবাদ। আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ এবং আমিই পবিত্র ও বেদ্য ওঁকার, আমি ঋক্ যজু ও সাম। ১৭।

ভাষ্য। কিঞ্চ, পিতা জনয়িতা অহং অস্য জগতো, মাতা জনয়িত্রী ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা, পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যং পবিত্রং পাবনং ওঁকারশ্চ ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। আরও আমি (এই) জগতের "পিতা" জনক "মাতা" জননী (আমি) "ধাতা" প্রাণিগণের উদ্দেশে কর্ম্ম সকলের ফলবিভাগ-কর্ত্তা, ও "পিতামহ" পিতারও পিতা, (আমি) "পবিত্র" পাবন ও "বেদ্য" জ্ঞাতব্য ওঁকার, (আমিই) ঋক্ যজুঃ ও সাম। ১৭।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮।

অন্বয়। (অহং) গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং (তথা) অব্যয়ং বীজম্। ১৮।

মূলানুবাদ। (আমিই) গতি ভর্ত্তা প্রভু নিবাস শরণ সুহৃৎ প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ। ১৮।

মূলানুবাদ। কিঞ্চ গতিঃ কর্ম্মফলং ভর্ত্তা পোষ্টা প্রভুঃ স্বামী সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য নিবাসো যস্মিন্ নিবসন্তি শরণমার্ত্তানাং মৎপ্রপন্নানাং আর্ত্তিহরঃ, সুহৃৎ প্রত্যুপকারনিরপেক্ষঃ সন্ উপকারী প্রভবঃ উৎপত্তির্জগতঃ, প্রলয়ঃ প্রলীয়তে যস্মিন্ ইতি। তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্ ইতি, নিধানং নিক্ষেপঃ কালান্তরোপভোগ্যংপ্রাণিনাং, বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণাং, অব্যয়ং যাবৎসংসারভাবিত্বাৎ অব্যয়ং, নহ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি। নিত্যং চ প্ররোহদর্শনাৎ বীজসন্ততির্নব্যেতীতি গম্যতে। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (আমি) "গতি" কর্ম্মফল, "ভর্ত্তা" পোষণ-কারী, "প্রভু" স্বামী, "সাক্ষী" প্রাণিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্মের দ্রষ্টা, "নিবাস" যাহাতে প্রাণিগণ নিবাস করে (তাহাকেই নিবাস কহে), "শরণ" আর্ত্ত হইয়া যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের আর্ত্তিকে আমি হরণ করি, "সুহৃৎ" প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ উপকারকারী, "প্রভব" জগতের উৎপত্তি, "প্রলয়" যাহাতে (জগৎ) প্রলীন হয়। এইরূপ

(আমি) "স্থান" যাহাতে অবস্থান করে (তাহার নাম স্থান), "নিধান" প্রাণিগণের কালান্তরে উপভোগ্য ফল সমূহ নিক্ষেপ করা যায় যে স্থানে, (তাহাকে নিধান বলে), "বীজ" প্ররোহধর্ম্মি জগতের প্ররোহের কারণ "অব্যয়" যতদিন সংসার, ততদিন (সেই বীজ) বিদ্যমান বলিয়া অব্যয়, এই জগতে বীজ না থাকিলে প্ররোহ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যহই সংসারে প্ররোহ দেখা যায় বলিয়া সংসারের বীজও অব্যয়, ইহা বুঝা যায়। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

অন্বয়। অহং তপামি, অহং বর্ষং, অহং গৃহ্ণামি অহং উৎসৃজামি, (অহং) অমৃতং মৃত্যুঃ চ হে অর্জ্জুন অহং সৎ অসচ্চ॥ ১৯।

মূলানুবাদ। আমি তাপ দিয়া থাকি, আমিই বৃষ্টি, আমিই গ্রহণ করি, আমিই উৎসর্গ করি, আমিই অমৃত ও মৃত্যু, হে অর্জ্জুন, আমিই সৎ ও অসৎ। ১৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ তপামি অহং আদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিৎ রশ্মিভিরুল্বণৈঃ অহং বর্ষং কৈশ্চিৎ রশ্মিভিঃ, উৎসৃজামি, উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্ণামি কৈশ্চিৎ রশ্মিভিরষ্টভির্মাসৈঃ পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি। অমৃতং চৈব দেবানাং মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং। সৎ যস্য যৎসম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানং তদ্বিপরীতমসৎ চৈবাহমর্জ্জুন ন পুনরত্যন্তমেবাসদ্ ভগবান্ স্বয়ং কার্য্যকারণে বা সদসতী। যে পূর্ব্বোক্তৈ-র্নিবৃত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈঃ মাং পূজয়ন্তউপাসতে জ্ঞান-বিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। আরও, আমি আদিত্য হইয়া কতকগুলি তীব্ররশ্মি দ্বারা বর্ষণ করিয়া থাকি। আমিই জল বিসর্জ্জন করি, বিসর্জ্জন করিয়া আবার ঐ জলরাশি আটমাসে শোষণ করিয়া লই এবং বর্ষাকালে আবার বর্ষণ করিয়া থাকি। আমি দেবগণের অমৃত ও মর্ত্ত্যগণের মৃত্যু। আমি সৎ, যে কারণে সম্বন্ধিরূপে যে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেই কারণে তখন সেই কার্য্যকে সৎ বলা যায়। কার্য্য যখন কারণে অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে অসৎ বলা যায়। ভগবান ত আর একবারে অসৎ নহেন, অথবা সৎ এই শব্দের অর্থ কারণ, অসৎ এই শব্দের অর্থ কার্য্য, হে অর্জ্জুন, আমি সৎ ও অসৎ এই

উভয়স্বরূপ। পূর্ব্বে উপাসনার যে প্রকার রীতি বর্ণিত হইয়াছে, সেই রীতি অনু-সারে (অর্থাৎ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে) একত্ব রূপে বা পৃথক্‌রূপে ভাবনারূপ জ্ঞানময় যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহাদিগকে জ্ঞানবিদ্ কহে। সেই জ্ঞানবিদ্‌গণ নিজ নিজ বিজ্ঞানানুসারে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০।

অন্বয়। ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকং আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ২০।

মূলানুবাদ। ঋক্ যজুঃ ও সামবেদবিৎ সোমযাগকারী ও বিগতপাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ সমূহের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া স্বর্গে যাইতে অভিলাষ করে। তাহারা পবিত্র সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহের উপভোগ করিয়া থাকে। ২০।

ভাষ্য। যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ—ত্রৈবিদ্যাঃ ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ মাং বস্বাদি-দেবরূপিণং সোমপাঃ সোমং পিবন্তি ইতি সোমপাস্তেনৈব সোমপানেন পূত-পাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা স্বর্গতিং স্বর্গগমনং স্বর্গতি-স্তাং প্রার্থয়ন্তে। তে চ পুণ্যং পুণ্যফলং আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানং অশ্নন্তি ভুঞ্জতে দিব্যান্ দিবি ভবান্ দেবভোগান্ দেবানাং ভোগাস্তান্। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা জ্ঞানহীন (সুতরাং) কামকামী (তাহাদের অবস্থা কি তাহাই বর্ণিত হইতেছে) "ত্রৈবিদ্য" ঋক্ যজু ও সামবেদবিদ্ "সোমপ" যাহারা সোম পান করে, তাহাদিগকে সোমপ বলা যায়; এবং সেই (বিহিত) সোম পানের দ্বারা "পূতপাপ" পাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া (তাহারা) নানাবিধ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা "আমাকে" (বসুপ্রভৃতি দেবরূপীকে) পূজা করিয়া "স্বর্গতি" স্বর্গগমনকে অভিলাষ করিয়া থাকে। তাহারাই নিজ পুণ্যের ফল স্বরূপ সুরেন্দ্রলোক অর্থাৎ ইন্দ্রপদকে প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য স্বর্গীয় দেবগণের ভোগ্য বস্তু সমূহের উপভোগ করিয়া থাকে। ২০।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মং (ত্রৈধর্ম্ম্যং) অনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

অন্বয়। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে (সতি) মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি এবং কামকামাঃ (জনাঃ) ত্রয়ীধর্ম্মং অনুপ্রপন্নাঃ গতাগতং লভন্তে। ২১।

মূলানুবাদ। তাহারা বিশালস্বর্গলোক ভোগকরিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে (আবার) মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়াথাকে। এইরূপবেদোক্ত (কাম্য) ধর্ম্মকে যাহারা আশ্রয় করে, সেই সকল কামকামী ব্যক্তিগণ এই প্রকারে গমনাগমন লাভ করিয়া থাকে। ২১।

ভাষ্য। তে তমিতি তে তং স্বর্গলোকং বিশালং বিস্তীর্ণং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমিমং বিশন্তি আবিশন্তি। এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রৈধর্ম্ম্যং কেবলং বৈদিকং কর্ম্ম অনুপ্রপন্না গতাগতং গতং চ আগতঞ্চ গতাগতং গমনাগমনং কামকামাঃ কামান্ কাময়ন্তে ইতি কামকামা লভন্তে গতাগতমেব ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ লভন্তে ইত্যর্থঃ। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। তে তং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। তাহারা সেই "বিশাল" বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে এই মর্ত্ত্য লোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপ যথোক্ত প্রকারে "ত্রৈধর্ম্ম্য" কেবল (জ্ঞানহীন) বৈদিক ধর্ম্ম (কর্ম্ম) কে আশ্রয় করিয়া "গতাগত" গত ও আগত (অর্থাৎ) গমনাগমনকে লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে না। (কাহারা ?) কামকামিগণ, যাহারা কামকে কামনা করে, তাহাদিগকেই কামকামী বলা যায়। ২১।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

অন্বয়। যে জনাঃ অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাং পর্য্যুপাসতে নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং অহং যোগক্ষেমং বহামি। ২২।

মূলানুবাদ। যাহারা অন্য কার্য্য হইতে বিরত ও অনবরত ধ্যানপরায়ণ

হইয়া সর্ব্বদা আমার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি। ২২।

ভাষ্য। যে পুনর্নিষ্কামাঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ—"অনন্যাঃ" অপৃথগ্‌ভূতা পরং দেবং নারায়ণং আত্মত্বেন গতাঃসন্তশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ সন্ন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে তেষাং পরমার্থদর্শিনাং নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং যোগক্ষেমং যোগঃ অপ্রাপ্তস্যপ্রাপণং ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি প্রাপয়ামি অহং। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতঃ স চ মম প্রিয়ঃ যস্মাৎ তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। নন্বেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্। সত্যমেব বহত্যেব। কিং তু অয়ং বিশেষোঽন্যে যে ভক্তাঃ তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে। ন হি তে জীবিতে মরণে বা আত্মনো গৃদ্ধিংকুর্ব্বন্তি কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে। অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা কিন্তু নিষ্কাম ও তত্ত্বদর্শী (তাহাদের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে যে) "অনন্য" আপনাকে পৃথক্‌বলিয়াবোধ যাহারা না করে, তাহাদিগকে অনন্য কহে অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণকে যাহারা আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই "অনন্য"। যে সকল অনন্য সন্ন্যাসিগণ অনবরত চিন্তাপর হইয়া আমার উপাসনা করে, সেই পরমার্থদর্শী ও "নিত্যাভিযুক্ত" অনবরত আদরের সহিত আমার ধ্যাননিরত ব্যক্তিগণের, যোগ ও ক্ষেমের সম্পাদন আমিই করিয়া থাকি। যাহা নাই, এমন অভিলষিতবস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ কহা যায়, সেই লব্ধ বস্তুর প্রতিপালনকে ক্ষেম কহা যায়। জ্ঞানী আমার আত্মা, ইহাই আমার মত ; যে কারণে সেই আমার প্রিয়, সেই কারণে ঐ সকল সাধকগণ আবার আমার আত্মভূত, সুতরাং প্রিয় হইয়া থাকে। এই স্থানে এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে যে, অন্য ভক্তগণেরও ত ভগবান্‌ই যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকেন। সত্য, ভগবান্‌ই তাহাদেরও যোগক্ষেম বহন করেন বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে—অন্য—যাহারা (পৃথক্‌দর্শী) ভক্ত, তাহারা নিজের ভোগের ইচ্ছায় নিজেই আপনার আপনার যোগ ক্ষেম সম্পাদন করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অপৃথক্‌দর্শী, তাহারা কখনও নিজের ভোগেরইচ্ছায় যোগক্ষেম সম্পাদনের চেষ্টা করে না। কি জীবনে কি মরণে কোন অবস্থাতেই তাহারা

আপনার ভোগ কামনা করে না, কারণ, তাহারা সকল সময়েই এক মাত্র ভগবান্‌কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। এইজন্য ভগবানই তাহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। ২২।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। যেঽপি অন্যদেবতাভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ সন্তঃ যজন্তে হে কৌন্তেয় তেঽপি অবিধিপূর্ব্বকং মামেব যজন্তি। ২৩।

মূলানুবাদ। যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত অথচ শ্রদ্ধার সহিত (অন্য দেবতার) উপাসনা করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয় তাহারাও অবিধি পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। ২৩।

ভাষ্য। নম্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেৎ ত্বদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব যজন্তে সত্যমেবং যেঽপি অন্যদেবতাভক্তা অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তে শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতা অনুগতাস্তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকং অবিধিরজ্ঞানং অজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, তুমিই যদি অন্য সকল দেবতার স্বরূপ, তখন যে কেন যাহার উপাসনা করুক না কেন, সকলেইত তোমার ভক্ত (এবং তোমারই উপাসনা করিয়া থাকে)। সত্য বটে (তাহারা আমারই উপাসনা এই প্রকারে করিয়া থাকে কিন্তু বিশেষ এই যে) যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধিসমন্বিত হইয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই স্থানে অবিধি শব্দের অর্থ অজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞানপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকে। ২৩।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ।

অন্বয়। হি অহং সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। (তে) মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি।

মূলানুবাদ। আমি সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (তাহারা)

যথার্থরূপে আমাকে জানেনা, এই কারণেই তাহারা (শ্রেয়ঃ পথ হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ২৪।

ভাষ্য। কস্মাৎ তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যুচ্যতে যস্মাৎ।—অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাং চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। মৎস্বামিকোহি "যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইতি হি উক্তম্। তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবৎ। অতশ্চাবুদ্ধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাচ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে তে। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। কেন এই কথা বলা হইল যে, তাহারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে, যে কারণে আমি বেদবিহিত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমি দেবতা রূপে যজ্ঞের ভোক্তা "অধিযজ্ঞোঽহং এবাত্র" এই শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা প্রভু। কারণ, আমিই যজ্ঞের স্বামী। (অন্য দেবতাভক্তগণ) আমাকে যথার্থ ভাবে জানিতে পারে না, এই কারণেই তাহারা অবুদ্ধি পূর্ব্বক উপাসনা করিয়াও উপাসনার সম্যক্ ফল হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকে। ২৪।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। দেবব্রতা দেবান্ যান্তি পিতৃব্রতা পিতৄন্ যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং যান্তি। ২৫।

মূলানুবাদ। দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণের যাহারা উপাসক, তাহারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। ভূতোপাসকগণ ভূতনিচয়কে প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্য। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তত্বেন অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলমবশ্যম্ভাবি কথং? যান্তি গচ্ছন্তি দেবব্রতা দেবেষু ব্রতং নিয়মোভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি। পিতৄন্ অগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিকর্ত্তারঃ। ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুঃষষ্টিযোগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যাঃ ভূতানাং পূজকাঃ। যান্তি মদ্যাজিনো মদ্যজনশীলা বৈষ্ণবাঃ মামেব। সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তে অজ্ঞানাৎ।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

স্বামীজি যখন প্রথমবার আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত হন, তখন মান্দ্রাজের 'হিন্দু' নামক পত্রিকার একজন প্রতিনিধি চিংলিপট ষ্টেশনে স্বামীজির সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত ট্রেনে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত আসেন। গাড়ীতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল।

স্বামীজি, আপনি আমেরিকায় কেন গেছ্লেন?

বড় শক্ত কথা। আমি এর আংশিক উত্তর দোবো। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরিছিলুম;—দেখ্লুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হোল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছ্লুম।

আপনি জাপানে কি দেখ্লেন? জাপানের মত ভারত কি উন্নতি কত্তে পার্বে?

কিছুই কত্তে পার্বে না, যদ্দিন না ভারতের ত্রিশ ক্রোর লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের মত এমন স্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না আর তাদের একটু বিশেষত্ব এই যে, অন্য অন্য জাতের একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে তেমনি তারা আবার বেজায় অপরিষ্কার। জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য্য, তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার। আমার ইচ্ছে, আমাদের যুবকেরা জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল বোলে মনে করে আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ বোলে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ঢের তফাৎ। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক বাদে দূষিত; জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম আস্তিক।

জাপান হঠাৎ এরকম বড় হোল কি কোরে? এর রহস্যটা কি?

জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা। যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়্‌তে প্রস্তুত আর যাদের মনমুখ এক, তখন ভারত সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই ত দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন সাঁচা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের মত বড় হবে। জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ কত্তে প্রস্তুত। তাইতেই তারা বড় হয়েছে। তোমরা তা নও, হবে কেমন কোরে? তোমরা যে কামিনীকাঞ্চনের জন্যে সব ত্যাগ কত্তে প্রস্তুত।

আপনার কি ইচ্ছে, ভারত জাপানের মত হোক?

তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন কোরে জাপান বা অন্য জাতের মত হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা কোরে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই একটা একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলো তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্চে ধর্ম্ম। সংস্কার বল, আর যাই বল, সবই গৌণ। লোকে বলে, হৃদয়টা ভেঙ্গে গেলে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে নিশ্চয় ভাঙ্‌বে, তখন ধর্ম্ম তরঙ্গ খেল্‌তে থাক্‌বে। আমরা জাপানীদের মত নয়, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াটাতেই কেমন শান্তি এনে দেয়। আমি এখানে সর্ব্বদা কায কচ্চি, কিন্তু এরি মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ কচ্চি। ভারতে ধর্ম্ম কার্য্য কল্লে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য্য কত্তে গেলে শেষে মৃত্যু হয়—বহুমূত্র হয়ে।

যাক্ জাপানের কথা। আচ্ছা, স্বামীজি, আপনি আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে কি দেখ্‌লেন?

গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি ভালই দেখিছিলুম। কেবল মিসনরি আর "চার্চ্চ মাগী" গুলো ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় আতিথেয়, সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।

"চার্চ্চ মাগী"—একি স্বামীজি?

স্ত্রীলোকে যখন বে কর্ব্বার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তখন সব রকম স্নানের

জায়গায়* ঘুরতে থাকে আর একটা পুরুষ পাকড়াবার জন্য যত রকম কৌশল করবার করে। সব চেষ্টা কোরে যখন বিফল হয়, তখন সে চার্চে যোগ দেয়, তখন তাদের ওখানে ওল্ডমেড বলে। তাদের মধ্যে অনেকে বেজায় চার্চের গোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। এরা ভয়ানক গোঁড়া। তারা পুরুতদের মুটোর ভেতর। পুরুতদের সঙ্গে মিলে তারা সংসারটাকে নরকে পরিণত করে, আর ধর্ম্মটাকে নকড়া ছকড়া কোরে ফেলে। এদের বাদ দিলে, আমেরিকানরা বড় ভাল লোক। তারা আমায় বড় ভাল বাস্‌তো, আমিও তাদের বড় ভালবাসি। আমি যেন তাদেরই একজন, এই রকম বোধ করতুম।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়াল, আপনার ধারণা?

আমার ধারণা, চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল,—জগতের সামনে অক্রীশ্চান ধর্ম্ম সকলকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অক্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রাধান্য—আর ক্রীশ্চান ধর্ম্মই হীন প্রতিপন্ন হোলো। সুতরাং ক্রীশ্চানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। দেখ না কেন, এখন পারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্চে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে পারিসে 'ধর্ম্মমহাসভা' না হয়, তার বিশেষ চেষ্টা কচ্চেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে। উহাতে বেদান্তের তরঙ্গ বিস্তার হবার সুবিধা হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্চে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরুত আর 'চার্চমাগী' গুলো ছাড়া।

ইংলণ্ডে আপনার প্রচার কার্য্যের কিরূপ আশা দেখ্‌চেন, স্বামীজী?

খুব আশা আছে। দশ বৎসরও যেতে হবে না—অধিকাংশ ইংরাজই বেদান্তী হবে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী আশা। আমেরিকা-

* আমেরিকার সমুদ্রের ধারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে স্নানের জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত থাকে। বড় বড় লোকে সেখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করে। এই সব স্থানে বড় লোকের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার সুবিধে হয়। অনেকের সেই স্থান থেকেই ভবিষ্যৎ বিবাহ হবার স্থির হয়ে যায়।

সং—

নেরা ত দেখ্ছো সব বিষয়েই একটা হুজুগ কোরে তোলে। ইংরাজেরা হুজুগে নয়। বেদান্ত না বুঝ্লে ক্রীশ্চানেরা নিউটেষ্টামেণ্টও বুঝ্তে পারে না। বেদান্ত সব ধর্ম্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। বেদান্তকে ছাড়্লে সব ধর্ম্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধরে সবই ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

আপনি ইংরাজ চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখ্লেন?

ইংরাজেরা কোন বিষয় বিশ্বাস কোরেই তৎক্ষণাৎ কাযে লেগে যায়। ওদের কাযের শক্তি অসাধারণ। ইংরাজ পুরুষ বা মহিলা অপেক্ষা উন্নত নরনারী সমগ্র জগতে দেখ্তে পাওয়া যায় না। এই জন্তেই তাদের উপর আমার বাস্তবিক বিশ্বাস। অবশ্য প্রথম তাদের মাথায় কিছু ঢোকান বড় কঠিন; একবার দিতে পারে আর সহজে উহা বেরোয় না। ইংলণ্ডে কোন মিসনরি বা কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলে নি—একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য্য হলুম, আমার অধিকাংশ বন্ধুই চার্চ অফ ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনেছি, যে সব মিসনরি এ দেশে আসে, তারা ইংলণ্ডের খুব নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। কোন ভদ্র ইংরাজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মত ইংলণ্ডেও জাতের খুব কড়াকড়। আর চার্চের অন্তর্ভুক্ত ইংরাজ সব ভদ্র শ্রেণীভুক্ত। তোমার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাক্তে পারে, কিন্তু তাতে তোমার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্তে আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই একটী পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনরীরা কি, তা ত এখন জেনেছি। এখন এই কর্ত্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিসনরিদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমরা ত ওদের চিনে নিইছি। এখন ওদের মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই কর্ত্তব্য।

স্বামীজী, অনুগ্রহ কোরে আপনি আমায় কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজসংস্কারকদের কার্য্যপ্রণালী কি রকম, এ সম্বন্ধে কিছু বল্বেন?

সব সমাজ সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাদের নেতারা এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্ম্মভিত্তি বার করবার চেষ্টা কচ্চেন—আর সেই ধর্ম্মভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক দলপতি, যারা আমার বক্তৃতা শুন্তে আস্তেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন কত্তে হলে বেদান্তকে ভিত্তি স্বরূপ আমাদের নেওয়া দরকার।

ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড় অজ্ঞ। কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ, এখানে দরিদ্রতা একটা রাজদণ্ডযোগ্য অপরাধ বোলে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ, ইউরোপীয় জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।

জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল, আপনি বলেন?

লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন, তাই কত্তে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভিতর বিস্তার কত্তে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান করে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে।

কিন্তু স্বামীজি, আপনি কি মনে করেন, এ কায সহজে হতে পারে?

অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কত্তে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কায কত্তে প্রস্তুত, তা হলে কালই এটা হতে পারে। কেবল এই কাযে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, সেই পরিমাণে ইহা সিদ্ধ হবে।

কিন্তু যদি বর্ত্তমান হীনাবস্থা তাদের ভূতকর্ম্মজন্য হয়, তবে স্বামীজি, আপনি কিরূপে মনে করেন, সহজে ইহা ঘুচ্‌বে আর আপনার তাহাদিগকে কিরূপেই বা সাহায্য করবার ইচ্ছা?

স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন,—

কর্ম্মবাদই অনন্তকাল মানবের স্বাধীনতার ঘোষণা কচ্চে। যদি কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগকে হীন অবস্থায় আন্‌তে পারি, এ কথা সত্য হয়, তবে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধনও নিশ্চয়ই সাধ্যায়ত্ত। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্ম্মের দ্বারাই আপনাদের এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। সুতরাং তাহাদিগকে উন্নতি করবার আরও সুবিধা দিতে হবে। আমি সব জাতকে একাকার কত্তে বলি না। জাতিভেদ খুব ভাল। এই জাতিভেদ প্রণালীই

আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতিভেদের কার্য্য কি, তা লাখে একজন জানে কিনা সন্দেহ। জগতে এমন কোন যায়গা নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিভেদের মধ্য দিয়া জাতিভেদের অতীত অবস্থায় যেতে চাই। জাতিভেদের উদ্দেশ্যই এই। ভারতে এই জাতিভেদ প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্চে, সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ে দেখ, তবে দেখ্‌বে, এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত কর্‌বার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতি উন্নত হয়েছেও। আরও অনেকে হবে। এই রকমে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্য্য-প্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের কত্তে হবে, কারণ, প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা।* আর যত শিগ্‌গির তাঁরা এটী করেন, ততই সকলের পক্ষেই ভাল। এ বিষয়ে দেরি করা উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করা উচিত নয়। ইউরোপ আমেরিকার জাতিভেদের চেয়ে ভারতের জাতিভেদ অনেক ভাল। অবশ্য আমি একথা বলি না যে, ইহা একেবারে সম্পূর্ণ ভাল। যদি জাতিভেদ না থাক্‌তো, তবে তোমরা থাক্‌তে কোথায়? জাতিভেদ না থাক্‌লে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিষ কোথায় থাক্‌তো? জাতিভেদ না থাক্‌লে ইউরোপীয়দের পড়্‌বার জন্যে এ সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাক্‌তো? মুসলমানরা ত সবই নষ্ট কোরে ফেল্‌তো। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছো? ইহা সর্ব্বদাই গতিশীল। কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি খুব মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীকে এই কথা বলি। আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখ্‌তে পাই, যেমন দেশকাল পাত্র, তাতে কোন জাতেই এর চেয়ে মহৎ কর্ম্ম কোত্তে পাত্তো না। আমি বলি, তোমরা বেশ কোরেছো, এখন আরও ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর।

স্বামীজি, জাতিভেদের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে আপনার কি মত?

* অভিজাত সম্প্রদায় যদি আপনাদের ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দেন, তবে অভিজাত সম্প্রদায় বোলে আলাদা কিছুই থাকে না। কাযেই উহার মূলোচ্ছেদ হয়।

জাতিভেদ প্রণালীও ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছে। কেবল মূল তত্ত্ব বদ্‌লাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে বেদ পড়তে হবে। বেদ ছাড়া আর সব শাস্ত্রই যুগভেদে বদ্‌লে যাবে। বেদের শাসন নিত্য। অন্যান্য শাস্ত্রের শাসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। যেমন, কোন স্মৃতি এক যুগের জন্য, আর একটী স্মৃতি আর এক যুগের জন্য। বড় বড় মহাপুরুষ, অবতারেরা—সর্ব্বদাই আসছেন আর কি ভাবে কায করতে হবে, দেখিয়ে যাচ্ছেন। কতকগুলি মহাপুরুষ নিম্নজাতির উন্নতির চেষ্টা কোরে গেছেন, কেউ কেউ, যেমন মধ্ব, স্ত্রীলোকদিগকে বেদ পড়বার অধিকার দিয়েছেন। জাতিভেদ কখন যেতে পারে না, তবে উহাকে পুনরায় নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজপ্রণালীর ভিতর এমন জীবনীশক্তি আছে, যাতে সহস্র সহস্র নূতন প্রণালী গঠিত হতে পারে। জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়া একবারে ভুল। নূতন যা কিছু হবে, তা পুরাতনেরই বিকাশ।

হিন্দুদের কি সমাজসংস্কারের দরকার নেই?

খুব আছে। প্রাচীনকালে বড় বড় মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন প্রণালী বার কর্ত্তেন, আর রাজারা আইন কোরে সেইটে চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই রকম কোরেই সমাজের উন্নতি হোতো। বর্ত্তমান কালে এই রকম সামাজিক উন্নতি কোত্তে গেলে এমন একটা শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজা নেই, এখন লোকেদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা কত্তে হবে। সুতরাং আমাদের ততদিন অপেক্ষা কত্তে হবে, যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ কোত্তে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়। কোন সংস্কারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্পই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কিছু হতে পারে না। এই জন্য কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে, (যা কখন কার্য্যে পরিণত হবে না,) বৃথা শক্তিক্ষয় না কোরে, আমাদের উচিত, একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক তয়েরি করা, যারা আপনাদের আইন আপনারাই কোরবে। এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ কোরে নেবে। তা না হোলে এ সকল সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী এই যে,

নিজেদের দ্বারায় নিজেদের উন্নতি সাধন। ইহা কার্য্যে পরিণত কোত্তে সময় লাগ্‌বে, বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে, কারণ, প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই রাজার অব্যাহত শাসন ছিল।

আপনি কি মনে করেন, হিন্দু সমাজ ইউরোপী সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ কোত্তে কৃতকার্য্য হোতে পারে?

না, সম্পূর্ণ রূপে নয়। আমি বলি যে, গ্রীক মন—যা ইউরোপীয় জাতির বহির্ম্মুখীন শক্তিতে প্রকাশ পাচ্চে, তার সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্ম যোগ হোলে তাই ভারতের পক্ষে সমাজের আদর্শ হবে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, মিথ্যা মিথ্যা দিনরাত কতকগুলো বাজে কাযে শক্তিক্ষয় না কোরে ইংরাজদের কাছ থেকে নেতার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার, ঈর্ষ্যাভাব, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস শেখা তোমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। একজন ইংরাজ কাকেও নেতা বোলে স্বীকার কোল্লে তাকে সব অবস্থায় মেনে চল্‌বে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞাধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হোতে চায়, হুকুম তামিল কর্ব্বার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম কর্ব্বার আগে হুকুম তামিল কোত্তে শেখা। আমাদের ঈর্ষ্যার অন্ত নাই। আর যতই আমরা হীনশক্তি, আমরা ততই ঈর্ষ্যাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষ্যা দ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হোতেই পারে না। ততদিন আমরা এই রকম ছোড়ভঙ্গ হয়ে থাক্‌বো, কিছুই কোত্তে পার্ব্বো না। ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখ্‌তে হবে, বহিঃপ্রকৃতি জয় আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শিখ্‌তে হবে, অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহোলে আর হিন্দু, ইউরোপীয় বোলে কিছু থাক্‌বে না, উভয়প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর এক দিক বিকাশ কোরেছে। এই দুইটীর মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।

স্বামীজি ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?

ক্রিয়াকাণ্ড হচ্চে ধর্ম্মের কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে উহা এখন সম্পূর্ণ আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাযের

ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ড উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন প্রবর্ত্তন কর্ত্তে হবে।

তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন, দেখ্‌ছি।

না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড কোর্ত্তে হবে। সকল বিষয়েরই অনন্ত উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইহাই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পশ্চাতে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দু জাতির ইতিহাসে বরাবর কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনের চেষ্টা হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা কোল্লেন, তার ফলে ভারত থেকে তাড়িত হলেন—তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্ব্বদাই গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশকাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন। ইহাই আমাদের কার্য্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারক সকলেই ইউরোপীয় বিনাশকারী সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হবেও না, হয়ও নি। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক সম্পূর্ণ গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা কচ্চে। শুভাদৃষ্টই হউক, আর দুরদৃষ্টই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতজীবনের সমগ্র ইতিহাস। যেখানে এমন কোন সমাজসংস্কার সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে উড়ে গেছে।

আপনার এখানকার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ?

আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য দুটী শিক্ষালয় কর্ত্তে চাই,—একটী মান্দ্রাজে, আর একটী কলকাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হোন, অসাধুই হোন, জ্ঞানীই হোন, অজ্ঞানীই হোন, ব্রাহ্মণই হোন আর চণ্ডালই হোন।

এইবার হিন্দুর প্রতিনিধি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেণ মান্দ্রা-

জের এগমোর ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে লাগিল। এইটুকু মাত্র স্বামীজীর মুখ হতে শোনা গেল, তিনি ভারত ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসায় থাকৃতে চান না। হিন্দুর প্রতিনিধি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গীতাতত্ত্ব।

(জ্ঞানযোগ।)

(২৭ শে অগ্রহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বরে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

গতবারে আমরা দুটী কথা বিশেষরূপে শিখেছি। প্রথম, দুর্ব্বলতা, শারীরিকই হোক, বা মানসিকই হোক, যা থেকে আসে, সে সমস্তই পাপ; অতএব তাহা একেবারে ত্যাগ কত্তে হবে। কারণ, সে সময়ে মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য প্রভৃতি সব ভুলে যায়। দ্বিতীয় কথা হচ্চে, মন মুখ এক কত্তে হবে অর্থাৎ পণ্ডিতের মত কথা বলা অথচ কাযে অন্য রকম করা চল্‌বে না। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন। সকল স্থানে সব বিষয়েই ইহা সত্য। কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে, সব যায়গায় ইহার দরকার। অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, মন মুখ এক কোরে ধর্ম্ম কর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু সংসার করা চলে না। কিন্তু সেটী ভুল। জগতের নানাবিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মানুষ বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চে, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি ঘোর সাংসারিক বিষয়েও যে যত পরিমাণে সৎ উত্তম আন্‌তে পার্ব্বে, যত পরিমাণে মন মুখ এক কোরে খাটতে পার্ব্বে, তত পরিমাণে তার উন্নতি।

গীতা সম্বন্ধে আর একটী কথা জানা আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা বলেছিলেন। সে কথা শুন্‌লেই বা কে, লিখ্‌লেই বা কে? যুদ্ধক্ষেত্রে ত ব্যাসও ছিলেন না, সঞ্জয়ও ছিলেন না, অথচ গীতা পাঠে দেখ্‌তে পাই, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুচর সঞ্জয় তাঁর প্রভুকে গীতা বল্‌ছেন আর মহর্ষি ব্যাস উহা শ্লোকাকারে মহাভারতনিবদ্ধ কোরেছেন। তাঁরা জান্‌লেন কি রকম কোরে? গল্প আছে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ জান্‌বার জন্য মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা করায় ব্যাস তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁর বাসনা পূর্ণ করবার জন্য ঐ যোগদৃষ্টি সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন। তাই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের সব ব্যাপার দেখ্‌ছেন আর ধৃতরাষ্ট্রকে বল্‌ছেন।

আজকার বিষয় জ্ঞানযোগ। মানুষের যখন মোহ আসে, তখন আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না। যখন আত্মীয় স্বজন কেউ মরে যায়, বা জীবনপ্রবাহের একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তনরূপ আবর্ত্ত এসে উপস্থিত হয় আর ক্ষুদ্র মানুষের যত কিছু মতলব এক ঘায়ে সব ভেঙ্গে দেয়, সেই শোকের সময় আত্মজ্ঞান যদি কারো থাকে, তবেই সে ঠিক থাক্‌তে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তন সকলেরই জীবনে কখন না কখন এসেছে বা আস্‌বে। অর্জ্জুনের জীবনে এই মহাসমর সেই পরিবর্ত্তন এনেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে আত্মজ্ঞান সহায়ে বীরাগ্রণী অর্জ্জুন জীবনের এই মহাসন্ধিস্থল সহজে উত্তীর্ণ হোয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হোয়েছিলেন। কিন্তু কত লোকই না ঐরূপ স্থলে আশার আলোক না দেখ্‌তে পেয়ে পথহারা হয়ে অবনতি ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সে জন্য গীতার প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। অর্জ্জুনের প্রতিও বটে, আর সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সকল মানবের প্রতিও বটে। এই জন্য পরমহংসদেবও শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। সংসারের মধ্যে সব পরিবর্ত্তনশীল। জড়রাজ্যের অন্তর্ভূত সকলেই এই নিয়মের অধীন। কোথায় যাচ্চে কি উদ্দেশ্যে, কে বল্‌তে পারে? পরিণামবাদীরা (Evolutionsts) বলেন, ক্রমোন্নতি হচ্চে; হবার উদ্দেশ্য কি, তা বল্‌তে পারেন না। বীজ থেকে গাছ, ফুল, ফল হচ্চে, ইহার উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্য এ খেলা? মানুষের মনে সর্ব্বযুগে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উদয় হয়েছে ও হচ্চে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত

কোন উত্তর পায় নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলেন, ইহার উদ্দেশ্য এক অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুসম্পন্ন সমাজশরীর গঠন করা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শৃঙ্খলরূপ বিচিত্র জগৎকার্য্য চলেছে, ইহা অনাদি। এই যে ব্যাপার, ইহা ভগবানের দিক্ থেকে দেখ্‌লে উদ্দেশ্য-বিহীন লীলা বিলাস বা খেলা মাত্র বোধ হয়, কারণ, বিশ্বসৃজনে ভগবানের কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা আছে বল্‌লে তাঁতে অপূর্ণতা দোষ উপস্থিত হয়। তাই শাস্ত্রকারেরা বলেন, সৃষ্টি তাঁর খেলামাত্র। তিনি যে সৃষ্টি কোরে বড় হোলেন বা ছোট হোলেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের দিক্ থেকে দেখ্‌লে অর্থাৎ মানুষ এ জগতে এসে নানা চেষ্টা কেন কচ্চে, এ কথা ভাব্‌লে উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, সংসারবন্ধন কেটে আত্মজ্ঞান লাভ করা, পূর্ণত্ব লাভ কোরে সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাত অতিক্রম করা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়জিৎ, আত্মজ্ঞানী, সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত মনুষ্যসমাজ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হবে অর্থাৎ সে সমাজে সকল অঙ্গের মনের ভিতরের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ায় সদা শান্তি ও আনন্দ বর্ত্তমান থাক্‌বে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখ্‌লেন, অর্জ্জুনের এ মোহ, আত্মজ্ঞান ভিন্ন যাবার নয়, তখন তিনি বল্লেন,

'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।'

তুমি আমি যে কখন ছিলাম না বা থাক্‌বো না, তা নয়। আত্মা অজর, অমর। এই শরীর জড়। যে জিনিষ জড় হতে উৎপন্ন, তাকে জড়ের নিয়মে থাক্‌তে হবে। যাহা সূক্ষ্ম জড় অর্থাৎ মন হতে প্রসূত, তাহা সূক্ষ্মের নিয়মে চল্‌বে। যাহা জড় হতে উদ্ভূত, তাকে নিত্যকাল ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা বৃথা। জড়ের নিয়ম পরিবর্ত্তনশীলতা। তাকে পরিবর্ত্তিত হতে দোব না, একভাবে চিরকাল রাখ্‌বো, এ চেষ্টা মূর্খের কায, অজ্ঞানের কায। সংসারে এ চেষ্টা প্রতিনিয়ত হচ্চে। কোন সময়ে যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জগতে আশ্চর্য্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।'

রোজ রোজ লোক মরছে, দেখ্‌তে পাচ্চি। সংসারের মধ্যে এমন

কেউ নেই যে, একজনকে না একজনকে মত্তে দেখে নি। তবু সকলেই এমন ভাবে কায কচ্চে, যেন সে অমর। সকলের ভেতরেই এই জড় শরীরকে চিরকাল ধরে রাখ্‌বার বাঞ্ছা।

জড়ের ষড়্‌ বিকার আছে। জন্ম, কিছুকাল অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি বা সুপক্বাবস্থা, ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ, এই ছয় অবস্থাভেদ। শাস্ত্র বলেন, মনও সূক্ষ্ম জড় হতে তয়ির। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, Mind, Spirit, Soul সব একই জিনিষ। আমাদের দেশে চার্ব্বাকের মতও তাই। মন বা আত্মা মস্তিষ্কের কার্য্য মাত্র। মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে। কোন কোন পরিণামবাদী পণ্ডিত বলেন, মনটা মস্তিষ্কের কার্য্যমাত্র নহে, উহা এক স্বতন্ত্র পদার্থ—উহাই সর্ব্বদা আমি, আমি কচ্চে, এবং উহাই আত্মা। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি, মানসিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি আছে। মনও জড়ের ন্যায় পরিবর্ত্তন-শীল—ইহা কিরূপে আত্মা হবে? অতএব শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীরের দ্বারা যেমন, মনের দ্বারাও সেইরূপ কার্য্য করা-চ্চেন বা চালাচ্চেন। প্রশ্ন হতে পারে—মন খারাপ হলে পাগল হয়;—আত্মা যদি মন থেকে স্বতন্ত্র পদার্থই হবে, তবে শরীরের এবং মনের পরিবর্ত্তন তাকে লাগে কেন? তাকে অন্যরূপ কোরে দেয় কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, আত্মা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হন না, তবে যে পরি-বর্ত্তন দেখা যায়, তার অন্য কারণ আছে। ধর—একজন একটা বেহালা বাজাচ্চে, হঠাৎ তাঁত ছিঁড়ে গেলো, আর বাজ্‌লো না। এ স্থলে যে বাজাচ্চে, তার দোষ, না, বেহালার দোষ? সেইরূপ আত্মা রূপরসগন্ধ প্রভৃতি ভোগ কর্‌বার জন্যে মন ও দেহরূপ যন্ত্র সৃষ্টি কোরেছে। ইহা বিকল হোলে আর কার্য্য হয় না। কিন্তু যন্ত্র বিকল হোয়ে পূর্ব্বের ন্যায় আওয়াজ না বেরুলেই আত্মা যন্ত্রী যেমন তেম্নি থাকে। আমাদের শাস্ত্র এইরূপে শরীর ও মন হতে আত্মার পার্থক্য দেখিয়েছেন। শরীর ও মন জড়, আত্মা চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ। শরীরের ন্যায় মনেরও উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ। আত্মা নিত্য ও অবিনাশী।

'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।'

আত্মা নিত্য, পরিবর্ত্তনরহিত এবং সকলের মধ্যে একভাবে রয়েছেন।

'দেহিনোঽস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥'

এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আস্‌ছে, মরে গেলেও তেমনি একটী দেহ আসে অথবা পুনর্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বৃদ্ধি, পূর্ণতা এবং হ্রাসরূপ নানা পরিবর্ত্তন আছে, দেহান্তর প্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা। শাস্ত্র আরো বলেন যে, এ কথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জান্‌তে পারি।

আত্মা পরিবর্ত্তিত হন না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তবে ভোক্তা কাকে বলি? কে ভোগ কর্‌ছে? কে সুখী, দুঃখী হচ্চে? বেদ বলেন, যতক্ষণ আত্মা আপনাকে ইন্দ্রিয় ও মন যুক্ত বোধ করেন, ততক্ষণই তিনি ভোক্তা থাকেন, যখনই ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়, তখনই আত্মা আপনার যথার্থ পূর্ণস্বরূপ অনুভব করেন। শাস্ত্রে তাই বলে, আমরা যে আপনাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত ভাব্‌ছি, ইহাই আমাদের কারণ শরীর। কেননা, যথার্থ আমরা কে, এ কথাটী ভুলে গিয়ে যদি আমরা আমাদিগকে শরীর ও মনবিশিষ্ট বলে না ভাব্‌তুম, তা হলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ কোর্‌তো না। ঐ ভুলে যাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া, অতএব ঐটেই কারণ শরীর। কেবল মাত্র জ্ঞানলাভেই এই শরীরের নাশ হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। কিন্তু আপনার স্বরূপ ভুলে গেলেও আত্মার বাস্তবিক ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আত্মা চিরকাল পূর্ণ। মনবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বোলে ভাব্‌লেই কি যথার্থ তাই হবে? না, আত্মা যেমন তেমনি ঠিক আছে। পরমহংসদেব বল্‌তেন, যেমন চকমকি পাথর চার শো বৎসর জলের ভিতর রাখ, তুলে এনে ঠুক্‌লেই যে কে সেই, আগুন বেরুচ্চে, আত্মাও ঠিক তাই। শরীর মনকে যখনই দেখে বন্ধন, তখনই তা ফেলে দিয়ে আপনি কে, জেনে নেয়। আমরা সংসাররূপ স্বপ্ন দেখ্‌ছি। স্বপ্নও ত নানা রকম দেখি। যেন আমি মরে গেছি, যেন আমায় একজন কেটে ফেলেছে, রক্তের ধারা বয়ে যাচ্চে আর কাটা মুণ্ড ও ধড়টা সাম্‌নে পড়ে রয়েছে, আবার জাগ্‌লেই কোথাও কিছু নাই। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সকলেই একদিন তেমনি জেগে উঠ্‌বে। সেই জন্যই শাস্ত্রকার যাস্ক বলেন, আত্মজ্ঞানে আর্য্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের সমান অধিকার। উহা সকলকে শিখাও। কে জানে, কাহার আত্মা কখন

জাগরিত হবে? পরমহংসদেব বল্‌তেন, যদি তীব্র বৈরাগ্য উদয় হয় ত তিন বৎসরে, তিন মাসে বা তিনদিনেও আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে।

গীতাও বলেন,

'স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।'

মৃত্যুকালে যদি ক্ষণমাত্রও এই জ্ঞানের উদয় হয় ত সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয়ে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।

এই আত্মজ্ঞানই বেদের মূলভিত্তি, ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন। ভারত হতেই অপরাপর দেশে এই জ্ঞানের প্রচার হয়েছে। যে দিন ভারত এই জ্ঞানের কথা ভুলবে, সে দিন জাতীয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ হবে। অপরাপর দেশের লোকের এই জ্ঞান যথাযথ বুঝ্‌তে এবং অনুভব কত্তে এখনও ঢের দেরি। ধর্ম্মরাজ্যে এখনও আমরা জগতের গুরুস্থানীয় রয়েছি। ইংরাজ প্রভৃতি অপরাপর জাতকে বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধাদি অপর সমস্ত বিষয়ে গুরু স্বীকার করিয়া শিক্ষা করিও, কিন্তু ধর্ম্মে এস্থানটা অধিকার কর্‌বার এখনও তারা উপযুক্ত হয় নাই। ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি পরমহংসদেব প্রমুখ সাধুদের ছাড়িয়া বিদেশী, বিধর্ম্মীর নিকট আপন ধর্ম্মের মহিমা শুন্‌তে যাওয়ার চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? আজ কাল কোন কোন সম্প্রদায় বৈদিক ধর্ম্মের দু চারটে তত্ত্ব আপনাদের ভিতর উল্টো কোরে ঢুকিয়ে নিয়ে যথার্থ ধর্ম্ম বলে শিক্ষা দিচ্চে। কেহ বা বল্‌ছে, এককোটি জন্মের পর মানুষ চাক আর নাই চাক, মুক্ত হবেই হবে এবং তার আত্মজ্ঞান হবে। এরূপ কর্ম্মবাদ ঘোর অদৃষ্টবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদ কখন এরূপ শিক্ষা দেন না। বেদ বলেন, মানুষ মনে কল্লে এখনি মুক্ত হতে পারে, অথবা না মনে কোল্লে অনন্তকাল স্বপ্ন দেখ্‌তে পারে। মানুষের মুক্তি হবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কোথাও দেওয়া হয় নি। পুরাণাদিতেও বলা আছে মাত্র যে, চুবাশি লক্ষ যোনি ক্রমশঃ কোরে জীব মনুষ্য জন্ম পায়। মুক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কেমন কোরেই বা হোতে পারে? জন্ম মরণাদিতে আত্মার ত কোন দোষ বাস্তবিক লাগে নি। আত্মা যেন নিদ্রিত; যে দিন ঘুম ভাঙ্‌বে, সে দিন মুক্ত হবে। আত্মা সর্ব্বশক্তির আধার; যে দিন তাহা উপলব্ধি কোর্‌বে, যে দিন জান্‌বে, আমি রাজার ছেলে, সেদিনই স্বস্থানে চলে যাবে, আপন মহিমায় বর্ত্তমান থাক্‌বে। কোন

কোন সম্প্রদায় বল্‌ছেন, চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গনিবাসী মুক্তাত্মাদিগের সহিত তাঁহারা বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। নিত্য তাঁহাদের সহিত দর্শন, স্পর্শন এবং পত্র প্রেরণাদি পর্য্যন্তও হয়ে থাকে। বেশ কথা ; হয়ে থাকে হোক। কিন্তু বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে যখন তাঁদের কিছুমাত্র নামগন্ধ নাই, তখন তাঁহাদের পরিচয় লবার জন্য আমাদের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নাই। আয়ু অল্প ; যে যা বোল্‌বে, তাই নিয়েই ছুটোছুটি কোরে হায়রান হবার সময় কোথা ?

আত্মায় সুখ দুঃখের লেশ লাগ্‌ছে না ; তিনি পূর্ণ। কিন্তু শরীর এই জড়রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্ত্তন হচ্চে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মানুষের মর্‌বার সময় কি হয় ? স্থূল শরীরটা, যেটা নিয়ে মন খেল্‌ছে, তখন একেবারে বিকল হয়ে যায় ;—তখন লোকে ছেঁড়া কাপড ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেমন নূতন কাপড় পরে, আত্মা তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ কোরে নূতন শরীর ধারণ করে আর এই শরীরে যে সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা ও কার্য্য করা হোলো, তার সংস্কার মনের সঙ্গে থেকে যায়। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এবং রূপরসাদির সংস্কার, এই গুলি আত্মার সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম জড়ে প্রস্তুত। মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের মৃত্যুতে নষ্ট হয় না, মৃত্যুর পরেও আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকে। অথবা স্থূল শরীরটা ফেলে দিলে আত্মার, আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়বান, এ বোধ নাশ হয় না। তখন পূর্ব্ব শরীরের সংস্কারানুযায়ী হয়ে আত্মার অন্য একটা স্থূল শরীর ধারণের বা গঠনের ইচ্ছা হয় এবং যে পিতামাতার ঔরসে জন্মিলে আপন সংস্কার বিকাশের উপযোগী শরীর পাওয়া যাবে, তাঁহাদের নিকট আকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই তাকে আকর্ষণ কোরে নিয়ে যায়। ঐ সূক্ষ্ম শরীরের দৈর্ঘ্য, বিস্তার বা গুরুত্বাদি নাই এবং গর্ভাধানের দিন হইতেই মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম শরীর চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেটাও জড়। উহা বায়ু এবং আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূল শরীরের সাহায্যে যতদূর শিখে গেছে, নূতন জন্মে নূতন স্থূল শরীর পেয়ে আত্মা তারপর থেকে কার্য্য আরম্ভ করে এবং জ্ঞানলাভ কত্তে থাকে।

পূর্ব্বে যা বলা হোল, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, কেন আমরা সকলে সমান বিদ্যাবুদ্ধি সম্পদ্ নিয়ে সকল বিষয়ে সমান হয়ে সংসারে

জন্মাই না, কেনই বা সংসারে একটী মানুষের শরীর মন আর একটীর সঙ্গে সমান হয় না? কেনই বা মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমাদের ভিতর স্বাভাবিক প্রভেদ বর্ত্তমান? পুনর্জ্জন্মবাদ হতেই ইহার বেশ মীমাংসা হয়। পিতার দোষগুণ সন্তানে আসে, এই কথা বোলে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সম্বন্ধবাদিতায় ভেদ বা বৈষম্যের মীমাংসা করেন, যথা, শারীরিক নানা প্রকার রোগ, মানসিক অশেষবিধ দোষ বা গুণ পিতা হতে অনেক পরিমাণে সন্তানে আসে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সব স্থলে দেখা যায়, ছেলে বাপের মত আদৌ নহে, সেখানে তাঁরা শিক্ষার তারতম্য বোলে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এইরূপে দোষটা সব বাপের ও গুরুর উপর এসে পড়ে। তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিগত বৈষম্যের অন্য কোন সমাধান দিতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, এ প্রভেদ কর্ম্ম অনুসারে হয়। মানুষ যখনি যে কাজ করে, উহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করে এবং এ উদ্দেশ্য লাভ কর্ত্তে তার নিজের ভিতরের এবং বাহিরের কতকগুলি শক্তিকে এক বিশেষ ভাবে চালিত কোরে থাকে। ঐ সকল শক্তি যখন জাগরিত ও চালিত হোলো, তখন ফলস্বরূপ কতকগুলি পরিবর্ত্তন এনে দেবেই দেবে। ঐ পরিবর্ত্তন গুলিকে আবার তাহার মন ভাল বা মন্দ, সুখ বা দুঃখ বোলে বোঝে বা অনুভব করে। যদি ভাল বা সুখ বোলে বোঝে, ত মন সে গুলিকে চিরকাল ধোরে নিজস্ব কোরে রাখতে চায়। আর যদি মন্দ বা দুঃখ বোলে বোঝে বা ভবিষ্যতে সেগুলি নিশ্চিত দুঃখ এনে দেবে এমনও বোঝে তা হলে মন সে গুলিকে যে কোন উপায়ে হউক, তাড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপে বীজ থেকে যেমন গাছ হয়ে আবার সেই গাছে ফুল, ফল ও বীজ উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এক কর্ম্ম হতে সুখ বা দুঃখ ভোগ এবং অপর কর্ম্মও এসে উপস্থিত হয়। অনেক কর্ম্মের ফল বা সুখদুঃখ ভোগ হবার এ জন্মে সময় হোলো না দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই উহা পর জন্মে হয়ে থাকে।

বেদান্তে মনুষ্যকৃত সকল কর্ম্মের পাঁচ ভাগ বিভাগ করা হয়েছে, যথা, নিত্য, আগামী, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও প্রতিষিদ্ধ। নিত্য কর্ম্ম শৌচ সন্ধ্যাদি প্রত্যহ কর্ত্তেই হয়। কাম্য বিশেষ ফল নাই, না কর্লে দোষ আছে। প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি কর্ত্তে শাস্ত্র নিষেধ করেন, যেমন, চুরী

কোরোনা, খুন কোরোনা ইত্যাদি। সঞ্চিত কর্ম্মগুলি মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও তাদের ফল ভোগ কত্তে বাকি রয়েছে। তাদেরই মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ স্বরূপ মানুষ এ জন্মে ভাল বা মন্দ শরীর, মন ও নানা চেষ্টা প্রাপ্ত হয়েছে। এই গুলির নামই প্রারব্ধ। আর এই জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম গুলিকে বা যে কর্ম্ম গুলির ফলে পর জন্ম হবে, তাদের আগামী কর্ম বলা হয়েছে। আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম বোঝাবার জন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার রচিত গ্রন্থে একটী বেশ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা, একজন লোক ধনুক ধরে তীর ছুঁড়ছে। একটা তীর ছুঁড়ে ফেলেছে। একটা ছুঁড়বো মনে কোরে ধনুকে লাগিয়েছে আর কতকগুলো তার পিঠে বাঁধা —তূণে রয়েছে। যেটা ছুঁড়ে ফেলেছে, সেটা যেখানে হয় লাগ্‌বে। ঐ তীরটার সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করা যেতে পারে। ঐ কর্ম্মের উপর মানুষের কোন হাত নাই। ঐ কর্ম্মের ফল তার শরীর মন ভোগ কর্ব্বেই কর্ব্বে। ইচ্ছা কল্লেও সে ঐ ফলভোগ রোধ কত্তে পার্‌বে না। সেই জন্য মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ কোরেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল শরীরে ভোগ করেন।

যে তীরটা ছুঁড়বে বোলে হাতে নিয়েছে, সেটাকে আগামী কর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐ তীরটা যেমন সে ছুঁড়তেও পারে, না ছুঁড়তেও পারে, সেইরূপ আগামী কর্ম্ম মানুষ ইচ্ছা কল্লে রোধ কত্তে পারে। যে তীরগুলো পিঠে বাঁধা রয়েছে, সেই গুলোর সঙ্গে তার সঞ্চিত কর্ম্মের তুলনা হতে পারে।

শাস্ত্রকার বলেন, যে কর্ম্ম কোচ্চো, তার ফলভোগ কত্তেই হবে। একটা কর্ম্ম আবার অন্য কর্ম্ম প্রসব করে। এইরূপে কর্ম্ম বন্ধন দিনে দিনে জন্মে জন্মে বাড়্‌তে থাকে। এর শেষ কবে হবে? যে দিন আত্মজ্ঞান লাভ হবে। মানুষ যে দিন দেখ্‌বে, সে অখণ্ড, অবিনাশী, জরামরণরহিত পূর্ণানন্দময় আত্মা। সে কখন ভোগ করেও নি, কর্ব্বেও না। শরীর ও মনই এতকাল কায করেছে ও ভোগ করেছে। জবাফুলের পাশে থাকাতেই রংটা কাঁচের গায়ে লেগেছে, কাঁচটা লাল দেখিয়েছে, উহা বাস্তবিক কাঁচের রং নয়।

অথচ শুদ্ধ স্বরূপ আত্মা আছেন বোলেই সব কায কর্ম্ম চলেছে,

অতএব সেই জ্ঞান লাভ হলেই আর কোন কর্ম্মের জোর চলে না, সমুদয় কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়, জ্ঞান অগ্নির তেজে সমুদয় ভস্ম হয়ে যায়।

'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।'

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।'

এই জ্ঞান লাভই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। সুখই ভোগ কর বা দুঃখই ভোগ কর, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ও দুটোর একটাও নয়। সংসারে থাক্ বা সন্ন্যাসীই হোক্, ছাত্র জীবনের মধ্যে বা ব্যবসা বাণিজের ছুটোছুটির ভেতর যেখানেই থাকুক না কেন, মানুষ সকল অবস্থায় এমন ভাবে কায কত্তে পারে, যাতে তার প্রত্যেক কাযই তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে। লোকে মনে করে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা সংসার থেকে আলাদা কোরে রাখ্‌বার যো নেই। এটা বোঝাবার জন্মেই যেন গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে রণভূমিতে, যেথায় হিংসা দ্বেষের তরঙ্গ গর্জ্জাচ্চে। উদ্যমরহিত হয়ে থাক্‌বার সাবকাশ মাত্র নাই এবং মানবমনের পৈশাচিক প্রবৃত্তি গুলোই নিঃসঙ্কোচে খেল্‌তে দাঁড়িয়েছে। এখানে যদি ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ উপদেশ ও অনুষ্ঠান চলে, তবে সংসারে আর এমন কোন্ স্থান আছে, যেথানে উহা চল্‌বে না? যে ধর্ম্ম সকলের জন্য নয়, সে ধর্ম্ম কে চায়? তুমি সুখে থাক, শান্তি পাও আর আমি দুঃখে কষ্টে মরি, ইহা শাস্ত্রকারের ইচ্ছা নয়। যথার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান গৃহস্থ জীবনে বা সন্ন্যাস নিয়ে সব যায়গায় চল্‌বে। যথার্থ ধর্ম্ম সকলকে এক যায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্চে, 'মানুষ, তুমি যে পূর্ণস্বরূপ, তাই আছ। হাপারি কেন মনে কর না, তুমি ক্ষুদ্র, তোমার শরীর আছে, তোমার সুখ দুঃখ ভোগ হচ্চে, তুমি মর্ত্ত্য ইত্যাদি, তুমি যা তাই আছ ও থাক্‌বে।' ধর্ম্ম বল্‌ছেন,—

'য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং'

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ম্ হন্তি ন হন্যতে।'

যে কেউ আত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিম্বা মনে করেন, আত্মা মরে, তাঁরা উভয়েই আত্মাকে জানেন না, আত্মা জন্মেনও না, মরেনও না।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'।

হবেন বা হয়েছেন, তাও নয়, পুরাতন হলেও নিত্য নূতন।

'বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনং অজমব্যয়ং।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥'

যিনি নিত্য স্বরূপ আত্মাকে জানেন, তিনি কাকেই বা মার্‌বেন, কার দ্বারাই বা হত হবেন? তিনি কিছুই করেন না। তাঁর শরীর মন আমরণ আপনা আপনি কার্য্য কোরে চলে যায়। সৎকায, পরোপকার প্রভৃতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়।

দেখা গেল, আত্মজ্ঞান মানুষকে সুখদুঃখের পারে নিয়ে যায়। সেই জন্য মানুষ যখন শোকে মোহে অবশ হয়ে পড়ে, তখন আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ঐ জ্ঞান উপলব্ধি না কোরে অর্জ্জুনেরও শোক মোহ যায় নি। বিশ্বরূপ দর্শন না কোরে, এক মহাশক্তির হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে রয়েছি, একথা অনুভব না কোরে কারো কোন দিন অজ্ঞানপ্রসূত শোক মোহ দুর্ব্বলতাদি লোপ হয় না। অর্জ্জুন যখন দেখ্‌লেন যে, সংসারে কারো কিছু কর্‌বার ক্ষমতা নেই, তখুনি তাঁর ভ্রম ঘুচ্‌লো, তখুনি তাঁর শোক মোহ দূরে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে এই আত্মতত্ত্ব বলে গেছেন মাত্র, তা নয়, কিন্তু সাধারণ ভাবে অর্জ্জুনকে আরও অনেক বুঝিয়েছেন। বলেছেন, তোমার যশ যাবে, তোমাকে লোকে কাপুরুষ ঠাউরে অবজ্ঞা কর্‌বে, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল ইত্যাদি। একথাগুলি অনেক সময় লোকে না বুঝে দোষ দেয়। মনে করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি ছাই কথা বল্‌ছেন। তবে কি লোকে নিন্দা কোর্‌বে বোলে ভয়ে অসৎ কায গুলোও কত্তে হবে? না, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখ্‌লে ভগবানের একথাগুলিরও গভীর ভাব আছে দেখা যায়। দেখ্‌তে পাই, লোকে যার যশ করে, বাস্তবিক তার কোন না কোন বিশেষ গুণ আছে। যদি গুণ না থাকে, তবে সে যশ স্থায়ী হয় না। ভাল কায কল্লে সাধারণ লোকে তোমার সৎ উদ্দেশ্য বিশেষ কোরে না বুঝ্‌লেও গুণ কীর্ত্তন করে। কারো দোষ গুণ বিচার কর্ব্বার জন্যে সম্মুখে ধর্‌লে অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষও বুঝ্‌তে পারে। কেন না, সকলের ভেতর ভগবান রয়েছেন। তাঁর শক্তিতেই ভাল মন্দ বোঝ্‌বার ক্ষমতাও তাদের স্বভাবতঃ রোয়েছে। যদি তোমায় লোকে নিন্দা করে, তবে তার দুটো কারণ হোতে পারে। হয় লোকে তোমায় বুঝ্‌তে পারে না, তুমি এত

উন্নত অথবা তুমি যথার্থ নিন্দার পাত্র। সে স্থলে আপনাকে তোমার প্রথমতঃ বোঝা দরকার। স্থিরভাবে আপনাকে খুব তন্ন তন্ন কোরে দেখে তবে লোকের কথা তোমার উপেক্ষা করা উচিত। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমেই দেখালেন যে, মোহের জন্যই তাঁর এই ভাবের উদয় হয়েছে—ভয় হয়েছে—তাই তিনি যুদ্ধ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা কচ্ছেন। তাই অকারণ লোকে তাঁর অযশ কোর্ব্বে না, এ কথা তাঁর জানা উচিত এবং মোহ ছাড়া উচিত,—

ভগবান তার পর বল্‌ছেন,—

'অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥'

আত্মা নিত্য জন্মাচ্ছেন ও নিত্য মচ্ছেন, একথাও যদি স্বীকার কর, তা হলেও তোমার শোক করা উচিত নয়, কারণ, মত্তে হবে, এটা সকলে জানে। যে দিন থেকে ছেলেটা জন্মাল, সে দিন থেকে সে মরবার দিকেই এগুতে লাগ্‌লো। তাই বল্‌ছেন, এই অপরিহার্য্য বিষয়ের জন্য ভাব্‌লে কি হবে? শরীর ত নিশ্চিত যাবেই। আবার জন্মাবে। তবে তার জন্য আর শোক কেন? এ বিষয়ে শোক করা মূর্খের কায।

'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥'

মানুষ কোথা হতে এখানে এসেছে, কেউ জানে না, কোথা যাবে, তাও জানে না। এই যে সব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও দুইদিনের জন্য, একথাও জানে। তবে আবার মিছে শোক কেন? আর যদি মানুষকে অবিনাশী আত্মা বলে জেনে থাক, তা হলে সে ত কখন মর্ব্বে না, একথা স্থির। তবে আবার শোক কিসের?

'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥'

সেই আত্মাকে কেহ বা আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, কেহ বা ইহার আশ্চর্য্য-

স্বরূপ বলে, কেহ বা তাই অবাক্ হয়ে শোনে, আবার মন্দভাগ্য কেহ বা শুনেও ইহার বিষয় ধারণা কত্তে পারে না।

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥'

যদি এই যুদ্ধে হেরে যাও, ক্ষত্রিয় তুমি, কর্ত্তব্য পালন কোরে সম্মুখ যুদ্ধে মরে স্বর্গে যাবে, জিৎলে রাজ্য পাবে, অতএব যুদ্ধ কর। কিরূপে যুদ্ধ কর্‌বে ?

'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।'

সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় লাভ লোকসান সমান জ্ঞান কোরে যুদ্ধ কর। তা হলে পাপ স্পর্শ কত্তে পার্ব্বে না। কিছু দেখো না। কেবল কর্ত্তব্য ও সত্য পালন কোত্তে যুদ্ধ কোর্‌ছ, এইটী দেখ। এই রকমে সংসারে যদি আমরা কায কোত্তে পারি, সব সময়ে এই ভাব যদি মনে রাখ্‌তে পারি, সংসারে এসে লাভ লোক্‌সানের দিকে নজর না রেখে যদি ঈশ্বরের চাকর চাকরাণীর মত কায কোরে যেতে পারি, কিছুতেই আর বন্ধন আস্‌বেনা। ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হবে। ইহাই জ্ঞানযোগের মূল কথা।

বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির।

—০:০*০:০—

১। সাধারণ নিয়ম।

এই ছাত্রাবাস 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির' নামে অভিহিত হইবে।

সর্ব্বজাতীয় হিন্দুছাত্রই ইহাতে স্থান পাইবেন। তাঁহারা যে কোন পরীক্ষার্থী হউন এবং ভারতের যে প্রদেশের অধিবাসীই হউন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদিগের এই ছাত্রাবাসে স্থান পাইবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

যদি স্থান থাকে, তবে জুলাই মাস হইতে ছাত্র না হইলেও কয়েকজনাকে লওয়া যাইতে পারে।

এই ছাত্রাবাসে ভর্ত্তি হইতে গেলে এই 'মন্দিরে'র কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা বিবেকানন্দ সমিতির সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে।

ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক আবেদনকারীকে একটী প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে আর এই মন্দিরের পরিচালনার জন্য যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে বা ভবিষ্যতে করা হইবে, তাহা মানিয়া চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

এই 'মন্দিরে'র প্রাত্যহিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন কার্য্যাধ্যক্ষ এখানে সর্ব্বদা বাস করিবেন।

বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী থাকিয়া সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবেন ও ছাত্রগণের সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।

এই মন্দির হিন্দুভাবে পরিচালিত হইবে আর ইহার উদ্যোক্তাগণের সর্ব্বদা এই লক্ষ্য থাকিবে, যাহাতে ছাত্রগণের চরিত্র স্বামী বিবেকানন্দের উপদিষ্ট পথে গঠিত হয়।

অসুস্থ অবস্থায় দক্ষ চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে ছাত্রগণকে দেখিবেন ও ঔষধের ব্যবস্থা দিবেন।

এই 'মন্দিরে'র উদ্যোগিগণ সময়ে সময়ে ইহার কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞ ভদ্রলোক ও মহিলাগণকে আনয়ন করিবেন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ ইহার তত্ত্বাবধারক হইতে স্বীকার করিয়াছেন।

সিষ্টার নিবেদিতা	ব্রজনাথদে,—
এন, এন, ঘোষ	তত্ত্বাবধারক, মেট্রো-
নরেন্দ্রনাথ সেন	পলিটান বিদ্যালয়।
ডাক্তার চুনীলাল বসু	প্রোফেসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২। মাহিনা।

ভর্ত্তি হইবার সময় ছাত্রগণকে ভর্ত্তি হইবার জন্য কিছু সতন্ত্র দিতে হইবে না।

মাসে মাসে নিম্নলিখিত হারে মাহিনা লওয়া হয়।—

একতলার একটী স্থানের জন্য	১২৲
দোতলার " " "	১৪৲

তেতলার	”	”	”	১৪॥০
চার তলার	”	”	”	১৫৲

যে কেহ নিজের জন্য একটীর অধিক স্থান চাহিবেন, তাঁহার একতলার একটী অধিক স্থানের জন্য ৪৲ টাকা এবং দোতলা, তেতলা ও চার তলার প্রত্যেক অধিক স্থানের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া অধিক লাগিবে।

প্রত্যেক মাসের মাহিনা মাসের প্রথমেই দিতে হইবে, যেন কোন মাসের ১০ই তারিখের অধিক না হইয়া যায়।

১০ই তারিখে মাহিনা দিতে না পারিলে প্রতিদিন চারি আনা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

ছাত্রগণ যে বেতন দিবেন, তাহাতে তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধা গুলির অধিকারী হইবেন।

(১) আবাসস্থান, (২) দুইবার উত্তম আহার, (৩) রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আলো, (৪) গৃহের চাকরগণের সাহায্য, (৫) পীড়িত হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা ও শুশ্রূষা, (৬) বিবেকানন্দ সমিতির পুস্তকালয়ের ব্যবহার (৭) মন্দিরের ব্যায়ামশালার ব্যবহার (৮) ধর্ম্মশিক্ষা (৯) তত্ত্বাবধান। তাঁহারা পাইবেন না,—

দুগ্ধ, জলখাবার, নিজস্ব চাকর, ধোবা, পাত্র (থাল, গেলাস, বাটী) শয্যা, মাখিবার তৈল, রাত্রি দশটার পর আলো, দন্তমঞ্জন প্রভৃতি।

যাঁহারা পূজা ও খ্রীষ্টমাস ছুটির সময় বাড়ী যাইবেন, তাঁহাদিগকে ‘মন্দিরে’র নিত্য ব্যয়, যথা,— চাকরের মাহিনা, ট্যাক্স প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ মাহিনারঅর্দ্ধেক দিতে হইবে।

এক সপ্তাহ বা তাহা হইতে অল্প সময়ের জন্য এখানে না থাকিলে তাহার জন্য মাহিনা হইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবে না।

কলেজ খোলা থাকিতে থাকিতে যদি কেহ এক সপ্তাহের অধিক এখানে না থাকেন, তবে তাঁহাকে এক সপ্তাহের যতদিন অধিক কামাই থাকিবে, ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য চার আনা করিয়া বাদ দেওয়া যাইবে।

যে সকল ছাত্র মাসের ১০ই এর পূর্ব্বে ভর্ত্তি হইবেন, তাঁহাদিগকে পুরা মাহিনা দিতে হইবে।

১০ই হইতে ১৫ই এর মধ্যে ¾

১৫ই হইতে ২০শের মধ্যে	‡
২০শের পরে	৳

প্রত্যেক গ্রীষ্মাবকাশের সময় মন্দির বন্ধ থাকিবে। তখন কেবল ছাত্রদিগের নিকট হইতে ঘরের ভাড়া স্বরূপ কিছু কিছু নিম্নলিখিত হারে লওয়া হইবে।

এক তলায়	৩৲
দোতলায়	৪৲
তেতলায়	৪৷৹
চারিতোলায়	৫৲

যাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে একেবারে মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত টাকা দিতে হইবে না ;

যাঁহারা একেবারেই 'মন্দির' পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি গ্রীষ্মাবকাশের পর আবার যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিয়মিত ভাবে ছুটির সময় যেরূপ হিসাবে ঘরভাড়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহা দিতে হইবে।

ছাত্রগণের বন্ধু বা অভিভাবকগণ তিন দিন ক্রমান্বয়ে থাকিতে পারিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন ।৵৹ আনা করিয়া লাগিবে।

অসুস্থাবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে ছাত্রগণের গৃহে খাবার দিয়া আসিতে হইলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র খরচ লাগিবে।

কোন রোগীর পথ্যের খরচ যদি দৈনিক চারি আনার অতিরিক্ত হয় তবে সেই অতিরিক্ত ব্যয় ছাত্রেরই বহন করিতে হইবে।

পীড়িতাবস্থায় ঔষধের খরচ ছাত্রগণকে দিতে হইবে।

৩। আচরণ।

ছাত্রগণ পরস্পরকে এক পরিবারান্তর্গত মনে করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্মান ও যত্ন করিবেন।

তাঁহারা যেন কোনরূপে পরস্পরকে বিরক্ত না করেন অথবা মন্দিরের সাধারণ শান্তিভঙ্গ না করেন।

তাঁহারা যেন মন্দিরের স্থায়ী তত্ত্বাবধারক ও কার্য্যাধ্যক্ষের কথা মানিয়া চলেন ও মন্দিরের নিয়ম সমস্ত প্রতিপালন করেন।

মন্দির হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অথবা কোন বিশেষ কারণে রাত্রি

দশটার পর বাহিরে থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে তত্ত্বাবধারকের অনুমতি লইতে হইবে।

মন্দিরের দ্বার রাত্রি দশটার সময় বন্ধ হইবে। দশটার ভিতর যেন সকলেই মন্দিরের মধ্যে থাকেন।

রাত্রি ভোজনের পর সকলেই যেন নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যান, যেন কথা বার্ত্তা কহিয়া বা অন্য কোনরূপে মন্দিরের শান্তিভঙ্গ না করেন।

বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সাধারণ ভোজন গৃহে সকলকেই ভোজন করিতে হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে কার্য্যাধ্যক্ষের অনুমতি অনুসারে তাহা তাঁহার গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া আসা হইবে।

ছাত্রগণের কিছু আবশ্যক হইলে চাকর বাকরকে নিজেরা হুকুম না করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহা জানাইবেন—তিনি চাকরকে বলিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

যদি কাহারও কোন অভিযোগ থাকে, তিনি তত্ত্বাবধারক ও কার্য্যাধ্যক্ষকে তাহা জানাইবেন।

ছাত্রগণ নিম্নলিখিত উপায়ে বাড়ী পরিষ্কার রাখিতে সাহায্য করিবেন।

(ক) নিজের নিজের জিনিষ যথা স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া।

(খ) দরজার গোড়ায় পাপোশে জুতা মুছিয়া ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা রাখিয়া।

(গ) আবশ্যক হইলে পিকদানি ব্যবহার করিয়া।

(ঘ) দেয়ালে পেরেক না মারিয়া অথবা তাহার উপর হিজিবিজি না কাটিয়া, মেজে বা জানালা দরজা খারাপ না করিয়া, না ভাঙ্গিয়া বা নষ্ট না করিয়া।

এই সকল গুলির যিনি ঐরূপে ক্ষতি করিবেন, তাঁহার খরচে তাহা সারাইয়া লওয়া হইবে।

নিয়ম ভঙ্গ করিলে বা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অবাধ্য হইলে মন্দির হইতে দূরীভূত করা হইবে।

৪। ধর্ম্ম শিক্ষা।

যাহাতে ছাত্রগণ তাঁহাদের ধর্ম্মের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় জ্ঞান লাভ

করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হইবে। ছাত্রগণকে সেই সুবিধার সাহায্য লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

জোর করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

পূজা ও ধ্যানের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকিবে। ছাত্রগণ প্রাতে ও সায়ং কালে তথায় গিয়া স্বচ্ছন্দে ধ্যানাদি করিতে পারেন।

ছাত্রগণ বিবেকানন্দসমিতির পুস্তকালয়ের ধর্ম্মপুস্তকগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন।

উপযুক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ সপ্তাহে তিন দিন অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন। ছাত্রগণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন এবং তাঁহাদের নিকট সাধনাও শিক্ষা করিতে পারেন।

মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে বিবেকানন্দ সমিতির যে শনিবাসরীয় বক্তৃতা হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য ছাত্রগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সভা ৫৷৷০ টার সময় হইয়া থাকে।

যদি ৫ জন ছাত্র আবেদন করেন, তবে গীতা অথবা অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে নিয়মিত অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

'বিবেকানন্দস্মৃতিমন্দিরে'র মুদ্রিত ইংরাজী নিয়মাবলি হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ আশা ও বিশ্বাস করিতেন যে, ভারত আবার উন্নত হইবে। আর তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, এ উন্নতি ধনিগণের দ্বারা হইবে না, নিঃস্বার্থ, দৃঢ়চেতা, অগাধ সহানুভূতিসম্পন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীস্থ বালক ও যুবাগণের দ্বারা হইবে। বাঙ্গালী জাতির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইহারাই আপনারা জাগিয়া শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করিবে। এই শিক্ষক মণ্ডলী গঠনের জন্যই তাঁহার বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন। 'কিন্তু কয়জন এ জগতে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে?—এ ভারতে কয়জন?' তাই যাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মত যুবকগণের চরিত্র গঠন হইতে পারে, তজ্জন্য এই 'মন্দির'-স্থাপনা। অবশ্য আরম্ভ অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অতি বৃহৎকায় বটবৃক্ষ নিহিত থাকে, তা কে না জানে? আমরা জানিয়া পরম আনন্দিত হইলাম যে, ইতিমধ্যেই 'মন্দিরে' আব ছাত্র ধরিতেছে

না। ৪২টী স্থান সব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কার্য্যও অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। কলিকাতার ছাত্রাবাসসকলের দুর্দ্দশা কাহারও অবিদিত নাই। সর্ব্বস্থানেই ছাত্রগণের আহারের অতিশয় কষ্ট, অথচ তাহাদিগকে রীতিমত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। তার পর কি বিদ্যালয়ে, কি গৃহে, কি ছাত্রাবাসে সর্ব্বত্রই শিক্ষা ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য। যে ধর্ম্ম শিক্ষার মূল বীজস্বরূপ, যাহার অভাবে শিক্ষা শিক্ষাপদ বাচ্যই নহে, সেই ধর্ম্ম শিক্ষা রীতিমত কোথাও হয় না। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বাধ্য হইয়া উদাসীন। কোন কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার চেষ্টা দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা প্রায় কোনরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষাতেই পর্য্যাপ্ত। 'শুদ্ধ উপদেশাপেক্ষা একটা জীবন যে সহস্রগুণে শিক্ষাপ্রদ,' ইহা সনাতন সত্য। কিন্তু জীবন্ত আদর্শের অভাবে এ সত্য কার্য্যে পরিণত বড় একটা হয় না। মিসনরি ছাত্রাবাস সমূহে আহারের কোন কষ্ট নাই, ধর্ম্মশিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতেছে। আপনার ধর্ম্মের বিষয় মোটেই না জানিয়া বাল্যকাল হইতেই পরধর্ম্মের শিক্ষা পাইয়া ছাত্রগণের একরূপ ডালখিচুড়ি পাকাইয়া যায়। অনেকে যৌবনের অবিমৃশ্যকারিতায় পরধর্ম্মে দীক্ষিত পর্য্যন্ত হইয়া রক্তের তেজ কমিলে অনুতপ্ত হন, কিন্তু শিক্ষার দোষে স্বধর্ম্মের নিন্দাকে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য ও এক মাত্র ধর্ম্মবোধে চিরকাল আশ্রয় করিয়া থাকেন।

এই অনিষ্টগুলি নিবারণ করাই আমাদের এ ক্ষুদ্র উদ্যম। যাহাতে উত্তম খাদ্য খাইয়া শরীর এবং তাহার সঙ্গে মনও পুষ্টিলাভ করে, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত এখানে আছে। তার পর চরিত্র গঠনের এবং স্বধর্ম্মশিক্ষার যত প্রকার সুবিধা সম্ভব, তাহা ছাত্রগণকে দেওয়া হইতেছে। একটী বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম্মশিক্ষাদানে কোনরূপ জোর নাই। ধর্ম্ম জোর করিয়া গিলাইয়া দিবার বস্তু নহে। উহা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। কেবল এমন কতকগুলি অনুকূল সুযোগ দিতে হয়, যাহাতে হৃদয়ের ভিতর গুপ্তপ্রদেশে নিহিত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জাগরিত হয়। এখানে তাহার সমুদয় আয়োজন রহিয়াছে। প্রথমতঃ সাধু সঙ্গ। সাধুসঙ্গই ধর্ম্ম লাভের প্রথম সোপান। সাধুর নিকট সর্ব্বদা থাকিলে তাঁহার পবিত্র চরিত্রের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে সকলের ভিতরই সঞ্চারিত হয়। ২য়,—সদ্‌গ্রন্থ ও সদাচার্য্যের

উপদেশ প্রাপ্তির সুযোগ। তার পর যখন ধর্ম্মভাব প্রাণে একবার জাগরিত হয়, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্ম একটু নিভৃতস্থানের প্রয়োজন হয়। এখানে সেই জন্ম একটী ঠাকুর ঘরও স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই কার্য্য যে অতি মহৎ ও অতি প্রয়োজনীয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ যে এই কার্য্যের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ বিশেষ প্রার্থনীয়। যাহাতে ইহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে, যাহাতে ছাত্রবৃন্দ আদর্শ চরিত্র হইয়া সর্ব্ব প্রকারে দেশের উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, তজ্জন্ম চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

সম্পাদক।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

—০:০*০:০—

আমরা কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মাসিক বিবরণী উক্ত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে রীতিমত পাইতেছি। সম্প্রতি মে ও জুন দুই মাসের বিবরণী পাইয়াছি। তাহাতে দেখা যায়, প্রতিমাসে প্রায় দুই শত ব্যক্তি (সাধু ও দরিদ্র গৃহস্থ) এই আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আর প্রতি মাসে প্রায় ৫।৬ জন করিয়া সাধু আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়া আশ্রমাধ্যক্ষের সেবা শুশ্রূষার গুণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

কাসিমবাজারের মহারাজা এই আশ্রমের সাহায্যার্থ ২৫৲ টাকা দিয়াছেন। বোম্বাই এর নাথুভাই আশ্রমের ব্যবহারার্থ একটী টেবিল, কতকগুলি বিছানাপত্র, খাটিয়া, লণ্ঠন, বাতি, বাক্স, ঔষধ ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিয়াছেন। আগরানিবাসী লালা বৈজনাথজীও কতকগুলি ঔষধ এবং সাগু ও এরারুট দিয়াছেন।

অন্যান্য অনেক সহৃদয় ব্যক্তিও আটা, ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং কেহ কেহ বা অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। সাধুতার পোষক দরিদ্র অনাথের সেবক এই সকল সহৃদয় মহাজনগণকে আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ।

বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানি অনুগ্রহ করিয়া অল্পমূল্যে নানাপ্রকার ঔষধ বিক্রয় করিয়া এই পরম হিতকর কার্য্যের সাহায্য করিয়া আমাদের পরম ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। যে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ৩৯।/৫ এবং জুন মাসে ৪৩/১০। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন দেশের অন্যান্য ধনিব্যক্তি-গণ পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের সদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া আপনারাও কৃতার্থ হইতে পারেন এবং আমাদিগকেও জীবসেবারূপ মহৎ কার্য্যের অবসর দিয়া কৃতার্থ করিতে পারেন।

মহাভাব।

জ্ঞান অজ্ঞান অন্তরালে আপনি বাজিছে সুর,
অপূর্ব্ব অমিয় ভরা, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সারা
রবি শশী গ্রহতারা ভেদিয়ে অনন্ত দূর।
নাহি দিবা নাহি রাতি, নাহিক কালের গতি,
উচ্ছ্বসিত ভাব গীতি, তরঙ্গিত অবিশ্রাম।
উন্মাদিনী উলঙ্গিনী, প্রসূতি প্রকৃতি রাণী
স্বভাবে আপন হারা মিশায়ে দিয়াছে প্রাণ,
নির্ব্বাণ বিকাশে জ্যোতি, উপশান্ত চিদ্‌ভান।
জড়েতে চৈতন্য ফোটে, সৃষ্টিস্থিতি লয় ছোটে,
জীবত্ব গিয়েছে টুটে, ছায়া কায়া নাহি আর
শিব শিব ব্যোম্ ব্যোম্, হরি ওম্ হরি ওম্
অরূপ সুন্দর চির একাকার একাকার।
অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাস, চিদানন্দ স্বপ্রকাশ
মোহিত স্তম্ভিত বেদ, শাস্ত্রষড়্‌দরশন
মধুর কেবলারতি, অবাক্ অগাধ গতি,
তৎসৎ স্বরূপে ঋষি মহাভাবে নিমগন।

শ্রীআশুতোষ দেব, এম, এ।

জপ পরমার্থ।

(মহাত্মা নানকের জপজী অবলম্বনে)

(১)

একমাত্র পরমাত্মা প্রণব ওঁকার,
নিরবৈর নিরভয় জন্ম নাহি যার,

অকালমূরতি যিনি অখিলের স্বামী,
আদি সত্য সনাতন সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
সৃষ্টির আদিতে স্থিত, যুগাদিতে বিরাজিত,
কিবা ভূত ভবিষ্যৎ কিম্বা বর্ত্তমান,
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে যিনি বিদ্যমান,
চিন্তার অতীত প্রভু লোকচিন্তামণি,
অব্যক্ত যে ইচ্ছাময় অসীম আপনি,
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ জীব, ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব,
লক্ষ জন্ম ধ্যান করে নহে তিরপিত,
স্বরূপনির্ণয়ে জ্ঞানী জ্ঞান পরাভূত,
হেন মূঢ় নাহি কেহ জগত সংসারে,
তাঁরে না চিন্তিয়ে মিথ্যা মৌনী হয়ে ফেরে,
সহস্র চাতুরী খেলা, বুদ্ধিশক্তি তর্কছলা,
কার্য্যকরী হয় না ক মিলাতে সে ঠাঁই,
অনাদি কারণ কর্ত্তা ঠাকুর গোঁসাই,
ভাবের দেবতা তিনি প্রভু ভগবান,
ভক্তির ভাবেতে মিলে নাহি বিধি আন,
ভজ ওরে মূঢ় মন, স্থিরচিতে অনুক্ষণ,
অগতির গতি সেই পতিতপাবনে,
নিত্যসত্য বাসুদেব শ্রীচৈতন্যধনে,
ব্যাপিত যাঁহার প্রেম অনন্ত সংসারে,
নিত্যানন্দভাবে যিনি অন্তরে বাহিরে।

শ্রীআশুতোষ দেব, এম, এ।

জপ পরমার্থ।

(২)

যাঁহার আদেশে সৃষ্টি অনন্ত আকার,
যাঁহার আজ্ঞার নাহি হয় পারাপার,
যাঁহার ইচ্ছায় হয় জীবের উদ্ভব,
অসম্ভব যাঁহা হতে নিমেষে সম্ভব,

উত্তম অধম ভাব, প্রকাশ বা তিরোভাব,
সুখ দুঃখ মোহ শান্তি শাস্তি পুরস্কার,
নিয়ত সাধিত হয় ইচ্ছায় যাঁহার,
দেবতা, মানব কিম্বা পশুপক্ষী হীন,
চরাচরে যত জীব যাঁহার অধীন,
সে পুরুষ পুরাতনে, সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণে,
কর পূজা নিশিদিন ত্যজি কুবিচার,
ভাতিবে জ্ঞানের জ্যোতি আনন্দ অপার।
আমি আমি মহাতম ত্বরা হবে নাশ,
সর্ব্বদা হেরিবে নিত্য সত্যের বিকাশ।

শ্রীআশুতোষ দেব, এম, এ।

"এই জগৎই ব্রহ্ম।"

—•:○•○:•—

নীরনিধি নীরে ভাসি,
নীরনিধি রূপ রাশি,
ক্ষুদ্র এ নয়নে মম পূর্ণ না নেহারি।
দূর চক্রবালে নভ মিশে গেছে,
তারও পর শুনি নীরনিধি আছে,
অনন্ত সে রূপ কোথা ফুরায়েছে,
সীমান্ত কিছু দেখিতে নারি।

(তাই) তার এক মহা তরঙ্গেরে ধরি,
পূর্ণ নীরনিধি কল্পনা করি,
সে তরঙ্গে বলি, "রাম, কৃষ্ণ, হরি,
শ্রীচৈতন্য, কালী, ত্রিপুরারি।"

যখন যে নাম হৃদয়েতে আসে,
ডাকি প্রাণ ভরে তাঁরে সেই ভাষে,
নাম ভেদে কিছু যায় না ত এসে,
ভেদ শূন্য তিনি বহু নামধারী।

বুদ্ধ রূপে তিনি বৌদ্ধ জগতে,
তিনি মহম্মদ আরব মরুতে,
তিনি খ্রীষ্ট, অবতীর্ণ জেরুজালেমে,
তিনি রামকৃষ্ণ, পূর্ণ ব্রহ্মচারী।

শ্রীচণ্ডীচরণ বর্দ্ধন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধরের বাড়ী আগমন ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ আশ্বিন শুক্লা একাদশী ১লা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসিতেছেন। সঙ্গে নারাণ, গঙ্গাধর।* পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল।

ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, 'আমি মালা জোপ্‌বো? থ্যাক থু! এ শিব যে পাতাল ফোঁড়া শিব, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ!' অধরের বাড়ীতে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। কেদার, বিজয়, বাবুরাম ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। কীর্ত্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন। অধর ঠাকুরের আদেশ ক্রমে আফিস হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীর্ত্তন শুনেন। বৈষ্ণবচরণের সংকীর্ত্তন অতি মিষ্ট। আজও সংকীর্ত্তন হইবে। ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তেরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর নারাণ ও বাবুরামকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, আপনারা আশীর্ব্বাদ করো, যেন এদের ভক্তি হয়। নারাণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল। ভক্তেরা সকলে বাবুরাম ও নারাণকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি)। তোমাদের সঙ্গে রাস্তায়

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য এক টাকা। ৫৭ নং রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট,—বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

† গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ। ইনি ঠাকুরের অদর্শনের পর উত্তরাখণ্ড হইয়া তিব্বত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অধুনা বহরমপুরের নিকট ভাবদা নামক স্থানে অনাথাশ্রমের ভার লইয়াছেন। ইঁহারও কৌমার বৈরাগ্য।

দেখা হোলো, তা না হলে তোমরা কালীবাড়ী গিয়ে পড়তে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হোয়ে গেল।

কেদার (বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি)। ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে আপনার ইচ্ছা!

ঠাকুর হাঁসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ভ করিয়া রাসকীর্ত্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকীর্ত্তন যাই আরম্ভ হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ইনি বেশ গান। এই বলিয়া বৈষ্ণব-চরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর' এই গানটী গাইতে বলিলেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন,—

'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়।' ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, 'কেমন?' বিজয় বলিলেন, 'আশ্চর্য্য!'

ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধরিলেন।

গান।

ভাব হবে বৈ কিরে।
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কিরে।
ভাবে হাঁসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে।
সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।
যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে)
গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে।
গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

আর্ছার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন,—

গান।

হরি হরি বলরে বীণে।

বীণে একবার হরি বল, হরিনাম বিনে নাই সম্বল,

* * * * * *

পরম তত্ত্ব আর পাবিনে।

ঠাকুর কীর্ত্তনিয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবচরণকে বলিলেন, ঐ রকম কোরে বলো—কীর্ত্তনিয়া ঢঙে।

বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন।

গান।

শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে।
ভাসিতেছে সেই তরী শুদ্ধাসরোবরে॥
শ্রীগুরু করুণা করি সেই ধন দিলে।
সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কূলে॥
যদি বল ছয়রিপু হইবে পবন।
ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান॥
তুফানেতে কি করিবে আছে শ্রীদুর্গানাম তরী।
অবশ্য পাইবে কূল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য মা, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥
চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় মা তুমি বিশ্বমূল॥
ত্রিলোক জননী তুমি ত্রিলোক তারিণী।
ওমা সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি॥

ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিলেন,—

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় মা তুমি বিশ্বমূল ॥
ত্রিলোক জননী তুমি মা ত্রিলোক তারিণী।
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ॥

কীর্ত্তনিয়া আবার আরম্ভ করিলেন।

বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আব আকাশ।
রূপ দিক দিগন্তর তোমা হতে প্রকাশ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে।
তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেদার ও কয়েকটী ভক্ত গাত্রোত্থান করিলেন—বাড়ী যাইবেন। কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন আর বলিলেন, আজ্ঞে তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)। তুমি অধরকে না বলে যাবে? অভদ্রতা হয় না?

কেদার। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হোলো—আর কিছু অসুখ বোধ হয়েছে—আর বিয়ে থায়ের জন্য একটা ভয় হয়—সমাজ আছে—একবার তো গোল হয়েছে—

বিজয়। এঁকে রেখে যাওয়া—

এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসিলেন। ভিতরে পাতা হইয়াছে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন ও বিজয় ও কেদার এঁদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে।

বিজয়, কেদার ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন। কেদার, বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিলেন।

কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, মাপ করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলুম। কেদার বুঝি ভাবিলেন, ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোন্ ছার।

কেদারের কর্ম্মস্থল ঢাকায়। সেখানে অনেক ভক্ত তাঁহার কাছে

আসেন ও তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারূপ দ্রব্য আনয়ন করেন। কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

কেদার (বিনীতভাবে)। লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। কি কোর্‌বো প্রভু, হুকুম করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বছর উন্মাদের পর ওদেশে * গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে! খান্‌কি পর্য্যন্ত খাইয়ে দিলে। এখন কিন্তু পারিনা।

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে মৃদুস্বরে)। প্রভু, আপনি শক্তি সঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে। আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হয়ে যাবে গো।—আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাক্‌লে হয়ে যায়।

কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্র † আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার নিরাকার, আবার কত কি, তা আমরা জানি না। শুধু নিরাকার বল্লে কেমন কোরে হবে?

যোগেন্দ্র। ব্রাহ্ম সমাজের এক আশ্চর্য্য। বার বছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখ্‌ছে। আদি সমাজে সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পূজাতে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আস্‌তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখ্‌ছে।

অধর। শিবনাথ বাবু সাকার মানেন না।

বিজয়। সেটা তাঁর বুঝ্‌বার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বৌরূপী কখন এরং কখন সে রং। যে গাছতলায় বোসে থাকে, সেই ঠিক জান্‌তে পারে। আমি ধ্যান কোত্তে কোত্তে দেখ্‌তে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, তাঁরা কত কি বল্লেন। আমি বল্লুম, তাঁর ‡ কাছে যাবো, তবে বুঝ্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ঠিক দেখা হয়েছে।

---

* ওদেশে—কামারপুকুরে, ঠাকুরের জন্ম ভূমি।

† শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র—বঙ্গবাসীর সম্পাদক।

‡ তাঁর কাছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে।

কেদার। ভক্তের জন্য সাকার। ভক্ত প্রেমে সাকার দেখে। ধ্রুব যখন ঠাকুরকে দর্শন কল্লেন, বলেছিলেন, কুণ্ডল কেন দুল্‌ছে না? ঠাকুর বল্লেন, তুমি দোলালে দোলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব মান্‌তে হয় গো—নিরাকার সাকার সব মান্‌তে হয়। কালীঘরে ধ্যান কত্তে কত্তে দেখ্‌লুম রমণী খান্‌কি। বল্লুম, মা, তুই এইরূপেও আছিস্। তাই বল্‌ছি, সব মান্‌তে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন,—'এসেছেন এক ভাবের ফকির'—ইত্যাদি।

বিজয়। তিনি অনন্তশক্তি আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না? কি আশ্চর্য্য, সব রেণুর রেণু, এরা সব কি না এই সব ঠিক কত্তে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলিছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপ্‌ড়ে গিছ্‌লো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক-দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাব্‌ছে, এবারে এসে পাহাড়টা নিয়ে যাব! (সকলের হাস্য।)

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [৪র্থ বর্ষ, ৩২৪ পৃষ্ঠার পর।

সামান্য ছলনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ভার্য্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহা তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত হয় নাই। তাহা নহে:

আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

এই চিরন্তন নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, আত্মরক্ষার্থ তিনি দারত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে পার যে, বঞ্চনাবাক্য ভার্য্যাকে মুগ্ধ

করিয়া, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ সমীচীন হয় নাই। মিথ্যাভাষণ সর্ব্ব কালেই যে দোষাবহ, ইহা নীতিবিশারদগণের মত নহে। সূর্য্য স্থির আছেন ও পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহা মূর্খকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং তাঁহারা বলেন,

মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন, যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্।

মূর্খকে তাহার মতে মত দিয়া, এবং পণ্ডিতকে, যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বশে আনয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব জননী শচীদেবীকেই গৃহত্যাগের কথা জানাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে নহে। শ্রীমৎ শাক্যসিংহ তস্করের ন্যায় গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী ভার্য্যাকে আপনার মনোভাব কিছুই জানিতে দেন নাই। যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া ও গোপা উভয়েই পতিভক্তির আদর্শস্থল ছিলেন, পতির সুখেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন, তথাপি তাঁহারা লোকহিতের জন্য অবতীর্ণ সাধারণের সামগ্রী মহাপুরুষদ্বয়কে কেবল আপনাদেরই করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া স্বার্থরূপ মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত মোহনিবন্ধন, তাঁহাদিগকে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। জমাম্বা তাদৃশী পতিপরায়ণা ছিলেন না, তিনি তিনবার পতির আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে যদি শ্রীরামানুজ আপনার মনের যথার্থভাব কহিতেন, তাহা হইলে এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত। আত্মসুখ মুখ্য এবং পতিসুখ যাঁহার জীবনের গৌণ উদ্দেশ্য, এরূপ স্বার্থপরায়ণা দেহাত্মাভিমানিনী রমণীর কেবল ইহাই ইচ্ছা হয় যে, স্বামী হরিসেবা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তাঁহারই সেবায় নিরত থাকুন। এরূপ স্থলে, হরিসেবা প্রসঙ্গই উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র। রামানুজ জমাম্বার অন্তরে হরিভক্তির বীজ রোপণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বার্থসিকতাময় ঊষর ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি উপরোক্ত কালের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অশ্রুবারিই স্বার্থসিকতা বিধৌত করিবার এক মাত্র উপায়, ইহা তিনি সবিশেষ জানিতেন, সেই জন্যই তাঁহার গৃহত্যাগ করা। ইহাতে, একদিকে যেমন তাঁহার হরিসেবাসমুৎসুক মন, অহরহ তদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে, অপর দিকে তেমনি, জমাম্বার নয়নে অনুতাপাশ্রু প্রবাহিত করিয়া তদীয় হৃদয়ের ঊষরতা নাশ করিবে।

সুতরাং জমাতাকে ছলনা করিয়া শ্রীরামানুজের সন্ন্যাস গ্রহণ অন্যায় হয় নাই।

তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, তিনি যে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই, ইহা স্পষ্ট; কারণ, বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বীয়গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত উক্ত মত লইয়া বিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত তাৎকালিক কোনও সন্ন্যাসীকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। সাক্ষাৎ সনাতন শ্রীমদ্‌বরদরাজই তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন এবং ভগবানে ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী ভক্তিই তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ। তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরির ধ্যানেই নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহার পক্ষে সাংসারিক বিষয়ে মনোনিবেশ করা দুরূহ হইয়াছিল। অতএব সংসারত্যাগই ঈদৃশ মহানুভবগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ভক্তিরসে তিনি ইতর সমুদয় রস বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তিমার্গের সন্ন্যাসী বলিতে হইবে।

সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আবালবৃদ্ধবনিতা এই বার্ত্তায় বিস্মিত হইলেন। ভার্য্যা যুবতী ও পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না, আপনিও যুবক এবং পরম রূপবান্। এ অবস্থায় সংসারসুখ পরিত্যাগ করা যে ভোগপরায়ণগণ এক প্রকার অসম্ভব বোধ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে বাতুল বিবেচনা করিলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে অবতার পুরুষগণের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কতলোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিতে লাগিল। তত্রত্য মঠবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিলেন। তাঁহার গুণাতিশয্য ও পাণ্ডিত্য কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং দু একজন শিষ্যও তাঁহার পদপ্রান্ত অধিকার করিতে লাগিল। দাশরথি নামা তাঁহার এক ভাগিনেয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি বেদবেদান্তবিশারদ ও হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পরে হারিতগোত্রসম্ভূত কুরনাথ বা কুরেশ নামা কোনও মহানুভব যুবক তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্যের স্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি অতুলনীয় ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। এই দুই শিষ্যের সহিত মঠে উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করতঃ শ্রীরামানুজ যখন আগন্তুকগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন, তখন তাঁহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত।

একদা যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধা জননী শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিতে আসিয়া শিষ্য রামানুজকে মঠে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার রূপে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে করিলেন যে, যদি তাঁহার সন্তান এই মহানুভবের শিষ্যত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই পরম শান্তিলাভ হইবে। যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করিয়া অবধি মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার জননী অবগত ছিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর দেবতুল্য বিগ্রহ অবলোকন করিয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে বরদরাজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, যাদবপ্রকাশকে যদি তিনি উক্ত মহানুভবের পদপ্রান্তে আনিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার পরম মঙ্গল হইবে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তানের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে বিশেষরূপে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যাদব স্বীয় শিষ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে ভাবিয়া মাতৃবাক্য পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন উক্ত অপ-সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইল না। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সহসা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত পথে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার মনে একপ্রকার অশান্তির বাতাস উঠিয়াছে। ইহার উপশম হয় কিরূপে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন। আপনি শ্রীমদ্‌বরদরাজের মুখ স্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ।" ইহাতে কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, অদ্য আপনি গৃহে গমন করুন, কল্য প্রভুর নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কহিব।"

পরদিন কাঞ্চিপূর্ণের মুখ হইতে রামানুজের অসাধারণ মহত্ত্ব, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে নিজ মঙ্গল সাধিত হইবে শুনিয়া, যাদবপ্রকাশ মঠে যাইয়া রামানুজকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাবিলেন, মূর্খের ন্যায় একবারে কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। গতরজনীতে স্বপ্নে রামানুজের শিষ্য হইতে তিনি কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অদ্য আবার কাঞ্চিপূর্ণের মুখেও সেই কথা। কিন্তু তিনি স্বপ্নে বা কথায় ভুলিবার লোক ছিলেন না। এই জন্য আহারান্তে মঠে গমন করিলেন।

বাস্তবিকই রামানুজের অমানুষী জ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তথাপি যাঁহাকে শিষ্য বলিয়া ধারণা আছে, তাঁহাকে একেবারে গুরুর আসনে কে সহজে বসাইতে চাহেন?

যাদবপ্রকাশকে সমাগত দেখিয়া শ্রীরামানুজ সবিশেষ অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহার এই সমাদরে তিনি নিরতিশয় প্রীত হইলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর যাদব প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, আমি তোমার পাণ্ডিত্য এবং বিনয়ে পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও বাহুদ্বয়ে পদ্ম ও চক্র ধারণ করিয়াছ দেখিতেছি এবং তোমার সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই সমীচীন বোধ হয়। ভাল, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে পার?" ইহাতে শ্রীরামানুজ কহিলেন, "এই কুরনাথ নিরতিশয় মেধাবী, ইঁহার সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ। আপনি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। ইনি আপনাকে অনায়াসে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারিবেন।" যাদব কুরনাথের দিকে কটাক্ষ করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, সাম বেদের প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, ভগবান বলিতেছেন, 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি।' অতএব প্রথমে আপনাকে সামবেদেরই প্রমাণ দিতেছি।

প্রতে বিষ্ণোরব্জচক্রে পবিত্রে জন্মাম্ভোধিং তর্ত্তবে চর্ষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দধতেঽন্যে পুরাণলিঙ্গান্যঙ্গে তাবকান্যর্পয়ন্তি॥

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ভবসাগর পার হইবার জন্য বাহুমূলে বিষ্ণুর পবিত্র পদ্ম ও চক্র চিহ্ন ধারণ করেন। কেহ কেহ সেই সকল পুরাণ চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন।

পবিত্রমিত্যগ্নিঃ। অগ্নির্বৈ সহস্রারঃ। সহস্রারো নেমিঃ। নেমিনা তপ্ততনুর্ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি।

ইতি অথর্ব্বণি।

অগ্নি পরম পবিত্র। তিনি সহস্রদল পদ্মের ন্যায় শোভাশালী। পদ্ম চক্রাকার যন্ত্রতুল্য। অগ্নিদগ্ধ সুতরাং লোহিত উক্ত যন্ত্র প্রয়োগে যাঁহার দেহ উত্তপ্ত হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈঃ রঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবামঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥

পরাশর সংহিতা।

যাঁহারা চক্রাঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন, আমরাও তাঁহাদের ন্যায় এই সকল বিষ্ণুচিহ্ন দ্বারা রক্ষিত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্য লাভ করিব।

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

ভীষ্মপর্ব্ব।

ব্রাহ্মণগণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ উপবীতের ন্যায় শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিবেন।

হরেঃ পদাকৃতিং আত্মনো হিতায় মধ্যেচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রম্ যো ধারয়তি, স পরস্য প্রিয়োভবতি, স পুণ্যবান্ ভবতি, স মুক্তিমান্ ভবতি।

মহোপনিষদ্।

যে ব্যক্তি আত্মহিতের জন্য হরিপদাকার মধ্যচ্ছিদ্র অর্থাৎ মধ্যস্থলে অবকাশযুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি পরমাত্মার প্রিয়, পুণ্যবান্ ও মুক্তিমান্ হয়েন।

হে পণ্ডিতবর! অতঃপর ব্রহ্ম যে সগুণ, শ্রুতি হইতে তাহার প্রমাণ দিতেছি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।" শ্বেতাশ্বতরে। তিনি বিবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন। তাঁহার জ্ঞান, বল ও কার্য্য স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। অর্থাৎ তিনি পাপলেশপরিশূন্য, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা তাঁহাতে নাই। তিনি যাহা কামনা ও সঙ্কল্প করেন, তাহা কখনও মিথ্যা হয় না।

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধোদেব একো নারায়ণঃ। একো বৈ নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সমো ন সূর্য্য ইতি। নারায়ণই পরম ব্রহ্ম ও পরম তত্ত্ব। এ সমুদয় নারায়ণ ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনিই নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, বিকারবিহীন, নামহীন, শুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকাশক। পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। তখন, ব্রহ্মা, শিব, পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য ইঁহারা কেহই ছিলেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

হরিঃ পরায়ণং পরং হরিঃ পরায়ণং পরম্।
পুনঃ পুনর্বদাম্যহং হরিঃ পরায়ণং পরম॥"

কুবনাথ এইরূপে ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে দিতে লাগিলেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিলাম না। তাঁহার মুখ হইতে বৃষ্টির ন্যায় অবিরামধারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া যাদব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বেই তাঁহাদের সৌজন্য ও সৌন্দর্য্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পূর্ব্ব অত্যাচার, মাতৃবাক্য, কাঞ্চিপূর্ণকথিত শ্রীবরদরাজের অভিপ্রায় প্রভৃতি স্মরণ করতঃ তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সহসা রামানুজের পাদমূলে পতিত হইয়া, নিবারিত হইলেও দৃঢ়ভাবে তদীয় চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে রামানুজ, তুমি সত্যই রাঘবের অনুজ। আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া তোমার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি কর্ণধার হইয়া এই ভীষণ ভবসিন্ধু হইতে আমাকে উদ্ধার কর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।" গুরুকে তদবস্থ দেখিয়া রামানুজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অশান্তি সমূলে নাশ করিয়া ফেলিলেন।

মাতার আদেশ লইয়া, যাদবপ্রকাশ সেই দিবসই পূর্ব্বশিষ্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, অঙ্কন, দাস্য নাম গ্রহণ প্রভৃতি পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া অরুণ বসন ধারণ করতঃ অতীব দর্শনীয় হইলেন, এবং "গোবিন্দদাস" এই নামে স্বীয় গুরু কর্তৃক আহুত হইয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। ভক্তিমার্গের উপর তাঁহার স্বাভাবিক দ্বেষ সমূলে উৎপাটিত হইল। তাঁহার বিদ্যাভিমান কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি অন্য এক প্রকারের মানুষ হইয়া গেলেন। তাঁহার নীরস নয়নযুগল অনুতাপাশ্রুর বন্যায় অহরহ প্লাবিত হইতে লাগিল। গর্ব্বের পরিবর্ত্তে দৈন্য আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। তিনি পরম বৈষ্ণব হইলেন। রামানুজের এই অমানুষী শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে নিন্দা করা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার যশঃ

সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বগুরুর দৈন্য ও অনুতাপ দেখিয়া একদা শ্রীরামানুজ তাঁহাকে কহিলেন, "মহানুভব, আপনার মন নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আপনি বৈষ্ণবগণের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন, উক্ত অপযশ অপনয়নের জন্য আপনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, প্রকৃত বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করুন, তাহা হইলেই আপনার পূর্ণ শান্তি লাভ হইবে।"

উক্ত বাক্যানুসারে যাদব অল্পদিবসের মধ্যেই "যতিধর্ম্মসমুচ্চয়" নামক এক অতুলনীয় গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক শ্রীগুরুর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছিল। ইহার কিছু দিবস পরে তিনি মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিলেন।

শ্রীরামানুজ একণে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়া নিষ্কণ্টকে সুধীগণের মনোরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)　১৮৯৩।

প্রিয়,

"আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই—উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়, প্রভুর নাম ধন্য হউক," যখন সেই প্রাচীন ইহুদীবংশসম্ভূত মহাত্মা মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া উপরোক্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। এই কথার মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গভঙ্গ নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার অতি গভীর তলদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দের স্তর রহিয়াছে। "শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।" কারণ, এই সকল দুঃখের মুহূর্ত্তে, যখন, সেহস্ত পিতার

চীৎকারে বা মাতার ক্রন্দনে কর্ণপাত করে না, তাহার হৃদয় মোচড়াইতে থাকে, যখন শোকদুঃখনিরাশায় পৃথিবী যেন আমাদের পদতল হইতে অপসারিত বোধ হয়, যখন চতুর্দ্দিক কেবল এক অভেদ্যদুঃখরাশি ও সম্পূর্ণ নৈরাশ্যময় বলিয়া প্রতীত হয়, তখন হঠাৎ আলোর প্রকাশ হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় আর আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই, প্রতিভাবান, বীরহৃদয় ব্যক্তি সেইঅনন্ত, পূর্ণ, নিত্যানন্দময় সত্তামাত্রস্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। তখনই যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখের গর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায় আর তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উঠিতে থাকে, যত দিন না সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপে পঁহুছায়, "যেখানে অসৎ ব্যক্তি পীড়ন করিতে পারে না ও শ্রান্তব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।"

ভ্রাতঃ, দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিওনা, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

"কেন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার
কায কর, করে মর—এই হয় সার।"

হে প্রভু! তোমার নাম, তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হে প্রভু! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভু, জননীর হস্ত আমাদিগকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু "অন্তরাত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল।"

হে প্রেমময় পিতঃ। তুমি আমাদিগকে শান্তভাবে তোমার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু প্রাণের যন্ত্রণায় তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সমুদয় পরিবারকে মরিতে দেখিয়াছিলে; দেখিয়া বুকে হাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলে, তুমি আমাদিগকে বল দাও। হে প্রভু, এস, এস হে আচার্য্যচূড়ামণি। তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞাপালন

করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভু, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে যেমন তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়ভাবে ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন, ইহাই দিবারাত্রি বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ।

---

(২)

চিকাগো।
২৮শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয় আ——

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, কারণ, আমি নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন পর্য্যন্ত নানাস্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

জানি না, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁর উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, যিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কায করিবার চেষ্টা কর, যেন আমি কখন ছিলাম না। কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিওনা। যাহা পার, করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না।

আমি বলিতে পারি না, আগামী গ্রীষ্মকালে এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব কি না, সম্ভবতঃ না।

ইতিমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে, তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখ যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশে আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিলপ্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের উপর কার্য্য কর, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কর। বড় বড় কায কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যক নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়।

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর, হে বীর-হৃদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্যকিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও, "অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।" তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক,—আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, "উঠো, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।" জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে! কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ হইও না, বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ বৎস উৎসাহ—প্রেম বৎস প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা: আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা পাপ—ভয়।

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। মান্দ্রাজের যে সকল মহোদয় ব্যক্তি আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্য্যে শৈথিল্য না দেন, আর চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক।

অহঙ্কৃত হইত না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিও না। কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কায কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কায এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত অনন্ত সর্ব্বগ্রাসী, সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও।

সকল হস্ত উঁহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্—জয় প্রভুর জয়!"

স্—ক—ভ—এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে তাঁহাদিগকে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ধার কখন শুধিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই। তোমরা কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড করিবার চেষ্টা কর। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীবদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তার পর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। এক দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না, তখনই পার হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালন ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে, প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভ—এর গৃহে একটী সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটী কুটীর ভাড়া লও এবং কাযে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, কিন্তু ইহাই মুখ্য। যে কোন রূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের উন্নতি বিধান করিতেই হইবে। কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে; এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কায কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, প্রভু

তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

তোমাদের স্নেহের—
বিবেকানন্দ।

"ব্রহ্মকুণ্ড" বা "পরশুরামকুণ্ড"।

(শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মাতাদীন শুকুল এম্, এ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় কর্ত্তৃক সাধারণ গোচরার্থ "আসাম গেজেটে" প্রকাশিত।)

"পরম পূজ্যপাদ ভগবান পরশুরামের নাম ও তাঁহার ইতিহাস হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। তিনি দশ অবতারের একটী অবতার, আর বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তাঁহার অবতীর্ণ হইবার কারণ অন্য কিছুই নহে, 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। অত্যাচারী ক্ষত্রিয়গণের কবল হইতে সাধুগণকে রক্ষা করিবার জন্য পরশুরাম অবতীর্ণ হয়েন এবং দুষ্ট দমন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সেই শত্রুঘাতী পরশু অর্থাৎ কুঠার খানি ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। সেই দিন হইতে উক্ত ঘটনার স্মারক স্বরূপ ব্রহ্মকুণ্ড 'পরশুরাম কুণ্ড' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানা দিক্ দেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই তীর্থে আগমন করেন। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, হিন্দুমাত্রেই এই পরম পুণ্যপ্রদ তীর্থ দর্শন করাকে স্বীয় কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত মনে করেন। এই মহাতীর্থ পবিত্র ও সুবিখ্যাত ধাম সমূহের অন্যতম। কথিত আছে যে, স্বয়ং পরশুরাম এই স্থানে সাধন সহায়ে শোণিতরঞ্জিত স্বীয় দেহকে বিধৌত করেন এবং তদবধি ইহা সাধারণে প্রচারিত যে, যে কেহ এই পরশুরাম কুণ্ডে অবগাহন করিবেন, তিনিই স্বীয় কৃত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ করিবেন।

ভারতের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে যথায় ব্রহ্মপুত্র হিমালয় হইতে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া আসাম প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছেন, এই কুণ্ড সেই স্থলে স্থিত। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তুলাকারে প্রবাহিত এবং এই

যক্রের দক্ষিণ তটে স্থিত একটী গভীর কুণ্ডে এই প্রবাহের পরিসমাপ্তি। এই কুণ্ডটী চতুষ্পার্শ্বেই পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলি উত্তর ও পশ্চিম দিকের অপেক্ষা সমধিক উচ্চ; ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহটী উত্তরপূর্ব্ব দিক হইতে এই কুণ্ডের দিকে ধাবমান। কথিত আছে, ব্রহ্মপুত্র পর্ব্বত গাত্র হইতে উত্থিত হইয়া এই ব্রহ্মকুণ্ডে নিমজ্জিত হন ও পরে আসাম প্রদেশে প্রবাহিত হয়েন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে প্রবাহিত বলিয়াই এই নদের নাম ব্রহ্মপুত্র। বর্ত্তমান সময়ে কুণ্ডের নিকটে এই প্রবাহের নাম 'দেবপানি' এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে 'লেওপানি' ও ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত।

কুণ্ডের নিকটে কেহই বসবাস করে না, তবে উত্তরে পাহাড়ের বহু উচ্চ প্রদেশে দিগারু মিস্‌মিদিগের আবাস। নিকটস্থ গ্রাম অন্নাধিক ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতব্যাপী অন্যান্য তীর্থসমূহের ন্যায় এই তীর্থে কোনও পাণ্ডা বা পুরোহিত নাই। দৃশ্যটী বড়ই গম্ভীর ও ভীতিপ্রদ। দিবাভাগে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, রাত্রি কালে পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে একরূপ মন্দানিল প্রবাহিত হয়, উষাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই ধীরসমীর অদৃশ্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই কুণ্ডে স্নান করিবার বিশেষ কোনও অসুবিধা নাই। কুণ্ডের সংলগ্ন তিনটী ঝরনা আছে। তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে স্থিত। গুহাটী লম্বায় ৭ ফিট, প্রস্থে ৩ ফিট ও ৪ ফিট উচ্চ। কুণ্ডের শীতল জলে অবগাহন করিয়া স্নানার্থী গুহামধ্যস্থ ঝরনার পরিষ্কার ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণজলে স্নান করিয়া আরাম পায়। যাত্রিগণ অনেকেই পয়সা, দুয়ানি, সিকি প্রভৃতি কুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করে। কুণ্ডটী অতি গভীর, কিন্তু ঝরনা ও কুণ্ডের মধ্যস্থিত স্থানে বালি পড়িয়া বুজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই কুণ্ডযাত্রিগণ মিস্‌মিদিগের হস্তে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেন, এক্ষণে যাত্রিগণের সেরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। এক্ষণে ইংরাজ সাম্রাজ্য পর্ব্বতের তল প্রদেশ অবধি বিস্তৃত এবং যদিও পর্ব্বত গুলির চতুঃপার্শ্বস্থিত প্রায় ৪০ মাইল বিস্তৃত প্রদেশ সমূহ ইংরাজ রাজের খাসে নাই, তথাপি ইঁহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এই জনমানবহীন প্রদেশেও বর্ত্তমান; দেখিলেই এই প্রদেশটী ইংরাজ শাসনাধীন ব্যতীত অন্য কিছুই বলিয়া বোধ

হয় না। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় কুণ্ডের চারি পাশে এমন কোনও দোকান নাই, যাহা হইতে যাত্রিগণ প্রসাদ বা তীর্থভ্রমণস্মারকস্বরূপ কোনও স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইবে। দেবখস্, দেব-মণি ও দেব আলু প্রভৃতি কয়েকটী সামগ্রী সামান্য অর্থব্যয়ে মিস্‌মি কুলিদিগের নিকট হইতে যাত্রিগণ ক্রয় করেন। দেবখস উলুখড়ের ন্যায়, উহার এক রকম ফল হয়, ঐ ফল নীল ছালের দ্বারা আবৃত। ছাল ছাড়াইলেই ফলটী একটী মুক্তার আকার ধারণ করে এবং সেই জন্যই উহার নাম দেবমণি। স্থানীয় লোকেরা উহার মালা প্রস্তুত করে এবং রুদ্রাক্ষাদি ধারণের ন্যায় উহা যত্নে রাখিয়া দেয়। দেবআলু আলুর ন্যায়ই একটী পদার্থ, কিন্তু আস্বাদন জলের মত।”

মাতাদীন শুকুলসাহেব লিখিতেছেন,—“আমি ২০শে জানুয়ারি তারিখে এই কুণ্ড দর্শন করি। অল্পদিনের অবকাশ লইয়া ১২ই তারিখে আমি ‘ডিব্রু-সাদিয়া-রেলওয়ের’ ডিব্রুগড় ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া তালুপ পহুঁছি। তালুপ ডিব্রুগড় হইতে ৫১ মাইল দূরে। তালুপ রেল ত্যাগ করিয়া সাদিয়া যাই। ১৪ই জানুয়ারি সাদিয়া হইতে পদব্রজে চান্‌পুরায় পহুঁছি। সাদিয়া হইতে চান্‌পুরা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থলে আমরা আমাদের নৌকায় আরোহণ করি। আমরা দলে নয় জন ছিলাম, সাদিয়া হইতে আমরা দুই খানি নৌকা ভাড়া করি। ৫জন সাদিয়া হইতেই নৌকায় উঠে আর আমাকে লইয়া বাকী ৪জনে চান্‌পুরা অবধি স্থলপথে আসিয়া নৌকা ধরিলাম। চান্‌পুরা ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে নয়টার সময় আমরা মিস্‌মিঘাটের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে পঁহুছিলাম। তৎ-পরদিবস বেলা ১১ টার সময় আমরা মিস্‌মিঘাটে আসিয়া উপস্থিত হই। এখান হইতে আমরা পদব্রজে চৌখাম্ নামক গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামে খামটী-রাজ “চউসাঙ রাজা গোহেন” বাস করেন। পর্ব্বতজলপ্রদেশ পর্য্যন্ত ইঁহার প্রভাব বিস্তৃত। সাদিয়ার এসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল অফি-সারের নিকট হইতে আমি একখানি পরিচয় পত্র গ্রহণ করি, সেই পরি-চয় পত্র পাঠে খামটী-রাজ আমাদিগকে ৪টী মিস্‌মি কুলি ও ২ জন খামটী পথ-প্রদর্শক দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭ই জানুয়ারি আমরা চৌখাম ত্যাগ করিয়া কমলাঙ্‌পত্তি নামক স্থানের কিছু দূরে আশ্রয় লই। এই স্থানে আমাদিগকে জলের মধ্য দিয়া ৩ মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল।

সেই দিবস আমরা একুনে ১০ মাইল পদব্রজে যাই। পর দিবস লেও-পানির তটবর্ত্তী থাকিয়া, ১৯শে জানুয়ারি বেলা ১২॥০ টার সময় আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে পঁহুছি। ২০শে জানুয়ারি অহোরাত্র কুণ্ডের তটে অবস্থান করি। ২১শে প্রাতে ৯টার সময় কুণ্ড হইতে রওনা হইয়া দুই দিবসে এক নূতন পথে মিস্‌মি ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া, যাইবার সময় মিস্‌মি ঘাট হইতে ১৮ ঘণ্টার পরশুরাম তীর্থে উপনীত হই, কিন্তু প্রত্যাগমন কালে ১৪ ঘণ্টা মাত্র লাগিয়াছিল। আর মিস্‌মি ঘাট হইতে সাদিয়ায় পঁহুছিতে পুরা এক দিবস লাগে। সাদিয়া হইতে মিস্‌মি ঘাটে নৌকারোহণে যাইতে হইলে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত সহায়ে যাইতে হয়। পথের প্রথমার্দ্ধ স্থির, স্রোতহীন, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধ অর্থাৎ চান্‌পুরা হইতে মিস্‌মি ঘাট নৌকারোহীর বিশেষ কষ্টকর। কারণ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অল্প বিস্তর প্রায় ১৩টী প্রবাহ আছে। প্রবাহের উপর জল অত্যন্ত অল্প, তাহাদিগের উপর দিয়া নৌকা লইয়া যাওয়া বিশেষ আয়াস-প্রদ। নৌকাগুলি এতদ্দেশীয় ডোঙ্গার ন্যায়, এক একটী বৃক্ষের মধ্যভাগ কুঁদিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। নৌকাগুলির পরিমাণ দীর্ঘে ৩০ হইতে ৫০ ফিট, প্রস্থে ৩।৪ ফিট, গভীরতায় মধ্যভাগে ১½ বা ২ ফিট মাত্র। এক এক-খানিতে ১০।১২০ জন এক সময়ে যাইতে পারে। এই সকল প্রবাহের উপর আসিয়া আরোহিগণকে নৌকা হইতে নামিয়া মাঝিদিগকে সাহায্য করিতে হয়। স্থানে স্থানে স্রোত এত প্রখর যে, চানপুরা হইতে মিস্‌মি ঘাটে যাইতে দুইদিন লাগিয়াছিল, কিন্তু স্রোত সহায়ে পৌনে তিন ঘণ্টার বিপরীতে আসা যায়।

সাধারণতঃ গমন কালে যাত্রীর নৌকা চারি দিবসে যায়, কিন্তু আমাদিগের নৌকা অল্প বোঝাই থাকায় কারণ অল্প সময়ে আমরা পহুঁছি। মিস্‌মিঘাট হইতে চৌখাম গ্রামে পহুঁছিবার একটী পথ আছে, তাহাও গভীর জঙ্গলের মধ্যে আর স্থানে স্থানে তিনটী খাল পার হইতে হয়। তন্মধ্যে একটীতে পারাপারের নৌকা আছে; অপর দুইটীতে জলের মধ্য দিয়া যাইতে পারা যায়।

চৌখাম গ্রামটী খাম্‌টী রাজ চউসাঙ রাজা গোহেন এর রাজধানী। রাজা গোহেন বর্ম্মাদেশস্থ 'সান' দিগের সমজাতীয় ও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মতাবলম্বী। গ্রামে একটী বৌদ্ধ মন্দির আছে, এই মন্দিরে একজন 'ফুঙ্গাই' অর্থাৎ বৌদ্ধ

পুরোহিত বাস করেন। ইনি খাম্‌টী বালকগণকে খাম্‌টা ভাষা শিক্ষা দেন ও তাহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শ্রবণে আনন্দ হয় যে, প্রত্যেক খাম্‌টীই কথঞ্চিৎ শিক্ষিত। তাহাদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে জানে না, এমন লোক বিরল। ছাত্রগণ বহুদূরস্থ গ্রামসমূহ হইতে অধ্যয়নার্থ চৌখাম গ্রামে আইসে ও চৌখাম গ্রামবাসিগণের যত্নে পালিত হয়। গ্রাম্য আচারানুসারে প্রত্যেক পরিবার হইতে একটী লোকের আহারোপযোগী যথেষ্ট ভোজ্য প্রত্যহ মন্দিরে পাঠাইতে হয়। (আহা কি সুন্দর নিয়ম! ধন্য চৌখামবাসী! তোমাদের এই সদাচার সভ্য জগতের অনেকানেক জাতির অনুকরণীয়)। সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে খাম্‌টীরাজ পথ-প্রদর্শক ও কুলি যোগাইবার কারণ দস্তুরির মত একসের লবণ, এক-সের তামাক ও একটী করিয়া টাকা আদায় করিতেন। বর্ত্তমান বৎ-সর (১৯০২) হইতে কেবল দুইটী করিয়া টাকা লইয়া থাকেন। সাদিয়া হইতে মিস্‌মিঘাটের প্রত্যেক যাত্রীর যাতায়াতের দুই টাকা নৌকা ভাড়া লাগে। রাজা প্রত্যেক পথ-প্রদর্শকের জন্য ৫৲ টাকা ও প্রত্যেক কুলির জন্য ৫৲ টাকা লইয়া থাকেন। চৌখাম্ গ্রামে ৬টী কেঁয়েদের দোকান আছে। এই সকল দোকানে বিবিধ প্রকারের খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় হয়। চৌখাম্ হইতে পরশুরাম কুণ্ড অবধি পথে কোন রূপ দোকান, চটী বা অন্য কোনও রূপ আশ্রয় স্থান না থাকায় প্রত্যেক যাত্রীকেই চৌ-খামের দোকান হইতে অন্ততঃ ৬ দিবসের উপযোগী আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সাদিয়া হইতে গমনকালীন দশজন যাত্রী সমবেত হইলে ইংরাজ প্রতিনিধি (এসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল অফিসার) একখানি পাস অর্থাৎ অনুমতিপত্র প্রদান করেন। এই অনুমতি পত্র চৌখাম্ রাজের নিকট লইয়া গেলে, তিনি পথপ্রদর্শক ও মোটবাহী কুলির বন্দোবস্ত করেন। চৌখাম্ হইতে কুণ্ডাভিমুখে পর্য্যটন ক্রমশঃই দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। ভাল পথ নাই বলি-লই হয়, প্রায়ই শুষ্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য খালসমূহের উপর দিয়া যাইতে হয়। ১০ মাইল মাত্র একটী পথ আছে, কিন্তু তাহাও বহুতৃণগুল্মসমাচ্ছাদিত ও জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী। চৌখাম্ হইতে ৬ মাইল অতিক্রম করিবামাত্র কমলাঙপাস্তি নামক ক্ষুদ্র প্রবাহের মধ্য দিয়া জলপথে ৪ মাইল পথ যাইতে হয়। শৈবালযুক্ত পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ড সকলের উপর দিয়া জল-পথে এইরূপ পদব্রজে ভ্রমণ করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কমলাঙপাস্তি উত্তীর্ণ

হইয়া আরও তিনটি চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের উপর দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে কয়টি শুষ্ক, এজন্ত অনায়াসসাধ্য। এই সকল খাল এখন কেবল কতকগুলি ছোট বড় স্রোতাঘাতে বর্ত্তুলীকৃত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বালুকা আচ্ছাদিত সমতল ভূমিখণ্ড মাত্র লক্ষিত হয়।

পথে এই সকল নানা কষ্টের কারণে যাত্রিগণ প্রথমে ভীত হয়, তদুপরি এক শীতকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে উপরোক্ত প্রবাহগুলি জলপূর্ণ থাকায় পথ দুর্গম হইয়া উঠে। অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ করিয়া সকলকেই ফাল্গুনের মধ্যে এই তীর্থযাত্রা সমাধা করিতে হয়। সাদিয়া পর্য্যন্ত পথে যাত্রীর বাসোপযোগী গৃহাদি থাকায় বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না। "তালুপ" ও "সাইকোয়া ঘাটে" এক একটী সরাই আছে, তাহাতে অন্যূন ৫০জন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সাদিয়াতে কেঁয়েদের অনেকগুলি দোকান আছে আর তিন চারিটী আখড়া বাড়ী আছে, যাহাতে যাত্রিগণ বিশ্রাম করিতে পারে। সাদিয়া ত্যাগের পর এক চৌখাম্ ব্যতীত অন্ত কোথাও চটী বা সরাই নাই। চৌখাম্ রাজের বহির্ম্মহলের গৃহ সকল ও কেঁয়েদের দোকানগুলিই যাত্রিগণের শেষ আশ্রয়। সাদিয়া ও মিস্‌মিঘাটের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে রন্ধনাদি কার্য্যের জন্ত নামিতে হইলে মাঝীরা তীরদেশে আপনাপন নৌকার ছইএর সাহায্যে চালার মত তৈয়ার করে। চৌখাম্ হইতে পরশুরাম পর্য্যন্ত পথে মিস্‌মি কুলিরা তীরদেশে এক প্রকার চালা প্রস্তুত করে। আচ্ছাদন গুলি এক শিশির সম্পাত রোধ ভিন্ন বায়ু বা বরুণদেবের গতিরোধে নিতান্ত অক্ষম। মিস্‌মি কুলিরা ও খাম্‌টি পথপ্রদর্শকেরা বেশ পরিশ্রমী। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই অহিফেনসেবী। তাহারা কিছু আফিঙ, আলু ও লবণ পাইলে মহা মহা কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত। পরশুরাম কুণ্ড তীরে কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও কেঁয়ে সওদাগর চকোরের খুঁটীর উপর করিউগেটেড লৌহের আচ্ছাদন দিয়া একটী আবাস প্রস্তুত করিয়াছিল। খুঁটি গুলি পচিয়া যাওয়াতে মিস্‌মিরা সেই সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লৌহাচ্ছাদন গুলি এদিকে ওদিকে প্রক্ষিপ্ত ভাবে অদ্যাবধি পড়িয়া রহিয়াছে। যাত্রিগণ এই সকলের সাহায্যে অস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করে। পর্ব্বতগাত্রে একটী গহ্বর আছে, তাহাতে ৫।৬টী লোক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ব্যাঘ্র ও অন্যান্ত পশুসকল এই সকল স্থানের চতুঃপার্শ্বে বিচরণ করে

বটে, কিন্তু এযাবৎ তাহাদিগের দ্বারা কোনও যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এবং কুণ্ডরাজের পবিত্র সীমানার মধ্যে তাহাদিগের গতায়াতের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

দেহ-কল।

(স্বামী যোগেশ্বরানন্দ।)

সাধকপ্রবর কমলাকান্ত তাঁহার একটী সঙ্গীতে কহিয়াছেন, "শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে। চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।" বাস্তবিকই ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহরূপ কলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কত বড় বড় মনস্বী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই কলের এক এক অংশ বা এক এক অংশের কার্য্য বিচার করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কত মহাজন তনু মন ধন সমর্পণ করিয়া ইহারই পর্য্যালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছেন। এই বুধমণ্ডলীর গভীর গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে কত নূতন নূতন তথ্যের উদ্ভাবন হইতেছে ও কত পুরাতন তথ্য নূতন আলোকে নূতন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আজ পাঠকগণের সমক্ষে বৈজ্ঞানিকদিগের এই দেহ-কলসম্বন্ধীয় সামান্য দুই একটী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই শরীরকে বাষ্পীয় কল বা এঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এঞ্জিন আমাদের অনেক কার্য্য করিয়া থাকে—রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়, গমচূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়া দেয়, সরিষা হইতে তৈল নিষ্কাসিত করে ইত্যাদি। অর্থাৎ এঞ্জিনের দ্বারা আমরা বহুবিধ কার্য্য করাইয়া লইয়া থাকি ও মনে করিলে অপরাপর বহুবিধ কার্য্য করাইয়া লইতেও পারি। সেইরূপ আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকি ও স্বেচ্ছামত করাইতেও পারি। কিন্তু কার্য্য অর্থেই শক্তি ক্ষয় কিম্বা বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শক্তিই কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এঞ্জিন যখন কার্য্য করিতে থাকে, তখন এঞ্জিনস্থিত বাষ্পীয় তাপ-শক্তির ক্ষয়

হয়। আমরাও যখন কার্য্য করিয়া থাকি, তখন আমাদিগেরও শরীরের শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। হস্ত পদ পরিচালন, ভ্রমণ, গুরু বস্তু উত্তোলন ইত্যাদি আমাদের সমস্ত কার্য্যেই শক্তিক্ষয় হইতেছে। কিন্তু এ শক্তি কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহা উত্তাপ।

একজন কারিকর কামারের "নাই" (কূট) এর উপর একখণ্ড কঠিন লৌহ রাখিয়া লৌহের হাতুড়ী দিয়া ঘন ঘন আঘাত করিতেছে। কিছু ক্ষণ পরে লৌহখণ্ড অগ্নির মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই তাপ কোথা হইতে আসিল? লৌহখণ্ডের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, লৌহ হাতুড়ীরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই ও নাইএরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই— এ সকল বস্তু যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। যদ্যপি এ সকল বস্তু হইতে উত্তাপের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাদিগের কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত। যত বারই কেন আঘাত করা হউক না, ততবারই লৌহখণ্ড উত্তপ্ত হইবে, তথাপি কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে না। বৈজ্ঞানিকেরা কহেন, এ তাপশক্তি কারিকরের শরীর হইতে হস্ত দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া লৌহে প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ কারিকরের নাই খণ্ডের উপর আঘাত করার ন্যায়, আমরা যে সকল কার্য্য করিতেছি, সে সমস্ত কার্য্যেই আমাদের শরীরের তাপ শক্তির ক্ষয় হইতেছে।

এঞ্জিনে কয়লা দিতে হয়, কয়লা জলকে বাষ্পে পরিণত করে। বাষ্প উত্তাপশক্তির জন্য প্রসরণধর্ম্মশীল। এই প্রসরণধর্ম্মের গুণে বাষ্পীয় উত্তাপশক্তিকে এঞ্জিনে কার্য্যে পরিণত করা হয়। এঞ্জিনে জল বা বাষ্পের প্রয়োজন হইলেও উত্তাপশক্তি জল বা বাষ্পের নহে, তাহা কয়লার। কয়লার জ্বলনেই এই তাপের উদ্ভব। জল কার্য্য করিবার পক্ষে সহায় মাত্র।

শরীরেও কয়লা দিতে হয়। এ কয়লা অন্ন বা খাদ্য দ্রব্য। আমাদিগের অন্নগত জীবন। আহার না দিলে শরীর কখনই থাকিতে পারে না। প্রতি কার্য্যের সহিত তাপ শক্তির ক্ষয় হইতে থাকিলে, তাহার সম্পূরণ করিবার জন্য যে পদার্থ হইতে তাপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা দিতে হইবে। এঞ্জিনের পক্ষে এই জন্য আহার্য্য কয়লা। আমাদের পক্ষেও একভাবে আহার্য্য সেই কয়লা বা অঙ্গার।

যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আমাদিগের শরীররক্ষার্থে প্রয়োজনীয়, সেই

সকল খাদ্যদ্রব্যকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, যথা, কার্ব্বোহাইড্রেট্‌স্ (Carbohydrates) বা অঙ্গার সম্বন্ধীয় এবং নাইট্রোজেনাস্ (Nitrogenous) বা নাইট্রোজেন সম্বন্ধীয়। আমরা যে সকল খাদ্য দ্রব্য সচরাচর ভোজন করিয়া থাকি, তাহাদের কতক গুলি এই কার্ব্বোহাইড্রেট্ পদার্থ প্রধান অথবা সহজ ভাষায় বলিতে গেলে অঙ্গার-প্রধান ; আর কতকগুলি নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ প্রধান বা সহজ ভাষায় নাইট্রোজেন প্রধান। চাল, আলু, কাঁচকলা, চিনি প্রভৃতি এই অঙ্গারপ্রধান খাদ্যের অন্তর্গত। ডাল, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্যের অন্তর্নিবিষ্ট।

এই স্থানে আর কিছু বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কয়লা যে কি পদার্থ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। নাইট্রোজেন স্বাভাবিক অবস্থায় বায়বীয় পদার্থ, অর্থাৎ দেখিতে বায়ুর ন্যায়। কিন্তু অন্যান্য ভূত-পদার্থের সহিত সম্মিলিত অবস্থায় কঠিন পদার্থের ভিতরেও থাকিতে পারে। আমরা যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত প্রতিক্ষণে গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রতি পাঁচ ভাগে (মাপে) চার ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ অক্‌সিজেন নামক বায়ু আছে। সংযুক্ত ভাবে নাইট্রোজেন,নিশাদল, সোরা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে অবস্থিত।

আমরা প্রথমে অঙ্গার প্রধান আহারীয় দ্রব্যের বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অঙ্গারপ্রধান পদার্থ বলিলে কেহ যেন না একটী পদার্থ মনে করেন। ইহা এক জাতীয় পদার্থ। এই জাতিতে অসংখ্য প্রকার পদার্থ আছে। কিন্তু সকল গুলিই প্রায় একই প্রকার পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাদিগকে এক জাতিতে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সকলেরই ভিতরে অঙ্গার, হাইড্রোজেন এবং অক্‌সিজেন আছে। এই অঙ্গারপ্রধান পদার্থ যে সকল আহারীয় দ্রব্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে অঙ্গারপ্রধান খাদ্য বলিব।

আমরা অঙ্গারপ্রধান খাদ্য আহার করিলে, এই অঙ্গার খাদ্য দ্রব্যের পরিপাকের সহিত আমাদিগের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই রক্ত আমাদিগের ফুস্ ফুস্ যন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তখন বহিঃস্থিত বায়ু ফুস্‌ফুসে যাইয়া প্রবেশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুতে অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটী পদার্থ আছে। বায়ুর অক্‌সিজেন শোণিতস্থ অঙ্গারকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং এই দাহক্রিয়োৎপন্ন দূষিত বায়ু প্রশ্বাস-

বায়ুরূপে পুনরায় বহিঃক্ষিপ্ত হয়। এই দহন ক্রিয়ার সময়ে উত্তাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই উত্তাপই সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হয় এবং সমস্ত দেহের শক্তির মূলীভূত কারণ।

যখন এঞ্জিনে কয়লা জ্বলিয়া থাকে, তখনও কয়লা বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং সেই সংযোগের ফলে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উত্তাপই বহ্নিশিখারূপে প্রকাশিত হয়। এস্থলে কয়লা ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ উৎকট অর্থাৎ দ্রুতভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া বহ্নিশিখা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন শোণিতস্থ অঙ্গার নিঃশ্বাস-বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন সংযোগকার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় বলিয়া বহ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠে না। অথচ পর্য্যাপ্ত উত্তাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায়, এঞ্জিনে যেমন কয়লা জ্বলিয়া থাকে, আমাদের শরীরেও সেইরূপ কয়লা জ্বলিয়া থাকে।

এঞ্জিনে কয়লা জ্বলিয়া যে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার কতকটা এঞ্জিনকেই একরূপ অবস্থায় উত্তপ্ত রাখিতে ব্যয়িত হইয়া থাকে, অবশিষ্ট উত্তাপ কার্য্য করিয়া থাকে। শরীরেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কতকটা উত্তাপ শরীরকেই উত্তপ্ত রাখিতে ব্যয়িত হয়। শরীর এঞ্জিনের ন্যায় একরূপ উত্তপ্ত ভাবে না থাকিলে, শরীরের কার্য্য হইতে পারে না। অবশিষ্ট উত্তাপ শরীরের কার্য্যকরী শক্তি।

এঞ্জিনে কিছুক্ষণ কার্য্য করিলে, এঞ্জিন হইতে কতকগুলি ভস্মাদি বহির্গত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কেননা, এগুলি এঞ্জিনের কোন প্রয়োজনে আইসে না। সেইরূপ আমাদিগের শরীর হইতে অনাবশ্যকীয় বিষ্মূত্রাদি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

শরীরের সহিত বাষ্পীয় কলের সাদৃশ্যের কথা কথিত হইল, এইবার কিছু বৈসাদৃশ্যের কথা বলিব। এঞ্জিন কিছুদিন কার্য্য করিতে থাকিলে, এঞ্জিনের অবয়বগুলির ক্ষয় হইয়া থাকে। (Boiler) বয়েলার বা অন্ত কোন অঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। আর তাহার দ্বারা এঞ্জিনের কোন কার্য্য হয় না। আমাদিগেরও শরীরের অবয়ব সকল প্রতিক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। প্রতিকার্য্যের সহিত শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলির ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। গমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালন, গুরুবস্তু উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্যের সহিত ত ক্ষয় হইবেই. এতদ্ব্যতীত অধ্যয়ন,

চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যেও শারীরিক ক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে। একজন অধ্যয়নশীল বা চিন্তানিরত ব্যক্তিকে দেখিয়া সাধারণে হয় ত, মনে করিতে পারে যে, সে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অধ্যয়ন বা অন্য কোন চিন্তার সময়ে মস্তিষ্কের উৎকৃষ্ট অংশের ক্ষয় হইয়া থাকে। যদিও এইরূপ প্রতিক্ষণে আমাদিগের শরীরের ক্ষয় হইতেছে, তথাপি এই ক্ষয়ের জন্য আমরা একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়ি না। কারণ, প্রকৃতি এই ক্ষয় সম্পূরণের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমরা যে আহার করি, তাহা হইতেই আপনা আপনি এই ক্ষয়ের পূর্ণতা বিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের শরীর রক্ষার্থে দুই প্রকার খাদ্য প্রয়োজন, অঙ্গার-প্রধান ও নাইট্রোজেন-প্রধান। সকল লোকেই, ইহাদিগের বিষয় জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক, এই দুই প্রকার খাদ্যই আহার করিয়া থাকে। প্রতিদিন শরীরের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের ক্ষয় হয়, উক্ত নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্যই তাহার পূর্ণতা আনয়ন করিয়া দেয়। কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চারের জন্য যেমন অঙ্গার-প্রধান খাদ্যের প্রয়োজন, শক্তির আধার দৃঢ় রাখিবার জন্য, স্নায়ু শিরা ইত্যাদির বলাধানের জন্য তেমনি নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্যের আবশ্যক। সাধারণে ডাল, মৎস্য ইত্যাদি যে সকল পুষ্টিকর ভোজ্য আহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের দ্বারাই এই ক্ষয় সম্পূরণের কার্য্য হয়।

এইরূপ বাষ্পীয় কলের ন্যায় আমাদিগের দেহ-কল চলিতেছে। বিরাম নাই, দিনরাত্র চলিতেছে। কত পদার্থ-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা এই দেহকলের স্থূল স্থূল কার্য্যের আলোচনায় ব্যাপৃত, কত মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্য লইয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন। এই আলোচনার ফলে যতই নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে, ততই এই কল ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

এই কলের সুচারু কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া জনসাধারণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, এই কল কি আপনি চলিতেছে, না, ইহার কোন অধিষ্ঠাতা আছে? বাষ্পীয় কল বা এঞ্জিনের ন্যায় ইহার কি কোন এঞ্জিনিয়ার নাই? আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কহেন, আছে। যিনি আছেন বলিয়া এই দেহ-কল চলিতেছে, যাঁহার অবর্ত্তমানে ইহা একেবারে অচল হইয়া যায় যাঁহার সত্তায়ই, জড় হইলেও এই দেহ

চেতনাশক্তি সমাবিষ্ট, সেই দেবীই এই কলের অধিষ্ঠাতা—তিনিই ইহার এঞ্জিনিয়ার।—সাধকপ্রবর কমলাকান্তও পূর্ব্বোক্ত সংগীতে এই দেবীকে কালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন,

"যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় আর কলের কাছে॥"

কেম্ব্রিজে বেদান্ত।

বিগত ৩রা অগষ্টের ইণ্ডিয়ান নেশনে প্রকাশ,—

"শুনিতেছি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে। অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন বেতন দেওয়া হইবে না, তিনি যেরূপ ছাত্র আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তাহাদের বেতনে তাঁহাকে কার্য্য চালাইতে হইবে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যত্নে এই বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তাঁহারই উপর অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভার পড়িয়াছে। আমরা সংবাদপত্রে এই সংবাদ পাঠ করিতেছি। ইহা কতদূর সত্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের কতকগুলি সহযোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যক্তিবিশেষকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিতে সুপারিশ করিতেছেন। বাঙ্গালী সংবাদপত্রপরিচালকগণ অবশ্য বাঙ্গালী অধ্যাপক ব্যতীত আর কিছুরই চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহারা কুচবিহার কলেজের বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে এই বিষয়ের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা উক্ত বাবুর বিরুদ্ধে কিছু জানিনা, আর হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচায়কও কোন বিষয় জানি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা শীল মহাশয়কে সুপারিশ করিতেছেন, তাঁহারা কিসে তিনি এই পদের উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধেও কিছুই বলেন নাই। শীলমহাশয়কে তাঁহারা যেমন সুপারিশ করিতেছেন, তদ্রূপ বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং এতদ্বিধ অনেককেই সুপারিশ করিতে পারিতেন। আমাদের বাঙ্গালী সহযোগিগণ এই কার্য্যের জন্য একজন বাঙ্গা-

শীর নাম নির্দ্দেশ করাতে অথচ কেন তিনি এই পদের উপযুক্ত, তাহা প্রকাশ না করাতে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা এবং কতকটা হঠকারিতাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মনে হয়, নব্য ভারত, ব্রহ্মচারিন্, ব্রহ্মবাদিন্ ও সিদ্ধান্তদীপিকা পত্রিকায় কতকগুলি লেখক, শীলমহাশয় অপেক্ষা হিন্দুদর্শন বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা লোকের সাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়াই তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিতে পারি।

* * * * * *

কোন বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির গুণাগুণ লইয়া ব্যক্তিগত মতের কোন প্রয়োজন নাই,—আবশ্যক—প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর স্থাপিত সিদ্ধান্ত।

"যদি এই প্রত্যক্ষ ও প্রকাশিত প্রমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশ সংস্কৃত বিদ্যায় ও হিন্দুদর্শনের জ্ঞানে বিশেষ পশ্চাৎপদ। আমাদের এখানে এমন কোন পণ্ডিত নাই, ভারতের অন্য অন্য স্থানে যেরূপ আছে। অবশ্য আমাদের এখানে কতকগুলি শিক্ষিত পণ্ডিত আছেন, কিন্তু ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের দ্বারা কোন কায হইবে না। আমরা এখানে ইউরোপীয় ভাবে শিক্ষিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি—বাঙ্গালায় ইহার সংখ্যা অতি অল্প।

* * * * * *

"বাঙ্গালা দেশ যে শুধু সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় ভারতের অন্যান্য জাতি হইতে পশ্চাৎপদ, তাহা নহে, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, ভারতের অন্যান্য স্থানে কি হইতেছে, তাহার বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

* * * * * *

যাঁহারা বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সুপারিশ করিতেছেন, তাঁহারা কি এম, রঙ্গাচার্য্য ও এম, সি, বরদরাজ আয়াঙ্গারকে জানেন না, যাঁহারা রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের সহিত বেদান্তসূত্র অনুবাদ করিয়াছেন? অথবা গঙ্গানাথ ঝাকে জানেন না, যিনি অনেকগুলি উপনিষদ্ এবং সংখ্যদর্শনের অনেক গ্রন্থ সভাষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন? অথবা তাঁহারা কি অধ্যাপক এম, এন, দ্বিবেদীকে জানেন না, যিনি "শঙ্করানুসরণ" গ্রন্থ লিখিয়াছেন, একখানি উপনিষদের এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্যসহ অনুবাদ করিয়াছেন? অথবা তাঁহারা কি মিরাটের রামপ্রসাদকে জানেন না, যিনি "প্রকৃতির সূক্ষ্মতর শক্তি সমূহ" নামে গ্রন্থ লিখিয়াছেন? অথবা

তাঁহারা কি সীতারাম শাস্ত্রী ও মহাদেব শাস্ত্রীকে জানেন না, যাঁহারা কতকগুলি উপনিষদ্ সভাষ্য অনুবাদ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত ভদ্রলোকটী শঙ্কর ভাষ্যের সহিত গীতার অনুবাদ করিয়াছেন?

* * * * * *

বিস্ময়ের বিষয়, যে অল্প কয়েক জন বাঙ্গালী হিন্দুদর্শনের কতকটা বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মোটেই উল্লিখিত হয় নাই। আমরা যতদূর জানি, বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু, বাবু সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ডন পত্রিকার সম্পাদক বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই কয়জন হিন্দুদর্শনের একটু বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করিয়াছেন। প্রথম দুই জনের সহিত আমাদের আলাপ নাই এবং আমরা জানি না, তাঁহাদের বক্তৃতাশক্তি আছে কি না। শেষোক্ত দুই জনের সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে কিন্তু সতীশ বাবু সমুদ্র পার হইয়া ইংরাজগণের নিকট বক্তৃতা করিবার লোক নহেন আর হীরেন্দ্র বাবুর যদিও বক্তৃতা শক্তি আছে, যদিও তিনি রীতিমত পণ্ডিত, যদিও তাঁহার ভাবগুলি খুব পরিষ্কার, তথাপি তিনি অতি শান্ত-প্রকৃতি, লাজুক ও পুরাতন তন্ত্রের পক্ষপাতী বলিয়া বিলাত যাইবার লোক নহেন। উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিলাত যাইতে কে প্রস্তুত, বলা কঠিন। কিন্তু কাহাকেও গায়ে পড়িয়া সুপারিশ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত লোক কে, তাহা জানা আবশ্যক।

* * * * * *

"হিন্দুদর্শনের উপদেশ সম্বন্ধে আমরা আর একটী মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কতকগুলি লেখা, বিশেষতঃ, শঙ্করাচার্য্যের দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার শেষ পুস্তিকাখানি দেখিয়া আমাদের মনে এই কথাগুলি উদিত হইয়াছে। হিন্দুদর্শনের প্রকৃত ভাবের দিকে মোটে না যাইয়াও উহার সঠিক একটী বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাবটী, এই রহস্যটী কি? হিন্দুদর্শন কেবল মাত্র মতবাদ নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এবং প্রধানতঃ উহা হিন্দুর ধর্ম্ম। বাস্তবিক সর্ব্বত্রই দর্শন ও ধর্ম্মের মিলনই প্রার্থনীয়। নিও-প্লেটোনিষ্ট, খ্রীশ্চিয়ানগূঢ়তত্ত্ববাদিগণ ও রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে বাদ দিলে, আমরা প্রাচ্যদেশে যেরূপ দার্শনিক দেখি, তৎসদৃশ দার্শনিক ইউরোপে দেখা যায় না। ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ দর্শনের চর্চ্চা করেন মাত্র, ভারতবাসী তদনুসারে জীবন-গঠন করেন। যখন ভারতীয় সাধু আমাদিগকে বলেন যে, একমাত্র সত্য বিদ্যমান, বাহ্যজগৎ মায়া আর ভগবৎসত্তা বাহিরে খুঁজিলে

পাওয়া যায় না, ভিতরে খুঁজিলেই পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে ইউরোপীয় অদ্বৈতবাদী (Monist) বিজ্ঞানবাদী (Idealist) সর্ব্বংব্রহ্মবাদী (Pantheist) বা অতীন্দ্রিয়বাদীর (Transcendentalist) সহিত এক দলে ফেলিয়া তাঁহার গায়ে কোন বিলাতী ছাপ দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দর্শন তাঁহার নিকটে ধর্ম্মস্বরূপ। উহা কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা মতবাদ নহে, উহা একটী শিল্প। তিনি কেবল সত্তা একমাত্র, ইহা শিক্ষা দেন না, কিন্তু উহা জীবন্তভাবে অনুভব করেন। তিনি তাঁহার নিজ আত্মার গভীর প্রদেশে যোগদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার বিদ্যা অভ্যাস করেন আর তথায় তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলেন— বিন্দু সিন্ধুতে যাইয়া মিলিত হয়—আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। তাঁহার দর্শন তাঁহার নিকট কেবল মাত্র মতবিশেষ নহে, কিন্তু উহা প্রধানতঃ ও বিশেষতঃ সাধন-স্বরূপ। উহা তাঁহার পক্ষে পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য প্রার্থনা, শুদ্ধ ও প্রস্তুত হওয়া। উহা তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম ক্ষয় করিবার ও পুনর্জ্জন্ম হইতে রক্ষা পাইবার উপায় স্বরূপ। যে দার্শনিক এইরূপে তাঁহার জীবন গঠন করেন, তাঁহার পক্ষে বাহ্যপূজা অনুষ্ঠানাদির কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক উপাসনা কেবলমাত্র দার্শনিক ও সাধুর জন্য, সাধারণের জন্য নহে; সংস্কারকগণ এই কথাটী সর্ব্বদাই ভুলিয়া গিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রকৃতমনুসরামঃ। ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া রোধ করিয়া আত্মা যে আপনাতে মগ্ন হন, ইহা কেবল মানসিক ব্যাপার গুলির আলোচনার জন্য মানসিক অন্তর্দ্দৃষ্টি নহে। উহা যোগদৃষ্টি, সমাধি, সময়ে সময়ে ঐ অবস্থায় গূঢতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হয়। তিনিই হিন্দু দর্শনের প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারেন, যিনি গুরুর ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাকে তাঁহার মতগুলি হিন্দুর দৃষ্টি হইতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, হিন্দুদর্শনের স্বীকৃত সত্যগুলি এবং তাহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে আর উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় শিখাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ ভাবের আচার্য্যপদ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, যদি বক্তৃতাশক্তির চর্চ্চা করিতেন, তবে তিনি একজন হিন্দুদর্শনের উপযুক্ত বক্তা হইতেন। সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কোন শিষ্য এখনও পাওয়া যাইতে পারে, যিনি কেবলমাত্র যে হিন্দুদর্শন ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবেন, তাহা নহে, পাশ্চাত্যদিগের মনে উহার সত্য সকলও উদ্দীপনা করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন।”

কঠোপনিষৎ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমা বল্লী।

স্বর্গফলকামী বাজশ্রবস ব্রাহ্মণ
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞে করিলেন পণ।
নচিকেতা নামে তাঁর আছিল তনয়,
দক্ষিণা হইছে দান, হেন কালে মতিমান
সেই কুমারের হৃদে শ্রদ্ধা আবেশন,
বসিয়া চিন্তয়,—
'জলপান যাবা করিবে না আর,
শেষ তৃণ যারা করেছে আহার,
দুগ্ধ যাহাদের হয়েছে নিঃশেষ,
অন্ত যাহাদের প্রসবের ক্লেশ,
মৃত্যুর দুয়ারে যাহারা অতিথি,
হেন গাভী দানে নিরানন্দ লোকে গতি।

বলে, 'তাত, মোরে কারে দিবে দান'
মৌনভাবে জনকের অবস্থান।
পুনঃ 'তাত, মোরে কারে দিবে দান।'
তনয়ের এই শ্লেষ ভর্ৎসনায়, জীবন্মৃত প্রায়,
না কিছু উত্তর করিল প্রদান।
'বল তাত, মোরে কারে দিবে দান।'
পাগলের মত, ক্রোধে জ্ঞানহত,
বলে পিতা
'শমনেরে তোরে করিব প্রদান।'

শিশু স্থিরচিত, সরলতা গাম্ভীর্য্যজড়িত,
হৃদে তার হইল উদিত,—
'অনেকের আগে হেসে যাই,

অনেকের মাঝে থেলে যাই,
জানি নাক কিবা কায, আজি সেই যমরাজ
সাধিবেন আমার দ্বারায়।
দেখ দেখ পূর্ব্ব সবাকার গতি,
ভাব ভাবী নরগণের নিয়তি
শস্য প্রায় মর্ত্ত্যজীব হয় লয়,
শস্যপ্রায় পুন ধরায় উদয়।'

যমগৃহে নচিকেতা উপনীত ;
যমরাজ অদর্শনে, অতীব আকুল মনে,
তিন রাত্রি হইল যাপিত।

(যম প্রত্যাগত হইলে যমানুচরের যমের প্রতি উক্তি।)
'অতিথি ব্রাহ্মণ অনলের প্রায়
দীপ্ত তেজে হয় গৃহেতে উদয়,
পাদ্য অর্ঘ্যদানে শান্ত সে অনল,
আন বৈবস্বত, আন শীঘ্র জল।
আশা ভগ্ন, নষ্ট ইষ্টাপূর্ত্তফল,
সত্যবাণী সাধুসঙ্গও বিফল,
পুত্র পশু ধন সব পায় নাশ,
বিফল উদ্যম, বিফল প্রয়াস,
অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি নিকেতনে যার,
নিবাসে ব্রাহ্মণ না পেয়ে আহার।

(যমরাজ নচিকেতার প্রতি।)
'হে ব্রহ্মন! নমস্য অতিথি,
তিন রাত্রি অনাহারে, যে হেতু মম আগারে
করেছ বসতি ;
বরত্রয় করহ গ্রহণ।
ব্রহ্মন্, প্রণমি পদে, অপরাধ পদে পদে,
দাও মোরে অভয় বচন।'

নচিকেতা। 'ধর্ম্মরাজ, এই মোর আদিবর,
পিতা তুষ্ট যেন হন মোর পর,
মোর পর ক্রোধ করেন বর্জ্জন।
তব অনুজ্ঞায় নিজ নিকেতন
হে যম, যখন করিব গমন,
চিনিয়া আমারে আপন নন্দন,
যেন তিনি মোরে করেন গ্রহণ।'

যম। 'মোর এই বরে ওহে নচিকেতঃ,
পিতা তব মৃত্যুমুখ প্রত্যাগত
তনয়ে চিনিয়ে পূর্ব্ববৎ স্নেহ
করিবেন তোমা প্রতি নিঃসন্দেহ।
ক্রোধশূন্য হয়ে পিতা তব প্রতি
সুখনিদ্রাবেশে যাপিবেন রাতি।'

নচিকেতা। 'শুনেছি, স্বরগে ভয় কিছু নাই,
নাহি তুমি তথা, জরা বা সেঠাই,
ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই অতিক্রম কোরে
শোকশূন্য—সুখে স্বর্গলোকে ফেরে।
সেই স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন
জান তুমি দেব, অগ্নি উপাসন।
শ্রদ্ধাবান আমি, শিখাও সে তত্ত্ব
স্বর্গলোকে যাহে লভে অমৃতত্ব।
দ্বিতীয় বরেতে ইহাই প্রার্থনা,
শিখাও হে দেব, অগ্নি আরাধনা।'

যম। 'শুন নচিকেতঃ, তোমায় হে বলি
স্বর্গ্য অগ্নিতত্ত্ব শুন কুতূহলী—
অনন্ত অনন্ত লোক প্রাপ্তিদ্বার,
অবস্থিত এতে সকল সংসার,
সবাকার হৃদিগুহায় নিহিত
জানিও নিশ্চয় ওহে নচিকেত।

এত বলি তারে সৃষ্টি আদিভূত
অগ্নির স্বরূপ করিলা বিদিত।
কিরূপ ইষ্টক অগ্নির চয়নে,
কত সংখ্যা—দিতে হয় বা কেমনে।
উপদিষ্ট বাক্য আবৃত্তি করিলা,
মৃত্যু তুষ্ট হয়ে আবার কহিলা।

মহাত্মা শমন অতি প্রীতমতি
বলিলেন তারে, 'তুষ্ট আমি অতি।
বর অদ্য আরো করি হে প্রদান,
তব নামে এই অগ্নির আখ্যান
হইবে জগতে—করহ গ্রহণ
এই রত্নমালা বিবিধ বরণ।
পিতা মাতা আচার্য্যের লয়ে অনুমতি
তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন
করে যেই, আর ইজ্যা, দান, অধ্যয়ন,
জানে সে সর্ব্বজ্ঞদেবে—হৃদয়ে বসতি
হিরণ্যগর্ভের অংশ—পূজনীয় যিনি,
দেখে তাঁরে পরাশান্তি লভয়ে অমনি।
এইরূপ তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন,
জানিয়া কিরূপ, কত ইষ্টকেতে, কিরূপেতে বেদীর রচন,
মৃত্যুপাশ প্রথমেই অতিক্রম কোরে,
শোকশূন্য স্বর্গলোকে আনন্দেতে ফেরে।
এই অগ্নি স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন,
দ্বিতীয় বরেতে যাহা করিলে প্রার্থন,
তব নামে লোকে ধরায় ঘুষিবে,
শেষ বর নচিকেতঃ, চাও এবে।'

নচিকেতা। 'নরলোকে সন্দেহ প্রচার,—
দেহের পতন হলে, তবু থাকে কেহ বলে
কেহ বলে থাকে নাক আর।

তব পাশে এর তত্ত্ব জানিতে বাসনা,
ইহাই তৃতীয় বর—আমার প্রার্থনা।'

যম। 'দেবগণও ইথে সংশয়িত পুরা,
নয় সুবিজ্ঞেয় এ সূক্ষ্ম ধরম,
অন্য বর চাও, ওহে নচিকেতঃ,
কোরো নাহে উপরোধ, দাও ক্ষমা।'

নচিকেতা। 'শুনি দেবগণও সংশয়িত ইথে,
তুমিও বলিছ, নয় সুবিজ্ঞেয়,
তব সম এর বক্তাও দুর্লভ,
এ বরেরও তুল্য নাহি আর বর।'

যম। শত আয়ু পুত্র পৌত্র লহ বর,
বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য, ঘোটক,
লও বর ভূমিখণ্ড বিস্তারিত,
যত ইচ্ছা তব হোক পরমায়ু।
এর তুল্য যদি আরো কিছু বর
হয় মনোনীত, বিত্ত, চিরবৃত্তি,
চাও তাহা, কর ভূভাগ শাসন,
সর্ব্বকামভাগী করিব তোমায়।
যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ মর্ত্ত্যেতে,
সব চাও, তব চায় যথা প্রাণ,
এই বীণাহস্তা, বিমান আসীনা
রামাদল মর্ত্ত্যলোকেতে দুর্লভ।
মম দত্ত ইহাদের লও সেবা
মৃত্যুতত্ত্ব প্রশ্ন ছাড় নচিকেতঃ।'

নচিকেতা।' হে অন্তক, মর্ত্ত্য দুদিনের সব,
জীর্ণ করে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের তেজ,
যত হোক আয়ু, অতি অল্প তাহা,
নৃত্য গীত রথ থাকুক তোমার।

বিত্তলাভে তৃপ্ত নরকুল,
তোমা দেখে বিত্ত আর কিবা ফল?
তোমার শাসনে জীবনাশা কিবা?
সেই বর শুধু প্রার্থনীয় মোর।
অজর অমর দেবগণে পেয়ে
বল কোন্ জরাজীর্ণ মর্ত্ত্য নর
জেনে হিতাহিত, রূপ রতি সুখ
অতি দীর্ঘ আয়ু করিবে কামনা?
হে মৃত্যো, যে তত্ত্বে সবে সন্দিহান,
পরলোক তথ্য বল সে মহান্,
যেই এই বর অতি গূঢ় হয়,
নচিকেতা অন্য না করে প্রার্থনা।'

দ্বিতীয়াবল্লী।

যম। 'শ্রেয় এক হয়, প্রেয় হয় আর,
দুই ভিন্নফল, বাঁধে মানবেরে,
শ্রেয় যেই লয়, শুভ হয় তার,
লক্ষ্যভ্রষ্ট—প্রেয়ে করিলে বরণ।
শ্রেয় প্রেয় দুই আসে নর পাশে
বিচারেতে ধীর জানে দুয়ে ভেদ,
ধীর বরে শ্রেয়ে, প্রেয়ে হীন মেনে,
মন্দ লোভে লয় প্রেয়ের শরণ।
ধন্য নচিকেতঃ, ত্যজিলে সকল
প্রিয় কাম্যবস্তু করিয়ে বিচার,
অর্থের এপথ কর্‌নি গ্রহণ,
যাহে মগ্ন হয় বহু নরকুল।
মহান্তর, ভিন্নফল, বিপরীত,
অবিদ্যা ও বিদ্যা যার জানে জ্ঞানী
বিদ্যাকামী নচিকেতা, লয় মানি,

বহু প্রলোভনে নহ বিচলিত।
ঘোর অবিদ্যার মাঝে বর্ত্তমান,
মোরা জ্ঞানী, মোরা পণ্ডিত—ধারণা,
ঘোরে মূঢ় নানা বিষম কুপথে,
অন্ধনীয়মান অন্ধের মতন।
পরলোক বালদ্বন্দে নাহি ভায়,
যে জন প্রমত্ত, মূঢ় বিত্ত মোহে,
হেথা সব—পরলোক নাই, মেনে
পুনঃ পুনঃ বশে আসয়ে আমার।
শ্রবণদুর্লভ অনেকের যিনি,
শুনেও অনেকে জানে না যাঁহায়,
আশ্চর্য্য সে বক্তা, লব্ধাও দুর্লভ,
জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য, শ্রেষ্ঠ গুরু যার।
হীন নরপ্রোক্ত এই আত্মতত্ত্ব
নহে সুবিজ্ঞেয় অনেক চিন্তায়,
শ্রেষ্ঠাচার্য্য বই নাই আর গতি,
অতি সূক্ষ্ম আত্মা, তর্ক অগোচর।
তর্কগম্য নহে এ তত্ত্ববিজ্ঞান,
গুরু উপদেশে সুলভ হে প্রিয়,
সত্যধৃতি তুমি পেয়েছ এ জ্ঞান,
তোমা সম প্রষ্টা বহু যেন পাই।
জানি আমি বিত্ত অনিত্য নিশ্চয়,
অধ্রুব সাধনে ধ্রুব নাহি পায়,
তবু মোহে নাচিকেত অগ্নিচয়ে,
অনিত্যে পেয়েছি নিত্যপ্রায় পদ।
শ্রেষ্ঠ আমা হতে তুমি নচিকেতঃ,
ধীর শান্ত অতি তোমার হৃদয়,
পেয়ে হাতে সব কাম্যবস্তু জাত,
ব্রহ্মপদ *, যাহে জগতের স্থিতি,

* ব্রহ্মার পদ।

ক্রতুশ্রেষ্ঠফল যে অনন্ত পদ,
যে পদেতে লেশ মাত্র নাই ভয়,
সবে স্তুতি করে যে মহান্ পদ,
অণিমাদি যাহে লভয়ে বৈভব,
সেই ব্রহ্মপদ, শ্রেষ্ঠ জগতেতে,
ধৃতিবলে তুমি করেছ বর্জ্জন।
সে দুর্দ্দর্শ, গূঢ় দেশে অবস্থিত,
বুদ্ধিগুহাহিত, গহ্বরনিহিত,
সনাতন দেবে অধ্যাত্ম যোগেতে
ধ্যান কোরে ধীর ত্যজে হর্ষশোক।
শুনি ইহা মর্ত্ত্য করিয়া ধারণ,
অণু আত্মা ধর্ম্মবান দেহ হতে
পৃথক্ জানিয়ে, লভিয়ে তাঁহারে,
আনন্দের বস্তু পেয়ে আনন্দেতে,
হইয়ে বিভোর থাকে দিবানিশি।
মুক্ত তোমা তরে ব্রহ্মের সদন,
ওহে নচিকেতঃ, হেন লয় মন।'

নচিকেতা। 'ধর্ম্ম হতে ভিন্ন, অধর্ম্মেরও পর,
কার্য্য কি কারণ সবার উপর,
ভূতভাবী সব হইতে পৃথক্,
যা দেখিছ তাহা বল হে আমায়।'

যম। 'সর্ব্ববেদে প্রতিপন্ন যেই পদ,
সকল তপস্যা যেই পদ তরে,
যাঁর প্রাপ্তি আশে ব্রহ্মচর্য্য সেবে,
সংক্ষেপে বলিব আমি সেই পদ—ওঁ।
এ অক্ষরই ব্রহ্ম, এ অক্ষরই পর,
এ অক্ষর জেনে যে যা চায় পায়,
শ্রেষ্ঠ আলম্বন ব্রহ্ম আরাধনে,
জেনে ইহা পূজ্য হয় ব্রহ্মলোকে।
নাহি জন্মে মরে অলুপ্তচেতন,

অনন্তপ্রভব, নহে জন্মদাতা,
অজ, নিত্য, ক্ষয়হীন, পুরাতন,
হত নহি হয় দেহ হত হলে।
হন্তা ভাবে যদি মারিব ইহারে,
হত ভাবে আমি হইলাম হত,
উভয়েই আত্মস্বরূপে অজ্ঞানী,
আত্মা কভু নাহি হানে কিম্বা হত।
অণু হতে অণু, মহতো মহান
আত্মা এ জীবের গুহায় নিহিত,
অকাম যে, দেখে হয়ে বীতশোক,
ধাতার কৃপায় মহিমা আত্মার।
উপবিষ্ট, কিন্তু অতি দূরগামী,
শয়ান, তথাপি ধায় সব স্থানে,
সুখ দুখ এ বিরোধী ধর্ম্মী দেবে,
আমা ছাড়া কেবা পারে জানিবারে ?
অশরীর, কিন্তু অনিত্য শরীরে,
নিত্যকাল হয় যাঁর অবস্থান,
অতীব মহান বিভু সে আত্মায়,
জেনে ধীর জন করে নাকো শোক।
নহে আত্মা লভ্য বহু বেদ পাঠে,
মেধাবলে কিম্বা অনেক শুনিলে,
বরেন যাঁহারে, তাঁর লভ্য ইনি,
তাঁরি পাশ প্রকাশেন নিজরূপ।
দুষ্কার্য্য হইতে অনেক বিরত,
নয় সমাহিত কিম্বা শান্তচিত,
শুধু জ্ঞানবলে কভু সে জনার,
নাহি হয় লাভ পরমাত্মা ধন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ওদন যাঁহার,
মৃত্যু যাঁর হয় সুস্বাদু ব্যঞ্জন,
কে জানিতে পারে কোথা সেই জন,

স্বরগে পাতালে কিম্বা মর্ত্ত্যলোকে ?

তৃতীয়া বল্লী।

হৃদয় আকাশে নিত্য অবস্থান
উভে নিজকৃত কর্ম্মফলপায়ী
আলো ছায়া যথা ব্রহ্মবিদে বলে,
পঞ্চাগ্নি গৃহস্থ, তিন নাচিকেত
যেই জন করিয়াছে অনুষ্ঠান।
যজমান স্বর্গ সেতু নাচিকেত,
কিম্বা সে অভয় অক্ষয় পরম
ব্রহ্ম যিনি ভবপারের আশ্রয়
উভয়েই মোরা সক্ষম জানিতে;
আত্মা যিনি, হন তিনি রথী,
শরীর সে রথ জেনো তাঁর,
সারথি বুদ্ধিরে জেনো ধীর,
রশ্মির স্থানীয় জেনো মনে।
ইন্দ্রিয় সকল হয় তার হয়,
বিষয় সমূহে জেনো গম্য পথ,
দেহেন্দ্রিয় মনে মিলিত আত্মারে,
ভোক্তা আখ্যা দেন মনীষী সকলে।
বিজ্ঞান রহিত সদা যেই জন,
মন যুক্ত নয় কখন যাঁহার,
ইন্দ্রিয় সকল অবশ তাঁহার,
সারথির দুষ্ট ঘোটকের প্রায়।
কিন্তু যেই সদা বিজ্ঞানে শোভিত,
যুক্ত মন হয় নিত্যকাল যাঁর,
ইন্দ্রিয় সকল বশেতে তাঁহার,
সারথির শিষ্ট অশ্বের মতন।
নাহিক বিজ্ঞান কখন যাঁহার,
অসংযত মন, অশুচি অন্তর,

সেই পদ সে ত কভু নাহি পায়,
লভে পুনঃ পুনঃ দারুণ সংসার।
বিজ্ঞানে শোভিত সদা যেই জন,
সংযত অন্তর, সদা শুদ্ধচিত,
তারি লভ্য সদা সে পরম পদ,
পুন জন্ম নাহি হয় যাহা পেলে।
বিজ্ঞান সারথি হন সদা যাঁর,
মনরশ্মি দৃঢ় করেন ধারণ,
পথশেষে তিনি হন উপনীত,
বিষ্ণুর পরম শ্রেষ্ঠ সেই পদে।
স্থূলেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম শক্তি তার,
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ মন যার নাম,
মনেরও উপর বুদ্ধি বলে যারে,
বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ মহানাত্মা নাম।
মহৎ হইতে অব্যক্ত পরম,
পুরুষ সে হয় অব্যক্তেরও পর,
শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু পুরুষ হইতে,
সেই কাষ্ঠা, সেই হয় পরা গতি।
সর্ব্বভূতে আত্মা স্থিত গূঢ়রূপে,
প্রকাশ না হয় স্থূলদৃষ্টি জনে,
সূক্ষ্মদর্শী জনে একাগ্রতা বলে
সূক্ষ্মা বুদ্ধি লভে দেখে সদা তাঁরে।
বাক্য মনে প্রাজ্ঞ করুন বিলয়,
মনে জ্ঞানাত্মায় করুন সংযম,
মহানাত্মে জ্ঞান করি প্রবিলাপ,
শান্তাত্মায় লয় করুন মহৎ।
উঠো, জাগো, যাও শ্রেষ্ঠ গুরু পাশে,
লভ তাঁহাদের কাছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
ক্ষুরধার সম কঠিন, দুর্গম,
এ পথে কবিরা করেন বর্ণন।

অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়,
অরস, অগন্ধ, অনন্ত, অনাদি,
নিত্য, ধ্রুব, সেই মহত্তের পর,
জেনে তাঁরে মুক্ত মৃত্যু মুখ হতে।
সনাতন নাচিকেত উপাখ্যান,
যমালয়ে যাহা যমের কথিত,
বাখানিলে ইহা অথবা শুনিলে,
ব্রহ্মলোকে সদা হয় মহীয়ান।
এ আখ্যান অতি গোপনীয় যাহা,
শুনায় যেজন ব্রাহ্মণ সভায়,
কিম্বা শ্রাদ্ধকালে হইয়ে প্রযত,
অনন্ত অসীম ফল হয় তাঁর,
অনন্ত অসীম ফল হয় তাঁর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চতুর্থী বল্লী।

বহির্মুখেন্দ্রিয় স্বয়ম্ভু সৃজিলা,
দেখে তাই বহিঃ, নহে অন্তরাত্মা,
কোন ধীর প্রত্যগাত্মারে হেরিলা,
প্রত্যাবৃত্তদৃষ্টি, অমৃতত্ব আশে।
বালক বাহিরে কামনায় ধায়,
পড়ে সেই সর্ব্বব্যাপী মৃত্যুপাশে,
কিন্তু ধীর, অমৃতত্ব কি তা জেনে,
ধ্রুব নাহি খোঁজে অধ্রুবের মাঝে।
যার বলে গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস,
মনোহর স্পর্শ করে অনুভব,
তাহারি জ্ঞানেতে জ্ঞাত বস্তু সব,
কি অজ্ঞাত আর বল সে আত্মার?
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
স্বপ্নকালে যাহা হয় অনুভব,

কিম্বা অনুভূত জাগ্রৎ দশায়,
উভয়েই দেখে শক্তিতে যাঁহার,
সেই আত্মা বিভু অনন্ত মহান,
জেনে তাঁরে লোকে করে নাকো শোক।
কর্ম্মফলভোগী এই জীবে যেই,
জানে আত্মা বলি সমীপস্থ অতি,
ভূত ভবিষ্যৎ সকলের প্রভু,
দেহের রক্ষণে হয় উদাসীন,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
আদিতে ব্রহ্মের তপস্যাপ্রভব,
দেখে যেই জন হিরণ্যগর্ভেরে,
সলিলেরও আগে যাহার উদ্ভব,
হৃদয় গুহায় প্রবেশিয়ে যিনি
ভূতগণ সহ করেন নিবাস,
দেখে সেই সত্য পরম ব্রহ্মেরে,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
প্রাণরূপে যেই সর্ব্বদেবাত্মিকা
অদিতি উদ্ভব পরব্রহ্ম হতে,
গুহায় প্রবেশি অবস্থিত যিনি,
ভূতগণ সহ সম্ভব যাঁহার,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা
অরণিদ্বয়েতে জাতবেদা যেই
নিহিত গর্ভিনীগর্ভের সমান,
অপ্রমত্ত নর হবি লয়ে যাঁর
গায় গুণগান নিতি দিন দিন,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
এখানেও যাহা, সেখানেও তাই,
সেখানেও যাহা, এখানেও তাহা,
পুনঃ পুনঃ মৃত্যু লভে সেই জন,
ইথে যেই জন দেখে নানা প্রায়।

মন ভিন্ন কিছু দিয়ে নাহি পায়,
আছে নাহি ইথে কিছু ভেদাভেদ,
পুনঃ পুনঃ মৃত্যু লভে সেই জন,
দেখে যেই জন ইথে নানা প্রায়।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মাত্র হন ইনি,
শরীরের মাঝে এঁর অবস্থান,
ভূতভাবী যাহা, সবার ঈশান,
না থাকে জুগুপ্সা জানিলে ইঁহারে,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মাত্র হন ইনি,
নাহি যাহে ধূম হেন জ্যোতি প্রায়,
ভূতভাবী যাহা, সবার ঈশান,
আজও তিনি, কালও তিনি বর্ত্তমান,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
যথা বৃষ্টিজল পোড়ে উচ্চভূমে
নানাপথে নানাধারে বহমান,
তথা ধর্ম্ম ভিন্ন প্রত্যেক শরীরে,
দেখে যেই, তার হয় অনুগামী।
শুদ্ধোদক মাঝে যথা শুদ্ধোদক
পড়িলে মিশিয়ে হয় একরূপ,
মুনিজন যেই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী,
আত্মা তার তথা হয় হে গৌতম।

পঞ্চমী বল্লী।

একাদশদ্বার আছে এক পুর,
অবক্রচেতস সে অজ রাজার,
ধ্যান কোরে তাঁরে করে নাকো শোক,
মুক্তি লভে আর জন্ম নাহি পায়,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
তিনি হন দিব্য স্বর্গবাসী ভানু,

অন্তরীক্ষবাসী মাতরিশ্বা তিনি,
অনল, যাঁহার পৃথিবী নিবাস,
গৃহবাসী তিনি অতিথি ব্রাহ্মণ,
কিবা দেব, নব, যজ্ঞ কিবা ব্যোম,
সবার অন্তরে নিবাস তাঁহার,
জলে জন্ম তাঁর শুক্তি মুক্তারূপে,
পৃথিবীতে ব্রীহিযবরূপধারী,
যজ্ঞের সাধন স্বরূপে জনম,
পর্ব্বতে জনম নদী আদিরূপে,
নানা রূপধারী তবু একরূপ,
অবিতথভাব অতীব মহান।
ঊর্দ্ধে প্রাণ তিনি করেন কর্ষণ,
অপানে করেন তিনি অধোগামী,
মধ্যেতে আসীন সে বামন দেবে
সর্ব্বদেব সদা করে উপাসনা।
এই শরীরের মাঝে যেই দেহী,
শরীর হইতে যায় যবে চলি,
কিবা থাকে অবশেষ তদা?
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা,
প্রাণ বলে নহে মর্ত্ত্যের জীবন,
কিম্বা সে জীবিত অপান শক্তিতে,
অপর শক্তিতে ধরে নর প্রাণ,
যাহাতে আশ্রিত সদা এ উভয়।
পুনরায় বলি শুন হে গৌতম,
সেই গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব সনাতন,
মৃত্যু অন্তে যথা অজ্ঞানী জনার
অবস্থা আত্মার, তাও শুন বলি।
যেরূপ কর্ম্ম, বিজ্ঞান যাহার,
সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি,
কোন দেহী পশে যোনির দুয়ারে,

কেহ বা লভয়ে স্থাবর শরীর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রাণ সুপ্ত হলে পর,
জাগে যে পুরুষ সবার হৃদয়ে,
নানা কাম্যজাত করিয়া নির্ম্মাণ,
তাঁহাতে আশ্রিত আছে সর্ব্বলোক,
কেহ নাহি তাঁরে করে অতিক্রম,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা!
যথা অগ্নি হয়ে প্রবিষ্ট ভুবনে,
দাহ্য বস্তু ভেদে ধরে ভিন্নরূপ,
সর্ব্বভূত আত্মা তথা এক যদি,
রূপভেদে ধরে সদা ভিন্নরূপ,
কিন্তু সে স্বরূপ অবিকৃত তাঁর,
সদা একরূপ, ভিন্ন নহে কভু।
এক বায়ু যথা প্রবিষ্ট ভুবনে,
আধার ভেদেতে ধরে ভিন্ন রূপ,
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা সেই মত,
এক, কিন্তু হন ভিন্ন রূপভেদে।
অবিকৃত কিন্তু স্বরূপ তাঁহার,
একরূপ সদা ভিন্ন নহে কভু।
সূর্য্য যথা সর্ব্বলোকের লোচন
লিপ্ত নাহি হন অশুচি স্পর্শেতে,
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা এক সেই
নহে লিপ্ত কভু জগতের দুখে,
জগৎ অতীত স্বরূপ তাঁহার।
এক সেই সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা
সকল জগৎ বশেতে যাঁহার,
একরূপ যিনি করেন বহুধা,
ধীর যাঁরা তাঁরে দেখিছেন সদা,
নিজ আত্মামাঝে সদা অবস্থিত,
শাশ্বত সে সুখ লভেন তাঁহারা,

নহে অন্ত কামী বহির্ম্মুখ জন।
অনিত্যের মাঝে নিত্য যেই জন,
চেতন সবার চৈতন্ত কারণ,
এক হয়ে যিনি জগতে সবার
কাম্যবস্তু সদা করেন বিধান,
ধীর যাঁরা তাঁরে দেখিছেন সদা,
নিজ আত্মামাঝে সদা অবস্থিত,
শাশ্বত সে সুখ লভেন তাঁহারা,
নহে অন্ত কামী বহির্ম্মুখ জন।
সেই অনির্দ্দেশ্য পরম সুখেরে
এই সেই বলি জানেন বিধান,
কিরূপে জানিব স্বয়ং প্রকাশ
কিম্বা আছে তাঁর প্রকাশ কারণ?
নাহি সূর্য্য তায় কিম্বা চন্দ্র তারা
নহেক বিদ্যুত, কোথা এ অনল?
তাঁহারি ভাসনে সবে অনুভায়,
তাঁহারি প্রকাশে সবার প্রকাশ।

ষষ্ঠী বল্লী।

ঊর্দ্ধে মূল এঁর, শাখা অধোভাগে,
অশ্বত্থ এ তরু নিত্য সনাতন,
সেই জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্ম সেই হয়,
তাঁহারই বলে অমৃত সকলে,
তাঁতে সর্ব্বলোক সদাই আশ্রিত,
কেহ নাহি তাঁরে করে অতিক্রম,
এই সেই জিজ্ঞাসিলে যাহা।
জগৎ সংসারে আছে যাহা কিছু,
সকলি নিঃসৃত প্রাণের কম্পনে,
মহা ভয়ানক—উদ্যত অশনি,
জানে যারা, মৃত্যু করে অতিক্রম।

ভয়ে এঁর তাপ দিতেছে অনল,
ভয়ে তাপ দেয় ব্যোমে বিবস্বান.
ভয়ে ইন্দ্র বায়ু স্বকর্ম্মেতে রত,
পঞ্চম সে মৃত্যু ধায় চারি ভিতে।
দেহের পতন হইবার আগে,
যে জন না চায় লভে তত্ত্বজ্ঞান,
সৃষ্ট লোক মাঝে লভয়ে জনম,
ধরে দেহ নানা কর্ম্ম অনুসারে।
আদর্শেতে যথা স্পষ্ট নিজ রূপ,
তথা এই দেহে আত্মার দর্শন।
যেখানেই যাও, যাও যেই লোকে
অস্পষ্ট দর্শন হয় সব স্থানে।
পিতৃলোকে দেখে স্বপনের প্রায়,
গন্ধর্ব্বলোকেতে জলে ছায়া যথা.
লোক মধ্যে শুধু ব্রহ্মার ভুবনে,
সুস্পষ্ট আত্মার লভয়ে দর্শন।
ছায়া ও আতপ ভিন্ন যেইরূপ,
তেমনি আত্মায় দেহে দেখে ভেদ।
দুষ্প্রাপ্য এ লোক, তাই সে উচিত,
ইহদেহে যত্ন আত্মার দর্শনে।
ইন্দ্রিয় সবার পৃথক্ কারণ,
উৎপত্তি বিনাশ ধর্ম্ম ইহাদের,
জেনে তাহাদিগে ভিন্ন আত্মা হতে,
ধীর জন কভু করে নাকো শোক।
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হয় মন,
মন হতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে যারে,
মহানাত্মা শ্রেষ্ঠ হয় বুদ্ধি হতে,
মহৎ হইতে অব্যক্ত উত্তম।
অব্যক্তের পর পুরুষ সে ব্যাপী,
যাঁর লিঙ্গ কভু না হয় নির্ণয়,

যেই জন্তু তাঁরে জানে, মুক্ত হয়,
অমৃতত্ব লাভ করে সেই জীব।
চক্ষুর গোচরে নাহি তাঁর রূপ,
কেহ নাহি চক্ষে দেখে কভু তাঁরে,
সংকল্প বিকল্প বর্জ্জিত হৃদয়ে,
মননেতে তিনি নিত্য প্রকাশিত,
জানে যারা এঁরে লভে অমৃতত্ব।
যে সময়ে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন,
হয় স্থির, বুদ্ধি ত্যজে নিজ কায,
তাহারেই বলে পরমা সে গতি
তাহারেই সাধু জানে যোগ বলি—
স্থিরভাবে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ধারণা।
তদা যেন যোগী রন সাবধান,
উৎপত্তি বিনাশ স্বভাব এ যোগ।
বাক্যমন কিম্বা চক্ষুর দ্বারায়
কভু লভ্য নন পরমাত্মা সেই,
অস্তি বলে যেই, তারি লভ্য ইনি,
উপলব্ধি অন্যে নারে করিবারে।
অস্তি অস্তি বোলে উপলভ্য হন,
স্বরূপেও এঁর হয় অনুভব,
আস্তিক্য বুদ্ধিতে সগুণে জানিলে,
নির্গুণ স্বরূপ হন প্রকাশিত।
কামনা যে সব হৃদয়ে আশ্রিত,
দূর হয় যবে, মর্ত্ত্য জন তদা
হয় অবিনাশী, অমৃত স্বরূপ,
এখানেই ব্রহ্ম করয় সম্ভোগ।
ইহলোকে এই জীবন দশায়
যবে হৃদিগ্রন্থি সব হয় ভেদ,
মর্ত্ত্য জন হয় অমৃত স্বরূপ,
এ পর্য্যন্ত হয় বেদানুশাসন।

শত, এক আর হৃদয়ের নাড়ী,
এক তার গেছে মূৰ্দ্ধাভেদ করি.
তাহার আশ্রয়ে ঊৰ্দ্ধে যেই যায়,
অমৃতত্ব সেই লভয়ে নিশ্চয ;
নানাগতি অন্য নাড়ীর আশ্রয়ে,
লভয়ে সংসার, না পায বিশ্রাম।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ অন্তরাত্মা,
সদা জনগণ হৃদয়ে নিবাস,
নিজ দেহ হতে কর আকর্ষণ,
তৃণ হতে ধৈর্য্যে ইষিকা মতন।
তাঁরে জেন অবিনাশী জ্যোতির্ম্ময়।
তাঁরে জেন অবিনাশী জ্যোতির্ম্ময়।
মৃত্যুপ্রোক্ত এই মহাতত্ত্বজ্ঞান
আর যোগবিধি সমগ্র জানিয়ে
হল নচিকেতা বিমুক্ত, বিরজা,
অপর যে কেহ জানিবে এরূপ
অধ্যাত্ম এ তত্ত্ব নচিকেতা মত,
সেও জ্ঞান লভি হইবে বিরজা,
সেও করিবেক মৃত্যু অতিক্রম।

মন।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর। ঐ সূক্ষ্ম শরীরের নাম মন। শরীর যেমন স্থূল ভূত দ্বারা গঠিত, সূক্ষ্ম শরীর মন তদ্রূপ সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা গঠিত। ভূত মাত্রই শক্তির আধার। স্থূল শরীরে শক্তি স্থূলভাবে কাজ করে। মনে শক্তির কাজ সূক্ষ্ম ভাবে। মনাশ্রয়ী শক্তির সূক্ষ্মভাবাপন্ন কার্য্যের বিকাশ চিন্তা। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরস্পর ভিন্ন নহে। উহারা একই শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশ মাত্র। চুল ও নখ যেমন স্থূল শরীরের অংশ, তেমনি স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের অংশ। যেমন আমরা চুল ও নখ কাটিয়া ফেলি, তেমনি মরিবার সময় স্থূল শরীর ত্যাগ করি, কিন্তু মন সঙ্গে যায়। খাদ্যের সূক্ষ্মাংশে মন তৈয়ার হয়। এক সর্ব্ব-ব্যাপী বিরাট্ মনের অংশ আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মন।

পঞ্চেন্দ্রিয় বহির্জগতের বিষয় গ্রহণ করিয়া মনের হাতে দেয়। মন তৎসমুদায় জীবাত্মার সমক্ষে আনয়ন করে, তাঁহার ভোগ ও জ্ঞানের জন্য। জীব বিষয়ের ভোক্তা; মন ইন্দ্রিয়গৃহীত ভোক্তব্য বিষয় জীবাত্মার নিকটে বহন করেন মাত্র। মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয় জীবাত্মার নিকট বহন করিয়া না লইয়া গেলে, জীবাত্মার বিষয়-ভোগ অসম্ভব। অনেক সময়, মনোযোগ সহকারে পাঠে নিমগ্ন থাকিলে, ঘরে ঘড়ি বাজিয়া গেলেও, শুনা যায় না। ঘড়ির শব্দজন্য বায়ুর কম্পন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, মন পাঠে নিযুক্ত থাকায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই বলিয়া, ঐ শব্দ জীবাত্মার শ্রবণ গ্রাহ্য হয় না। জীবাত্মা কর্ত্তা। "ইহা কর" "ইহা কোরো না," ইত্যাদিরূপ আজ্ঞা জীবাত্মা হোতে আসে, প্রথম মনে। মন সে আজ্ঞা ইন্দ্রিয়গণের নিকট বহন করেন। তার পর, ইন্দ্রিয়গণ তদনুসারে কার্য্য করে।

মন স্বতঃচেতন নয়। মনের চৈতন্য সর্ব্বচৈতন্যাধার ভগবানের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র।

মনের কার্য্য সাধারণতঃ দুই প্রকার। জ্ঞান-সহিত ও জ্ঞান-রহিত। জ্ঞান সহিত কার্য্যে কর্ত্তার অহং-জ্ঞান বিদ্যমান। প্রত্যহ যে সমস্ত কাজ

আমরা জেনে শুনে করে থাকি, তৎ সমুদায়ই জ্ঞান-সহিত কার্য্য। জ্ঞান-রহিত কাজে কর্ত্তার অহং-জ্ঞান অবিদ্যমান। পাকস্থলী, হৃদয়, ফুস্‌ফুস প্রভৃতি যন্ত্রের কার্য্য আমিই করি, কিন্তু সে সকলের কার্য্যে আমার অহং-জ্ঞান নাই। ঐ সকল কার্য্যকে জ্ঞান-রহিত কার্য্য বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-রহিত কার্য্য জ্ঞান-সহিত কার্য্য হইতে অপকৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন, যে সকল কাজ এক্ষণে জ্ঞান-রহিত, চেষ্টায় তৎ সমুদায় জ্ঞানসহিত হইতে পারে। অর্থাৎ যে সকল কাজে এক্ষণে আমাদের অহংজ্ঞান নাই, চেষ্টা দ্বারা সে সকল কাজে অহং-জ্ঞান স্থাপন করা যায়। ইহা ছাড়া মনের তৃতীয় অবস্থা আছে। এ অবস্থা জ্ঞান-সহিত অবস্থার উপরে। এ অবস্থায়ও অহং-জ্ঞান অবিদ্যমান। ইহার অপর নাম সমাধি। সমাধি অহং-জ্ঞান-শূন্য হইলেও অহং-জ্ঞান-শূন্য জ্ঞান-রহিত অবস্থার সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ।

মনের তিন অবস্থা—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তমঃ—জড়তা, কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা; রজঃ—কার্য্যতৎপরতা, কার্য্যে মহা উদ্যম ও উৎসাহ; সত্ত্ব—সংযম, কিনা কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই কর্ত্তার স্বায়ত্ত। মন যেন অশ্ব ও কর্ত্তা যেন অশ্বারোহী। তামসিক মন অলস অশ্ব, অশ্বারোহী চাবুকের উপর চাবুক মারিয়াও তাহাকে এক পা চালাইতে পারেন না। রাজসিক মন উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব, সে যেদিকে ইচ্ছা, সে দিকে দৌড়াইয়া যায়, অশ্বারোহী তাহাকে থামাতে বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথে চালাইতে অক্ষম। সাত্ত্বিক মন শান্ত ও তেজীয়ান্ অশ্ব, তিনি ঘোড়াকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে লইয়া যান, যেমন ইচ্ছা তেমনি করান, ঘোড়া তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রজঃ দ্বারা তমঃ অভিভূত করিয়া, পরে সত্ত্ব দ্বারা রজঃ জয় করিতে হয়।

মনকে তত গ্রাহ্যের ভিতর এনো না। মনকে দেখ্‌বে বালকের মত। কথা না শোনে, আবোল তাবোল ভাবে, তাড়া দেবে, তা হলে যা বল্‌বে, তা শুন্‌বে।

কার্য্য চিন্তার পরিণাম। মন সৎ ও উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ কর, তা হলে, আপনিই সৎ ও উচ্চ কাজ এসে যাবে। নিজেকে দুর্ব্বল, পাপী ভাব্‌লে, দুর্ব্বল ও পাপী হ'তে হয়। সবল ও পবিত্র ভাব্‌লে, তাই হোয়ে যায়। চিন্তার এম্‌নই শক্তি, নিজেকে যেমন যে ভাবে কিছু দিন পরে চিন্তা-শক্তি তাকে তাই তৈয়ার করে।

চিন্তা স্থূলাকার হবার আগে সূক্ষ্মাকারে থাকে। সূক্ষ্মাবস্থা স্থূলের বীজ। স্থূলভাব প্রাপ্ত হলে, তবে চিন্তা আমাদের সম্যক্ জ্ঞানগ্রাহ্য হয়। সূক্ষ্মাবস্থায় চিন্তা আমরা ঠিক্ ঠিক্ ধরতে বা জান্‌তে পারি না। স্থূলাবস্থায় চিন্তা সবল হইয়া উঠে; তখন তাকে রোধ করা কঠিন। বীজাবস্থায় চিন্তা দুর্ব্বল; রোধ করিতে হলে, বীজাবস্থায় রোধ করা সহজ। রাগ জ্বলে ওঠার অনেক আগে, যখন প্রথমে বোধ হয়, "এই আমার রাগ হতে আরম্ভ হচ্ছে," সেই বীজাবস্থায়ই ক্রোধবৃত্তির নিরোধ করা উচিত।

যে ভাব আশ্রয় করে কিছু দিন বা কিছু ক্ষণ মন কাজ করে, মনের স্বভাব আরও কিছু ক্ষণ সেই ভাবে থাকিতে চেষ্টা করা। বিশেষ ইচ্ছা ও শক্তি প্রকাশের দ্বারা মনের ঐ রূপ চেষ্টা নিবারণ করতে হয়। এই জন্য, যিনি অনেক দিন ধরে কুপ্রবৃত্তির সেবা করেন, তাহার মনের চেষ্টা হয়, আপনিই কুপথে যেতে। তিনি ভাল হবার ইচ্ছা করলেও, মন তাঁকে ভাল হতে দেয় না; মনের ঝোঁক্ হয় কুকাজে।

এক সুরে বাঁধা ৪।৫টি বাদ্য-যন্ত্র এক ঘরে আছে। উহাদের একটিতে মারলে যেমন সেটী বেজে উঠে, অপর যন্ত্রগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সুর দিতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ, যে যন্ত্রটীকে আঘাত করা হয়, তাহার কম্পন যে গুলিকে আঘাত করা হয় নাই, সে গুলির উপর কার্য্য করিয়া উহাদিগকে কম্পিত কোরে তোলে, এক সুরে বাঁধা হইলে এরূপ কার্য্য সম্ভব; নহিলে, নয়। মনোরাজ্যের ব্যাপারও এই রূপ। একভাবাপন্ন মন পরস্পর পরস্পরের উপর কাজ করে। অসৎ মন অসৎ মনের উপর, সৎ মন সৎ মনের উপর। অসৎকর্ম্মকারী ব্যক্তির মনের উপর জগতের অপর সমস্ত অসৎভাবাপন্ন মনের প্রভাব। সে প্রভাব, তাঁহার নিজের যতটুকু কুকাজ করার অভিপ্রায়, তাহা অপেক্ষা অনেক কুকাজ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক করায়। এই জন্য, অসৎ লোক আরও অসৎ হইতে থাকে। সৎকর্ম্মকারীর মনের উপর জগতের অপর সমস্ত সৎভাবাপন্ন মনের প্রভাব—সৎ লোক যে প্রভাব বলে নিজের চেষ্টার অতিরিক্ত সৎ হইতে থাকে। অসৎ-লোকের মনের প্রভাব অপর অসৎ ব্যক্তিকে অধিকতর অসৎ করে। সুতরাং তাঁহার প্রথম দোষ, তিনি নিজে অসৎ; দ্বিতীয় দোষ, অপরকে আরও অসৎ করেন। সৎ লোকের সম্বন্ধেও ঐরূপ, তিনি নিজে সৎ ও পরের সৎ হওয়ার সহায়ক। দুর্বল মন অপেক্ষা

সমীপস্থ মনের প্রভাব অধিকতর। সে চিন্তা বহুদিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা, যে চিন্তা অল্পদিন পূর্ব্বে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ের চিন্তা, ইহাদের প্রভাব অধিকতর। যে চিন্তায় চিন্তাকর্ত্তার অধিকতর একাগ্রতা, সে চিন্তা অধিকতর বলবতী ও তাহার প্রভাব অধিকতর।

প্রত্যেক মনে যে চিন্তার উদয় হয়, নিবৃত্তির পর উহা মনের উপর একটা দাগ রেখে যায়। মনের উপর ঐ রূপ অনেক দাগ আছে, এ জন্মের ও পূর্ব্ব জন্মাবলীর। সে সকল দাগ আপাততঃ প্রত্যক্ষ না হইলেও উহারা মনের জ্ঞান-রহিত স্তরে লুক্কায়িত আছে। সুবিধা হইলেই উহা যে চিন্তার দাগ, সে চিন্তারূপে প্রকাশিত হয়। রাগের দাগ রাগরূপে, দ্বেষের দাগ দ্বেষরূপে, প্রীতির দাগ প্রীতিরূপে, ইত্যাদি। অপ্রকাশ থাকিলেও, জ্ঞান-রহিত স্তর হইতেই, ঐ সকল দাগ প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিতেছে। যদি সৎ-চিন্তার দাগ অধিক হয়, তাহলে সে ব্যক্তির চরিত্র ঐ সকল দাগের প্রভাবে সৎ হয়। অসৎ চিন্তার দাগ অধিক হইলে, চরিত্র অসৎ হয়। সর্ব্বদা অসৎ কথা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য দ্বারা মনে অসৎ ভাবের দাগ অনেক পড়িলে, সে ব্যক্তি পরে ভাল হইবার ইচ্ছা করিলেও, সহজে ভাল হইতে পারে না। ঐ সকল অসৎ দাগ তাহাকে বলপূর্ব্বক অসৎকার্য্যে প্রেরণ করে। তদ্বিপরীত, সর্ব্বদা সৎ কথা, সৎ চিন্তা, সৎ কার্য্য দ্বারা সৎ ভাবের দাগ অনেক পড়িলে, সে ব্যক্তি নিজে ইচ্ছা না করিলেও দাগ সমূহের বলে সৎ হইতে বাধ্য হয়। যখন সৎ ভাবের দাগ এত অধিক হয় যে, সে ব্যক্তির পক্ষে অসৎ কাজ করা অসম্ভব হয় ও ঐ সমস্ত দাগ তাঁহাকে সর্ব্বদাই সৎকার্য্যে প্রেরণ করে, অসৎকাজে ইচ্ছা হইলেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সে ইচ্ছা সাধনে রোধ করে, তখনই বলা যায়, যথার্থ মানুষের সচ্চরিত্রের পাকা গঠন হইয়াছে।

মন যেন চস্‌মা। যে জিনিষ আমরা দেখি, সব দেখি মনের মধ্য দিয়ে, আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় মন; মনের মধ্য দিয়া সমস্ত জ্ঞান। লাল চস্‌মায় জিনিষ লাল দেখায়, হল্‌দে চস্‌মায় হল্‌দে, সবুজ চস্‌মায় সবুজ। যেমনটী চস্‌মা, তেমনটী দর্শন। জগতের যা কিছু আমরা দেখি, তাহাদের দর্শন ও জ্ঞান ঐ রূপ; অর্থাৎ যেমনটী মন দিয়ে দেখি, তেমনটী দেখি। দৃষ্ট জগতের যথার্থ স্বরূপ, মন দিয়ে যেমন দেখি, তা

ছাড়া যা, সে স্বরূপ চিরকাল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। দেখ্‌তে হলেই, মনের ভিতর দিয়ে; আর মন নিজের রং দৃষ্ট জিনিষের যথার্থ স্বরূপের উপর দিয়ে তবে দেখাবে। কাজেই সে রং বাদ দিলে, জিনিষটা কি দাঁড়ায়, সে জ্ঞান মানবজ্ঞানাতীত। আজ আমরা মানুষের মন নিয়ে জগৎটা এই এই রকম দেখ্‌ছি। কাল যদি এই মনটা আর এক রকম হয়ে যায়, এই জগৎটা আর এক রকম দেখ্‌বো। অন্য রকম মন যাদের, সে সকল জীব এই জগৎটাকেই আর এক রকম দেখ্‌ছে। ভগবান্‌কে দেখ্‌তে হলেও, এই মন দিয়ে। সুতরাং ভগবদ্দর্শনও ভগবানের যথার্থ স্বরূপে মনের রং মাখান।

যোগী বলেন, মন দেখা যায়। কিন্তু যাঁরা স্থূল শরীর দেখ্‌ছেন, তাঁরা মন দেখ্‌ছেন না ও দেখ্‌তে পারেনও না। স্থূল শরীরের অনুভূতির নাশের পর, মনের অনুভূতি সম্ভব। নহিলে, নয়।

জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ এক, দ্বৈতবর্জ্জিত। কিন্তু তিনি মনের বহু চিন্তার সহিত নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করে নিজেকে বহু মনে করেন ও দেখেনও বহু। এই দেখার নাম অবিদ্যা, অবিদ্যা নাশের নাম মোক্ষ। মনের চিন্তার সংখ্যা যত কম হবে, জীবাত্মার অবিদ্যামূলক আত্মীয়তা স্থাপনের সুবিধাও তত কম হবে। সুতরাং জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইলে, চিন্তার সংখ্যার হ্রাস করিতে হইবে। চিন্তার সংখ্যার হ্রাসের সঙ্গেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ বৃদ্ধি হইবে। রাজযোগের ধারণা চিন্তা সংখ্যা হ্রাসের উপায়। একটী মাত্র চিন্তায় মনকে একাগ্রতা সহকারে নিবিষ্ট রাখিলে, সেই চিন্তার দ্বারা অন্য চিন্তা সমুদায় তাড়িত ও অভিভূত হইবে, তার পর, এই শেষ চিন্তাটীকেও নাশ করিতে হইবে। তন্নাশের পর, জীবাত্মার আত্মীয়তা স্থাপনের উপায় নাই; নিজেকে বহু ভাবিবার উপায় নাই; ফল, অবিদ্যানাশ ও একমেবাদ্বিতীয়ম, স্বস্বরূপে স্থিতি ইহার নাম সমাধি, যোগের চরম লক্ষ্য।

সক্রেটিস ও এথেন্সবাসিগণ।

হে এথেন্সবাসিগণ,

আর অল্পদিন অপেক্ষা করিলে না বলিয়া, যাহারা এথেন্সের দোষো-দেষারণে ইচ্ছুক, তাহারা তোমাদিগকে জ্ঞানী সক্রেটিসকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া অপবাদ দিবে। কারণ, যাহারা তোমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা এই সুযোগে আমি জ্ঞানী না হইলেও আমাকে জ্ঞানী বলিবে। কিছু দিন অপেক্ষা করিলে তোমাদের বিনা কর্তৃত্বেই ইহা সম্পন্ন হইত। কারণ, দেখিতেছ ত, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে—আমার মৃত্যু অতি নিকট। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, আমার যেরূপ যাহা বলা উচিত ছিল, আত্মরক্ষার সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন করি নাই বলিয়া আমাকে এইরূপ শাস্তি পাইতে হইতেছে। তাহা কখনই নহে। আমার বলিবার কিছু ছিল না বলিয়া আমি শাস্তি পাইতেছি না, আমার প্রগল্‌ভতা ও নির্লজ্জতার অভাব বলিয়া। তোমাদের ইচ্ছা, অপরে যেমন তোমাদের নিকট কাঁদে কাটে, নানারূপ কাকুতি মিনতি করে, তোমাদের নানারূপ তোষামোদ করে, আমিও সেইরূপ করিব। কিন্তু আমা হইতে এরূপ হইতেই পারে না, কারণ, এরূপ ব্যবহার আমার অযোগ্য। স্বাধীন মানুষের অযোগ্য কোন কার্য্য কখনও আমার দ্বারা কৃত হয় নাই বা কোন বাক্য উচ্চারিতও হয় নাই। এখনও আমি নিজের সাপক্ষে বলিয়াছিলাম বলিয়া অনুতাপও করিতেছি না। নিজের সাপক্ষে লড়িয়া মৃত্যুকে, আমি কাকুতি মিনতি করিয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করি। বিচারালয়ে বা যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত নয় যে, যাহাই হউক, কোন রূপে জীবনটা বাঁচাইতে হইবে, যুদ্ধকালে অনেক সময় দেখা যায় যে, অনুসরণকারিগণের নিকট অস্ত্রসমর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অন্যান্য বিপদস্থলেও এইরূপ নানা উপায় আছে। মৃত্যু হইতে জীবন রক্ষা, হে এথেন্সবাসিগণ, কিছু কঠিন নয়, অধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাওয়াই কঠিন। অধর্ম্ম মৃত্যু অপেক্ষা দ্রুতগামী। আমি এখন বৃদ্ধ, বেশী চলিতে পারি না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে অল্পগামী মৃত্যু আমার নাগাল ধরিয়াছে। কিন্তু আমার বিচারকর্ত্তা-

গণ অধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অধিক দ্রুতগামী, সুতরাং অধর্ম্ম তাঁহাদের নাগাল ধরিয়াছে। আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিতেছি। তোমরা আমার শাস্তি মৃত্যু সাব্যস্ত করিয়াছ, কিন্তু আমার বিচারকর্ত্তাদিগকে স্বয়ং সত্য, অবিচার ও অধর্ম্মরূপ দোষে দোষী স্থির করিয়া শাস্তি দিয়াছেন। আমার শাস্তি আমি গ্রহণ করিলাম, তাঁহারাও তাঁহাদের শাস্তি গ্রহণ করুন।

কিন্তু যাঁহারা আমাকে এই রূপ প্রাণদণ্ডে দণ্ডার্হ স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি বলিতে চাই, ভবিষ্যতে তাঁহাদের কি অবস্থা হইবে। আমি বলিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর—তোমরা আমাকে যে শাস্তি দিয়াছ, তাহা হইতে কঠিন শাস্তি আসিবে। তোমরা আমাকে এই শাস্তি দিয়া মনে করিতেছ,আর কেহ তোমাদের কার্য্যের সমালোচনা করিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহার বিপরীত তোমাদের ঘটিবে। তোমরা অনেককে জান না, যাহাদিগকে আমি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট। সুতরাং তাহারা যখন তোমাদের কর্ম্মের সমালোচনা করিবে, তোমাদের অধিকতর বিরক্তি উৎপাদন করিবে। কারণ, তোমরা যদি মনে করিয়া থাক, যাহারা তোমাদের অসৎ কার্য্যের জন্য তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদিগকে মারিয়া তোমরা অপরকে নিবারণ করিবে, তাহা হইলে তোমরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এইরূপ আত্মরক্ষা করা সম্ভবও নহে, ইহাতে বিশেষ মহত্ত্বও নাই। অপর ব্যক্তিকে তোমাদিগকে তিরস্কার হইতে নিবারণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও মহৎ উপায়—নিজেদের জীবন এমন ভাবে সংযত করা, যাহাতে সমুদয় সদ্‌গুণরাশি তোমাদের মধ্যে বিকাশ হয়।

আমি তোমাদের নিকট এইটুকু ভিক্ষা করি। হে এথেন্সবাসিগণ, যখন আমার ছেলেরা বড় হইবে, তখন যদি তাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা ধনোপার্জ্জনে অধিক আসক্ত হয়, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে তিরস্কার করিয়া যন্ত্রণা দিতাম, সেইরূপ তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিও। আর যদি তাহারা বাস্তবিক কোন গুণে গুণী না হইয়া আপনাদিগকে বড় বলিয়া মনে করে, তবে আমি তোমাদিগকে যেরূপ তিরস্কার করিতাম, তোমরাও সেইরূপ তাহাদিগকে তিরস্কার করিও। এইরূপ করিলে আমি ও আমার পুত্রগণ তোমাদের নিকট ন্যায়সঙ্গত যাহা পাপ্য, তাহাই পাইব।

একণে আমাদের পৃথক্ হইবার সময়, আমি মরিতে যাইতেছি— তোমরা জীবনধারণ করিতে যাইতেছ, কিন্তু কে ইহার মধ্যে উচ্চতর গতি লাভ করিবে, তাহা দেবগণ ব্যতীত আর কেহই জানেন না।

রামকৃষ্ণ মিশন।

(আমেরিকা)

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল, যে, জুন ও জুলাই এই তিন মাস স্বামী ত্রিগুণাতীত কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলস নামক স্থানে প্রচার করিবেন। তাঁহার সেই স্থানের প্রচার কার্য্যের কিছু সংক্ষিপ্ত আভাস দিতেছি। লস এঞ্জেলস হেরাল্ড ও লস এঞ্জেলস ডেলি টাইম্‌স পত্রে তাঁহার বক্তৃতার কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে,—

৪ঠা মের লস এঞ্জেলস হেরাল্ডে প্রকাশিত হইয়াছে,—

'কলিকাতার স্বামী ত্রিগুণাতীত গত কল্য বৈকালে ব্রেণ্ট্‌স্ হলে 'স্বর্গের সুসমাচার বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে এত ভিড় হয় যে, যদি হলটী আরও বড় হইত, তাহা হইলেও লোক ধরিত না; অনেকে দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। জে ব্রিটজ মহাশয় বক্তাকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেন। ইংরাজী ভাষায় বক্তার খুব দখল আছে। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

'শরীরকে বশ না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না। আজ কাল বড় বড় অধ্যাপকেরা জীবনের উৎপত্তি রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের অভ্যন্তরীণ আত্মাই জীবনের মূল এবং সেই আত্মা পরমাত্মা হইতে আসিতেছে। ঈশ্বর আমাদের সকলকে প্রতিদিনই, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে আদেশ প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বরতনয় যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ হইতে মহা প্রয়োজনীয় সুসমাচার আনয়ন করিয়াছিলেন আর তিনি ক্রুশে মরিলেন, যাহাতে এই সুসমাচার, এই আদেশ আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়। কি ঘৃণা, কি লজ্জার কথা যে, আমরা এই সকল আদেশে অধিক মনোযোগ প্রদান করি না। ভগবান আমাদের পরম প্রেমাস্পদ বন্ধু; তাঁহার নিকট হইতেই

আমাদের সকল উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব-ব্যাপী, অনন্ত, পূর্ণস্বরূপ। ধর্ম্ম বাস্তবিক একটী বিজ্ঞান। লোকে বিভিন্নরূপে এই ধর্ম্মের ধারণা করে বলিয়া অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সকলের পশ্চাতেই সত্য রহিয়াছে—সেই সত্যই ভগবান। সকল বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য,—কোন এক বিষয়ে একত্ব বাহির করা। ধর্ম্মবিজ্ঞানে ভগবানই সেই একত্ব। যদি আমরা তাঁহার নিয়ম সকল মানিয়া চলি, তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয় আবাসে প্রকৃত মুক্তিসুখ উপভোগ করিব।'

বক্তৃতার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রশ্নোত্তর হইল। স্বামীজি একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁহার বিশ্বাস, বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট একই পুরুষ—ঈশ্বরতনয়।

ইহা ব্যতীত স্বামীজি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুগণের সমুদয় অনুষ্ঠানের মূলেই ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, নিজের সুখ হিন্দুজীবনের উদ্দেশ্য নহে।

(বাঙ্গালোর)

বাঙ্গালোর বেদান্তসমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বাঙ্গালোরে যাইয়া অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলির নাম, তারিখ, ও সভাপতিগণের নাম দেওয়া গেল।

২৫শে জুলাই—শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদয় জগদ্বাসীকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সভাপতি—মহীশুরের দেওয়ান বাহাদুর।

২৬শে জুলাই—যোগ—সভাপতি—প্রধান বিচারপতি।

২৯শে জুলাই—বেদান্ত—সভাপতি মাধব রাও, সিনিয়র কৌন্সিল।

৩১শে জুলাই—সকল ধর্ম্মের এক লক্ষ্য। সভাপতি—মহীশুর গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

২রা আগষ্ট—ভক্তি ও দরিদ্রসেবা। সভাপতি—মহীশুর মহারাজের সিনিয়র কৌন্সিল।

২রা আগষ্ট—রামায়ণ।

২রা আগষ্ট—ঈশ্বরধারণা। সভাপতি—জেলা সেসন জজ।

৩রা আগষ্ট—ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

৪ঠা আগষ্ট—জীবনের আদর্শ সমূহ।

এতদ্ব্যতীত হিন্দী ভাষায় এক দিন ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

বক্তৃতার দিন ব্যতীত প্রতিদিনই প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যার পর ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সমাগত জিজ্ঞাসুগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন। মহীশুরের মহারাজার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত। বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজে ফিরিবার সময় তথাকার গণ্যমান্য সকল লোক মিলিয়া তাঁহাকে একটী বিদায় সূচক অভিনন্দন দেন, তিনিও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন।

(কলিকাতা)

স্বামী সারদানন্দ এক্ষণে কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ছাত্রগণের নিকট ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি, অধিবেশন স্থান মেট্রোপলিটান মেন বিদ্যালয়, সময় শনিবার অপরাহ্ন ৫টা। বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি, অধিবেশন স্থল, ৫০ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা। পূর্ব্বে উদ্বোধনে যে, বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির নামক ছাত্রাবাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার ২৭ জন ছাত্রের আবেদনে ঐ মন্দিরের ছাত্রগণের সুবিধা জন্য প্রতি রবিবার চার ঘটিকার সময় স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদিগকে গীতা পড়াইতেছেন।

বিগত জন্মাষ্টমীর দিবস কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।

(বর্দ্ধমান)

গত ১০ই শ্রাবণ রবিবার হইতে বর্দ্ধমান, মহাজনটুলি শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে "রামকৃষ্ণ সমিতি" নামে একটী সভার অধিবেশন হইতেছে। প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৫ঘটিকার সময় ইহার অধিবেশন হয়। সভায় বেদসংহিতা, উপনিষদ্, গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক মেম্বরের আগ্রহে শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয় ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার সম্পাদক, বাবু হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু জগবন্ধু মিত্র ডাক্তার ইহার সহকারী সম্পাদক, বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার সেক্রেটারি, বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র রায় মোক্তার ইহার এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি ও বাবু রামকৃষ্ণ দত্ত ইহার ট্রেজারার নিযুক্ত হইয়াছেন। সভায় বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গীতার শাঙ্করভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ও সঙ্গীত

চার্য্য বাবু রামলাল দত্ত মহাশয় ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

(জাপান)

স্বামী সদানন্দ একটী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া বিগত ৭ই আগষ্ট তারিখে জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণ বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় রোগমুক্ত হইবার আশায় দলে দলে বৈদ্যনাথে আগমন করে। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় যেমন তাহাদের যথেষ্ট কষ্ট হইতেছিল, তেমনি ঐ সংক্রামক রোগ বিস্তারের হেতুভূত বলিয়া তাহারা বৈদ্যনাথনিবাসিগণেরও যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। এই দ্বিবিধ অনিষ্ট নিবারণ কল্পে পরলোকগত পণ্ডিত গিরিজানন্দ ঝা, বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং তদানীন্তন বৈদ্যনাথ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় প্রথমেই বিল্ডিংফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৯২ সালে ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং সরকার মহাশয়ের পত্নীর নামে ইহার নামকরণ হয়। ১৮৯৫ সালে ইহা খোলা হয়। বৈদ্যনাথ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসুর যত্নেই ইহার উন্নতি হইয়াছে। ইনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়াতে এক্ষণে বাবু বরদাপ্রসাদ বসু ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন।

প্রায় ৪৪।৪৫জন করিয়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণ এখানে আশ্রয় পাইতেছে। এবং অনেকে চিকিৎসাগুণে ও সেবাশুশ্রূষায় আরোগ্য লাভও করিতেছে। অনেক মহাশয় ব্যক্তি এককালীন অথবা সাময়িক অর্থদান দ্বারা আশ্রমের সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। আশা করা যায়, এই জীবসেবারূপ মহৎ কর্ম্মে ভারতের সর্ব্বসাধারণ যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া ধন্য হইবেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে বাবু বরদাপ্রসাদ বসু, সম্পাদক, রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম, বৈদ্যনাথ ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

Lambs among Wolves বা ভারতীয় মিশনরিগণ। ইংরাজী ভাষায় সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রথমে লণ্ডনের ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতীয় মিসনরিগণ হিন্দুনারী সমাজের উপর যে সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহার অতি সুন্দর উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং মিসনরিগণ ভারতীয় জীবনে কিছু কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে ত্যাগ ও পবিত্রতার আদর্শে জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ। মহারাষ্ট্র ভাষায় কবিতাকারে ক্ষুদ্র পুস্তিকা, মূল্য ৵০ আনা। জি, আর, টুলু ইহার গ্রন্থকার। ইহা তাঁহার নিকট মুকুন্দ জাঙ্গিরা (বম্বে) ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শিবরাত্রি, ভগবতী গীতা ও বিবিধ কবিতা। রামশর্ম্মা কর্ত্তৃক ইংরাজী পদ্যে লিখিত। গ্রন্থকারের কবিত্ব ও ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা প্রশংসনীয়। শিবরাত্রি বর্ণনচ্ছলে তিনি সংসার রূপ মায়াবাজারের বর্ণন করিয়াছেন। ভগবতী গীতায় বর্ণিত এই, কোন সাধকের উপর মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে কুমারী, কালী, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দশভুজা, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি বিবিধ রূপ প্রদর্শন করেন। এই বিভিন্ন-রূপ বর্ণনায় গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তি, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কবিত্বশক্তি প্রভৃতি সুন্দর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। বিবিধ কবিতাগুলির মধ্যে অনাহত চক্রের ধ্বনি ও রূপ, পাপিয়া প্রভৃতি কবিতাগুলি সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি উপ-লক্ষে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশক একটী কবিতাও ইহার মধ্যে দেখি-লাম। 'বাপরে বাপ' নামক কবিতা বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক।

গীতাতত্ত্ব।

জ্ঞানযোগ।

(২৭শে ডিসেম্বর, ১৯০২এ বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়, এ কথা আমি প্রথম বারে বলেছি। প্রক্ষিপ্ত নয়, তার আর একটা কারণ আছে। শাস্ত্রপাঠে দেখ্‌তে পাই, আমাদের দেশের দার্শনিকদের একটা অসাধারণ গুণ ছিল। সেই গুণটার একটু আধটু এখনকার দেশীয় ও বিদেশীয় দার্শনিকদের জীবনে এলে তাঁদের নিজের এবং অপর সাধারণের পরম লাভ হয়। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় প্রমাণ কোরে নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন না, কিন্তু যাতে সেটা জীবনে পরিণত কত্তে পারেন, তার চেষ্টা কত্তেন এবং পরিণত হবার পর ঐ সত্য জন সাধারণে প্রচার কত্তেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবন দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তিনি গীতাতে যা বোলেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তা অনুষ্ঠান কোরে তার সত্যতা দেখিয়ে গিয়েছেন অথবা গীতায় প্রচারিত সত্য সকল তাঁর জীবনেই প্রথম সম্যক্ অনুষ্ঠিত দেখ্‌তে পাই। অতএব তিনিই যে গীতাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোগের বিষয় পূর্ব্বে কতক বোলেছি। মনের শক্তি উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পূর্ণভাবে চালিত করার নাম যোগ। দেখ্‌তে পাই, কোন ছেলে চেষ্টা কোরেও লেখাপড়া শিখ্‌তে পাচ্ছে না, পাশ কত্তে পাচ্ছে না, এর কারণ কি? তার মনের শক্তি এক জায়গায় জড় কত্তে পারে না, আর কতকগুলি বিষয়ের দিকে মনের কতকটা সর্ব্বদা পড়ে থাকে; সে, সমস্ত মন গুটিয়ে নিয়ে এক বিষয়ে দিতে পারে না। মনের শক্তি অন্যদিকে ব্যয় হয়ে যায়, সে জন্য সে উদ্দিষ্ট বিষয় ঠিক আয়ত্ত কত্তে পারে না। যোগ মানে উদ্দেশ্য যাহাই হোক না কেন, তাহাতে পৌঁছিবার বা উহা লাভ কর্‌বার সহজ উপায়। সে সহজ উপায়টী কি? শরীর, মনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে এনে ঐ বিষয়ে লাগানো। ধনলাভ হোক, ধর্ম্মলাভ হোক, অথবা পরের কল্যাণের জন্য অন্য কোন কার্য হোক, তাহাতে

কৃতকার্য্য [illegible] সহজ উপায়ের সাধারণ নামই যোগ দেওয়া যেতে পারে। সমস্ত [illegible] এনে আন্‌বার শক্তি কোথা থেকে [illegible] সকলেরই আত্মার ভিতর রয়েছে। কেন না, আত্মাই সকল শক্তির [illegible] শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। ঐ সকল যন্ত্র নিয়ে তিনি এই অদ্ভুত খেলা খেল্‌ছেন। যন্ত্র খারাপ হোলে যেমন কোন বিষয় ভাল কোরে করা যায় না, সেইরূপ মন বুদ্ধি মলিন হলে আত্মার খেলাও তদ্রূপ হয়। তাঁহার অশেষ শক্তি প্রকাশের সুবিধা হয় না। কিন্তু মন বুদ্ধি যদি খুব শুদ্ধ হয়, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, তবে তাঁর ভিতরের শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ হয়ে থাকে।

যোগ শব্দ সাধারণ ভাবে প্রয়োগ কত্তে পাল্লেও আমাদের শাস্ত্রে উহা কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন জ্ঞানযোগ কাকে বলে, দেখা যাক। পরমহংসদেব বল্‌তেন, একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান। কোন বিষয়ে কাহারও বাস্তবিক জ্ঞান হয়েছে, কখন বোল্‌বো? যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশ—সে সকল যায়গায়, সকল জিনিষের ভিতর দেখ্‌বে। যার সুরজ্ঞান হয়েছে, সে সকল শব্দের ভিতরেই সুরের খেলা দেখ্‌তে পায়। একটা জিনিষ পোড়্‌লো, একখানা গাড়ী দৌড়্‌লো, একজন লোক কথা কহিল, এই সব ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ কোন্ সুরের কোন্ পরদায় হোলো, সে তা বুঝ্‌তে ও বল্‌তে পারে। এমন কি, সে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখ্‌তে পায়। রঙের খেলাতেও সে সুরের খেলা দেখ্‌তে পায়। সমগ্র জগৎ তাহার কাছে অপূর্ব্ব স্বরলহরী মাত্র এবং নাদই জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। পিথাগোরসের অনুভব হোতো, সূর্য্য চন্দ্রের ঘোর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব সুর চোলেছে। তিনি উহাকে Music of the Spheres বোল্‌তেন। পরমহংসদেবের অনুভব হোতো, সমুদয় জগৎমধ্যে এক অপূর্ব্ব ওঙ্কার ধ্বনি উঠ্‌ছে। পাখীর ডাকে, নদীর তরঙ্গে, সমুদ্রের কল্লোলে, সেই ওঁ ওঁ ধ্বনি। সকল স্থানের সকল শব্দের ভিতর দিয়ে সকল সময়ে সেই অনাহত নাদ প্রবাহিত হচ্ছে।

সুরজ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। রূপ বা রস জ্ঞান যার হোয়েছে, তার কাছে সমগ্র জগৎ রূপ ও রসের বিকার মাত্র বোলে অনুভূত হয়। বহুজ্ঞান সকলেরই রয়েছে। সুখদুঃখের জ্ঞানও সকলের আছে। স্থূলচক্ষে যাদের জড় বোলে মনে হয়, সেসকল পদার্থও

আঘাতের প্রতিঘাত দিয়ে নিজ জীবন এবং কিছু না কিছু জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির জ্ঞান 'জ্ঞানমেতন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাং' (চণ্ডী)—পশু পক্ষী ও মনুষ্যের সমান ভাবেই রয়েছে, এ জ্ঞানকে আমরা জ্ঞান বলি না। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের ভিতর যদি আমরা এক শক্তির বিকাশ, এক নিয়মের খেলা দেখ্‌তে পাই, তবেই তাকে জ্ঞান বোলে থাকি। ফলটা পেকে গাছ থেকে মাটিতে পোড়্‌লো। ঢিলটা ছুঁড়্‌লুম, মাটীতে এসে পোড়্‌লো। মানুষ লাফ দিয়ে আকাশে উঠ্‌তে পারে না। পৃথিবীটা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌ছে। ইত্যাদি জ্ঞানগুলিকে যত দিন না আমরা একশক্তিপ্রসূত বোলে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, ততদিন ঐ বহু জ্ঞানগুলি আমাদিগকে জ্ঞানের পথে বড় বেশী অগ্রসর করে নি। আর যাই দেখ্‌লুম যে, ঐ সকলগুলি মাধ্যাকর্ষণ নামক এক শক্তির খেলায় হচ্ছে, অমনি আমাদের জ্ঞান কতদূর ব্যাপিল, কতগুলি বিষযকে আমরা একসূত্রে গাঁথিতে পারিলাম, তাহা আর বোলে বুঝাতে হবে না। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ ও অনুভব সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করার নামই জ্ঞান। এই সকল অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবার কয়েকটী শ্রেণীর অন্তর্ভূত, দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্র বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই সমস্ত শ্রেণীকে একের অন্তর্ভূর্ত দেখ্‌তে পান। এই একজ্ঞান একবার হোলে আর কখনও অজ্ঞান আস্‌তে পাবে না। এজন্য গীতা বলেন, জ্ঞানী তিনিই, যিনি সদা সর্ব্বত্র সেই একের প্রকাশ দেখেন। এই বহুজ্ঞানের ভিতর যিনি সেই এককে দেখ্‌তে পান, 'একো বহূনাম্,' তিনিই মৃত্যুঞ্জয় হন, সুখদুঃখের পারে যান।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনে সর্ব্বত্র এই শিক্ষাই দেখা যায় যে, জ্ঞানসহায়ে কিরূপে আমরা সেই একের কাছে পৌঁছিব। সে এক যাই হোক না কেন, তাতে কি এসে যায়? যা হতে এই সব হয়েছে, সে তাই, সেখানে যেতে হবে। তাকে যাই বলনা কেন, ঈশ্বর, ভগবান, কালী, ব্রহ্ম—ঠিক বল্‌তে গেলে সে স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, ক্লীবলিঙ্গও নয়। এখন সেই একজ্ঞান লাভের উপায় কি? পরমহংসদেব বল্‌তেন, একটা বিষয়ে যদি আপনার লাভ লোক্‌সান ভুলে ষোল আনা মন ঢেলে দিতে পার, তবে সেই এক জ্ঞানে নিশ্চয় উপস্থিত হবে। সাধুই হও বা বিষয়ীই হও, যদি ষোল আনা হ'তে পার ত সেই একের

প্রকাশ দেখ্তে পাবে। স্বদেশের জন্য যদি ষোল আনা মন দিযে কেউ পাগল হতে পারে, ত সেই দেশহিতৈষিতার ভিতর দিয়ে তার নিকট সেই একের প্রকাশ হবে। বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি যে বিষয়ের চর্চ্চাই কর না যেন, যদি ষোল আনা মন দিয়ে কর ত উহাই তোমাকে সেই জ্ঞানে লয়ে যাবে। ইহা পরমহংসদেবের কথা। বড় নূতন কথা, বড় অদ্ভুত সত্য। শুন্তে যেমন সোজা, কত্তে তেমনি শক্ত। সব বিষয়েই ঐরূপ দেখি। যেটা খুব সহজ, সেটাই আবার খুব শক্ত। যেটা খুব নিকটে, সেটাই আবার খুব দূরে। গলায় হার রয়েছে, চারিদিকে খুঁজ্‌ছি, এ ভ্রম প্রায় হয়। আত্মা অত্যন্ত নিকটে কি না, তাই বুঝ্‌তে পারি না। তিনি যে আমারই ভিতর, এ কথা বিশ্বাস করি না। তাঁর দেখা পাবার জন্য পাহাড় পর্ব্বত নানাদেশ ঘুরে উপোষ কোরে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে শেষে দেখি, আমারই ভিতর তিনি। পরমহংসদেব বল্‌তেন, মানুষের মন যেন জাহাজের মাস্তুলের পাখী। কোন সময়ে একটা পাখী একখানা জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল। জাহাজ খানা চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পোড়্‌লো। পাখীটা বসে বসে বিরক্ত হয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টায় উড়্‌লো। কিন্তু চারিদিকেই জল। উড়ে উড়ে কোথাও স্থল না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে সেই মাস্তুলের উপর এসে বোস্‌লো। মানুষের মনও সেই রকম নানাদিকে নানাবিষয় অনুসন্ধান কোরে ক্লান্ত হয়ে শেষ আপনার ভিতর সেই একের দেখা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

সর্ব্বদা সকলের ভিতরে থাকৃলেও শুদ্ধ বুদ্ধির নিকট সেই একের জ্ঞান খুব কাছে। বদ্ধ জীবের জড় বুদ্ধির কাছে অনেক দূরে। জ্ঞানযোগ সাধন করা বা জীবনে পরিণত করা বড় শক্ত। অতি শুদ্ধ বুদ্ধি যাদের, তারাই পারে। বিচার কোরে কোন বিষয় ঠিক দেখে যখন উহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে কত্তে পার্ব্বে, তখনি তুমি জ্ঞানযোগ সাধন কর্ব্বার উপযুক্ত অধিকারী। মনে উঠ্‌লো, বড় লোক হবো, দেশ জুড়ে গণ্যমান্য হবো। অথচ বিচার কোরে দেখ্‌লে, এই দুদিনের জীবনে নাম যশের চেয়ে ভগবান লাভের চেষ্টাই ঠিক। কিন্তু মনকে ধোরে রাখ্‌তে না পেরে যদি তুচ্ছ ধনমানের জন্যই ছোট, তা হইলে তোমার দ্বারা জ্ঞানযোগ হবে না, তোমার অন্য রাস্তা। যে জ্ঞানযোগের সাধক, মন তার

মুটোর ভিতর, আয়ত্তের ভিতর থাকবে, যা হুকুম কর্ব্বে, তাই কর্ব্বে। ভগবান যীশু যখন নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের জন্য চল্লিশ দিন উপবাস কোরে তপস্যা করেন, তখন শয়তান প্রলোভন দেখাতে এসেছিল। ধন দেবে, মান দেবে, রাজ্যসম্পদ্ দেবে, সুন্দরী স্ত্রী দেবে ইত্যাদি বোলেছিল। তাই শুনে তিনি অমনি বলে উঠ্লেন, Get thee behind me, Satan! বাসনা শয়তান, দূর হও। আমাদের ভিতরও ঐ রকম অনবরত বাসনা উঠ্ছে। নানান্ জন্মের বাসনা সব ফুটে উঠ্ছে। আবার যখন সৎ উদ্দেশ্যে সাধারণ কল্যাণের জন্য কোন কায কত্তে যাচ্চো, তখুনি রক্তবীজের বংশের ন্যায় বাসনাসন্তান শত শত এককালে জাগরিত হয়ে ব্যাকুল কোরে তুল্ছে। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, তিনিই ঐ সব বাসনা-বীজ দেখ্তে এবং মন থেকে তাড়াতে পারেন। কিন্তু সংস্কার যদি বেশী দৃঢ় হয়, তবে আর শুধু বিচার কোরে তাড়াতে পারা যায় না। ঐ প্রকার লোকের অন্য পথ। সংস্কার অল্প হোলে বিচার কোরে মন ঠিক রাখা যেতে পারে। জ্ঞানযোগ যিনি সাধন করেন, তাঁর বাসনা তত প্রবল নয়, মন সহজেই তাদের আয়ত্ত কত্তে পারে এবং স্থির থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ জীবনে মহাজ্ঞানীর ভাব প্রতিপদে দেখ্তে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সঙ্কট স্থলেও তাঁর কি অদ্ভুত সমুদ্রবৎ স্থিরত্ব ও গাম্ভীর্য্য। ফলফুলশোভিত মধুর বৃন্দারণ্যে, শত্রুবেষ্টিত মথুরায়, রাজকুলসম্মানিত হস্তিনায়, রাগদ্বেষপূরিত রণস্থলে, পূর্ব্বস্মৃতিমুখরিত প্রভাসে এবং স্ববংশধ্বংসের সময়ও সেই স্থির, অচল, অটলভাব। যদুকুল ধ্বংশ হবার পূর্ব্বেই তিনি দেখ্লেন, কার্য্যকারণপ্রবাহের ফলস্বরূপ উহা ঘটিবেই ঘটিবে। ইহাদের কর্ম্মেই এই ভীষণ ফল প্রসব কর্ব্বে। অশেষ চেষ্টায়ও যখন ইহা ফিরিল না, তখন মহাজ্ঞানী গীতাকার স্থির হৃদয়ে আপন বংশের নিধন দর্শন কল্লেন। নিজের বংশ সাম্নে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ মন অবিচলিত হয়ে চুপ কেরে আছে। স্বামীজি বল্তেন, গীতার ভাব হচ্ছে, Intense activityর ভিতর Intense rest, অবিরাম কার্য্যের ভিতর অদ্ভুত বিশ্রাম, যোগীর অচল ভাব। গীতাসম্বন্ধে স্বামীজির এই ভাবে একখানি ছবি আঁকাবার ইচ্ছা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সারথি বেশে ঘোড়ার লাগাম ধোরে সৈন্যদলের ভিতর রথ চাল্লাচ্ছিলেন, এমন সময় বিষাদাভিভূত অর্জ্জুন লড়াই কোর্ব্বোনা বলাতে এক হাতে

তেজীয়ান ঘোড়াকে টেনে আয়ত্তে রেখেছেন আর অর্জ্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। শরীরের দ্বারা ঘোটক সংযম রূপ মহা আয়াস কল্লেও মনের অনন্ত প্রশান্তভাবের জন্য মুখে যোগীর ছবি আঁকা রয়েছে। ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের ভিতরও তাঁহার মনের এই অপরূপ প্রশান্ত ভাব আঁকাবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে কত রাজা মহারাজা মর্‌বে, কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় তার কিছুই ঠিক নাই, সকলেই অস্থির, আত্মাহারা, পাগল, কিন্তু তিনি স্থির, অটল, অচল হোয়ে অপরের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সকল কায চালাচ্ছেন আবার সেই সময়েই যোগের অতি গূঢ় বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। এই স্থিরতা প্রত্যেক মানবের শিক্ষা করা চাই। কায কত্তে কত্তে আমাদের ভিতর কাযের মত্ততা এসে যায়। সেইটেই খারাপ। তখন আমরা কায না চালিয়ে কায আমাদের চালায়, ইন্দ্রিয় আমাদের চালায়। প্রভু দাসপদে নত হয়, অহঙ্কৃত দাস প্রভুর প্রতি যা ইচ্ছা ব্যবহার করে। এই জীবনসংগ্রামে, কার্য্যক্ষেত্রে সেই জন্য সর্ব্বদা স্থির থাকৃতে হবে। এই জন্যই গীতার শিক্ষা, শুধু সন্ন্যাসীর জন্য নয়, সংসারীর জন্যও নয়, কিন্তু সকল দেশের, সকল কালের, সকল লোকের জন্যই প্রযুক্ত। এই জন্যই গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। কেন না, উপনিষদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিশেষত্বই উহাদের সার্ব্বজনীন উদারতা, সকল প্রকার অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া উপনিষদের ঋষি আবার মুক্তকণ্ঠে প্রচার কচ্ছেন, 'মানুষ, তুমি অমৃতের অধিকারী, অমৃতই তোমার স্বরূপ, তুমি ভ্রমে পড়ে আপনাকে আর্য্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি যাই মনে কর না কেন, কিছুই তোমায় বাঁধ্‌তে পারে না। তুমি স্বাধীন, স্বাধীন, চিরস্বাধীন।' এই অপূর্ব্ব উদারতা গীতার মধ্যে দেখেই মাহাত্ম্যকার লিখিয়াছেন, সমস্ত উপনিষৎ মন্থন কোরে গীতার উৎপত্তি হয়েছে।

জীবন সংগ্রামের এই মত্ততার ভিতর, এই যোগীর স্থিরতা আমাদের আনা চাই। কার্য্য কত্তে গেলেই যে একটা Reaction বা প্রতিক্রিয়া আসে, তার হাত থেকে বাঁচ্‌তে শেখা চাই। তবেই তোমার দ্বারা যথার্থ বড় কায হবে, তবেই তুমি ঠিক মানুষ নামের যোগ্য হবে। ফলাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত এই কর্ম্মমত্ততা কত সময় কত যে বিষময় ফল প্রসব করে, তাহা আর দেখিয়ে দিতে হবে না। ব্যবসা বাণিজ্যে লোক্‌সান

দিয়ে কত লোক হতাশ সাগরে ডোবে, আর উঠ্‌তে পারে না; পাশ করার মত্ততায় পোড়ে কত ছেলেই না একেবারে চিররোগী হয়ে পড়ে! আবার অশেষ চেষ্টায়ও পাশ না কোত্তে পেরে ছাত্রদের মধ্যে সময়ে সময়ে আত্মহত্যার অভিনয়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই মত্ততার ভিতর স্থিরতা আন্‌তে শেখা সকলেরই প্রয়োজন, বিশেষতঃ সংসারী লোকের। কারণ, তাহার পক্ষে সাংসারিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, এবং কর্ম্মের ভিতর এই স্থিরতা আন্‌তে পাল্লে উদ্যমের কিছুমাত্র হ্রাস যে হবে, তাহা নয়, এ কথা গীতাকারের নিজ জীবনেই সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবনের সহিত গীতার শিক্ষা মিলিয়ে নাও, দেখ্‌বে, ইহাতেও এতটুকু অনৈক্য নাই। স্বার্থের জন্য কর্ম্ম না কল্লেও তাঁর একার কর্ম্ম-উদ্যম অসংখ্য লোকের উদ্যমের চাইতে অধিক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের খেলার ভিতর দেখ, মথুরার এবং দ্বারকায় রাজসম্পদের ভিতর দেখ, যদুবংশ ধ্বংসের সময় দেখ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ, সব যায়গায় অপূর্ব্বকার্য্যের মত্ততার ভিতর তাঁর হৃদয়ে এই অদ্ভুত স্থিরতা ও শান্তি দেখ্‌তে পাবে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজাকে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। দুর্য্যোধন ভাবিল, একা শ্রীকৃষ্ণকে দলে না পেলাম, তাহাতে কি? তাঁর একার উদ্যম কিছু আর একাদশ অক্ষৌহিণী লোকের উদ্যমের সহিত সমান হবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ঠিক তার বিপরীত। তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায়, বিপদ্‌কালে তাঁর অনন্ত উপায়উদ্ভাবনী শক্তি, ঘোর নিরাশ অন্ধকারে তাঁর প্রাণসঞ্চারিণী অগ্নিময়ী বাণী, আবার মৃত্যুর ছায়ার ভিতর, স্বপক্ষের পরাজয়ের ভিতর, তাঁর অপূর্ব্ব অনবসাদ ও চিত্তপ্রসন্নতা, এই সমস্ত গুণ তাঁকে একাদশ অক্ষৌহিণী কেন, ভারতসমরে সমাগত উভয় পক্ষীয় সমস্ত বীরের সহিত সমতুল্য করেছিল।

জ্ঞানযোগের সার কথা এই। জ্ঞানযোগের সাধন হচ্ছে, 'নেতি নেতি' বিচার অর্থাৎ যাহা একত্বে লয়ে যাবার পথে অন্তরায়, তাহা বিচারপূর্ব্বক একবারে পরিত্যাগ করা। জ্ঞানযোগ শুনে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, 'জ্ঞানী হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তার লক্ষণ, চালচলন, আচার ব্যবহার

ইত্যাদি কিরূপ হয়?' এই খরস্রোত কর্ম্ম প্রবাহের ভিতর যিনি সর্ব্বদা নিজ জীবনে স্থিরভাব রাখ্‌তে পেরেছেন, তাঁর Expression অর্থাৎ ভাষা, চালচলন এবং অপরের সহিত ব্যবহার কেমন হয়? সিদ্ধপুরুষেরা যেমন ভাবে সংসারে কাযকর্ম্ম কোরে গেছেন, সেই সকল আমাদের শিক্ষার জন্য গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাঁদের চালচলন দেখে আমরা শিখ্‌বো কি করে? আমরা জড়বুদ্ধি, কর্ম্মফল-প্রত্যাশী, কামকাঞ্চনলুব্ধ জীব, আমাদের জীবনে তাঁদের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য ত নাই? নাই সত্য, কিন্তু সেই প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য, সেই প্রকার বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ উদ্যম জীবনে না আন্‌তে পার্লে উন্নতির আশা কোথায়? আবার আমাদের ভিতর যারা গুরু উপদেশে বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন চালাতে চেষ্টা কচ্ছে, কর্ম্মাবর্ত্তে পড়ে অনেক সময় তারা কি কর্ব্বে, কিছু ঠিক কত্তে পারে না। অথবা সেই পথে চল্‌তে চল্‌তে নব নব ভাব ও অনুভব জীবনে উপস্থিত হয়, সেগুলি ঠিক কি না, এ সন্দেহে তাদের মন ব্যাকুল হয়, তখন এই সকল জগদ্‌গুরুর পদ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবনের অনুভবের সহিত নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি মিলিয়ে পেলে সংশয় সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। সেই জন্য শাস্ত্র বলেন, সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরে সাধক নিজ জীবনে আন্‌বার চেষ্টা কোর্‌বে। এইই তার পক্ষে প্রধান সাধন।

সাধকের নিজ জীবনের উপলব্ধির সহিত গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মিলিলে সে অনুভবে আর ভুল নাই, একথাও ধারণা কোত্তে শাস্ত্র বলেন। শুক-দেব আজন্ম জ্ঞানী হোয়েও যত দিন না নিজের উপলব্ধ জ্ঞান গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যের সহিত মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁর নিজের অনুভব ঠিক কি না, এইরূপ সন্দেহের হাতে মধ্যে মধ্যে পড়্‌-তেন এবং মহর্ষি ব্যাসকে এই সন্দেহ দূর কর্‌বার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস দেখ্‌লেন, আমি শুকের বাপ, আমার কথা সে বাল্যাবধি শুনে আস্‌ছে, তাতেও যখন সন্দেহ যায় নাই, তখন ইহার অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভেবে চিন্তে তিনি শুককে রাজর্ষি জনকের নিকট গিয়ে তাঁকে গুরু স্বীকার কোরে উপদেশ নিতে বল্লেন। জনকের বাড়ীতে গিয়ে শুককে সাতদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়েছিল, কেউ খোঁজখবর

লয় নাই। এইরূপ অবজ্ঞাতেও তাঁর চিত্তে রাগদ্বেষাদির উদয় হোলো না। পরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে রাজর্ষি জনক তাঁর অশেষ মান্য ও অদ্ভুত সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। এইরূপ সম্মানেও শুক তাঁর উদ্দেশ্য ভুল্‌লেন না। তখন জনক তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের সমতা ও অবিচলতা বুঝিয়ে দিলেন। জনকের কথাতে বাপের কাছে যে সব শাস্ত্র পড়েছেন, সে সব শিক্ষার আর নিজের উপলব্ধির একতা শুক যখন মিলিয়ে পেলেন, তখন তাঁর সকল সন্দেহ দূর হয়ে মনে শান্তির উদয় হোলো।

জ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে গীতা এখন কি বলেন, তাই দেখা যাক।

প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

সকল বাসনা ছেড়ে যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট হয়ে আছেন, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে আয়ত্তাধীন কোরেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশ না হয়ে ইন্দ্রিয়গণকে আপন উদ্দেশ্য লাভের জন্য খাটিয়ে নেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। জ্ঞানী পুরুষ আমাদের মতনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কায কর্ম্ম করেন, কিন্তু কখনও আপনার উদ্দেশ্য ভোলেন না। ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁর চাকর এবং তিনি তাদের প্রভু, একথা সর্ব্বদা মনে রাখেন। আমরা ঐ কথাটা কেবল ভুলে যাই। তাই ইন্দ্রিয় যে দিকে চালায়, সেই দিকে ছুটি। উপনিষদ্ বলেন, আত্মা যেন রথী, এই শরীররূপ রথে আরোহণ কোরে রয়েছেন, ইন্দ্রিয় সেই রথের ঘোড়া এবং মন সেই ঘোড়ার লাগাম। বুদ্ধি সারথি সেই লাগাম ধোরে ঘোড়াগুলোকে রূপ রসাদি বিষয়ের পথ দিয়ে জ্ঞান ও শান্তিরূপ লক্ষ্য স্থানের দিকে চালাচ্ছে। শিক্ষার গুণে সারথির নিজের মাথার ঠিক থাক্‌লে ঐ সব পাগ্‌লা ঘোড়াদের ঐরূপ দুর্গম পথের ভিতর দিয়েও ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। আর তা না হলে ঘোড়াগুলো রাশ না মেনে কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে নিয়ে যায়। কখন বা গাড়ীখান উল্‌টেও দেয়। শুদ্ধ বুদ্ধি ঘোড়া চালিয়ে গন্তব্যস্থলে ঠিক উপস্থিত হয়। কিন্তু কামকাঞ্চনবদ্ধদৃষ্টি মলিন বিষয়-বুদ্ধি ঘোড়ার বশীভূত হয়ে পড়ে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হয়।

জ্ঞানীর অপর এক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি সুখদুঃখ উভয় অবস্থাতেই স্থির থাক্‌বেন। আমরা স্বার্থপর, নিজেদের সুখের জন্য লালায়িত। এতটুকু দুঃখ উপস্থিত হলে একেবারে আত্মহারা হই; ইচ্ছায় নিজেকে

বিপদ্‌গ্রস্ত কোবে পরের কাযে লাওয়া তো দূবের কথা। ঘরের পাশে প্লেগ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এই যে দেশে এত দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, আমবা তার কি কচ্ছি? ইহা যদি ইউবোপের কোন স্থানে হোতো, তো দেশেব সমস্ত লোক একেবারে খেপে উঠ্‌তো। বোল্‌তো, কেন দুর্ভিক্ষ হবে? কেন আমার দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মর্ব্বে? তারা জীবন উৎসর্গ কোর্ত্তো উহা দূর কর্ব্বার জন্য। আমরা এ বিষয়ে জড়, মহাতমোগুণী; কার্য্যে একেবাবে অলস। ডিগ্‌বি সাহেব লিখ্‌-ছেন, বিগত ১০৭ বৎসরের লড়াইয়ে পৃথিবীব ভিতর যত লোক মরেছে, এই ভারতবর্ষে তার ৪গুণ অধিক লোক মবেছে গত ১৯ বৎসবেব দুর্ভিক্ষে। কি ভীষণ ব্যাপার! আমবা আবার চেঁচাই, বড়াই করি,— আমাদেব বাপ দাদা পৃথিবীতে ভারি বড লোক ছিল। তারা বড় লোক থাক্‌লেও তোমাব কায দেখে তোমাকে ত সে বংশের সন্তান বোলে বোধ হয় না; তুমি কি কোচ্চো, তা একবাব ভেবে দেখ দেখি। তুমি, 'আমি ব্রাহ্মণ, জগতের পূজ্য' বোল্লে কি হবে? যে সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সে ভাব যে একেবারে লোপ হয়ে মহা জড়ত্ব আস্‌তে বসেছে। আব এই মলিনমুখ, ছিন্নবস্ত্র, ভারতেব শ্রমজীবী, যাদেব শূদ্র বোলে চিরকাল পায়ে দলেছ, অথচ যাদের পরিশ্রম, যাদের অধ্যবসায়, যাদেব শিল্পনৈপুণ্যেব জোরে ভারত আজও বিখ্যাত, যাদেব বংশধরেদেব নিকট হতে কব আদায কোরে এখনও দেশে স্কুল, কলেজ এবং তোমাদেব ছেলেদেব শিক্ষাব বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাদেব দিকে এখনও কি তোমবা ফিরে চাও, আপনাব বোলে দেখে তাদের দুঃখে একবারও কি দুঃখিত হও? এই জাতীয় পাপেব ফলেই আজ দেশেব এই শোচ-নীয় অবনতি। আমবা বুঝি আব নাই বুঝি, কর্ম্মফলদাতা কর্ম্মের ফল দেবেনই দেবেন। ভাবেব ঘবে চুবী হলে এইরূপই হয়ে থাকে। আমরা মুখে বলি, সর্ব্বঘটে নারায়ণ আর সকল স্ত্রীতে দেবী জগদম্বাব আবির্ভাব। কিন্তু কার্য্যকালে ও বেটা চাষা, ও বেটা চাঁডাল, ওকে ছুঁলে নাইতে হবে, ওব দৃষ্টিতে আমাব ভাত নষ্ট হবে, ওব ছায়া মাড়ালে আমি অপ-বিত্র হব। এই মুখে একখানা, পেটে একখানা, কখনও কাহাবও চেষ্টায় যদি দেশ হতে দূব হয়, ত তা ছাত্রদেব দ্বারাই হবে। ছাত্রেরা এখন থেকে শাস্ত্রকথিত এই সকল সত্য হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা কোরে যদি প্রাণপণে

দেশের এই অজ্ঞান দূর কর্‌বার চেষ্টা করে, তবেই হবে।

জ্ঞানীর লক্ষণে গীতা পুনরায় বল্‌ছেন ;—'বীতরাগভয়ক্রোধঃ।' আমি একটা জিনিষ লাভ কত্তে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা কচ্ছি। এমন সময় আর কেহ বা কিছু মাঝে এসে সেই পথের অন্তরায় বা বাধা হোলো। তখন তার প্রতি মনে যে ভাব ওঠে, সেইটের নাম ক্রোধ। আর কোন কিছু লাভ কর্‌বার অতীব আগ্রহের নামই রাগ বা কাম। এই কাম ক্রোধ যার নাই, তার কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে না। আমরা যে কাযই করি না কেন, যদি আসক্ত না হয়ে করি, তা হলে উহাই আমাদের এক জ্ঞানে লয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাব, ধ্যান জপাদির ন্যায় প্রতিদিন করণীয় সাধারণ কায সকলও তখন যোগীর লক্ষ্য এক জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আসক্তি আস্‌তে দেওয়া হবে না। উচ্চ উদ্দেশ্যে সব কায কত্তে হবে, অথচ স্থির থাক্‌তে হবে। জ্ঞানী পুরুষ যে সব কায করেন, স্বার্থপ্রসূত কাম ক্রোধাদির বশে করেন না। অতএব ইন্দ্রিয় জয় করা, স্বার্থপর কামনা বাসনা ত্যাগ করা আর সুখ বা দুঃখে অবিচলিত থেকে উদ্দেশ্যে স্থির থাকাই জ্ঞান-লাভের উপায়।

তার পর গীতাকার জ্ঞানের মহিমা বল্‌ছেন,

'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥'

হে পার্থ, ইহারই নাম ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির রাখা। একবার এইভাব জীবনে এলে আর শোকমোহাদি এসে কষ্ট দিতে পারে না। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও একবার এইভাব ঠিক ঠিক এলে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ হয়। অতএব যদি জ্ঞানী হও, নেতি নেতি কোরে সব ছেড়ে দাও। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কোরে কায কত্তে হয়—কোরো। যদি সত্যের উদ্দেশ্যে সব ছাড়্‌তে না পার, তবে তোমার পথ কর্ম্মযোগ। বল্‌তে পার, কর্ম্ম ত সকলে কচ্ছে। তা কোরে জ্ঞান লাভ কি কোরে হবে? তা নয়। আপনার ভোগ সুখাদির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হাজার হাজার বৎসর কল্লেও উহা কখন আমাদের এক জ্ঞানে লয়ে যাবে না। যেমন শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি সাধারণ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, পশু ও নরে সমান ভাবে আছে, সেইরূপ আপন সুখের জন্য কৃত কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্ম নহে।

ঐ প্রকার কর্ম্মও 'সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।' ঐরূপ কর্ম্ম বন্ধনের উপর বন্ধনই আনিয়া দেয়। অতএব প্রকৃত কর্ম্ম কর্ব্বার কৌশল জানা চাই। নতুবা আমরা সকলেই ত কর্ম্ম কচ্ছি। চুপ কোরে থাক্‌বার ত কারো যো নাই। জড়ের ভিতর, চেতনের ভিতর, সকলের ভিতরেই কর্ম্মকৃত এই অবিরাম গতি চলেছে। মনের ভিতর, বুদ্ধির ভিতরও সেই গতি সর্ব্বদা ছুটছে।

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।'

সকলেই আপনার আপনার স্বভাব নিহিত গুণের বশে অবশ হোয়ে কর্ম্ম কর্‌ছে। যার কাম বেশী, সে কামের চেষ্টায় ফির্‌ছে। যার ক্রোধ বেশী, সে তার দাস হয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে। যার লোভ বেশী, সে নিত্য নূতন জিনিষের পেছনে ছুটোছুটি কোরে হায়রাণ হচ্ছে। আবার যার সাধু-তায় হৃদয় পূর্ণ, সেও সৎকাযের অনুষ্ঠানে জীবন কাটাচ্চে। এইরূপে কর্ম্ম সমস্ত জগৎ ব্যেপে অধিকার স্থাপন কোরে রয়েছে। প্রত্যেক অণুর ভিতরে, রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুক্ষণ চোলেছে। ইহাও কর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। তোমার মনের ভিতর যেমন সর্ব্বদা কায চোলেছে, ওদের ভিতরও তেমনি। অতএব কায কোচ্চো বলেই যে একত্ব লাভ কোর্ব্বে, তা নয়। 'কর্ম্মযোগেন যোগিনাং।' যোগের আশ্রয় লয়ে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে হবে, তবেই হয়। এমন ভাবে সকল কায কত্তে হবে, যাতে সেই এক জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। গীতা বল্‌ছেন, কায কখন ছেড়োনা। কিন্তু এমন কৌশলে কর, যাতে তোমায় কাম-কাঞ্চনে না বাঁধ্‌তে পারে।

গীতাতে কর্ম্ম করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথা বলা হচ্ছে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন কি, এক একবার মনে হয়, কর্ম্ম করা যে উচিত, এবং যতক্ষণ শরীর থাক্‌বে, ততক্ষণ সকল-কেই যে কোন না কোন ভাবে কর্ম্ম কত্তে হবে, এ সব ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এর উপর গীতাকার এত কথা কেন বল্‌ছেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গীতা উপদেশের পূর্ব্বাবধি ভারতে দর্শনের চর্চ্চা অত্যধিক হয়েছিল। দর্শনের নানা মত লয়ে নানা সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছিল। দর্শনচর্চ্চার ফলে ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন অন্তবিশিষ্ট, নামরূপ বা দেশ কাল ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের গণ্ডীর বাহিরে মনের যাবার শক্তি নাই

এবং কোন কালে যেতেও পার্‌বে না। মনের এই সসীম স্বভাব সম্বন্ধে সকল দর্শনকারই একমত ছিলেন। অতএব তাঁদের সকলের অনুসন্ধানের এই এক উদ্দেশ্যই হয়েছিল যে, মানুষ কি কোরে এই সসীম মনের পারে গিয়ে অনন্ত সত্যের অধিকারী হতে পারে। মন যখন সীমাবদ্ধ, কখন অনন্তকে ধর্‌তে পার্‌বে না, তখন সম্পূর্ণ রূপে মন স্থির কোরে বোসে থাকা, সত্য লাভ কর্‌বার ইহাই একমাত্র উপায় বোলে প্রচারও হয়েছিল। ঐরূপ প্রচারের ফলে অপর সাধারণ লোকেরাও বুঝুক আর নাই বুঝুক, সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ মনকে যথার্থ স্থির কোরে নিলেন, কিন্তু জড়-দর্শী অপর সাধারণ কেবল মাত্র বাহিরে কার্য্য ছাড়্‌লো, কেহ কেহ বা নাম মাত্র সন্ন্যাসী হোলো। সাধারণের সেই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যই গীতাকারের কর্ম্ম করা উচিত কি না, এই বিষয় লয়ে এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই জন্যই তাঁর যথার্থ কর্ম্মই বা কি, কেমন কোরেই বা কোত্তে পারা যায়, এবং যথার্থ কর্ম্মরহিত হয়ে সকল বন্ধন হতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হওয়াই বা কি, ইহা বোঝাবার এত চেষ্টা। সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের অনেক স্থলে কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে, একথা সবিস্তার বুঝিয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

শ্রীম—কথিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ ঠাকুর ১২ নং মল্লিক ষ্ট্রীট, বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। মাড়োয়ারি ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। দুই দিন হইল শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম—কথিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য এক টাকা, ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বাবু শান্তিরাম ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গে আনন্দ করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন আবার ভক্তসঙ্গে সিঁতি ব্রাহ্ম সমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন!

আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপদ্ দ্বিতীয়া তিথি। বড়বাজারে এখনও দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

আন্দাজ বেলা ৩ টার সময় মাষ্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তেলধুতি কিনিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সেই গুলি কিনিয়াছেন। কাগজে মোড়া, একহাতে আছে। মল্লিক ষ্ট্রীটে দুইজনে পৌঁছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী জমা হইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছে না। গাড়ীর ভিতরে বাবুরাম, রাম চক্রবর্ত্তী। ঠাকুর গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মাড়োয়ারিদের বাটীতে পৌঁছিয়া দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপরতলায় উঠিলেন। মাড়োয়ারিরাও আসিয়া তাঁহাকে একটী তেতলার ঘরে বসাইল।

ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে—ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্যে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন।

একজন মাড়োয়ারি আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, থাক্, থাক্। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটু কর। প্রত্যেক কথাটীতে করুণামাখা।

মাষ্টারকে বলিলেন, স্কুলের কি—

মাষ্টার। আজ্ঞে, ছুটি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কাল আবার অধর সেনের ওখানে চণ্ডীর গান হবে।

মাড়োয়ারি ভক্ত গৃহস্বামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতে লাগিল।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের কামনা]

অবতার বিষয়ক কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।

পণ্ডিতজী। পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অবতার প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্য হন, আর দ্বিতীয়, দুষ্টের দমনের জন্য। জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কিন্তু সব কামনা যায় নাই। আমার ভক্তি-কামনা আছে।

এই সময় পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

[ভাব, ভক্তি, প্রেম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি)। আচ্ছা জী! ভাব কাকে বলে আর ভক্তি কাকে বলে?

পণ্ডিতজী। ঈশ্বরকে চিন্তা কোরে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম ভাব, যেমন সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা জী, প্রেম কাকে বলে?

পণ্ডিতজী হিন্দীতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দীতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ এক রকম বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীব প্রতি)। না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে, জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা পর্য্যন্তও ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

পণ্ডিতজী। আজ্ঞে হাঁ, যেমন মাতাল হলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা জী, কারুব ভক্তি হয়, কারুব আবার হয় না, এর মানে কি?

পণ্ডিতজী। ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায়, সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়।

পণ্ডিতজী হিন্দীতে এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিলেন।

[সমাধিতত্ত্ব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি।

পণ্ডিতজী। সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প আর নির্ব্বিকল্প। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, 'তদাকারকারিত।' ধ্যাতা, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। আর চেতন সমাধি ও জড় সমাধি। নারদ, শুকদেব এঁদের চেতন সমাধি। কেমন জী?

পণ্ডিতজী। আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর জী, উন্মনা সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী?

পণ্ডিতজী চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা জী, জপ তপ কল্লে তো সিদ্ধাই হতে পারে,—যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া।

পণ্ডিতজী। আজ্ঞে তা হয়, ভক্ত কিন্তু তা চায় না।

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর পণ্ডিতজী বলিলেন, আমি একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন কত্তে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, তোমার ছেলেটী বেশ।

পণ্ডিতজী। আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্চে, আর এক ঢেউ আস্‌ছে। সবই অনিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ভিতরে সার আছে।

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন; বলিলেন, পূজা কত্তে তা হলে যাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আরে বৈঠো, বৈঠো।

পণ্ডিতজী আবার বসিলেন।

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন। পণ্ডিতজী হিন্দীতে ঠাকুরের সহিত ঐ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, হাঁ, ও এক রকম তপস্যা বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু—কেবল দেহের দিকে মন।

পণ্ডিতজী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূজা করিতে যাইবেন।

ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু ন্যায়, বেদান্ত, আর আর দর্শন পড়্‌লে শ্রীমদ্ভাগবত বেশ বোঝা যায়। কেমন?

পুত্র। হ্যাঁ মহারাজ। সাংখ্যদর্শন পড়া বড দরকার।

এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল।

ঠাকুর তাকিয়ায় একটু হ্যালান দিয়া শুইলেন। পণ্ডিতজীর পুত্র মেজেতে উপবিষ্ট। ভক্ত কয়টীও বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া শুইয়া গান ধরিলেন।

গান।

হরিসে লাগি রহরে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।
তেরা বিগড়ী বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই,
শুগা পড়াযকে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই।
দৌলত ছুনিয়া মাল থাজানা, বেনিয়া বয়েল চরাই,
আউর একদিন আন পড়েগা খোঁজ খবর না পাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[অবতার কি এখন নাই ?]

গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মাড়োয়ারি ভক্ত, ঠাকুরকে বড ভক্তি করেন। পণ্ডিতজীর ছেলেটী বসিয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাণিনি ব্যাকরণ কি এদেশে পড়া হয় ?'

মাষ্টার। আজ্ঞে, পাণিনি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, আর ন্যায়, বেদান্ত এ সব পড়া হয় ?

গৃহস্বামী ও সব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

গৃহস্বামী। মহারাজ, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর নামগুণ কীর্তন। সাধুসঙ্গ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।

গৃহস্বামী। আজ্ঞে, এই আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কত আছে ? আট আনা ?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে, তা আপনি জানেন। মহাত্মার দয়া না হলে কিছু হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই খানে সন্তোষ কল্লে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। মহাত্মার হৃদয়ে তিনিই আছেন তো।

গৃহস্বামী। তাঁকে পেলে তো আর কথাই থাকে না। তাঁকে যদি কেউ পায়, তবে আর সব ছাড়ে। টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু সাধন দরকার করে। সাধন কত্তে কত্তে ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। মাটীর অনেক নীচে যদি কলসী করা ধন থাকে, আর যদি কেউ সেই ধন চায়, তা হলে পরিশ্রম কোরে খুঁড়ে যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্তু অনেক খোঁড়ার পর কলসীর গায় যখন কোদাল লেগে ঠং কোরে ওঠে, তখনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং করবে, ততই আনন্দ। রামকে ডেকে যাও; তাঁর চিন্তা কর। তিনিই সব যোগাড় কোরে দেবেন।

গৃহস্বামী। মহারাজ, আপনিই রাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী হয়?

গৃহস্বামী। মহাত্মাদের ভিতরই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না! আর এখন অবতার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন ক'রে জান্‌লে, অবতার নাই?

গৃহস্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন কত্তে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কল্লেন আর বল্লেন, আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি কোরে পবিত্র হবো? আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখ্‌লেন, ঋষিরা আহার ত্যাগ কোরে অনেকে পোড়ে আছেন, রামের বনবাস শুনে অবধি। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকে জানেন নাই।

গৃহস্বামী। আপনিও সেই রাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম! রাম। ও কথা বল্‌তে নেই।

এই বলিয়া ঠাকুর হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন,—

"ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসেরা।" আমি তোমাদের দাস। সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন্তু হয়েছেন।

গৃহস্বামী। মহারাজ, আমরা তো তা জানি না,—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি জান আর না জান, তুমি রাম।

গৃহস্বামী। আপনার রাগদ্বেষ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? যে গাড়োয়ান কল্‌কাতায় আস্‌বার কথা ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল আর এলো না। তার উপর ত খুব চটে গিছ্‌লুম। কিন্তু ভারি খারাপ লোক, দেখনা, কত কষ্ট দিলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[অন্নকূট মহোৎসব মধ্যে।]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে মাড়োয়ারি ভক্তেরা বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীময়ূরমুকুটধারীর আজ মহোৎসব। ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। দর্শন করিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন। ময়ূরমুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিলেন।

বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ হইলেন। হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বাসুদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন।'

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাবিষ্ট হইলেন। রামচক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল।

এ দিকে মাড়োয়ারি ভক্তেরা সিংহাসনস্থ ময়ূরমুকুটধারী বিগ্রহকে বাহিরে লইয়া যাইতে আসিলেন। বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে। যখন মহানন্দে মাড়োয়ারি ভক্তেরা সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠাকুরও সঙ্গে যাইতেছেন। ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের সময় মাড়োয়ারি ভক্তেরা কাপড়ের আড়াল করিলেন। ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতে লাগিল। ঐ ছাদের উপরেই ঠাকু-

বের সম্মুখে এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে মাড়োয়াবিরা খাইতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইলেন।

[রাজপথে 'দেওয়ালী' দৃশ্য মধ্যে]

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, 'আমরা না হয় গাড়ী থেকে নামি, গাড়ী পেছন দিয়ে ঘুরে যাক।' রাস্তা দিয়া একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালারা গর্ত্তের ন্যায় একটী ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিলেন, কি কষ্ট, এইটুকুর ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকে। সংসারীদের কি স্বভাব। ঐতেই আবার আনন্দময় হোয়ে আছে!

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, মাষ্টার, রাম চাটুর্য্যে। ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন।

একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাষ্টারকে বলিলেন, কি গো, পয়সা আছে? গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারি ধুম। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু আলোয় আলোময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী চিৎপুর রোডে পড়িল। সে স্থানেও আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় লোকে লোকাকীর্ণ। লোকে হাঁ করিয়া দুই পার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণি শ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রে স্থিত নানাবিধ মিষ্টান্নে সুশোভিত, কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ী একটী আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর ও ভক্তেরা শুম্ভ ও নিশুম্ভের ছবি দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোসনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—আরো এগিয়ে দেখ আরো এগিয়ে। ও বলিতে বলিতে হাসি

তেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে, এগিয়ে পড় না; কি কচ্ছিস্?

['এগিয়ে পড়্।']

ভক্তেরা হাঁসিতে লাগিলেন, বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড, নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়া বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি, আবার এগিয়ে দেখে, সোণার খনি; শেষে দেখে, হীরা-মাণিক!

তাই ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, এগিয়ে পড়্, এগিয়ে পড়্। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। দুই-খানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সঞ্চয়।]

মাষ্টার। আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না হয় এখন থাক, দুই খানাই নিয়ে যাও।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণীপাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বল্লুম, আমার সঙ্গে কোনও জিনিষ দিওনা। সঞ্চয় করবার জো নাই।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, তার আর কি। এ সাদা দুখানা এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। আমার মনে একটা কিছু হওয়া তোমাদের ভাল না।—এতো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বোল্‌বো।

মাষ্টার (বিনীত ভাবে)। যে আজ্ঞে।

গাড়ী একটী দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল, সেখানে কল্‌কে বিক্রী হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামচাটুর্য্যের প্রতি)। রাম, এক পয়সা কল্‌কে কিনে নও না।

[ভক্ত ও 'কাঞ্চন।']

ঠাকুর একটী ভক্তের কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাকে বল্লুম, কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস্। তা বলে কি জান? আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া লাগ্‌বে, কে যায়! * বেণী পালের বাগানে কাল গিছ্‌লো, সেখানে আবার আচার্য্যগিরি কল্লে। কেউ বলে নাই, আপনিই গায়—যেন লোকে জানুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। (মাষ্টারের প্রতি)। হ্যাঁগা একি বল দেখি, বলে, এক আনা আবার খরচ লাগ্‌বে!

মাড়োয়ারি ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এ যা দেখ্‌লে, বৃন্দাবনেও তাই। রাখালরা † বৃন্দাবনে এইসব দেখ্‌ছে। তবে সেখানে অন্নকূট আরও উঁচু; লোকজনও অনেক, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আছে, এই সব প্রভেদ।

[সনাতন ধর্ম্ম।]

"কিন্তু খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ! যথার্থ হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম্ম।—ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখ্‌লে! আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

"হিন্দুধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম্ম দেখ্‌ছো, এ সব তাঁর ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাক্‌বে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদের চরণে ভ্যো নমঃ।"

মাষ্টার বাড়ী প্রত্যাগমন করিবেন। ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া শোভাবাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে যাইতেছেন।

---

* তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা ছিল।

† রাখাল তখন বৃন্দাবনে।

হিমালয়ে কেদারনাথ।

বৈশাখ মাস—কলিকাতায় গ্রীষ্মের উত্তাপ দিন দিন যেমন বৃদ্ধি, প্লেগেরও তদ্রূপ সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভাব। বাৎসরিক প্রবেশিকা, এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ও গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ। এই অবসরে আমরা ৭ জন—অধিকাংশই শিক্ষার্থী—কেদারনাথ দর্শনার্থ ১৬ই বৈশাখ সন্ধ্যার সময় হাবড়া হইতে যাত্রা করি। স্থির হইয়াছিল, হরিদ্বার পথে না যাইয়া আলামোড়া হইয়া কেদার যাইতে হইবে, সুতরাং আমরা কাটগুদামের টিকিট কিনিলাম।

রেল পথে দেশ ভ্রমণের উপকার ও শিক্ষা—কিছুই লাভ হয় না। রাত্রে দশটার সময় গাড়ী চড়িয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, আমরা জন্মভূমি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর বেহারে আসিয়া উপস্থিত। এখন আর সে পুষ্করিণীবহুল, জঙ্গলময় লতা-গুল্ম-বেষ্টিত—পাদদেশ অগণন ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ-রাজি, বংশদণ্ডগঠিতদেহ তৃণ-আচ্ছাদিত কুটীর, বিস্তৃত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দেখা যায় না। বেহারের আচার, প্রকৃতি, ভাষা, পরিচ্ছদও বিভিন্ন। কিন্তু পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনায় এই সকল পরিবর্ত্তন তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কোথায় আজ পশুরক্তপ্লাবিত রাজগৃহের যজ্ঞভূমি, যাহা বজ্রনির্ঘোষে বিকম্পিত করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচারিত হইয়াছিল! কোথায় সেই ভারতের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোকের পাটলিপুত্র, যাহার মন্ত্রণাগারের রাজশাসন মধ্য ভারতের যবন রাজকুল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত! যে বিদ্যামন্দির জ্ঞানালোকচ্ছটায় অর্দ্ধ পৃথিবী সমুজ্জ্বল করিয়া বিদেশীয় সুধীমণ্ডলির তীর্থস্বরূপ হইয়াছিল, সেই নলন্দার বিহার কোথায়! বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র, ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ, মগধের গৌরব স্মৃতি আজ বিচিত্র মন্দিরাদির ধ্বংসাবশিষ্ট মৃৎপ্রস্তরস্তূপের নিম্নে সমাধিস্থ!

বেলা প্রায় দশটা; আমরা বাঙ্গালার এলাকা ছাড়াইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রবেশ করিলাম। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলে উঠিতে না উঠিতে গাড়ী ডাফরিন ব্রিজে উপস্থিত। আমাদের বামদিকে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন নগরী, হিন্দুর প্রধান তীর্থ বারাণসী। নিম্নে পবিত্রসলিলা

গঙ্গা তরতর শব্দে প্রবাহিতা। তট হইতে দীর্ঘ সোপান শ্রেণী ; তাহার উপর বিচিত্র সুন্দর সৌধাবলী : মাঝে মাঝে উচ্চ মন্দির চূড়া, আর সেই আকাশস্পর্শী বেণীমাধবের ধ্বজা, যেন চিত্রপটে অঙ্কিত। কাশীধামে সে দিন বিশ্রামার্থ অবতরণ করিয়া রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে অতিথি হইলাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কতিপয় ভক্তের আন্তরিক যত্নে ও অমানুষী পরিশ্রমে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। অসহায় দরিদ্র পীড়িতের চিকিৎসা ও সেবা ইহার উদ্দেশ্য। দেখিলাম, নানা পীড়াগ্রস্ত ৬৭টি রোগী আশ্রমে রহিয়াছে। দশাশ্বমেধে স্নান এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আমরা বারাণসী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। হিন্দুর সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের চিরসাক্ষী, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগত্রয়ের জীবন্ত ইতিহাস, বারাণসীর অন্তর্নিহিত রত্নরাশি আমাদের চক্ষে লুক্কায়িত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যভাণ্ডার পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমাচল, চিরতুষারাবৃত হিমাচলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলী, সেই শৈলশৃঙ্গে তুষারধবল কেদারনাথের পবিত্র মন্দির, আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল। আমরা পরদিবস যাত্রা করিলাম। সায়ংকালে অযোধ্যা নগরীর সম্মুখে উপস্থিত। যাঁহার গুণগানে বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি, যাঁহার নরলীলা হিন্দু সংসারের আদর্শ, যাঁহার রাজ্যশাসন যজ্ঞে জনক নন্দিনী আহুতি, যাঁহার "দোসর ন কোই" সেই সীতাপতি রামচন্দ্রের অযোধ্যা। সবই গিয়াছে, কিন্তু এ অতীতের স্মরণেও আমাদের মঙ্গল। আমরা সেরাত্রি গাড়িতে থাকিয়া প্রাতে বেরিলি পৌঁছিলাম। এখন অযোধ্যা পার হইয়া রোহিলখণ্ডে আসিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোহিলা নামক একদল আফগান এই স্থানে আসিয়া বাস করে, তাহাদের নাম হইতেই এই স্থানের নাম রোহিলখণ্ড। ইহারা সুশ্রী, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, মোগল রাজ্যের অধঃপতন সময়ে ইহাদের প্রতাপ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, ভূমি বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা, ফলশালী বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ। বেরিলিতে গাড়ী বদল হয়। রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেল কোম্পানির গাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, ইঞ্জিন খানির গঠনও বিভিন্ন, ইহাতে কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহার। আমরা কুমায়ুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কাটগুদাম পৌঁছিবার ৯।১০ মাইল বাকি আছে, দূরে ঘন কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া দুর্ভেদ্য আকাশস্পর্শী প্রাচীরাকার কি যেন

দেখা গেল। যত দূর দেখ, সেই ঘন কৃষ্ণ মেঘ শ্রেণী দিগন্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যতই অগ্রসর হই, মেঘশ্রেণী ততই নিকটতর, কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে। অঙ্গসৌষ্ঠব ক্রমেই স্ফুটতর, নিবিড় হরিৎ পত্রমণ্ডিত তরুকুলসমাচ্ছাদিত; সেই পাদপ শ্রেণী ভেদ করিয়া কত শত নিঝরিণীর বক্ররেখা কৃষ্ণ প্রস্তর রাশি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টিপথে প্রকাশিত। রেলগাড়ী কাটগুদামে পৌছিল; আমরা হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত। পবিত্র ভারতের শিরোভূষণ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়; হিন্দুর চক্ষে হিমালয় জীবন্ত, হিমালয় দেবতা, হিন্দুর পরমারাধ্যা মহা শক্তির পিতৃগৃহ। হিন্দুর ভোগ, হিন্দুর যোগ, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর মোক্ষ, হিন্দুর হিন্দুত্বের কারণ এই হিমালয়। যে সিন্ধু সরস্বতী, যে গঙ্গা যমুনা আর্য্যাবর্ত্তকে "সোণার ভারত" করিয়াছে, হিমালয়ের চির তুষারে তাহাদের উৎপত্তি। হিমালয়ের শান্তিময় ক্রোড়ে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রেমাস্বাদনে, মহান্ গাম্ভীর্য্যের উদ্বোধনে যে আর্য্য প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল, ভারত তাহারই গৌরবে গৌরবান্বিত। যোগীঋষি-আকাঙ্ক্ষিত, দেবগন্ধর্ব্বপরিসেবিত হিমালয় আমাদের সম্মুখে। মহিমা দর্শনের চক্ষু কোথায়? কাটগুদামে সন্ধ্যা হইল, যে দিকে চাই, উচ্চ গিরিশ্রেণী নীরবে দাঁড়াইয়া। মস্তকের উপর নীলআকাশ, ক্রমে অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইতেছে। আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া নব দর্শনের চিন্তাসুখ অনুভব করিতেছি, সহসা চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে পাখী সকল ডাকিয়া উঠিল, চাহিয়া দেখি, পাহাড়ের পশ্চাৎ হইতে চাঁদ উঠিয়াছে। উপত্যকা ভূমি জ্যোৎস্নালোকে সমুজ্জল। চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণসুখকর নানা পশু পক্ষীর রব স্তব্ধ করিয়া ব্যাঘ্রগর্জ্জনবৎ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। শুনিলাম, ইহা এক প্রকার হরিণের (Barking deer) ডাক।

কাটগুদাম হইতে আরম্ভ করিয়া পদব্রজে নাইনিতাল, রামগড়, আলমোড়া হইয়া কেদার দর্শনে অগ্রসর হইলাম। আলমোড়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত চড়াই করিয়া উচ্চ উচ্চতর পর্ব্বত শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, চারিদিকে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গশ্রেণী, যেন ভীষণ তরঙ্গসমাকুল মহোদধি কোন অগস্ত্যশাপে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। বহুনিম্নে অতিক্রান্ত পর্ব্বত মালা শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় দেখাইতেছে, গিরিগাত্রে কত প্রস্রবণ ক্ষীণ রজতশুভ্র রেখায় প্রবাহিনী।

আম্র, বট, অশ্বথ, দেবদারু প্রভৃতি উষ্ণ সমতলের বৃক্ষাদি আর দেখা যায় না। এখন কেবল ঝাউ, পাইন, বিশাল ওকের রাজ্য ; খোবানি, ষ্ট্রবেরি, আপেল, পিচ এবং ন্যাসপাতির অরণ্য। কোথাও স্বভাবের স্বহস্তরোপিত বন্য চামেলি ক্ষেত্র, কোথাও গিরিগা[illegible] [illegible] করিয়া ধবল [illegible]পমালায় আপাদমস্তক মণ্ডিত পার্বতীয় গো[illegible] নন্দন কানন, কোথাও শোভাময়ী লোহিত পুষ্পগুচ্ছে নম্রশির যোজনব্যাপী রডডেন-ড্রনের উপবন। স্বভাবের বিচিত্রতা ও নবীনত্বে মনে দিব্যভাবের আবেশ হয়, যেন কোন অভিনব লোকে বিচরণ করিতেছি। দূরে সংসারের কোলাহল, এক মহান নীরব রাজ্য, প্রকৃতি শান্তিময়ী, সৌন্দর্য্যের মোহিনী মূর্ত্তি আত্মহারা করিয়া দেয়, প্রাণ দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই মাধুর্য্যে মিশিতে চায়। আমার দরিদ্র ভাষা কি করিয়া প্রকাশ করিবে ?

এই পার্ব্বতীয় প্রদেশ কুমায়ুনের মধ্যে। অধিবাসীদিগকে পাহাড়িয়া বলে। ইহারা দরিদ্র, কৃষিকার্য্য প্রধান উপজীবিকা। স্ত্রী পুরুষে পরিশ্রমী। স্ত্রীলোকেরা চাষবাস দেখে, পুরুষেরা সামান্য ব্যবসা বা কুলি-বৃত্তি করে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বেনিয়া দুই শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গৌরবর্ণ, সুশ্রী, দৃঢকায়, শান্তস্বভাব, আর্য্যরক্তে ইহাদের উদ্ভব। স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, যেন দেবী মূর্ত্তি। এই সকল পার্ব্বতীয় ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, চাল, মুগ, কলাই, আলু, খোবানি, ন্যাসপাতি, পিচ প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এখানে দুগ্ধ ঘৃত দধি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সরিষার তৈল, কেরোসিন ও চিনি নীচে হইতে আমদানি হইয়া থাকে। কুমায়ুনের মধ্যে রামগড়ের পার্ব্বতীয় দৃশ্য অতি মনোহর। বিখ্যাত নাইনিতাল আলু এই স্থানে উৎপন্ন। এখানকার গভর্ণমেণ্টের কার-খানায় পাইনের নির্য্যাস হইতে টারপিন তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিবিড় জঙ্গলের একটি বৃক্ষ কাটিবার কাহারও সাধ্য নাই। ধন্য ইংরাজের রাজশক্তি ! কুমায়ুন অতিক্রম করিয়া গাড়োয়াল যাইতে নিম্ন উপত্যকা ভূমি পার হইতে হয়। ওক, রডডেনড্রন, পাইনের শীতল সীমা হইতে নামিয়া চিরপরিচিত আম্র, অশ্বথাদি আবার দেখিতে পাইলাম। এই উপত্যকা হিমালয়কে দুই সমান্তরাল পর্ব্বত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ শৈল মালার উচ্চতা কোথাও ৫।৬০০০ ফিটের অধিক নয়। দারজিলিং, সিমলা, নাইনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি

এই অংশেই নির্ম্মিত। উপত্যকার উত্তরস্থ গিরিশ্রেণী মুকুটস্বরূপে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গাবলি ধারণ করিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের নদ নদী ইহার চিরতুষারক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা কুশিনদী পার হইয়া গাড়োয়ালের পার্ব্বতীয় ভূমি আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। স্থানে স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে এই প্রদেশে সমৃদ্ধ জনপদের অভাব ছিল না। বর্ত্তমান অধিবাসী গাড়োয়ালীরা গুর্খাদিগের ন্যায় খর্ব্বকায়, আর্য্য ও তাতার মিশ্রণে উৎপন্ন। অধিকাংশই কৃষিজীবী। নদীজলপ্রপাত অবলম্বনে জাঁতাকল চালাইয়া শস্যাদি পেষণ করিয়া থাকে। কুমায়ুনিদিগের মত ইহারাও ব্রাহ্মণ ও বণিক দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রাচীন কাল হইতে এই পর্ব্বতমালার সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রকায় ছাগল পৃষ্ঠে ভারত ও মধ্য আসিয়ার পণ্যদ্রব্য বিনিময় হইত। সুধুই কি পণ্যদ্রব্য? ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম এই পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূর চীন জাপান প্লাবিত করিয়াছিল। আমাদের ও অসুর তাতার সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিল। যতই উচ্চে উঠি, শৈত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাইন ওক উইলো মণ্ডিত শৃঙ্গাবলী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গাথা গান করিল। কিন্তু এ প্রকৃতি সুন্দর গম্ভীর। দূরে ধবল তুষারাচ্ছাদিত মহোচ্চশৃঙ্গশ্রেণী অনন্তের প্রতিবিম্ব, পার্শ্বে ধীর গম্ভীর হর হর শব্দে প্রবাহিতা অদম্য বেগবতী ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনীকুল। পবনহিল্লোলে বিকম্পিত বৃক্ষপত্ররাশি হইতে সেই হর হর হর হর ধ্বনি। এক মহান অস্তিত্বের ছায়া যেন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ হর হর হর হর শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা গন্তব্যস্থানে উপনীত। বিবিধ রাগরঞ্জিত ভাবরসোন্মত্তকারী বিচিত্রতা অপহৃত, প্রকৃতির ললিত ভৈরব সঙ্গীতধারা নীরব। ধবল হিমাচল শির, স্রোতহীন ধবল কঠিন নির্ঝরিণীপ্রপাত, ধবলসলিলা মন্দাকিনীর ধীর প্রবাহ, ধবল চূড়া কেদারনাথের চন্দ্রমন্দির। বহুরূপা প্রকৃতি আর নাই, দেশ কাল পরিপূর্ণ করিয়া সত্যং শিবং অদ্বৈতম বিরাজিত।—

(এক) রূপ অরূপনামহীন, অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথা।

* * * *

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুন অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়া দল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা নিরন্তর;
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ্মনসোগোচর বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

আমরা হিমালয়ে কেদারনাথ দর্শন করিয়া ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখী হইলাম। দেশবৎসল কতিপয় মহানুভবের সাহায্যে, ভারতহিতার্থ অর্পিতজীবন সিষ্টার নিবেদিতার উদ্যোগে, ও শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দের আশ্রয়ে, আমরা কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক হিমালয় দর্শনে বহির্গত হই। দেড় মাসকাল পদব্রজে এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, দুর্ব্বল, শ্রমকাতর, আত্মনির্ভরহীন, কল্পনাপ্রিয়, বাঙ্গালি বালকেতে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে।

আমাদের নিঃস্বার্থ সাহায্যকারী মহাত্মাগণের শুভ ইচ্ছা আমরা কতদূর পূর্ণ করিয়াছি, বলিতে পারি না। ভরসা করি, আমাদের অগ্রণী ছাত্রবর্গ ভবিষ্যতে তাঁহাদের আশা সফল করিবেন।

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ
বাগবাজার।

শিবস্তোত্রম্।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

ওঁ নমঃ শিবায়।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ।
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্।
সুবিমলগগনাভে ঈশসংস্থেঽপ্যনীশে।
মম ভবতু ভবেঽস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ॥ ১॥

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় রূপ অঙ্কুর সমূহ অনন্ত মহিমারূপে যাঁহার উপর কল্পিত হয়, মেঘলেশপরিশূন্য অখণ্ড আকাশেই যাঁহার স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়, সৃষ্টিরূপে স্রষ্টার উপর অবস্থিত হইলেও, যিনি স্বরূপতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া এক এবং অদ্বিতীয়, সেই নিখিল ভূতের জন্মদাতা ভবের প্রতিই আমার সমুজ্জ্বল ভক্তিবন্ধন চিরকাল বর্ত্তমান থাকুক। ১।

নিহতনিখিলমোহেঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরমপ্রেম্ণা মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণযতি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্॥ ২॥

যাঁহাতে সমুদয় মোহ নাশ পাইয়াছে, জগতের ঈশ্বরত্ব যাঁহাব উপর সংস্থাপিত, যিনি (সমুদ্র মন্থন কালে ত্রিলোক রক্ষাকবতঃ) আপনার পরমপ্রেমরূপতার পরিচয় দিয়া দেবদেব মহাদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, যিনি স্বীয় প্রেমময় বিগ্রহ দ্বারা জীবনিবহকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদেব হৃদয়াভ্যন্তরেই বিশ্বলীলার বিকাশ করিতেছেন, সেই পরম পুরুষের সর্ব্বব্যাপিত্ব কেবল ছলনা মাত্র, অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিলে জীবহৃদয়ের বহির্ভাগে তিনি অবস্থিত, এরূপ কল্পনা করিতে হয়, প্রত্যুত এই জগৎ নিখিল জীবের হৃদয় মধ্যেই নিহিত আছে, তাহার বাহিবে নাই॥ ২॥

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ
প্রমথতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্ম্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্॥ ৩॥

যাহাতে পূর্ব্ব সংস্কার রূপা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে, ঘূর্ণিত তরঙ্গমালার ন্যায় যাহাতে বিচিত্র শক্তি সবেগে সংঘৃষ্ট হইতেছে, "তুমি, আমি" ইত্যাকার দ্বন্দ্বসমূহ যাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, সেই শান্তমূর্ত্তি শিবে সংস্থাপিত নিরতিশয় অস্বাভাবিক, অশান্ত চিত্তকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপো যত্র একো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্ ॥ ৪ ॥

যাঁহাতে পিতা পুত্ররূপ ভাব, নির্ম্মল বৃত্তি সমূহ, অগণন বহুবিধরূপ নিহিত আছে, তাঁহার একভাবই সত্য (একমেবাদ্বিতীয়ং)। প্রকৃতির বিকার জন্য সৃষ্টিরূপ প্রবল বায়ু শান্ত হইলে যাঁহাতে আর অন্তর্ বহির্ ইত্যাকার ভেদ থাকে না, সেই চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ রূপ অজ্ঞান-হর হরের পূজা করি ॥ ৪ ॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহা হইতে অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, যিনি শুভ্রজ্যোতিঃ রূপে প্রকাশমান, যাঁহার শোভা শ্বেত পদ্মের ন্যায় মনোহারিণী, জ্ঞানরাশিই যাঁহার অট্টহাস্য স্বরূপ, যোগিহৃদয়ের ভিতর দিয়া যাঁহার নিকট গমন করিতে হয়, যিনি নিরন্তর নিজ অখণ্ড রূপের ধ্যানে মগ্ন, যিনি আমার মনঃসরোবরের রাজহংসস্বরূপ, আমি তাঁহার প্রণত দাস, তিনি আমায় রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।
পরহিতকরণায় প্রাণবিচ্ছেদসুৎকং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ ৬ ॥

যিনি দুষ্কৃত নাশে বিশেষ পটু, দাক্ষায়ণী সতী যাঁহার গুণভিন্ন কখনও দোষ দর্শন করেন নাই, যিনি (সর্ব্বসংহারক) বিষরূপ কলঙ্ক ধারণ করিতেছেন, যিনি মনোহর কহ্লার কুসুমের ন্যায় কান্তিমান, যিনি পর-

হিতানুষ্ঠানের জন্য নিজ প্রাণদান করিতে নিত্য সমুৎসুক, প্রণত ভক্তগণের উপর যাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্থাপিত, আমরা সেই নীলকণ্ঠকে প্রণাম করি॥ ৬॥

স্বামীজির কথা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত)

১। ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?

ভক্তি তোমার ভিতরেই আছে, কেবল তাহার উপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পোড়ে রয়েছে, উহা সরিয়ে ফেল্‌লেই ভক্তি আপনা আপনি প্রকাশ হবে।

২। জিব চল্‌লেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চল্‌বে।

৩। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কর্ম্মযোগের উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

৪। ধর্ম্ম একটা কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ জিনিষ। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বইপড়া পণ্ডিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৫। এক সময়ে স্বামীজি কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করেন, তাহাতে তাঁহার নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিন্তু সে আপনাকে মানে না,' তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমাকে মান্‌তে হবে, এমন কিছু লেখা পড়া আছে? সে ভাল কায কচ্চে, এই সে প্রশংসার পাত্র।

৬। আসল ধর্ম্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখা পড়ার প্রবেশের কোন অধিকার নেই।

৭। কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন কোরে সিদ্ধ হও, তার পর কর্ম্ম কর্‌বার অধিকার, কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম কত্তে হবে, এর সামঞ্জস্য কোথায়?

তোমরা দুটো জিনিষ গোল কোরে ফেল্‌ছো। কর্ম্ম মানে এক জীবসেবা আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া কার

অধিকার নাই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা কত্তে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্চে।

৮। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর যেদিন থেকে বড় লোককে খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতনের আরম্ভ।

৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যেরূপ ভাবের (Feelings) বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

১০। অসৎ কর্ম্ম কত্তে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সাম্‌নে কর্ব্বে।

১১। গোঁড়ামী দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম্ম প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়া একটা উচ্চপথে তুলিয়া দেওয়াতে দেরী হইলেও পাকা ধর্ম্ম প্রচার হয়।

১২। সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

১৩। সাধুসঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তেই হয়ে যাবে।

১৪। গুরুর আশীর্ব্বাদে শিষ্য না পোড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

১৫। গুরু কাকে বলা যায়? যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বোলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

১৬। আচার্য্য যে সে হতে পারে না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার সমুদয় জগৎ স্বপ্নবোধ, কিন্তু আচার্য্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাক্‌তে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হোলো, তবে তিনি ত সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্য্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্য্যদেব শরীরে ব্যাধি আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে উহা তার মনকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, সে পড়ে যায়। আচার্য্য যে সে হতে পারে না।

১৭। এমন সময় আস্‌বে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝ্‌তে পার্বে।

নমো বিবেকানন্দায়।

তর্পণ।

আজি সেইদিন, যে দিনে আমার
প্রাণের দেবতা চলিয়া গেছে।
আজি চতুর্দ্দশী, সেই মহানিশি
এখন (ও) আঁধারে ছাইয়া আছে।

ঘন অন্ধকার, চৌদিকে আঁধার
ঘোর তমিস্রায় ধরণী ঘেরা।
নিশি তমোময়ী, নীরব অবনী
শুধু ঝিল্লীরবে প্রকৃতি ভরা।

এমন আঁধারে, এমন নিশায়
কারা ওরা আসে নদীর পারে ?
ভাগীরথীবক্ষে ক্ষুদ্র নৌকা ধায়
কি সংবাদ লয়ে, জানাতে কারে ?

পরদিন প্রাতে শুনিল জগত
নিদারুণ সেই নিঠুর বাণী।
আনন্দের হাট ভাঙ্গিল রে আজ।
শুনিল কাঁদিল জগত প্রাণী।

শেলসম বিদ্ধ হৃদয়ে আমার
কারে জানাইব মরম কথা,
বুক চিরে গেছে, শুধু প্রাণ আছে,
গায়িতে তাঁহার (ই) পবিত্র গাথা !

জগতের গেছে, কাঁদুক জগত,
তাহাতে আমার কি ক্ষতি হবে।
সহায় ভরসা নাহিক আমার
তিনি ছাড়া কেহ বিপুল ভবে !

ভিখারীর ধন করিল হরণ,
ওরে তোরা কেউ দিলিনা বাধা।
আমরা মানব, স্বর্গদেব সব
তাদেরও কি আজ লাগিল ধাঁধাঁ।

জানি স্বার্থপর এ জগতে সবে,
চাহিব না কিছু কাহার(ও) কাছে,
গুরুদেব মম, প্রাণের ঈশ্বর
কাঁদিয়া ধাইব তাঁহার(ই) পাছে।

এস এস দেব। হে আনন্দময়!
একবার মোরে দেখিয়া যাও।
বৎসরেক পরে সে পবিত্র স্মৃতি
অভাগার হৃদে জাগায়ে দাও।

প্রতিভা প্রদীপ্ত বদনমণ্ডল
রঞ্জিত ধর্ম্মের অরুণ রাগে।
জ্ঞানবিস্ফারিত নয়ন যুগল
কে আর ধরিবে নয়ন আগে।

কূট নীতিদলে পদেতে দলিয়া
প্রচারি সত্যের সুনীতি রাশি
ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা ঘোষিয়া
কে আর সমুখে দাঁড়াবে আসি।

নূতন আলোকে করি আলোকিত,
দেখাইলে জীবে নূতন পথ।
অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান করি প্রচারিত,
বুঝাইলে সেই পুরাণ মত।

মহাজড়বাদী আজি এ জগতে,
নূতন নূতন সকলে চায়।
একটু নূতন পাইলে কোথাও
উন্মাদের মত নাচিয়া ধায়।

মানব মনের নিগূঢ় বুঝিয়া
প্রচারিলে তুমি সে সব কথা,
নূতন রচিয়া নূতন ভাবেতে,
ঋষিরা গায়িল যে সব গাথা।

আপন জীবন করিয়া অর্পণ
যুঝি জগতের কাঠিন্য সনে,
বুঝেছিলে তুমি সুখ দুখ মিছা;
শুধু অজ্ঞানতা মানব মনে।

সুখ দুখ বলি' নাহি কিছু হেথা,
যাহা লয়ে ব্যস্ত মানব মন,
দ্বারে দ্বারে ফিরি বুঝাতে সে কথা,
তাই করেছিলে জীবন পণ।

শুধু অজ্ঞানতা, অবিদ্যা আশ্রয়,
তাই গো জগত লাঞ্ছনাময়।
(তাই) প্রেমানন্দময় প্রেমের সংসারে,
জগতের জীব প্রসন্ন নয়।

নাশিতে আঁধার আসিলে আবার,
বিলাইতে জ্ঞান রতন ধন।
বস্তুজ্ঞান দিয়া, দুখ বিমোচিয়া,
তুলিয়া ধরিতে পতিত জন।

সদা সন্ত্রাসিত অজ্ঞান মানবে
  দিয়াছিলে তুমি অভয় বাণী।
"তত্ত্বমসি" শুনি তড়িৎ প্রবাহে,
  দাঁড়ায়ে উঠিল পতিত প্রাণী।

"একা মাত্র আমি এ মহা জগতে
  আর কেবা আছে আমার পরে"
এই মহাসত্য দ্বারে দ্বারে গিয়া,
  কে আব জানাবে জীবেরে ধরে!

পব পর বলি নাই যে গো কেহ
  সকল (ই) আনন্দময়ের ছবি।
তাই পরসেবা, দিলে মহামন্ত্র,
  যাতে ফুটে উঠে প্রাণের রবি।

তাই সেবাশ্রম অনাথ আগার
  তাই দুর্ভিক্ষের মোচনে আশ।
তাই অদ্বৈতের মহিমা ঘোষিতে
  চারিদিকে আজি "অদ্বৈত বাদ"!

তাই সিন্ধুতীরে, ভূধর শিখরে,
  দ্বীপ দ্বীপান্তরে, নূতন কথা।
কুমার সন্ন্যাসী ধায় উপবাসী,
  দিতে জনে জনে নূতন গাথা!

তাই উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ ভুবন,
  প্রবুদ্ধ ভারত জাগায় সবে,
তাই ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মের মহিমা
  প্রচারে জগতে মহান্ রবে।

চিকাগোর সেই ধরম সভায়
　　হয়েছিল যেই শঙ্খের ধ্বনি,
আজ(ও) চারিদিকে বাজে মোর কাণে
　　সে অপূর্ব্ব শুভ শিবের বাণী! *

বেদান্তের কথা হৃদে হৃদে গাঁথা,
　　বেদান্তের প্রাণে প্রাণিত তুমি ;
বেদান্তের সেই পূর্ণ অবতার
　　"রামকৃষ্ণ" ছিল তোমার স্বামী।

"দাও দাও দাও ফিরে নাহি চাও"
　　এই মহামন্ত্র দিয়াছ জীবে,
"চূর্ণ স্বার্থমান, হৃদয় শ্মশান,
　　তবেত তাহাতে নাচিবে শিবে"!

ব্রত ত্যাগ জপ তপস্যা কঠোর
　　করি, জেনেছিলে জীবনে সার,—
প্রেম নামে তরি করে পারাপার,
　　প্রেম বিনা কিছু নাহিক আর!

তাই যাচি ভিক্ষা, দাও জ্ঞান দাও,
　　প্রেম-শতদল ফুটুক হৃদে!
আত্মপর ভুলে, ডুবে যাই আমি
　　প্রেমের পবিত্র আনন্দ-হ্রদে!

বৎসরেক পরে করিনু তর্পণ,
　　দীনহীন আমি নাই ক জ্ঞান।
দয়া করি তুমি লহ লহ দেব!
　　প্রেমহীন দেয় প্রাণের দান।

আষাঢ় কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।　　শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত।

যোগের দুচারিটী কথা।

(স্বামী বেদানন্দ)

একদিন চাণ্ডকাপালিক মহাযোগী ঘেরণ্ড সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধন কি, কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। অনন্তর ঘেরণ্ড যোগিরাট্ বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্নে আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, যত্ন-পূর্ব্বক ইহার উত্তর আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই স্থূলশরীরের নাম অন্নময় কোষ। উহা মাতৃগর্ভে মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির সারাংশের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর নিজভুক্ত অন্নাদি দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। এই হেতু অন্নপ্রচুর এই শরীরকে অন্নময় কোষ বলা হয়। কোষ বলিবার উদ্দেশ্য এই, যেমন অসিকে আবরণ করে বলিয়া সেই আবরক বস্তু কোষশব্দবাচ্য, তদ্রূপ এই স্থূলশরীরও আত্মার আবরণ স্বরূপ। এই শরীর তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান সাধন। যে হেতু স্থূল শরীর না থাকিলে সূক্ষ্ম শরীরস্থ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকরী হয় না। বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

যোগ দুই প্রকার,—হঠযোগ + ও রাজযোগ। প্রথমতঃ হঠযোগ দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তির শরীর শোধন করা আবশ্যক। অনন্তর শরীর শোধন হইলে রাজযোগ অবলম্বন করত দীর্ঘকাল নিরন্তর বিবেক-জ্ঞানের আশ্রয় লইলে জীব মুক্ত হয়। অতএব অগ্রে হঠযোগ শ্রবণ কর। 'আসনেন রুজং হন্তি প্রাণায়ামেন পাতকং' অর্থাৎ আসনের দ্বারা রোগ বিনষ্ট হয়

---

* প্রাপ্ত। প্রাপ্ত প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

ইতি উঃ সং।

+ প্রবন্ধলেখক হঠযোগ সম্বন্ধেই অধিক কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিবার প্রণালী দেখিয়া বোধ হয়, তিনি এই যোগ সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগে হঠযোগের প্রকৃত অধিকারী ও প্রকৃত গুরু উভয় পাওয়াই দুষ্কর। কেহ কেহ বিনা উপদেশে, কেহ বা অসিদ্ধ গুরুর উপদেশে হঠযোগের দু একটী ক্রিয়া অভ্যাস করিতে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আর অনেকেই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া আজীবন দেহটাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহাও দেখা যাইতেছে। অতএব সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে উদ্দেশ্য লাভের জন্য ভক্তি সহকৃত রাজযোগ অর্থাৎ ভক্তির সহিত ভগবানের নাম জপ ও ধ্যান ধারণাই যে সমীচীন মার্গ, ইহা কালানুগত এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ সম্মত।

ইতি উঃ সং।

এবং প্রাণায়ামের দ্বারা পাপ নাশ হয়। যোগাভ্যাসে উপযুক্ত স্থান কালাদির আবশ্যক।

যোগের উপযোগী স্থান কিরূপ? রাজধানী কিম্বা ঘোর অরণ্য-মধ্যে যোগস্থান হইতে পারে না। রাজধানীতে বহুলোকের সমাগম নিবন্ধন যোগী যোগভ্রষ্ট হয়। ঘোর অরণ্যে রক্ষকের অভাব বশতঃ নানা বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী এবং পুত্রকলত্রাদি সমীপে মনস্থির এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া সেখানেও যোগস্থান হইতে পারে না। পুত্রকলত্রের নিকট সর্ব্বদা বাস করিলে মমতাকৃষ্ট হইয়া যোগী যোগভ্রষ্ট হন। সুশাসিত রাজ্যে, যে স্থানে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় এবং যেখানে কোন উপদ্রব নাই, এমন স্থানে যোগস্থান নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ নিরুপদ্রব স্থানে একটী কুটীর অর্থাৎ যোগগৃহ নির্ম্মাণ করিবে এবং ঐ স্থান যেন চতুর্দ্দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত থাকে। প্রাচীরের মধ্যেই যাহাতে পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা বা কূপাদি থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঐ কুটীর গোময় দ্বারা বিশিষ্ট রূপে লেপন করা আবশ্যক। তাহাতে ঐ কুটীর কীটবর্জ্জিত হইবে।

ঐ কুটীরের মধ্যে প্রথমে কুশাসন, তদুপরি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা মৃগচর্ম্ম, তদুপরি বিশুদ্ধ বস্ত্রাসন বিস্তৃত করিয়া যোগী পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ যোগ আরম্ভ করিবে। সমতল বিশুদ্ধ ভূমিতে এই আসন করিতে হইবে। উন্নত-অবনত স্থানে বা খট্টাদির উপর আসন করিবে না।

মিতাহারী না হইয়া যিনি যোগাভ্যাসের চেষ্টা করেন, তাঁহার নানা ব্যাধি উপস্থিত হইয়া যোগের বিঘ্ন জন্মায়। সুতরাং মিতাহারী হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। মিতাহার কাহাকে বলে? মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে আহার করা বা অল্প অল্প করিয়া অনেক বার আহার করার নাম মিতাহার। একবার মাত্র আহার বা উপবাস করিবে না অথবা একবার পূর্ণ আহার করিয়া পুনরায় প্রহরের মধ্যে আহার করিবে না। পূর্ণ আহার কাহাকে বলে? ক্ষুধার পরিমাণ চারিভাগ করিয়া অর্দ্ধ অন্নের ও এক চতুর্থাংশ জলের দ্বারা উদর পূরণ এবং শরীর মধ্যে সহজে বায়ু সঞ্চার করিবে বলিয়া এক চতুর্থাংশ উদর শূন্য রাখিবে।

যোগাভ্যাসী কোন্ কোন্ বস্তু আহার করিবেন? আতপ চাল, গোধূম-চূর্ণ, মুগ, বুট ও মাসকলাইএর ডাল, মানকচু, মূলা, কাঁচকলা, বেগুণ, পটোল, থোড, মোচা, এঁচোড, হিংচাশাক, বেতোশাক, পলতা, বালা-

শাক, পাটশাক, গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, নবনীত; ইক্ষুচিনি, ইক্ষুগুড় প্রভৃতি* মিষ্ট (মিছরি, বাতাসা ইত্যাদি); পক্করম্ভা, ইক্ষুদণ্ড, দ্রাক্ষা অর্থাৎ আঙ্গুর, কিসমিস, খেজুর, নারিকেল, অম্লরসবিবর্জ্জিত অন্য সমস্ত সুস্বাদু ফল, এলাচি, জাতিফল, লবঙ্গ, হরিতকী, আমলকী, বিভিতকী, চুনবর্জ্জিত তাম্বুল, গুবাক অর্থাৎ সুপারি।

যোগাভ্যাসীর নিম্নলিখিত বস্তুগুলি আহার নিষিদ্ধ যথা,—তৈল, লবণ, কটু, তিক্ত, সকল প্রকার তীব্রগুণযুক্ত দ্রব্য, সকল প্রকার ভর্জ্জিতদ্রব্য, ঘোল, ছানা, দধি, মদ্য, মাংস, মৎস্য, সরিসা, :তাল, বেল, আম্র, পাকা কাঁটাল ইত্যাদি।

বহুল ভ্রমণ, স্ত্রীসেবা এবং বহ্নি সেবাও যোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

যোগী ব্যক্তির নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করাও বিধেয়। যথা,—যে বস্তু এক প্রহর হইল পাক হইয়াছে, তাহা খাইবে না। পর্য্যু-সিত (বাসী) ও অমেধ্য (অপবিত্র) বস্তুমাত্রই নিষিদ্ধ। সুস্নিগ্ধ, সুমধুর, মনো-ভিলষিত বস্তুসমূহই যোগী আহার করিবেন। যোগী সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিবেন ও বহু বাক্যালাপ, বহুলোক সংসর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন।

যোগারম্ভ করা কোন্‌কালে বিধেয়? শরৎ ও বসন্তে। অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই মাস চতুষ্টয়ই যোগারম্ভের প্রশস্ত কাল। যোগারম্ভ কালে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রতি দিন খাইতে হইবে।

আসন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তু যে যে ভাবে আপন আপন শরীর স্থির রাখিয়া বহুক্ষণ থাকিতে পারে, সে সকল-গুলিকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকা-রের আসন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যোগশাস্ত্রে পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন ও উগ্রাসন এই চারি প্রকার আসনকেই প্রশস্ত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কোন এক আসনে বহু-ক্ষণ বসিতে অভ্যাস করিবে। আসন সিদ্ধ হইলে যোগী নির্ব্যাধি হন।

শরীরস্থ ধাতু সমূহের যথাযথ বল ও সমতা সম্পাদনের নিমিত্ত হঠ-যোগীরা* কয়েক প্রকার ধৌতিক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া থাকেন। ধৌতি-ক্রিয়া সমনু ও নির্ম্মনু ভেদে দ্বিবিধ। সমনু অর্থাৎ মন্ত্রের সহিত ধৌতি-ক্রিয়ানুষ্ঠান আর মন্ত্রহীন ক্রিয়ার নামই নির্ম্মনু ধৌতি।

সমনু ধৌতি যথা,—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া ষোড়শবার প্রণবাদি মন্ত্রবিশেষ জপপূর্ব্বক বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু গ্রহণ

করিবে। অনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাসাপুট রোধ করিয়া চৌষট্টিবার মন্ত্রজপ করত কুম্ভক করিবে। পরে দ্বাত্রিংশৎ বার মন্ত্রজপ করত দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় এইরূপে বাম নাসাপুট রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিবে। কুম্ভকান্তে আবার বাম নাসাপুট দ্বারা রেচন করিবে। অভ্যাস দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ এই ক্রিয়ার এমন ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও অর্দ্ধরাত্রে বিংশতিবার করিয়া এই প্রকার অনুষ্ঠান করিলেও শরীর কিছু মাত্র অবসন্ন হইবে না বা অত্যধিক শ্রম অনুভব হইবে না। যাঁহারা একেবারে ১৬।৬৪।৩২ এই নিয়মে ক্রিয়ায় অসমর্থ, তাঁহারা ৪।১৬।৮ হইতে আরম্ভ করিতে পারেন। আলস্য-হীন হইয়া মাসত্রয় যাবৎ এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে নাড়ীশুদ্ধি হয়। নাড়ীশুদ্ধি হইলে যোগীর সমস্ত রোগ বিধ্বস্ত হইবে।

নির্ম্মনু ধৌতি যথা, বায়ুসার, জলসার, অগ্নিসার প্রভৃতি। তন্মধ্যে কলির জীবের জন্য বায়ুসার ও অগ্নিসারই প্রশস্ত। বায়ুসার ধৌতি যথা, ওষ্ঠদ্বয়কে কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া মুখ দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পান করিবে। অনন্তর উদর চালন করতঃ নাসিকার দ্বারা ঐ বায়ু ধীরে ধীরে রেচন করিবে। অগ্নিসার যথা,—নাভিকে মেরুদণ্ডে শতবার সংলগ্ন করিবে।

দেহশুদ্ধির জন্য যোগীরা আরও কয়েক প্রকার ধৌতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দন্তমূলধৌতি,—যথা, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা অথবা খদিররসের দ্বারা দন্তমূল তর্জ্জনীর দ্বারা যে পর্য্যন্ত না মল অপসারিত হয়, ততকাল মার্জ্জিত করিবে।

জিহ্বামূলধৌতি যথা,—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা জিহ্বামূল মার্জ্জন করিবে।

কর্ণরন্ধ্রধৌতি যথা,—তর্জ্জনী ও মধ্যমার দ্বারা কর্ণরন্ধ্র মার্জ্জন করিবে।

কপালরন্ধ্রধৌতি যথা,—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ দ্বারা ভ্রূদ্বয়মধ্য ও কপালরন্ধ্র মার্জ্জন করিবে।

এই চতুর্ব্বিধ ধৌতি নিদ্রান্তে এবং আহারান্তে অনুষ্ঠান করিলে যোগীর শ্লেষ্মাদোষ নিবৃত্তি হয়।

সমনু ও নির্ম্মনু এই উভয় প্রকার ধৌতির প্রভাবে যোগীর নাড়ী-শুদ্ধি হয়। নাড়ীশুদ্ধি হইলে যোগীর ঋজুকায়, সুগন্ধ, সুস্বর, সুকান্তি, বিষ্ঠামূত্রাদির অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ',—চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই যোগ। শারীরিক প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপই চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিবার পথের অন্তরায় স্বরূপ; কারণ, উহারা যোগাভ্যাসীর মনকে লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে না দিয়া শরীরেই আকর্ষণ ও নিবদ্ধ করিয়া রাখে। সে জন্য অভ্যাসকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাসকেও কুম্ভক দ্বারা রোধ করা আবশ্যক। শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধরূপ প্রাণায়াম এ জন্যই চিত্তবৃত্তিরোধকার্য্যে সহায়তা করে। এই প্রাণায়াম বহু প্রকার। প্রাণায়ামসিদ্ধ ব্যক্তির পৃথিবীতলে অসাধ্য কিছুই থাকে না। প্রাণায়ামাদি অঙ্গবিশিষ্ট যোগবলে যোগিগণ অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া গগনচরত্বাদি শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। মৃত্যুকালেও এই প্রাণায়াম দ্বারা নবদ্বার রোধ করিয়া সহস্রার ভেদ করতঃ যোগী দেবযান পথে আরোহণ করেন। প্রাণায়াম কালে শরীরকম্প, দর্দ্দুরবৎ পরিস্পন্দন এবং ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ভীত না হইয়া প্রাণায়াম সিদ্ধি সন্নিকট, ইহাই জানিতে হইবে। প্রাণায়ামের অনন্তর ধারণাধ্যান প্রভৃতি অবশিষ্ট যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান এবং দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস করিলে রাজযোগে সিদ্ধিলাভ হয়। ধারণাধ্যান প্রভৃতি অঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য, —মনকে এক বিষয়ে স্থির ও অবিচলিত রাখা। স্থির বিশুদ্ধ মনই রাজযোগ অভ্যাসের একমাত্র অধিকারী। রাজযোগকে রাজবিদ্যাও বলা হয়, কারণ, কেবল মাত্র ঐ যোগের অনুষ্ঠানেই জীবের দেহাত্মবুদ্ধি এককালে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয় এবং ঐ যোগ সিদ্ধি লাভ করিলেই তাহা হইতে আর অধিকতর উৎকৃষ্ট লভ্য বস্তু নাই, ইহা নিশ্চয় অনুভূত হয়। রাজযোগে সিদ্ধি লাভ করিলে পুত্রমরণাদি দারুণ দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের এককালে নাশ হয়।

রাজযোগী উক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাব হন। শাস্ত্র বলেন, অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এই যোগ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে যোগ অবলম্বনে পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি, ভগবৎপ্রাপ্তি, পরমানন্দরূপে অবস্থিতি এবং জরাব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে চিরমুক্তি হয়, তাহা ভিন্ন মনুষ্যের আর কি কর্ত্তব্য হইতে পারে? ভাবিয়া

দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, জরামৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত এই শরীর অনিত্য। এই অনিত্য শরীর দ্বারা যদি নিত্য পরমানন্দরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ক্ষণপ্রীতিকর বিষয়ভোগ দ্বারা এই শরীরের শক্তি বৃথা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইবেন? বহ্নিতাড়িত ভস্মরাশি, শৃগাল কুকুরের উপযোগী আহার অথবা মৃত্তিকারূপে পরিণতি ভিন্ন এই শরীরের গত্যন্তর নাই, তথাচ অল্পকালস্থায়ী এই শরীরের জন্য জীবগণ মিথ্যা আচরণ, অন্যায় উপায়ে অর্থোর্জ্জন প্রভৃতি কতই না অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বারবার দেহ হইতে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু ধীমান যোগী বিষয় ভোগ করিয়া দেহে আত্ম-বুদ্ধি নিবন্ধন আবার কীট পতঙ্গাদি যোনি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি বুঝিয়াছেন, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা একমাত্র যোগাবলম্বনেই হয়। সংকল্প ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তিনিরোধ না হইলে সংকল্প ত্যাগ হয় না। চিত্তবৃত্তিনিরোধ ও সঙ্কল্পত্যাগ চিত্তের একই অবস্থা। উহাকে সন্ন্যাস বা যোগ বলে, সুতরাং যোগী ও সন্ন্যাসী একই বুঝিতে হইবে। যাঁহার হীরক, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে সমজ্ঞান হইয়াছে, যিনি অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ক্রোধ ইত্যাদি অসৎ-বৃত্তি সম্পূর্ণ রূপ দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ যোগী। যাঁহার বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি নাই, যিনি সর্ব্বসংকল্পত্যাগী এবং শত্রু ও মিত্রে তুল্যদর্শী, তাঁহারই যথার্থ যোগসিদ্ধি লাভ হইয়াছে। ইনি সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও, ধ্যানস্থ হইয়া জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের সকল বৃত্তান্ত দর্শন করিতে না পারিলেও মায়ার প্রভাব নিরস্ত করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? প্রাচীন ভারতে যোগের বহুল প্রচার এবং যোগীর সংখ্যা অনেক ছিল বলিয়াই ভারত জগতের শিরোমণি হইয়াছিল। তখন সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত থাকিতেন। আবার কি সে দিন আসিয়া যোগশক্তি প্রভাবে নির্জ্জীব ভারত সজীব হইবে? ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ও যোগ যদি আমরা সকলে যত্নে রক্ষা করি, তবেই সে দিনের পুনরায় উদয় হইবে।

জাতীয়ত্ব বোধ।

বুকার টি ওয়াসিংটন নিগ্রোবংশোদ্ভব। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে ইঁহার জন্ম। তাঁহার মাতা একজন নিগ্রো ক্রীতদাসী, পিতা আমেরিকাবাসী। ভার্জিনিয়াতে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস কর্ম্ম করিত, তাঁহার মাতা তাহাদের পাচিকা ছিল। ইঁহার পিতা, ইঁহার বা ইঁহার জননীর কোনও খবর নিতেন না। বাল্যকালে দাসত্ব অবস্থায় থাকাতে তাঁহাকেও কারখানে ছোট ছোট কাজ করিতে হইত। আইনানুসারে যখন সমস্ত নিগ্রো ক্রীতদাস স্বাধীনতা লাভ করিল, তখন ওয়াসিংটন তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মেল্‌ডন্ নামক সহরে উপস্থিত হইলেন। এখানে ওয়াসিংটন ও তাঁহার ভ্রাতা লবণের খনিতে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

লেখা পড়া শিক্ষা করিতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে সময় তথায় কোন নিগ্রোই লেখা পড়া জানিত না এবং তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার দরুণ সমস্ত দিন তাঁহাকে লবণ খনিতে কর্ম্ম করিতে হইত। অল্প দিন পরেই মেল্‌ডন্ সহরে নিগ্রোদের জন্য একটী স্কুল স্থাপিত হইল। সমস্ত দিন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় তিনি সেই স্কুলে যাইতে পারিলেন না অথচ লেখা পড়া শিখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা। রাত্রিতে মাষ্টারের নিকট যাইয়া কিছু কিছু শিখিয়া আসিতেন।

তার পর দিবাভাগে স্কুলে যাইতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকালে ৯টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ২ ঘণ্টা লবণ খনিতে কর্ম্ম করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, তিনি দিবাভাগে স্কুলে যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। অল্পদিন পরেই তিনি এক কয়লার খনিতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। একদিন কয়লার খনিতে কাজ করিতেছেন, এমন সময় অন্য দুটী লোক হ্যামপ্‌টন স্কুল সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে, শুনিতে পাইলেন। এই স্কুলটী নিগ্রোদের শিক্ষার জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্কুলের কথা শুনিবা মাত্র তথায় পড়িতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই স্কুল তাঁহাদের বাসস্থান হইতে অনেক দূরে এবং সেখানে যাইতে অনেক খরচের দরকার। ছয় মাস কয়লার খনিতে এবং দেড় বৎসর জন্য এক

জন সাহেবের বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়া তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন ও সেই সম্বলে হাম্‌প্‌টন যাত্রা করিলেন। রিচ্‌মণ্ড (Richmond) সহরে পঁহুছিতেই তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল। গভীর রাত্রি, নিগ্রো বলিয়া হোটেলে স্থান পাইলেন না, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাস্তার ধারে শুইয়া পড়িলেন।

তাহার পর দিন অনেক চেষ্টা করিয়া এক জাহাজে মাল নামাইবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিন এই কর্ম্ম করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন ও তদ্দ্বারা হাম্‌পটন পৌঁছিলেন। প্রধান শিক্ষক হঠাৎ তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন না; তিনি তাঁহাকে পাঠগৃহ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন। ওয়াসিংটন এমন নিপুণতার সহিত তাহা পরিষ্কার করিলেন যে, শিক্ষক মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। স্কুল ও বোর্ডিংএর ব্যয় ভার বহন করিবার জন্য তাঁহার হস্তে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না। সুতরাং সে স্কুলে প্রহরী ও পরিষ্কারকের (Janiter and sweeper) কর্ম্ম করিয়া কষ্টেসৃষ্টে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি এক জন গ্রাজুয়েট (Graduate) হইলেন।

স্কুলের নিয়মিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান মেল্‌ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন ইচ্ছা করিলেই শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের অধীনে উচ্চ ও মাননীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সমভাবে চলিতে পারিতেন। নীচবংশ হইতে কোন লোক গুণী ও বিদ্বান্ হইলেই উচ্চবংশ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নানা প্রকার উপাধিমণ্ডিত করিয়া নিজেদের সমকক্ষ করিয়া লন। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্ব দেশেই অল্লাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়াসিংটন স্বজাতির মূর্খতা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই সাহেবদের সমকক্ষ হইতে চাহিলেন না। যে নিগ্রো বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, এবং যাঁহাদের অন্নে তাঁহার শরীর পুষ্ট হইয়াছে, সেই সমগ্র নিগ্রো জাতিকে তিনি উন্নত ও শিক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত আত্মসুখ, আত্ম-সম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া স্বজাতিপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মেল্‌ডনে নিগ্রোদের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তিনি কখনও শিক্ষকতা কার্য্য হইতে বিরত হইতেন না। এমন কি, বিশ্রাম সময়েও আমো-

দচ্ছলে নিগ্রো বালক বালিকাদিগকে দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ শিক্ষা প্রদান করিতেন।

স্কুলে যে ভাবে পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেভাবে শিক্ষা দিলে অশিক্ষিত সাধারণ লোক শিক্ষায় উদ্যোগী হইবেন না, এই ভাবিয়া তিনি নানাবিধ গল্পচ্ছলে ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক ও উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন নিগ্রোদের মধ্যে কার্য করার পর যখন দেখিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা লাভে উৎসুক, তখন তিনি টাস্কিগী (Tuskegee) নামক সহরে একটী স্থায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, লোকে যাহাতে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যাদি শিক্ষা করিতে পারে।

আমাদের দেশে যেমন সকলেরই জন্য এক রকম শিক্ষা, ও দেশে তেমন নয়। আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ লোকেরই উদ্দেশ্য বি, এ পাশ করিয়া কেরাণি হওয়া। আমাদের শিক্ষা পুস্তক কণ্ঠস্থ মাত্র। সে শিক্ষা কার্য্যে পরিণত অল্পই হয়। বি. এ ক্লাশে আমরা কত দর্শন, বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয় আলোচনা করি। কলেজ হইতে বাহির হইয়া যখন আমরা ৫০৲ টাকা বেতনে কোন আফিসে কাজ করি, তখন সে শিক্ষার অধিকাংশই কোন প্রয়োজনে আসে কি? আমরা সকল বিদ্যাই পুস্তক সাহায্যে শিক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করি, আর পাশ্চাত্য দেশে লোকে যাহা শিক্ষা করে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। তাহার ফলও প্রত্যক্ষ। উহারাই সমস্ত ঐহিক সুখ ভোগ করতলগত করিয়া রাখিয়াছে আর আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও অন্নচিন্তায় দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত।

ওয়াসিংটনের যত্ন ও শিক্ষার সুবন্দোবস্তে ক্রমেই তাঁহার বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্কুল ও স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তিনি এই অর্থ সংগ্রহের জন্য এক সহর হইতে অপর সহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইলেন।

ওয়াসিংটনের সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। কত বার রাজ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারী হওয়ার জন্য প্রলোভিত হইয়াছিলেন। ইচ্ছা কর-

লেই স্বজাতীয় লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া একজন খুব বড় লোক হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন স্বজাতীয় লোকদের উন্নতি কল্পে উৎসর্গীকৃত, সুতরাং তিনি সমুদয় প্রলোভন অনায়াসে জয় করিলেন। এই ওয়াসিংটন এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফল স্বরূপ তাঁহার স্কুল ও নিগ্রো জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণে উন্নত হইয়াছে। এই ওয়াসিংটনের জীবন হইতে কি আমাদের কিছুই শিক্ষা করিবার নাই? আহা, কি স্বজাতীয়ত্ব বোধ! আমাদের বিদ্যার অভাব নাই। আমাদের অভাব এইটী। আমরা নীচ জাতির মধ্যে যদি কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি করি, তৎক্ষণাৎ স্বজাতীয় লোকদিগের সহিত আত্মীয়তা অস্বীকার করিতে চেষ্টিত হইয়া থাকি।

উপসংহারে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, আমরা যেন নিগ্রো জাতির আদর্শ ওয়াসিংটনের জীবন অনুকরণ করিয়া চলিতে পারি এবং তাঁহার মত যেন আমাদের স্বজাতির উন্নতি কল্পে আমাদের জীবন ও স্বার্থ-পরতা বিসর্জ্জন দিতে পারি।

[দাসত্ব হইতে উন্নতি (Up from Slavery) নামক ইংরেজী পুস্তক হইতে গৃহীত।]

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
C/o বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
২৩ ডিঃ, ১৯০০।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। "স ঈশ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ," সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয়

---

* এই পত্র দুইখানি ইংরাজীর অনুবাদ নহে। যাঁহাকে এই পত্র দুইখানি লেখা হইয়াছিল, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে ইহা উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া পরম বাধিত করিয়াছেন। এইরূপ উপদেশপূর্ণ পত্র বোধ হয়, অনেক ব্যক্তির নিকট আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকট সেইগুলি প্রেরণ করিলে পরমাদরে তাহা গৃহীত হইবে।

উদ্বঃ সং।

প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটী যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাম "সমষ্টি", এক একটী নাম "ব্যষ্টি।" তুমি আমি "ব্যষ্টি", সমাজ "সমষ্টি।" তুমি আমি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটী "ব্যষ্টি", আর এই জগৎটী "সমষ্টি"—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার নাম ইং সোসিয়ালিস্ম, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্‌ডিভিডুয়ালিস্ম।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চির-দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার, এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটী মহৎগুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটী এই যে, দুটী একটী কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অনায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকত কাষ্ঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটীর প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মমত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্ত গুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে মনুষ্যো

করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্রসুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনীশক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিষের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বলচ্ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতি নীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটী রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটী চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না, কীটটী নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে

কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত, উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারায় যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারত-ভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়?" "ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়?" চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়-হীনের ইন্দ্রিয় সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার, বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর। আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা বাল্য বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্ম্মের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরদের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্ম্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে, যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচ্‌ছে আর এক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারা গাছটীকে ঘিরে রাখ্‌তে হয়, যত্ন কর্‌তে হয়। একটীকে নিঃস্বার্থ ভাল বাস্‌তে শিখ্‌তে পার্‌লে

ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষকে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাক্‌লে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাক্‌লে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তার পর আপনা আপনি বড় আস্‌বে।

তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। "কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগ্‌লে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।" যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখ্‌তে পাব না, যখন আশাভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীরননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকসিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোক সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

তখন

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং॥

সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি) তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

---

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

দেবঘর, বৈদ্যনাথ,
৩রা জানুয়ারি, ১৮৯৮।

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি মুনি দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য সমাজে আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অতি অহিতকর উপায়ও অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্টপুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষজাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায় অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটী অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটীর এক একটী পাত্র মিলাই কঠিন, এক একজনের দুই তিনটী কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেয় না, দিলে একটী কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ বিষয়েও এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও। পাশ্চাত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটী প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটী পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটী আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কায হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম করেন, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত?

অনেকে বলেন, হাঁ, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিবান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায়, ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা, সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার অধিকার স্বাভাবিক এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের, ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায়, জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থা উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি,—"ছোট লোকেরা লেখা পড়া শিখিলে আমাদের চাকুরি কে করিবে?"

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নারীনর অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরমপুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক

নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটী বড়ই সুন্দর এবং ঐটীই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্ম্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ইচ্ছারও বিনাশ সুতরাং হইল, কারণ, বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটী ধর্ম্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সতের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে, পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল, তাহার নাশই শ্রেয়, কিন্তু মশা মার্‌তে মানুষ মরার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখনাশ কর্‌তে নিজেকেও নাশ করে ফেল্‌লুম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্নপরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্নপরিণামের ত্যাগ এবং ঐ উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐ রূপ মনবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহাই বল, মন বুদ্ধির অগো-হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়; যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়, যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এ জন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কাম ভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটীই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

গুরুমূর্ত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য। * * * *

মনুষ্যে ঈশ্বর আরোপ বড়ই মুস্কিল, কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক, তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণ মিশন্।

(কনখল)

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। জুলাইমাসে ৯১ জন সাধু ও ৭০ জন গরীব গৃহস্থ আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছেন। পাঁচজনকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। এই মাসে ৫॥৵০ নগদ এবং প্রায় ১০৷১২ টাকার চাল, আটা, ডাল, লবণ ও দুগ্ধ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। খরচ হইয়াছে ৩১॥৵০। সহৃদয় জনসাধারণের এককালীন দানের উপর এই আশ্রমের নির্ভর। অতএব যাহাতে এই সৎকার্য্য আরো উত্তমরূপে চালাইতে পারা যায়, তজ্জন্য যিনি যাহা পারেন, তাহা কনখল সেবাশ্রম কনখল পোঃ (সাহারাণপুর) ঠিকানায় স্বামী কল্যাণানন্দের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা ভারতীয় সাধুর দ্বারাই ভারতের ধর্ম্ম এখনো সজীব রহিয়াছে বলিয়া জানেন, যাঁহারা সাধুসেবাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, আশা করি, তাঁহারা কেহই যথাসাধ্য এই সাধুসেবার সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

(কলিকাতা)

(বাগবাজার লাইব্রেরি)

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাগবাজার লাইব্রেরিতে বাবু মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাগৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

(বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি)

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির কথা উদ্বোধনে পূর্ব্বেই প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহার সেবাবিভাগের কার্য্য ছাত্রবৃন্দের দ্বারা অতি উদ্যমের সহিত চলিয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতার্থ ইঁহাদের ১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আগষ্ট পর্য্যন্তের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। আশা করি, এই সদুদ্যমে বাগবাজার পল্লীনিবাসী সকল সহৃদয় ব্যক্তিই যোগদান করিয়া আপনাদের পল্লীকে কলিকাতার আদর্শস্বরূপ করিবেন এবং অন্যান্য স্থানের ছাত্রবৃন্দও ইঁহাদের সৎকার্য্যের অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত এবং দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

৬ মাসে প্রতি রবিবার বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া ৫৫॥৭ চাল সংগ্রহ হয় এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫ জনকে ৪৫।৫ চাল সাহায্য করা হয়। কতিপয় উদারচেতা মহোদয়গণ দয়াপরবশ হইয়া চালের সহিত পয়সাও দিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা চাল না দিয়া মাসিক কিছু কিছু দিয়া থাকেন। এইরূপে সমিতির তহবিলে ১৩৷৴০ জমিয়াছে। সমিতির সহকারী সম্পাদক মহাশয় হাঁড়ীক্রয়ার্থে ৭৲ এবং লোকের বাড়ী বাড়ী চাল পৌঁছিয়া দিয়া আসিবার কারণ একটী ঠেলাগাড়ীর জন্য ৩৷৴০ দিয়াছেন।

(বহুবাজার)

বহুবাজার শিবতলার কয়েক জন যুবক মিলিয়া রামকৃষ্ণ সমিতির গঠন করিয়াছেন। প্রতি পক্ষে একটী আলোচনা সভা হয়। তাহাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ কিরূপে জীবনে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার আলোচনা হইয়া থাকে।

(শালখিয়া)

হাবড়া, শালখিয়ার কয়েকজন যুবকের যত্নে রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শালখিয়ার অনাথ দরিদ্রগণের সেবাই ইহার উদ্দেশ্য।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা ভক্তিমান্ অথচ অবিধি পূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদেরও যাগফল অবশ্যম্ভাবি। কেন (এরূপ হয়? তাহা বলা যাইতেছে যে)—"দেবব্রত" দেবতাগণের প্রীতির উদ্দেশে ব্রত নিয়ম অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তি যাহারা করে, তাহাদিগকে দেবব্রত কহা যায়, যাহারা দেবব্রত, তাহারা (নিজ নিজ ইষ্ট) দেবগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা "পিতৃব্রত" শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরায়ণ, তাহারা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যাহারা ভূতগণ (অর্থাৎ) বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃষষ্ট যোগিনী প্রভৃতিকে উপাসনা করে, তাহারাও ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলে। (অন্য দেবতার পূজার জন্য যে প্রয়াস, আমার পূজাতে সেই প্রকারই প্রয়াস) প্রয়াস সমান হইলেও লোক অজ্ঞান বশতঃ আমাকে ভজনা করে না সুতরাং তাহারা অল্পফল লাভ করিয়া থাকে।২৫।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

অন্বয়। যো ভক্ত্যা মে পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (বা) প্রযচ্ছতি প্রযতাত্মনঃ (তস্য) ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অহং অশ্নামি।২৬।

মূলানুবাদ। ভক্তিপূর্ব্বক যে কোন ব্যক্তি আমাকে পত্র পুষ্প ফল বা জল (যাহা কিছু) অর্পণ করে, সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক উপহৃত সেই সকল দ্রব্য আমি ভক্ষণ করিয়া থাকি।২৬।

ভাষ্য। ন কেবলং মদ্ভক্তানাম্ অনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলং সুখারাধনশ্চাহং কথং—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি ভক্ত্যা উপহৃতং ভক্তিপূর্ব্বকং প্রাপিতম্ ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ।২৬।

ভাষ্যানুবাদ। কেবল যে আমার ভক্তগণের নিবৃত্তিরূপ অনন্ত ফললাভ হয়, তাহাই নহে, আমার উপাসনাও কিন্তু বড় সুলভ (ইহাই বলা যাইতেছে) পত্র পুষ্প ফল "তোয়" জল (প্রভৃতি যাহা কিছু হউক না কেন) যে আমাকে ভক্তির সহিত অর্পণ করিবে, সেই "প্রযতাত্মা"

শুদ্ধবুদ্ধির প্রদত্ত (সেই সকল পত্র প্রভৃতি) "ভক্ত্যুপহৃত" ভক্তির সহিত উপহৃত (বস্তুগুলি) আমি "ভক্ষণ"—গ্রহণ করিয়া থাকি। ২৬।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ ২৭॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয়। যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি যৎ দদাসি যৎ তপস্যসি তৎ মদর্পণং কুরুষ। ২৭।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, তুমি যাহা কর, যে ভোজন কর, যে হোম কর, যে দান কর ও যে তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ কর। ২৭।

ভাষ্য। যত এবমতঃ—যৎ করোষি স্বতঃপ্রাপ্তং যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি হবনং নির্ব্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা যৎ দদাসি প্রযচ্ছসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্যান্নাজ্যাদি, যৎ তপস্যসি তপশ্চরসি তৎ কুরুষ মদর্পণং মৎসমর্পণম্। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণ এইরূপ, সেই জন্য তুমি যে কর (অর্থাৎ) স্বতঃ (গমনাদি), যে ভক্ষণ কর, যে শ্রৌত অথবা স্মার্ত্ত হোম কর, যে স্বর্ণ ঘৃতাদি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিয়া থাক এবং যাহা কিছু তপস্যাচরণ কর, তাহা (সকলই) আমাতে সমর্পণ কর। ২।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮॥

অন্বয়। এবং (সতি) শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে (তথা) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাং উপৈষ্যসি। ২৮।

মূলানুবাদ। শুভ এবং অশুভ ফলের হেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে এই ভাবে (কর্ম্ম করিলে) তুমি মুক্ত হইতে পারিবে। (এই প্রকার) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা ও বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। ২৮।

ভাষ্য। এবং কুর্ব্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু। শুভাশুভফলৈঃ শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মানি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মাণি এব বন্ধনানি তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ এবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে। সোঽয়ং সন্ন্যাসযোগো নাম সন্ন্যাসশ্চাসৌ—মৎসমর্পণ-

তয়া কর্ম্মত্বাদ্ যোগশ্চাসৌ ইতি তেন সন্ন্যাসযোগেন যুক্ত আত্মা অন্তঃ-করণং যস্য ত্বম সত্যং সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ জীবন্নেব পতিতে চাস্মিন্ মামুপৈষ্যসি আগমিষ্যসি। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার কি হইবে, তাহা শুন। শুভ ও অশুভ (অর্থাৎ) ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যাহাদের হয়, তাহার নাম শুভাশুভ ফল। শুভাশুভফল বলিলে কর্ম্মই বুঝায়। সেই কর্ম্মই বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে এবং এই প্রকারে আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া চলিলে সেই শুভাশুভফল কর্ম্মবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। এই সেই সন্ন্যাসযোগ, ইহা সন্ন্যাস হইযাও যোগ, কারণ, আমাতে ফলার্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানই ইহার স্বরূপ। সেই সন্ন্যাসযোগের সহিত যাহার "আত্মা" অন্তঃকরণ যুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা কহা যায়, তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে জীবিতাবস্থাতেই বিমুক্তি লাভ করিয়া পরে এই দেহ পতিত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ) মদ্‌ভাবকে লাভ করিবে। ২৮।

সমোঽহং সর্ব্ব-ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯॥

অন্বয়। অহং সর্ব্ব-ভূতেষু সমঃ মে দ্বেষ্যো নাস্তি (তথা) প্রিয়ো ন (অস্তি) যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি ময়ি তে তেষু চ অহমপি। ২৯।

মূলানুবাদ। আমি সকল ভূতেতেই সমান, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহাদিগের আত্মাতে আমার সত্তা প্রকাশ পায় এবং তাহারাও আমাতে বিদ্যমান থাকে। ২৯।

ভাষ্য। রাগদ্বেষবান্ তর্হি ভগবান্ যতো ভক্তানেবানুগৃহ্লাতি নেতরান্ ইতি তন্ন—

সমস্তুল্যোঽহং সর্ব্ব-ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ অগ্নিবদহং দূরস্থিতানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতাং অপনয়তি তথা অহং ভক্তাননুগৃহ্লামি নেতরান্। যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব ন মম রাগ-নিমিত্তং ময়ি তে বর্ত্তন্তে তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্ত্তে নেতরেষু নৈতাবতা তেষু দ্বেষোমম। ২৯।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিযচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। (স) ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি শশ্বৎ শান্তিং নিযচ্ছতি হে কৌন্তেয় প্রতিজানীহি মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি। ৩১।

মূলানুবাদ। (সেই ব্যক্তি) শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, সর্ব্বদা শান্তিকে লাভ করিয়া থাকে—হে কুন্তীনন্দন—তুমি প্রতিজ্ঞা (করিয়া ঘোষণা) কর যে, আমার ভক্ত কখন প্রনষ্ট হয় না। ৩১।

ভাষ্য। উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্‌ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্ত এব শশ্বৎ নিত্যং শান্তিং চোপশমং নিযচ্ছতি প্রাপ্নোতি। শৃণু পরমার্থং কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্‌ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি ইতি। ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। বাহ্য দুরাচারতাকে পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক সাধু নিশ্চয়ের সামর্থ্যে (সেই ব্যক্তি) শীঘ্র "ধর্ম্মাত্মা" ধর্ম্মচিত্তই হইয়া থাকে (এবং) নিত্য শান্তিকে প্রাপ্ত হয়। হে কুন্তীনন্দন। তুমি পরমার্থ শ্রবণ কর; (তুমি লোক মধ্যে) এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত (অর্থাৎ) আমাতে যাহার অন্তরাত্মা সমর্পিত হইয়াছে, সে কোন অবস্থাতেই প্রনষ্ট হয় না। ৩১।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। হে পার্থ যে পাপযোনয়ঃ স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রা অপি মাং হি ব্যপাশ্রিত্য স্যুঃ তেঽপি পরাং গতিং যান্তি। ৩২।

মূলানুবাদ। হে পার্থ যে সকল পাপযোনি স্ত্রী বৈশ্য অথবা শূদ্র সকল আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারাও পরমাগতিকে লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

ভাষ্য। কিঞ্চ মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা যেঽপি স্যুঃ ভবেয়ুঃ পাপযোনয়ঃ পাপা যোনির্যেষাং তে পাপযোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে তে ইত্যাহ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (শুন) হে পার্থ—আমাকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করিয়া—যে সকল "পাপযোনি" পাপজন্মা স্থিতি করে, তাহারা কে? —স্ত্রীজাতি, বৈশ্য ও শূদ্র। (যে কারণে আমাকে আশ্রয় করে এই জন্য) তাহারাও প্রকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। কিং পুনঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ (চ) ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়ঃ তথা (গতিং যান্তি ইতি বক্তব্যং) ইমং লোকং অনিত্যং অসুখং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। ৩৩।

মূলানুবাদ। (যাহারা জন্মতঃই পবিত্র) সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যদি আমাকে আশ্রয় করে, তবে তাহারা যে প্রকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা আর কি বলিতে হইবে? এই অনিত্য ও সুখহীন মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩।

ভাষ্য। কিং পুনরিতি কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ভক্তা রাজর্ষয়ঃ রাজানশ্চতে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। অতএবমতঃ অনিত্যং ক্ষণ-ভঙ্গুরং অসুখং চ সুখবর্জ্জিতং ইমং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং মনুষ্যত্বং লব্ধা ভজস্ব সেবস্ব মাং। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ। কিং পুনরিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। (তাহাদের সম্বন্ধে) আর কিং বলিতে হইবে? (যাহারা) "পুণ্য" পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ (ও) ভক্তিসম্পন্ন রাজর্ষি, যাহারা রাজা হইযা ঋষি, তাহাদিগকে রাজর্ষি কহা যায়। সে কারণ এইরূপ এই জন্য এই "অনিত্য" ক্ষণভঙ্গুর "অসুখ" সুখবর্জিত এই "লোক" মনুষ্যলোক পাইয়া (অর্থাৎ) পুরুষার্থ সাধন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ (ভব) মদ্যাজী (ভব) মাং নমস্কুরু। এবং যুক্ত্বা মৎপরায়ণঃ সন্ আত্মানং মামেব এষ্যসি। ৩৪।

মূলানুবাদ। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার

উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকার যোগ সাধন করিলে ও মৎপরায়ণ হইয়া আত্মভূত আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৪।

ভাষ্য। কথং ময়ি মনো যস্য স ত্বং মন্মনা ভব। তথা মদ্‌ভক্তো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলোভব। মামেব চ নমস্কুরু মামেব ঈশ্বরমেষ্যসি আগমিষ্যসি যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তম্। এবং আত্মানং—অহং হি-সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা পরা চ গতিঃ পরময়নং তং মাং এবম্ভূতমেষ্যসি ইত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যার্থঃ। ৩৪।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীভগবদ্‌গীতা-
ভাষ্যে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকারে?—মন্মনা হও (অর্থাৎ) আমাতে মনকে নিবেশিত কর। সেইরূপ আমার ভক্ত হও। "মদ্‌যাজী" আমার উদ্দেশে যাগকর্ম্মনিরত হও। আমাকেই নমস্কার কর। (এই প্রকার করিলে) আমাকে (অর্থাৎ) পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে (কি করিয়া?) এই প্রকারে মনকে সমাহিত করিয়া। এইরূপে আত্মাকেও প্রাপ্ত হইবে, কারণ, আমিই সকল ভূতের আত্মা, পরাগতি ও প্রকৃষ্টরূপ "অয়ন" আশ্রয়। সেই "সর্ব্বাত্মভূত" আমাকে প্রাপ্ত হইবে, এই অতীত পদের সহিত সম্বন্ধ (করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে) (কিরূপ হইতে হইবে? তাহাই বলিতেছেন) "মৎপরায়ণ—" (অর্থাৎ) অনন্যশরণ।

ইতি।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভগবদ্ গীতা ভাষ্যের
রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ নামক
নবম অধ্যায়ের অনুবাদ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত
পূর্ব্বার্দ্ধ শেষ।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

অন্বয়। হে মহাবাহো ভূয় এব মে পরমং বচঃ শৃণু যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি। ১।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান কহিলেন, হে মহাবাহো, তোমার (মদ্বাক্য শ্রবণে) প্রীতি হইয়াছে (এই কারণ) তোমার মঙ্গলের কামনায় আমি যে বাক্য বলিব (তুমি) আমার সেই উৎকৃষ্ট বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। ১।

ভাষ্য। সপ্তমেঽধ্যায়ে ভগবতত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা নবমে চ। অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবান্, তে ভাবা বক্তব্যাঃ। তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্যমুক্তমপি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ। ইত্যতঃ—ভূয় এব পুনর্হি মহাবাহো মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বচো বাক্যং যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবা-মৃতমিব পিবন্। ততো বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া। ১।

ভাষ্যানুবাদ। সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব ও বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর এইক্ষণ যে যে বস্তুতে ভগবানকে চিন্তা করিতে হইবে, সেই সকল বস্তুর পরিচয় দিতে হইবে। এবং ভগবানের তত্ত্ব উক্ত হইলেও অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বলিয়া (এই অধ্যায়ে) পুনর্ব্বার কথিত হইবে। "ভূয়ঃ" পুনর্ব্বার হে মহাবাহো আমার 'পরম' প্রকৃষ্ট—নিরতি-শয় বস্তুর প্রকাশক বাক্য তুমি শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্যে, অমৃত পান করিয়া যেমন অতীব প্রীতি লাভ করে, সেইরূপ প্রীতি লাভ করি-তেছ। এই জন্য তোমাকে যে পরম বাক্য বলা যাইতেছে, (তাহা শ্রবণ কর) তোমার হিতের ইচ্ছায় (আমি বলিতেছি)। ১।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

(শ্রীম—লিখিত।)

—০:*:০—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, ১২৪১ সাল, ইংরাজি ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কামারপুকুর গ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আর বর্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫২ বৎসরকাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান্ ও পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের মা ৺চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। ঐ গ্রাম কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় খুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখা পড়া শিখিবার পর, বাড়ীতে থাকিয়া ৺রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন, নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্য পূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাঁদা লাগ্‌ত।'

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাইয়া দিতে পারিতেন। ঠাকুর বাল্যকালেই সদানন্দ ছিলেন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

বাড়ীর পাশে লাহাদের বাড়ী, সেখানে অতিথিশালা—সর্ব্বদা সাধুদের

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ। সংক্ষিপ্তচরিতামৃত সমেত। মূল্য ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধান ১।০ পাঁচ সিকা। শ্রীশান্তিরাম ঘোষ, ৫৭ নং বস্থপাড়া; অথবা শ্রীচারুগুপ্ত, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি, কলিকাতা; নিকট প্রাপ্তব্য।

[illegible] ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন—এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম আনুড়ে একদিন মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল মূর্চ্ছা—ঠাকুরের ভাব সমাধি হইয়াছিল।

খুদিরামের মৃত্যুর পর, ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছু দিন নাথের বাগানে, কিছু দিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতে কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণী কলিকাতা হইতে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালী বাড়ী স্থাপন করিলেন। ১২৫৯ সাল স্নান যাত্রার দিন (ইংরাজী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছু দিন পরে নিজে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন। তাঁহারই দুই পুত্র রামলাল ও শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্ব্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকেন।

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটীগ্রামস্থ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীশারদামণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল। তখন ঠাকুরের বয়স ২১।২২, শ্রীশ্রীমার বয়স ছয় বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পর তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন!

আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না। পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন।

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না,—বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা মা করেন। কখন জড়বৎ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় থাকেন। কখন উন্মাদবৎ বিচরণ করেন। কখন বালকের ন্যায়। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভাল বাসিতেন না। সর্ব্বদাই মা মা!

কখন পঞ্চবটীতে একাকী বসিয়া গাভী যে রূপ বৎসের জন্য ডাকে, সেই রূপ ব্যাকুল হইয়া মা মা করিতেন। কখনও বা রাম! রাম! রমা রাম বলিয়া কাতর স্বরে নাম করিতেন। কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন—একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কিয়ৎপূর্ব্বে আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্ব্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে—প্রেমোন্মাদ, ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল! ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন, ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহারও কখন অন্তর্দ্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ) কখন অর্দ্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা।

কিন্তু ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্ব্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা, তোর কথা কেবল শুনবো আমি শাস্ত্রও জানিনা, পণ্ডিতও জানিনা। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস

করবো'। ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, 'যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা'।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, 'তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক্—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।' ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, 'ওরে ভক্তেরা, তোরা কোথায় কে আছিস্ শীঘ্র আয়!'

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের 'কাপ্তেন,' কিছু পূর্ব্বে আসিতে থাকেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯।১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু সর্ব্বদা সমাবিস্থ—কখন জড় সমাধি—কখন ভাব সমাধি। সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে! সর্ব্বদাই মা মা!

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র, তার পর আসিলেন; চুনী, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১র শেষভাগ ও ১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, সিঁতির গোপাল, মহেন্দ্র কবিরাজ, ছোট গোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী, সুবোধ, সান্যাল; ১৮৮৪ মধ্যে গঙ্গাধর, কালী, গিরীশ, দেবেন্দ্র, সারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ, হরি, দেখিতে দেখিতে ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে জয়মোহন, হাজরা, ক্ষীরোদ, যজ্ঞেশ্বর, কৃষ্ণনগরের যোগিন ও কিশোরী, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল (ঘোষ) ও নবগোপাল (কবিরাজ), বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, মহিমাচরণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন,

মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যে), সাধু প্রিয়নাথ, বিনোদ, তুলসী, হরিশ মুস্তফী, বসাথ, কথকঠাকুর, বালীর শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন, রাখাল (ঘোষ) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র ও সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত Williams, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ৺কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা যাইবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্ব্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্য্যসমাজের দয়ানন্দ, ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং সিওড়, শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, দীন (বসু) প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ, বেণী (পাল), জীবানন্দ, ভবানী, (ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়) নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা সর্ব্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে থাকিয়া দীননাথ ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আজ তিনি সন্ন্যাসী। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও আদি ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাকালে, দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্ম মন্দির ও সাধারণসমাজ উপাসনাকালে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্ব্বদা কখন ভক্ত সঙ্গে, কখন একাকী, আসিতেন।

কাল্নাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্য দেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত।

ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন

করিয়া অপর দিকে আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন, সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরাজ ও আমেরিকান্ ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

এক দিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'মা, তোর খৃষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখ্‌বো, আমায় নিয়ে চ।' কিছু দিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জ্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবিলাম, কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি, পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হলে কিন্তু, মা, গলায় ছুরী দিব।'

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন,—সকলের নাম করা অসম্ভব। বাল্যকালে অনেকে যথা নগেন্দ্র (মিত্র), তুলসী, রামকৃষ্ণ, হীরালাল (সেন), শান্তি, শশী, বিপিন, উপেন্দ্র (ইটিলীর), সুরেন্দ্র (গুপ্ত), সুরেন (বসু), নিবারণ ইত্যাদি, ও ছোট ছোট মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর আজ তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাস, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান, আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড সর্ব্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

আর্শিতে মুখ দেখা।

——০:*:০——

স্বদেশপ্রেমিক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সম্প্রতি ৺ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উক্ত মহাত্মার জীবন সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ও মনোহর বক্তৃতা করেন। সেই সূত্রে একটি ঘটনা বলেন, নীচে তার সারাংশ দেওয়া গেল। নয় বৎসর আগে মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে ফিরিবার সময় শোলাপুর ষ্টেশনে রাণাডে নিজের প্রথম শ্রেণীর গাড়ী থেকে নেবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প কর্‌তে যান। তার মধ্যে বক্তাও ছিলেন। ইতিমধ্যে একটি সাহেব রাণাডের গাড়ীতে উঠে তাঁর বিছানা পত্র হঠিয়ে রাণাডের জায়গাটি দখল করে বস্‌লেন। রাণাডের কাছে এ খবর গেল। তিনি নিজের গাড়ীতে ফিরে গিয়ে অন্য স্থানে বস্‌লেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না। সাহেব বাহাদুর ছিলেন সিভিলিয়ান আসিষ্টাণ্ট জজ্। পুনায় গাড়ী পঁহুছুলে সাহেব শুন্‌লেন, তিনি একজন হাইকোর্ট জজের বিছানা ও আসবাব ফেলে দিয়ে তাঁর জায়গাটি কেড়ে নিয়ে বসেছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য রাণাডের দিকে গেলেন। সাহেব আস্‌চেন দেখে রাণাডে পেছন ফিরে চলে গেলেন, সাহেবকে আলাপ কর্‌বার অবসর দিলেন না। পর দিন বক্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আগের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু কর্‌বেন কি না? রাণাডে উত্তর দিলেন, লাভ কি? ভেবে দেখ, আমাদের মনে কি ময়লা নেই? আমরা নীচজাতদের—আমাদের স্বদেশীদের সঙ্গে—আজ পর্য্যন্ত কেমন ব্যবহার করে থাকি? এই দুর্দ্দিনে যখন সবাই এক সঙ্গে মিলে মিশে স্বদেশের কল্যাণের জন্য খাটা দরকার, আমরা আমাদের সেকেলে অধিকার গুলি ছাড়ি না, ছোটজাতদের দাবিয়ে রেখেছি। রাজার জাত আমাদের অপমান কর্‌লে দোষ দি কেমন করে? এ রকমের ব্যবহারে বড়ই কষ্ট ও অপমান বোধ হয় এবং মনকে অধীর করে ফেলে বটে, কিন্তু এই সব যন্ত্রণার উত্তম শিক্ষা হচ্চে আরও আগ্রহের সহিত, আরও অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের সম্মুখে যে কর্ত্তব্য পড়ে রয়েছে, সেটি করা।

আর্শিতে মুখ দেখা, যেমন মুখ্‌টি দেখাবে, তেমনিটি দেখ্‌বে। একেই

কর্ম্মফল বলে নাকি? তাহলেত এখনো গড়াবে অনেক দূর। ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির আসা ও অনার্য্যপীড়ন যদি সত্য হয়, তাহলে ত বর্ত্তমান আর্য্যবংশধরদের ভোগরূপ কলির সবে সন্ধ্যে। যে ওজনে দেওয়া হয়েছে, সে ওজনে যদি ফেরৎ আসে, তাহলেই ত হয়েছে। তেল মাথার এক আঁচড় যেমন প্রমাণ, অনার্য্যের সহিত আর্য্যব্যবহার বিষয়ে "চলমান শ্মশান" * যদি তেমনি প্রমাণ হয়, মানে এই গুরুগম্ভীর বিশেষণ যদি অনার্য্যজাতির উপর আর্য্যজাতির আন্তরিক ভাবের সূচক হয়, তাহলে বুঝ্তে হবে, সত্য সত্যই আমাদের এখনও অনেক বাকী আছে। বাবা, "চলমান শ্মশানের" কাছে "কাফের" বা "ডার্টি নিগর" লাগে কোথা? মুসলমান ও ইংরাজ তাহলে ত বাপের ঠাকুর। "চলমান শ্মশান"! কি উচুঁদরের গালাগাল, ঘৃণায় কবিত্বের পরাকাষ্ঠা, একবারে সারের সার ঘৃণা। ছিঃ, মানুষ মানুষকে এমন কোরে ঘৃণা কর্‌তে হয়। তাই বুঝি এ দেশটার কখনও *সার্ব্বজনীন সমগ্র ভারতব্যাপী স্বদেশপ্রেম বলে জিনিষ হয়নি?* তাই বুঝি জাতিভেদহীন জাতিদের আক্রমণ মাত্রেই এতকালের পুরাতন ঠাট, এত জাঁক জমক, বড়াই, ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি সবই ভূমিসাৎ হয়েছে? মহামায়ীর সংসারে এত জুলুম চল্‌বে কেন? এক জন ত আছেন!

বলি, তাই কি এখনও আক্কেল হয়েছে? সেকেলে অধিকারগুলি এখনও কি উচুঁজাতিরা ছাড়্‌তে প্রস্তুত আছেন? ইংরাজদের দোষ দি, নিজেদের সঙ্গে আমাদের সমান অধিকার দেয় না, আপনাদের পক্ষে এক আইন, নেটিভের পক্ষে অন্য। একবার ঘর বাগে চেয়ে দেখ দেখি। হিন্দু সমাজ এখনও কি সব জাতকে সমান ভোগ অধিকার দেন? মনু ব্রাহ্মণ শূদ্রের এক আইন করে গেছেন কি?

এই নিদারুণ ঘৃণার ফল সুদে আসলে এখন পাওয়া যাচ্চে। এই ঘৃণা "নীচ জাতদের" বিদ্যাধিকার দেয় নি। কৃষি ও শিল্প এদেশে আবহমান কাল নীচজাতদেরই ব্যবসা। নীচজাতদের বিদ্যা নাই, তাই এদেশে কৃষি ও শিল্প এঁদো পুকুরের জলের মত নড়নচড়নরহিত, ক্রমেই ঘন হয়ে তলার দিকে যাচ্চে। অন্য সভ্যদেশে বিদ্যার অপরা কন্যা বিজ্ঞানের শক্তিতে কৃষি ও শিল্প বাজ্যে কি উন্নতিই হয়েছে।

* পন্থ্য হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রঃ।

শারীরক ভাষ্য ১।৩।৩৮

তুলনায় কি দেখতে পাওয়া যায়? কোথায় বিদ্যুতের বলে চালিত পৃথিবীর গর্ভভেদী বৃহৎ যন্ত্রপুঞ্জ, আর কোথায় চটো মড়া বলদে টানা চার আঙ্গুল মাটি খোঁড়া লাঙ্গল। কোথায় বৈশ্বানর ও বরুণ আপনারা খেটে বিশ্বকর্ম্মাবিনিন্দিত শত শত কলে দিনের মধ্যে শত শত কাপড় বুনে দিচ্চেন,—যেন রাবণ রাজার কারখানা, আর কোথায় সেকেলে তাঁতে চটি ক্ষীণ জীব মাকু ঠেলছে। কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিদেশী এসে আশ্চর্য্য যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের ভূগর্ভনিহিত রত্নরাজি উদ্ধার করচে, আর কোথায় ভারতবাসী সেই খনিতে তিন আনার কুলিগিরি করে ঘরের লক্ষ্মী পরের হাতে দিচ্চে। কোথায় রেল, কোথায় গরুর গাড়ি। কোথায় ষ্টিমার, কোথায় গাধা বোট। কোথায় মেসিনগণ, কোথায় তীর ধনুক। কেন এমন হল?

গেলবারের সেন্সসে প্রকাশ,—ভারতবর্ষে তিনকোটী লোক কমে গেছে। সারা ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা তিনকোটী আর বাঙ্গলা ও বম্বে এই দুই দেশে চল্লিশ লক্ষ "একার" মানে এককোটী বিশলক্ষ বিঘা ফসলী জমি একবারে চাষ হয় নি। এ কথাগুলি বিলাতী সংবাদ পত্র "ডেলি নিউস" বলচেন, নেটিভে নয়। সেন্সস্ আরও বলচেন, হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা সবশুদ্ধ ২৯,২৩,২৪১ হয়েছে, তার মধ্যে গত দশবছরে ৬,৩৮, ৮৬১ জন বেড়েছে। এমন হল কেন?

যে দেশে লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটী, মানুষেরা স্বভাবতই বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও সংযত, স্ত্রীলোকেরা সাধ্বী ও লক্ষ্মীর অংশরূপা, ভূমি রত্নগর্ভা, প্রকৃতি অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি, সে ভারতে এমন কেন হল?

হাজার হাজার বছর ধরে একমুটো উঁচুজাত যত নীচ জাতদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে বলেই না?—বিদ্যাধিকার দেয়নি বলেই না?

ভালজিনিষের লক্ষণ কি? আপনি ভাল হয়, কাছে যা থাকে, তাকেও ভাল করে। যে পরকে মন্দ কোরে আপনি ভাল হয় সেকি ভাল? কিন্তু এখানে হয়েছে উল্টো। উঁচুজাত হয়েছেন দেশশুদ্ধকে নীচু করে। ব্রাহ্মণ হয়েছেন অপরকে শূদ্র কোরে। এ কেমন উঁচু হওয়া? ব্রাহ্মণ হওয়া? তাই না আজ ব্রাহ্মণ গুণকর্ম্মহীন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলে ব্রাহ্মণ; মেথরের মোট বইচেন, গরুর গাড়ী হাঁকাচ্চেন। মহামায়ার সংসারে কি জুলুম চলে? মা অনেক সহ্য করেন, কিন্তু কড়ায় গণ্ডায় খবর নেন, ফাঁকি দিবার যোটি নাই।

এখন উপায়? কর্ম্মফল ত ভুগ্‌তেই হবে। ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যে অন্ধ হয়ে মানুষকে পশুর অধম করা হয়েছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই হবে। সৎ পুরুষকার অবলম্বন করা চাই। যাদের মনুষ্যত্ব হরণ করা হয়েছে, তাদের সেই অমূল্য রত্ন ফিরিয়ে দাও। হে উচ্চ জাতি অভিমানী হিন্দু, তুমি যদি এখনও বাঁচ্‌তে চাও, আর তোমার মাতৃভূমি, তোমার সমাজ ও ধর্ম্ম বাঁচাতে চাও, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যার অর্থ আছে, সে অর্থ ও শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে, যার অর্থ নাই, সে কেবল শারীরিক পরিশ্রম করে নীচ জাতদের বিদ্যা দাও, অধিকার দাও। উচ্চ জাতি উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা আপনার আপনার সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, আশা ত্যাগ করে গরিব, অনাহারক্লিষ্ট, নিরক্ষর, কুসংস্কারপূর্ণ, কদাচারনিরত চাষা ভূষা জোলা মালা তাঁতি কামার কুমোর মুচি মেথর প্রভৃতির গ্রামে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যাও, তাদের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া সদাচার শেখাও, তাদের অসুখ হলে সেবা কর, তাদের সব রকমে অনুভব করিয়ে দাও, তোমরা তাদের দুঃখে দুঃখী, তোমরা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমরা তাদের ভাই, তারা তোমাদেরই মত মানুষ, তারাও চেষ্টা কর্‌লে তোমাদের মত হতে পারে এবং নিশ্চয়ই হবে। জীবন উৎসর্গ না করিলে কোন বড় কায হয় কি? এত দিনের পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্তওত ভয়ঙ্কর কথা। এস, এখনো সময় থাক্‌তে কোমর বেঁধে লাগ। নীচ জাতদের তোল, তাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে বিদ্যাদান কর। কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, উন্নতি করেছেন, সব এনে নীচজাতদের সম্মুখে ধর। প্রথমে তাদের ঐ সকল নূতন অদ্ভুত ব্যাপার বোঝ্‌বার শক্তি করে দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেগুলি লওয়াও। আর নীচ জাতদের উচ্চ করে আপনার উচ্চতা প্রমাণ কর। "খ"।

আশা ও নিরাশা।

(স্বামী প্রকাশানন্দ।)

হৃদয়বান্ নিঃস্বার্থ মহাপুরুষগণের ভারতের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও আনন্দের উদয় হয়, কিন্তু সে ক্ষণিক; অমানিশার ঘোর অন্ধকারে ঝঞ্ঝাবাত ও খরতর বৃষ্টির ভিতর পথিকের চক্ষে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় ক্ষণিক। দেশের অবস্থার দিকে চাহিলে, দরিদ্র, পর-পদবিদলিত, দুর্ভিক্ষ ও রোগ জর্জ্জরিত ভারতসন্তানদিগের কথা ভাবিলে হৃদয় শুকাইয়া যায়, হতাশসমুদ্রের অতলতলে প্রাণ ডুবিয়া যায়। ভারত-কল্যাণকামনাকারীদিগের হৃদয় এই আশা ও নিরাশার মধ্যে নিরন্তর দোলায়মান।

কঠোর জীবন সংগ্রামে দুর্ব্বলগণ ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হয়, অপেক্ষাকৃত বলবান্ তাহাদের স্থান অধিকার করে, কালের করাল সমুদ্রে এই চির প্রবাহ চলিয়াছে, সে গতি রোধ করিবার ক্ষমতা হয়ত কাহারও নাই। কিন্তু প্রকৃতির এই অপরিহার্য্য নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, কর্ম্মীর অপ্রতিহত শক্তি যেন তুচ্ছ করিয়া হতভাগ্য ভারতে বলবান ও দুর্ব্বল, যোগ্য ও অযোগ্য সকলেই যেন মহামারীর ভীষণ কবলে কব-লিত হইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ রোগে একে ত চিররুগ্ন, তাহার উপর মহামারী দেশ প্রায় উজাড় করিয়া ফেলিল। যেন সমগ্র ভারতবাসীকে গ্রহণ করিলেও ইহার বিরাট তৃষা মিটিবে না। দুর্ব্বল-গণকে কর্ম্মে অবসর দিয়া বলবান্ ও যোগ্যপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণের আশা ছিল, কিন্তু সে দিকে আশা বড় অল্প। দিন দিন কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইতেছে দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মাহত।

এত নাড়া চাড়া সত্ত্বেও ভারতবাসী অসাড়ে নিদ্রিত। এখনও চৈতন্যের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পরিষ্কার পরি-চ্ছন্নতা, সাদাসিদে অথচ শুদ্ধভাবে বাস করিবার চেষ্টা নামমাত্র নাই। নবাবী চাল চলন ও অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়? সহরের যে অংশে ইংরাজেরা বাস করে, সে অঞ্চলে মহামারী ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ

প্রায় যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ কি, আমরা একবারও ভাবি না। তাহারা মানুষের মত বাস করিতে জানে; বাটী, ঘর, পল্লী প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখিতে জানে, তাহা যেন দেখিয়াও দেখি না এবং শিক্ষা করিতেও চাহি না। ভাগ্যক্রমে যাহারা এই অত্যাবশ্যকীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিতে শিক্ষা করে, তাহারা ইংরাজদিগের এই সদ্‌গুণের সহিত নানা মন্দ জিনিষও গ্রহণ করে ও বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া দুই দিকই হারাইয়া বসে। আমরা এতই স্থিতিশীল ও হিংসাদ্বেষে এতই জর্জ্জরীভূত যে, নিজেদের কল্যাণ বুঝিতে পারি না ও কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি আমাদের কোন ভাল বিষয় শিক্ষা দিতে আসিলে কেবল যে শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা নহে, তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষমতা থাকিলে অত্যাচার পর্য্যন্ত করিতে ছাড়ি না। বাটীতে বা বাটীর সম্মুখে আবর্জ্জনা স্তূপাকার করিয়া রাখিলে যদি কেহ দয়া করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এরূপ কদর্য্যভাবে অবস্থান নানাবিধ রোগ ও মহামারীর অন্যতম কারণ, তাহাতে এই ঈর্ষাপূর্ণ জবাব দিই, 'আমার বাটীতে বা কোম্পানীর রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিয়াছি, তাহাতে অপরের মাথা ব্যথা কেন ইত্যাদি'। যে পল্লী অপরিষ্কার ও আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ, সে স্থানে মহামারীর অধিকতর প্রকোপ, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিজেরা কদর্য্য থাকিয়া বাটীর চারিপার্শ্ব অপরিষ্কার রাখিয়া দশজনের রোগের ও অনেক সময় প্রাণবধের কারণ হই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় কি আছে, বুঝিতে পারি না। আমরা বিদেশীয় জাতির নিকট মহা ধার্ম্মিক ও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু ধর্ম্মের প্রথম স্তর 'শৌচ' কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে আমাদিগকে ধিক্। বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধির নাম শৌচ। বাহ্য শুদ্ধি না হইলে অন্তঃশৌচ হয় না, একথা ধ্রুব সত্য। আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া অতি অপরিষ্কার একখানি কাপড় পরিয়া—হয়ত সে অতি কুচরিত্র, শরীরে নানা রোগের বীজ লইয়া রন্ধন করিতে গেল; সেই অন্নাদি খাইলে আমাদের শরীর ও মন যে দিন দিন, দুর্ব্বল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ দেখি না। শুদ্ধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পরিষ্কার ব্যক্তিদ্বারা পক্ক সামান্য অথচ বলকারী ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে শরীর ও মন যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও

বলিষ্ঠ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় অথচ সামান্য ব্যাপার সকল আমরা কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা, হৃদয়ঙ্গম পর্য্যন্ত করিতে পারি না, আর বড় বড় কথা লইয়া আলোচনা করিতে যাই; ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে?

জননী জন্মভূমি আমাদের শস্যশ্যামলা, কবিগণের লেখনীতে ইহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণের প্রকোপ সত্ত্বেও আমাদের মা এখনও কৃপণা নহেন, তবে সেবা ও ব্যবহারাভাবে কালে সকলেই বিমুখ হয়। আমাদের এমনি শোচনীয় দশা হইয়াছে যে, কোন রূপে কলম পিশিয়া যেন তেন প্রকারেণ সংসার চালাইতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট। বাধা না পাইলে ত আমরা কিছুই শিখিব না। বাধাও আসিতেছে বিলক্ষণ। চাকরী বাকরীর অবস্থা দিন দিন যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে বড়ই গোলযোগ। এখনও যদি আমাদের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে বাঁচি, একধারে ধাক্কা খাইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হই, আমাদের এই অবস্থা। আমাদের কি ভাগ্যে আছে তা জানি না। হৃতসর্ব্বস্ব, নিরাশ্রয়, পরমুখাপেক্ষী হইয়া গোলক-ধাঁধার ভিতর যেন আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কে যে বাহির হইবার পথ দেখাইবে, জানি না। চাষ বাস, দেশীয় শিল্পাদিতে আমাদের দিন দিন আস্থা হউক; তাহা হইলে যদি কিছু হয়। এ বিষম সমস্যার মীমাংসা না হইলে আমাদের বিনাশের দিন সন্নিকট বুঝিতে হইবে।

সেন্সস্ রিপোর্ট পড়িয়া ত আক্কেল গুড়ুম হয়। দিন দিন মুসলমান ও খ্রীশ্চানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস, ইহার কারণ কি? সমাজের নেতৃত্বপদাভিমানী ব্যক্তিগণ কি ইহার জন্য দায়ী নহেন ও তাঁহারা কি ইহার কোন সদুপায় করিবেন না? আমাদের সমাজের বল যে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, ইহা নিবারণ করিবার উপায় কে করে? সমাজের মধ্যে পীড়িত ও অত্যাচারিত হইলে যে স্থানে অত্যাচার নাই ও পদমর্য্যাদা পাইবে, সেই স্থানে স্বভাবতঃ যাইবার প্রবৃত্তি মানুষের হয়। আমরা যদি এখনও বুঝিতে পারিয়া দরিদ্র নিম্ন জাতিদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করি, তাহাদের প্রতি যাহাতে অন্যায় অত্যাচার না হয়, তাহার চেষ্টা করি, তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে পদমর্য্যাদা দিতে পারি, এবং যাহারা আমাদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারি, বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের সমাজের শক্তিক্ষয় রোধ করা কতক পরিমাণে সম্ভবপর হয়। আর একটী গুরুতর কথা এই যে, আমরা নিজেদের উপর একেবারে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যে মানুষ, আমরা যে মনে করিলে অনেক কার্য্য করিতে পারি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। এই আত্মপ্রত্যয়, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান ভাব না উদ্দীপিত করিলে, দাসজনসুলভ ভীরুতা, কাপুরুষতা, নীচতা ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি ভাবসমূহ হৃদয় হইতে দূর করিয়া না দিলে আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত।

এক্ষণে সমগ্র জগতের দৃষ্টি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের উপর পড়িয়াছে। এক্ষণে নিজেদের ঘর গুছাইবার সময়। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, বিশ্বাস, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, উদারতা প্রভৃতি ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ আদর্শ সকল ছাড়িয়া দিয়া কতকগুলি দুর্ব্বলকর দেশাচারকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলে কই? পক্ষান্তরে যাহারা পিতৃপিতামহসেবিত ধর্ম্মভাবগুলি একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে, তাহাদের বলি, "হে ভ্রাতৃগণ! আগুন ছাই চাপা আছে বলিয়া আগুন পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে চাও? ছাইগাদার ভিতর বহুমূল্য রত্নসকল আছে, বাছিয়া লও এবং তাহাতেই 'ইতি' না করিয়া অন্যস্থান হইতে যে সকল উত্তম বলকর ও স্বাস্থ্যকর ভাব সমূহ আসিতেছে ও আসিবে, তাহাদের জন্য দ্বার নিরন্তর উন্মুক্ত রাখিয়া দাও।" আমাদের এমনই দুর্দ্দশা যে, কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে আসিলে, তাহাকে জুয়াচোর ও ধর্ম্মবিনষ্টকারী বলিয়া উড়াইয়া দি। যথার্থ সৎ ও মহৎ লোক চিনিবার চক্ষু আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহার উপর আমরা মিলিয়া কার্য্য করিতে জানি না। পরস্পর অবিশ্বাস, হিংসা দ্বেষ জর্জ্জরিত হইয়া ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না। ধর্ম্মের নেতাদিগের ভিতর মিল নাই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ একবার বলিয়াছিলেন যে, "ভাই সকল, যখন বাহিরের বাধার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তখন আমরা ১০৫ ভাই"। তাই বলি, এখনও কি আমাদের পরস্পর কলহ ও বিদ্বেষের সময় আছে, সকলে একত্র হইয়া সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা কেন না করি?

পাশ্চাত্য বীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত মহামূল্য রত্নসমূহ যাহাতে ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সকলে মিলিয়া কেন না করি? আমরা যে উপযুক্ত, তাহা কার্য্য দ্বারা জানাইতে না পারিলে, আমাদিগের ভিতর মাল আছে, জগতের সমক্ষে আমাদের কিছু বলিবার ও শিখাইবার আছে, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে ভিখারীর ন্যায় 'অমুক দাও তমুক দাও' বলিয়া হাজার চীৎকার করিলেও কিছু ফল হইবে না। এই জন্য আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ ভাব সকল জগতকে দিতে হইবে। তার জন্য চেষ্টা কই?

আমাদের ত এই অবস্থা। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম যে ধারে চাই, সেই দিকেই হতাশ ও হাহাকার। তথাপি এই হতাশের ভিতর হইতে ক্ষণিক আশার আলোক দেখিতে পাওয়া যায়—সে আশা আমাদের যুবকবৃন্দ। যুবকদিগের উপর ভারতের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। মেধাবী, পবিত্র, বলিষ্ঠ, দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত যুবক-বৃন্দের উপর আমাদের সমস্ত আশা ভরসা। ভারত-জননী আশাপূর্ণনেত্রে তাহাদিগের দিকে তাকাইতেছেন, আমাদের জননী কাঙ্গালিনীর ন্যায় সাশ্রুনয়নে তাহাদিগের নিকট হইতে যেন কি প্রার্থনা করিতেছেন। কোন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যে দিন ভারত-জননীর মন্দিরে লক্ষ লক্ষ নরবলি হইবে, সেই দিন ভারত জাগিবে"। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নচিকেতার জন্মভূমিতে কি শত শত বীর যুবক ভারত-মাতার দুঃখ-মোচনের জন্য জীবনোৎসর্গ করিবে না? জানি না, কতদিনে শত শত যুবক ত্যাগ, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতীয় ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ সত্য সমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিবে ও সমগ্র ভারতবাসীর দ্বারে যাইয়া শারীরিক ও মানসিক বলপ্রদ ও কল্যাণকর ভাব সকল প্রচার করতঃ আপন আপন জীবন-বলি প্রদান করিবে। উদ্বোধন! তুমি সুপ্ত, অধঃপতিত ও দরিদ্র ভারতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া তোমার মঙ্গলময়ী ও মৃতসঞ্জীবনী বার্ত্তা ঘোষণা কর, সমগ্র ভারত এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া জাগিয়া উঠুক, এই প্রার্থনা।

প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ।

জেরুসালেমের পথে।

(বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যাফা হইতে কয়েকটী রাস্তা কয়েক দিকে গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের কুল দিয়া বেরুৎ (Beyrouth) সুর (Tyre) সায়দ (Sydon) আক্কা (Acre) প্রভৃতি স্থান দিয়া এণ্টিওক হইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। জেরুসালেমে যাইবার দুইটী রাস্তা; প্রথম রাস্তাটী রাম্লে হইয়া গিয়াছে। ইহার নাম গাড়ীর রাস্তা। অপরটী লৌহবর্ত্ম; উহা ইস্মাইল উপত্যকা হইয়া জেরুসালেম পঁহুছিয়াছে। রাম্লে হইতে দাড়িম বাগান দিয়া অনবরত যাইতে লাগিলাম। অবশেষে বাগান ফুরাইয়া গেল, মাঠ আসিল। দেশ সমতল না হওয়ায় সর্ব্বদা রাস্তায় উঠিতে ও নামিতে হয়। কিন্তু পাহাড়ের চড়াইএর ন্যায় দুর্গম নহে। যাফা হইতে কয়েক মাইল দূরে ইউরোপীয়দিগের একটী সামান্য উপনিবেশ আছে। কয়েকজন মাত্র ইউরোপীয় এখানে বাস করে। তাহার পর প্রশস্ত মাঠ। এই মাঠ ঢেউ খেলানোর মত চলিয়াছে ও দেখিতে অতি সুরম্য। রাস্তায় দিবাভাগে সচরাচর অতি অল্প লোক চলিয়া থাকে। পরন্তু রাত্রিকালে বহুসংখ্যক উটের কাফিলা (Caravan) বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গতায়াত করিয়া থাকে। রেলপথে খরচ অধিক হওয়ায় সচরাচর মাল উটের পৃষ্ঠে প্রেরণ করা হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে মাঝে মাঝে গ্রাম আছে ও মাঠে খেতি হইয়া থাকে। তরমুজ, কুমড়া (গোল ও ছোট) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে গম, যব ও দোরা (তিল অপেক্ষা ছোট, রং ধূসর [Brown] কিন্তু গম বা যবের মত সুস্বাদু নহে) উৎপন্ন হয়। সর্ব্বদা দস্যুর ভয় হওয়াতে স্থানে স্থানে পুলিসের থাকিবার নিমিত্ত একটী একটী প্রস্তরের ঘর নির্ম্মিত আছে। তন্মধ্যে ২।১টী পুলিস সিপাহী থাকে। কাষ্ঠের অভাব প্রযুক্ত ছাদগুলি প্রায় খিলানকরা। দেশ দেখিতে অতিশয় মনোরম। রাস্তার নিকটে বা দূরে গ্রামগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। যাঁহারা বাইবেলে ঈশার উপমা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন যেন, বাইবেলটী জীবন্তভাবে দেশেতে লিখা

আছে। লোকেরা গুর্খার ন্যায় খর্ব্বাকৃতি, রং উজ্জল গৌরবর্ণ, মস্তক শরীরের লোকের অপেক্ষা কিছু বড় (তেঁএটে বা Bullet-headed) সাহসী ও বিনয়ী। আতিথ্য বিষয়ে ইহারা জগদ্বিখ্যাত। ক্রমে ক্রমে একটী গ্রামে প্রবেশ করিলাম ও আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। গ্রাম সব প্রায় পাহাড়ের উপর থাকায় অনেক দূর হইতে দেখা যায়। গ্রামে অনেক জলপাইএর গাছ আছে—নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। বাটীগুলি মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, ছাদগুলি সমতল। গ্রামে একটী বা দুইটী কূপ আছে। এই কূপ হইতে অরঘট্ট (হিন্দুস্থানী অরহট, ইং Water-wheel বা জলসেচনীচক্র) দ্বারা জল উঠাইয়া থাকে। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, মিশরদেশ যখন সাইরিসের পুত্র ক্যাম্বাইসিস জয় করেন, তখন এই পারস্যদেশীয় জলসেচনী-চক্র তথায় প্রচলন করিয়াছিলেন। কূপের উপর একটী বড় কাষ্ঠ রাখে ও তাহার উপর লম্বভাবে একটী বড় চক্র থাকে। তাহাতে অনেকগুলি মাটির কলসীর মালা করিয়া দেয়। ও কাষ্ঠের মুখে আর একটী চক্র রাখে। একটী ঘোড়া বা গাধাকে কাষ্ঠের অপর প্রান্তে বাঁধিয়া দেয়। জন্তুটী কলুর গরুর ন্যায় ঘুরিতে থাকে ও এই বড় চক্রটী ঘুরিতে থাকে এবং কলসের মালা হইয়া জল উঠিয়া জমীতে পড়ে ও অবশেষে আবশ্যকীয় স্থানে নালা দ্বারা চলিয়া যায়। যদিও ইহাকে পারস্যদেশীয় জলসেচনীচক্র বলে, কিন্তু এরূপ চক্র পারস্যদেশে কোথাও দেখি নাই। শুদ্ধ কনষ্টান্টিনোপলের ইয়াদিকালে (সপ্তদুর্গ) অর্থাৎ কনষ্টান্টাইন নির্ম্মিত পুরাতন সহরে একটী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মিশর দেশে এই চক্র সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্যালেষ্টাইনের কতিপয় স্থানেও ইহা দেখিলাম। গ্রাম্য লোকদিগের ফেলা (চাসা) কহিয়া থাকে। ইহার বহুবচন ফেলাহিন। ইহাদিগের কাহারও কাহারও পায়ে পাদুকা আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই পাদুকাবিহীন। পরিচ্ছদ গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটি সাদা পিরান—ভিতরে পায়জামা নাই। মিশরদেশের ফেলারা—এই পিরান নীলরঙে ছুপাইয়া থাকে। পুরুষদিগের মস্তকে একটী ফেজ ও তাহার উপর কাপড় বা রুমাল জড়ানো থাকে। ইহাকে ঠিক পাগড়ী বলা যাইতে পারে না। এদেশে মোল্লা ভিন্ন আর কেহ পাগড়ী পরে না। কিন্তু মোল্লাদিগের পাগড়ী লাল ফেজের উপর কয়েক ফের্দা সাদা কাপড় মাত্র।

ভারতবাসী, আফগান, বোখারী ও পারস্যদেশীয়দের ন্যায় বড় পাগড়ী প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদও এইরূপ। কেবল মস্তকে কেশের উপর একটী রুমাল বাঁধিয়া রাখে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সচরাচর মুখে বোরকা দেয় না। চলিতে চলিতে রাম্লে গ্রামে উপনীত হইলাম। ইহা সম্প্রতি ভগ্নদশায় পতিত ও অতি ক্ষুদ্র-গ্রামে পরিণত হইয়াছে। সহরে একটী বাজার আছে। জনসংখ্যা ৭০০র অধিক হইবে না। একটী বা দুইটী কাওয়াখানা আছে। ইহা অতি অপরিষ্কার দেখিলাম। গ্রামের গৃহগুলি নিতান্ত হীনাবস্থ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত। ক্রুসেডের সময় ইহা খ্রীষ্টানদের হস্তগত হয়। তখন ইহা এক প্রধান সহর ছিল। গ্রামের এক পার্শ্বে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকার খিলানগুলি Gothic arch ও প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহাতে খুব বড় দালান আছে, ছাদগুলি কতক কতক পড়িয়া গিয়াছে। অট্টালিকাটী এককালে চতুষ্কোণ ছিল। একধারে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত চতুষ্কোণ মিনার আছে। ইহার ভিতর দিয়া একটী সিঁড়ি আছে। তাহা দিয়া উপর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। উহার বহির্দ্দেশে মাঝে মাঝে শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের গাঁথুনি আছে—তাহার উপর গ্রীক ও লাটিন ভাষায় কিছু লিখা আছে। অপর পার্শ্বে গির্জ্জায় যেরূপ হল থাকে, সেইরূপ হল আছে। এই অট্টালিকায় অঙ্গনের এক কোণে নিম্নে যাইবার এক সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলে অঙ্গনের নিম্নে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে Crypt কহে। অতি প্রাচীন কালে যখন খ্রীশ্চিয়ানদের উপর নিরো প্রভৃতি কতকগুলি রোমক সম্রাট অত্যাচার করিয়াছিলেন, তখন খ্রীশ্চিযানেরা প্রাণভয়ে প্রকাশ্যতঃ উপাসনা করিতে না পারিয়া মাটীর নীচে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উপাসনা করিতেন। যদিও এখন এ প্রণালীর কিছু আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহা প্রাচীন-প্রথা বলিয়া এখানে গির্জ্জা করিলেই এইরূপ নীচে ঘর করা পবিত্র প্রাচীন প্রথা স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনে উইলিয়াম দি থার্ড নির্ম্মিত সেণ্টপল্স্ ক্যাথিড্রাল নামক যে গির্জ্জা আছে,—তাহাতেও ক্রিপ্ট আছে। ঐ গির্জ্জায় বর্ত্তমান লেখক কোন সময় এই ক্রিপ্ট বা ভূনিম্ন গৃহ দেখিতে যান। দুপেনি দেওয়াতে তাঁহার যাইবার অনুমতি হয়। উহার অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল দেখিতে পাওয়া যায়। এই হলের ভিতর ডিউক অফ

ওয়েলিংটন, নেল্‌সন্‌ ও লর্ড নেপিয়রের অস্থি সমাহিত আছে। কিন্তু কন্‌ষ্টান্টিনোপলে কনষ্টান্‌টাইন নির্ম্মিত আয়া সোফিয়া (ইংরাজী Saint Sophia) নামক যে প্রকাণ্ড গির্জ্জা ছিল, যাহা এখন অদ্ভুত মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে ও সমগ্র মুসলমানদিগের মসজিদের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ক্রিশ্চ দেখা যায় না। বোধ হয়, রামলের এই পুরাতন অট্টালিকাটী তৎকালের সন্ন্যাসী সিপাহীদের থাকিবার স্থান ছিল। বোধ হয়, অপরাংশে সন্ন্যাসিনীরাও থাকিতেন। এই প্রাসাদ অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু এখন ভগ্নাবশেষ হইয়াছে। সম্প্রতি ছাগ ও মেষপালকেরা এখানে ছাগ ও মেষ চরাইয়া থাকে। যাফা হইতে জেরুসালেমের মধ্যে কেবল এই স্থানে ছাগল দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছাগমাংস খাওয়া এখানে প্রথা নহে। ছাগলগুলি দেখিতে কাল। পারস্য দেশে ছাগমাংস খাইলে দন্ত-শূল হয় ও অন্যান্য নানা পীড়া হয়। এইজন্য পারস্য দেশে ছাগমাংস প্রচলিত নহে। কেবল গরিব গ্রাম্য লোকেরা কখন কখন খাইয়া থাকে ও পীড়িত হয়। বোধ হয়, এ দেশেও ছাগ-মাংস না খাইবার এইরূপ কোন কারণ আছে।

রামলে ও অপরাপর গ্রামে গ্রামবাসীদের তামাক খাইবার প্রথা স্বতন্ত্র। সাধারণ লোকে হস্ত-পরিমাণ একখণ্ড কাষ্ঠে নল করিয়া লয় ও তাহার মুখে মৃত্তিকা বা পিত্তলের একটী পাত্র করিয়া লয়। পাত্রের একদিক এই কাষ্ঠের নলে লাগান হয় ও অপর দিকে তামাক দেওয়া হয়। ইহাতে তাহারা শুকনা গুঁড়া তামাক দিয়া পান করিয়া থাকে। পারস্য দেশেও গ্রাম্য লোকের ভিতর এইরূপ প্রথা আছে। প্রাচীন লোকেরা এই নল প্রায় হস্তদ্বয় করিয়া থাকে। আবশ্যকমতে ইহা লগুড়ে পরিণত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই নলে একটী হাতল লাগা-ইলে চলিবার ছড়ি দিব্য হয়। প্রাচীন তুর্কি ছবিতে ইহার প্রতিকৃতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম চিবুক।

কেলারা গমনাগমন কালে সর্ব্বদা হাতে একটী লাঠি রাখিয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে ২ বা ২॥০ হস্ত ও ইহার মাথাটী নিতান্ত বড়। তাহার উপর বহুসংখ্যক পেরেক দিয়া থাকে। বোধ হয়, উহা কোন বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে নির্ম্মিত হয়। এই লাঠির এক ঘা প্রহার করিলে মানুষ বা হিংস্রজন্তুকে অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

যেরুসালেমের পথে যাইবার কালে পথের উভয় পার্শ্বের ক্ষেত্রে কুষ্মাণ্ড ও বার্ত্তাকু পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাকে আরবীতে বেদুনজান বা বেদুজ্জান বলিয়া থাকে। শশাও দেখিলাম ইহাকে খেয়ার কহিয়া থাকে।

যাফা হইতে রামলে প্রায় ২০ মাইল। এ দেশে পথের ধারে বিশেষ মাইলষ্টোন নাই। সাধারণ লোকে মাইলের হিসাব বুঝিতে পারে না। ইহারা দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সময় দ্বারা হিসাব করিয়া থাকে। এক ব্যক্তিকে যাফা হইতে রাম্‌লে কতদূর প্রশ্ন করাতে সে উত্তর করিল, "আব্‌বা সাহাৎ" অর্থাৎ চার ঘণ্টা। ইহার অর্থ, উট ৪ ঘণ্টায় এই জায়গায় পঁহুছিতে পারে। সচরাচর উট ঘণ্টায় ৫ মাইল করিয়া চলিয়া থাকে। পারস্য দেশেও এইরূপ প্রথা আছে। তাহারা দূরত্বকে মণ সের দিয়া হিসাব করিয়া থাকে। গ্রাম কতদূর জিজ্ঞাসা করিলে গ্রাম্য লোকেরা কহিয়া থাকে, নিম মান অর্থাৎ অর্দ্ধমন। এক ফার-সাক অর্থাৎ তিন মাইল ইং League ইহারা ১ মন হিসাব করে ও তদনুসারে দূরত্ব গণনা করে। ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানেও এ প্রথা আছে। রামলে হইতে জেরুসালেম ৪০ মাইল। আরবী ভাষার অনভিজ্ঞ থাকায় জেরুসালেম নাম কহিতে কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে এক ইহুদী কহিল, আরবী ভাষায় ইহাকে কুদ্দুস বৈৎউল্লা বা বৈৎঅল মোকাদ্দস কহিয়া থাকে। ইহার অর্থ ভগবানের গৃহ বা পুণ্যনগর। (ইহুদী) সালেম আরবী সেলামৎ সেলাআম (যীশু প্রথম ব্যবহার করেন। অর্থে শান্তি বা মঙ্গল)। মুসলমানদিগের প্রণামপ্রণালী সেলাম উল আলেকম। প্রথম ভগবান ঈশাই প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ ভগবান তোমাকে শান্তি দিউন। বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ইহুদী ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই নিমিত্ত অনেকগুলি আরবী ও ইহুদী শব্দ একই। যথা মাইযে (জল) ইহুদী ও আরবী এক। কুদ্দুস নাম কহিতে সকলে বুঝিতে পারিল ও কোথায় দিয়া যাইতে হইবে, ও কি প্রকার, ইসারায় বুঝাইয়া দিল। আমিও বুঝিলাম। এ দেশে কোন প্রকার যান না পাওয়ায় রাত্রিতে হাঁটিতে লাগিলাম ও ৪০ মাইল যাইয়া রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় জেরুসালেমে পঁহুছিলাম।

পথে যাইতে যাইতে অনেকগুলি গিরিনদী দেখিতে পাইলাম। ইহাদের

অনেক স্থানে জল শুকাইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে জল আছে। তাহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু আছে। অনেক গ্রাম পথ হইতে কিঞ্চিৎ দূর। পথিকদিগের যাইবার সময় অনেকে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এদেশে এক অতি সুন্দর প্রথা আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন বৃদ্ধা স্ত্রী পথের ধারে একটী প্রস্তর ও মৃত্তিকা দিয়া একটী পিল্‌পার ন্যায় করে ও তাহার ভিতরে একটী ছোট জালা রাখিয়া দেয়। তাহাতে জল ভরিয়া রাখে ও নিকটে একটী বাটী রাখিয়া দেয়। এই জলের স্থানে সেই বৃদ্ধা শয়ন করিয়া থাকে বা তাহার অল্পবয়স্কা কন্যাকে বসাইয়া যায়। জল কম হইলে ফের সেইটী পূর্ণ করিয়া দেয়। জল দান করিলে মুসলমান ধর্ম্মে মহা পুণ্য হয়। এই নিমিত্ত ইহারা তৃষাতুর পথিককে অতি আগ্রহের সহিত জলপান করাইয়া থাকে। ইহারা সকলকেই জল দিয়া থাকে; মুসলমান, ইহুদী বা অন্য কোন জাতিবিচার করে না। পারস্যদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কগ্নব্যক্তি নিতান্ত কাতর হইয়া জল চাহিলে তাহারা কখনও জল দেয় না। যদিও পারস্যদেশীয়েরা সিয়া বলিয়া পরিচিত, ও মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন জল বিনা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তৃষাতুরকে জল দান করা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ইহারা কহিয়া থাকে, কিন্তু পারস্যদেশীয় গ্রাম্য লোকেরা এত কঠিন হৃদয় যে, পয়সা লইয়াও তাহারা জল বিক্রয় করিতে চাহে না। প্রহার করিলে অনায়াসে সকল খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তখন আর মিষ্ট ভাষা বা অর্থের কিছু প্রয়োজন করে না।

রাম্‌লে হইতে জেরুসালেম অনবরত চড়াই করিতে হয়। যদিও রাস্তা প্রশস্ত, কিন্তু ক্রমাগত চড়াই করিতে করিতে মহা কষ্ট বোধ হয়। জেরুসালেম কয়েকটী পাহাড়ের (জাইয়ন, মোরিয়া প্রভৃতি) উপর নির্ম্মিত ও সমুদ্রসমতলের উপর ১৭০০ ফিট উচ্চ।

সম্প্রতি New Jerusalem (নব জেরুসালেম) নামে একটী সহর হইয়াছে। ইহা সহরের প্রাচীরের বাহিরে। এই স্থানের বাটি গুলি ইউরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত। অবশেষে যাফা গেট দিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

সংসার।

(স্বামী বোধানন্দ।)

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটী এই,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।

ইহার অর্থ এই, "উপরদিকে শিকড়, নীচে ডালপালা, এক নিত্য অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ছন্দ অর্থাৎ বেদগুলি তার পাতা। এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।" টীকাকারেরা বলেন, এই অশ্বত্থ বৃক্ষ আর কিছু নয়, উহা এই সংসার। অশ্বত্থ শব্দের একটী ধাত্বর্থ তাঁরা করেন এই,—শ্ব অর্থাৎ কালও যা থাকবে কি না সন্দেহ। মোট কথা হচ্চে অনিত্য। অনিত্য আবার অব্যয় কি রকম? অনিত্য মানে সর্ব্বদা একরূপে থাকে না; আবার অব্যয় অর্থাৎ প্রবাহরূপে নিত্য অর্থাৎ কোন না কোনরূপে এ সংসার অনন্তকালই থাকবে। ঊর্দ্ধে এর শিকড় অর্থাৎ ইহার কারণ হচ্ছেন নিত্য-শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম আর জীব জগৎ হচ্চে সেই ব্রহ্মের যেন শাখা প্রশাখা। তাঁরা নীচে কেন? না, তাঁরা মায়ার অন্তর্গত বলে। আর বেদ ইহার পাতা কেন? পাতাগুলি থাকার দরুণ রৌদ্র প্রভৃতি গাছের উপর বেশী অত্যাচার কত্তে পারে না। গাছটী ঠিক থাকে,—গাছের ডাল পালাগুলি সতেজ থাকে। বেদও সেই রকম নানা রকম কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করে—জীবকে স্বর্গে যাবার ও মুক্তি পাবার রাস্তা দেখাচ্ছেন। তাইতে জীবের রক্ষা হচ্ছে।

এই সংসারকে যিনি জানেন, তিনি বেদবিৎ। এখন সংসারকে জানাটা কি রকম? অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সংসারের রহস্য আবিষ্কার কর্ত্তে চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টার ফলে নানারূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছেন। এই সিদ্ধান্তগুলিকে প্রধানতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১ম,—আস্তিকমত, ২য়, নাস্তিকমত। আস্তিকগণ জগতের চেতন কারণ মানেন আর নাস্তিকেরা কেউ মানেন নি, কেউ বা উহার অস্তিত্বে সন্দি-হান, কেউ বা উহাকে অজ্ঞেয়, কেউ বা উহার জন্য মাথা ঘামান নিরর্থক বলে থাকেন। আস্তিকগণের মধ্যে আবার নানা শ্রেণী বিভাগ আছে।

প্রথমতঃ দ্বৈতবাদী। ইঁহারা জগৎ কারণকে জগৎ হতে সম্পূর্ণ আলাদা বলেন। তাঁদের মতে জীব ও জগৎ সেই চেতন পরম পুরুষের সৃষ্ট। জীবের কর্ত্তব্য—তাঁর উপাসনা ও পরোপকার। লক্ষ্য—তাঁর নিত্যদাসত্ব অথবা কোন কোন বাদীর মতে অনন্ত উন্নতি। তাঁদের মতে জীবের যতই উন্নতি হোক না কেন, সে কখন তার স্রষ্টার মত হতে পারবে না—চিরকাল তাঁথেকে পৃথক্ থাকবে। এঁরা স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টকে এক মনে করাকে মহাপাপ মনে করেন। কতকগুলি দ্বৈতবাদীর বিশ্বাস,—এই জগৎকারণ পরম পুরুষ জীবের কল্যাণার্থ সময়ে সময়ে দেহধারণ করে জগতে এসে থাকেন। ইঁহাদিগকে অবতার কহে। কোন কোন দ্বৈতবাদী অবতার মোটেই মানেন না, তবে তাঁরা লোককল্যাণার্থ মহা-পুরুষ বা আচার্য্যগণের মাঝে মাঝে অভ্যুদয় হয়, এ কথা স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদীগণ জগতের চেতন কারণ এক, ইহা স্বীকার কল্লেও অনেকে আবার প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যবান্ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন।

এর ঠিক উল্‌টো মত অদ্বৈতবাদ। তাঁরা দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তগুলি সব মেনে থাকেন। তবে তাঁরা বলেন, দ্বৈতবাদীরা যে দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ্‌ছেন, তার চেয়ে উচ্চদৃষ্টিতে জগৎকে দেখা যায়। সেই জন্য তাঁরা দ্বৈতবাদীদের জগৎ সম্বন্ধে মতকে নিম্নদৃষ্টি বা ব্যবহারিক দৃষ্টি বলেন আর তাঁরা যেটী সিদ্ধান্ত করেন, সেইটীকে পরমার্থিক বা সত্যদৃষ্টি বলে থাকেন। তাঁরা বলেন, এ সংসারটা যা দেখ্‌ছো, তা নয়—এ একটা ঘোর স্বপ্ন, এ একটা মায়ার ব্যাপার—ইন্দ্রজালের ব্যাপার। সত্যদৃষ্টি হলে দেখ্‌তে পাবে, এক চৈতন্য ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই। তবে আর যা দেখ্‌ছি, এ সব কি? এ সব যেমন অন্ধকারে দড়িগাছটাকে সাপ বলে বোধ হয়, কিম্বা ঝিনুককে যেমন রূপো বলে ভ্রম হয়, অথবা মরীচিকাতে যেমন জলভ্রম হয়। তাঁরা বলেন, যতই উন্নতি কর না কেন, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, গোলোক যেখানেই যাও না কেন, ঈশ্বরের নিত্যদাসই হয়ে থাক, আর যাই হও, তুমি সংসারকে ঠিক ঠিক জান্‌তে পার নি। যখনি তোমার সত্য জ্ঞান হবে, তখন দেখ্‌বে, এই জীব জগৎ, এমন কি, জগতের স্রষ্টা—ঈশ্বর যাঁকে বোল্‌ছো, তাও মায়ার অন্তর্গত—তাও ঠিক ঠিক সত্য নয়—প্রকৃত সত্য এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি সব

গুণের অতীত। তাঁ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নেই। এই জ্ঞান লাভ কত্তে গেলে অবশ্য অনেক কর্ম্ম কত্তে হয়, অনেক উপাসনা কত্তে হয়, কিন্তু এই জ্ঞানই হচ্চে সকলের পরাকাষ্ঠা পরম গতি। এঁবা সেই জন্য নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলেন, আর সগুণ ব্রহ্মকে একেবারে উড়িয়ে দেন না—তবে বলেন, উহা ব্যবহারিক সত্য—অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সত্য। যতক্ষণ উপাস্য উপাসক ভাব, ততক্ষণ ও অজ্ঞান। তুমি খুব ভক্ত হতে পার, তুমি খুব উন্নত চরিত্র হতে পার, তবু তুমি অজ্ঞান—যতক্ষণ তোমার এক বিন্দুও ভেদদৃষ্টি থাক্‌বে।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মাঝামাঝি একটা মত আছে। তাহাব নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এঁরা বলেন, জগৎ ও জীব সত্য। উহাবা সেই চেতনকারণের শরীর স্বরূপ। উহারা তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, সুতবাং তাঁহাব সহিত এক হিসাবে অভেদ আবার তাঁহা হইতে পৃথক্। যেমন দুধ থেকে দই হয়েছে। দইটা দুধ ছাড়া আর কিছু নয়—সুতরাং দুধ আর দই এক হিসাবে অভেদ বৈকি। আবাব যখন সেটা দই হয়েছে, তখন দুধ থেকে তাব স্পষ্ট ভেদ বয়েছে। এঁরা সেই জন্য পরিণাম-বাদী। জীব ও জগৎ সেই চৈতন্যবান পবম কাবণেরই রূপান্তরে পবিণাম মাত্র। জীব কখন তাঁব সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হতে পাবে না। তবে সৎকর্ম্মেব দ্বারা, সাধন বলে, উপাসনা বলে সে যে তাঁব অংশ, সে যে তাঁবই একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ, এটী বুঝ্‌তে পারে, এরি নাম জীবের মুক্তি।

একটী-উদাহরণ দ্বারা এই তিনিটী মতেব কথা বিশদ কবিতে চেষ্টা করিতেছি। এক জিনিষেব সঙ্গে আর এক জিনিষের ভেদ তিন বকমে হতে পাবে। প্রথম বিজাতীয ভেদ, যেমন গাছ আর একটা পাথর। গাছেব সঙ্গে পাথবেব কোন সাদৃশ্য নাই, দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়। তার পর সজাতীয় ভেদ, যেমন দুটো গাছ। এ গাছটা ও গাছ নয়, কিন্তু উভয়েই গাছ বটে, উভয়েই এক জাতীয়। তার পব স্বগত ভেদ —যেমন এক গাছেব ফল, ফুল, পাতা, ডাল প্রভৃতি। অদ্বৈতবাদীবা বলেন, জীবে ও ব্রহ্মে প্রকৃত পক্ষে কোন ভেদ নাই—স্বগতভেদও নাই। জ্ঞান হলে বোধ হবে, যে জীব আপনাকে গাছ থেকে পৃথক্ একটা পাথব মনে কচ্ছিল বা স্বতন্ত্র একটা গাছ মনে কচ্ছিল, অথবা গাছেরই অন্তর্গত একটা ফল বা ফুল বোধ কচ্ছিল, সে তার কিছুই নয়,

সে সমগ্র গাছটা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, জীব ফল বা ফুল পর্য্যন্ত হতে পারে, গাছ কখন হতে পারে না, আবার দ্বৈতবাদী বলেন, সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ তার সঙ্গে তাঁহার স্বরূপের মোটেই সাদৃশ্য নাই এবং কখন হতেও পাবে না।

নাস্তিক মতের ভিতরও যে অনেক অবান্তর ভেদ আছে, প্রথমই তার কয়েকটা আভাস দেওয়া হয়েছে। এখন আর একটু বিশদ করিয়া বলা যাক। এই নাস্তিক মতের মধ্যে প্রথমেই প্রাচীন চার্ব্বাক ও আধুনিক জড়বাদীদের কথা মনে পড়ে। তাঁরা জগতের চেতন কারণও মানেন না, আত্মাও মানেন না, স্বর্গ নরকও মানেন না, মুক্তিও মানেন না। তাঁরা বলেন, খাও, দাও, মজা কর। সামনে যা সুখ পাবে, তাই ভোগ করবার চেষ্টা কর—দুঃখকে দূর করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। নেহাত দুঃখ একটু আধটু আসে, কি কর্ব্বে? মাছটাতে কাঁটা আছে বলে কি মাছটা খাবে না? ধার করেও ঘি খাও, ধার শোধ কর্ব্বার জন্য চিন্তায় কোন দরকার নাই। তবে নেহাত যখন জেলের ভয় হবে, তখন যতটা পার, বাদ সাদ দিয়ে যত কম তোমার পাওনাদারকে দিতে পার, ততই ভাল। ধর্ম্ম ধর্ম্ম যারা করে, তারা সকলেই ভণ্ড। তার পর আর এক রকম নাস্তিক আছেন, তাঁরা একেবারে জোর করে বলেন না যে ঈশ্বর নেই, আবার ঈশ্বর মান্‌তে গেলেও তাঁর অস্তিত্বে বা তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে নানা সন্দেহ আসে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, ঈশ্বর না থাকলেও ঈশ্বর আছেন, এটা চিন্তা করা ভাল, কেন না, তাতে সমাজের অনেকটা শান্তি থাকবে। পরস্পরে বেশী মারামারি কাটাকাটি হতে পার্ব্বে না। আবার কোন কোন বাদী ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর মেনেই জগতে যত গোলমাল হয়েছে। অতএব ও সম্বন্ধে কোন চিন্তা করবার দরকার নেই। যদি ঈশ্বর কেউ থাকেন, তিনি অজ্ঞেয় তিনি মানুষের কোন কাজে আসেন না। আমাদের উচিত সংসারের নিয়মাবলি আবিষ্কার করা ও সেই নিয়মানুসারে চল্‌তে চেষ্টা করা। তাঁরা বলেন, যাতে জগতের অধিকাংশ লোকের হিত হয়, তাই কর।

আবার আর এক রকম নাস্তিক আছেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর আছেন কি না, ও নিয়ে মাথা বকাবার কিছু দরকার নেই। সৎকর্ম্ম কর, পরোপকার কর, নিজের চিত্ত শুদ্ধ কর, মনকে নিষ্কাম কর এমন কি,

কামনাকে একেবারে নাশ করে ফেল—তা হলে পরম শান্তি পাবে শুধু ইহজীবনে নয়, পরজীবনেও তুমি ঠিক থাক্‌তে না পার, তবে তোমা থেকে যে জিনিষটা উৎপন্ন হবে, সেইটে পরম শান্তি ভোগ কর্‌বে। এই হচ্চে, বৌদ্ধদের মত।

আবার বেদবিশ্বাসী, পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী, আত্মায় বিশ্বাসী এক রকম নাস্তিক আছেন—তাঁদের আমাদের শাস্ত্রে নাস্তিক না বলে নিরীশ্বর বাদী বলেছেন. কারণ, তাঁরা জগৎ কারণ নিত্য ঈশ্বর মানেন না। কিন্তু তাঁরা সাধনে উন্নত মহা মহা সিদ্ধ পুরুষগণকে জন্য-ঈশ্বর বলে থাকেন। ইহা আমাদেরই সাংখ্য মত। ইঁহারা বলেন, আত্মা জড়া প্রকৃতির অধীনে পড়ে আপনার শক্তি, আপনার স্বরূপ ভুলে গেছেন। সাধনার বলে চিত্ত-শুদ্ধি হলে বিবেক হবে—তখন তিনি প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হবেন—এর নাম তাঁরা দিয়েছেন কৈবল্য।

এক্ষণে কথা এই, আমরা সংসারকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখ্‌বো? কোন্ দৃষ্টিতে দেখ্‌লে যথার্থ বেদবিৎ হতে পার্‌বো? নানা মতমতান্তরের গোলক-ধাঁধায় পড়ে আমাদের যে দিশেহারা হতে হয়েছে। এখন কোন্ পথে যাই?

আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে ও স্বামী বিবেকানন্দের সবল ব্যাখ্যা দ্বারা এ সম্বন্ধে একটা নিশ্চয় ধারণা কত্তে সক্ষম হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, যাঁরা এই তত্ত্ব ভেবে ভেবে কিছু মীমাংসা কত্তে পারেন নি, তাঁদের নিকট সেই সমন্বয়বাণী বড় মধুর, বড় আশাপ্রদ, বড় শান্তিপ্রদ লাগ্‌বে।

ঠাকুর বলতেন, মত, পথ। যেমন এক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আস্‌বারই অনেক উপায় আছে, কেউ বা নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ রেলে, কেউ পদব্রজে, কেউ বা ষ্টিমারে আস্‌তে পারে, সেই রকম প্রত্যেক মতই যথার্থ আন্তরিকতার সহিত অকপট ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সেই এক ঈশ্বরে পৌঁছিয়া দেয়। অপর তিনি বল্‌তেন, তর্ক কোরো না। যে যে মতে চল্‌বে, যার যা বিশ্বাস, যার যা ধারণা, সে তা করুক। তাঁর দয়া হলে আপনার আপনার ভুল সব্বাই বুঝ্‌তে পার্‌বে। তিনি আর একটী উদাহরণ দিতেন—সেটী আরো সুন্দর। তিনি বল্‌তেন, সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ী ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারু ঘড়ী একবারে সম্পূর্ণ ঠিক যায় না, তা বলে কারু কাজ আটকায় না।

তবে মাঝে মাঝে ভাল ঘড়ীর সঙ্গে মেলাতে হয়, তাতে অনেকটা ঠিক থাকে।

স্বামীজি বল্তেন, মানুষের উন্নতি অনুসারে, ক্রম-বিকাশ অনুসারে মানুষ এক এক মতাবলম্বী হয়। যে জড় জগৎ ছাড়া আর কিছু দেখ্তে পাচ্চে না, যার দৃষ্টি কেবল সংসারের আহারপান ইন্দ্রিয় সুখেই বদ্ধ, সে আত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে বুঝিবে? তাহাকে তাহার জন্য অনুযোগ বিফল, তাহার নিজ মতের ভিতর থাকিয়া তাহাকে যতটুকু সৎকার্য্য করাইয়া লইতে পার কর; চার্ব্বাককে দেখাও, তুমি যেমন ভোজন পানকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া নিশ্চিন্ত আছ, আমি তাহা হইতে উচ্চ আত্মা বা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। জীবনে দেখাও, তুমি তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সুখভোগ করিতেছ। দেখাও তাহাকে, সে সুখের জন্য কত বিব্রত, কিন্তু সুখ তাহার কত দূরে, কিন্তু সুখ তোমার করতলগত। নতুবা কোটি কোটি যুক্তির অবতারণা করিলেও চার্ব্বাককে নিজমতে আনয়ন করিতে পারিবে না।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতগুলি যে সাধকেরই ক্রমোন্নতির অবস্থামাত্র, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। প্রথম অবস্থায় সাধক স্বভাবতই ভগবান হইতে পৃথক থাকেন ভগবানের গুণ ও আপনার গুণ সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে তখন তাঁহার সহিত আপনার অভেদ ভাবিতে সঙ্কুচিত হইবেন, একথা আর আশ্চর্য্য কি? অদ্বৈতবাদিন্, যুক্তিজাল বিস্তার না করিয়া দ্বৈতবাদীকে দেখাও, তোমার ভিতরে কিরূপ সেই ব্রহ্মশক্তির খেলা হইতেছে; দেখাও তোমার ভিতরে তাঁহার লীলা। দেখাও, তুমি যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাক, কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত করিয়া দাও কি না? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ আদি তোমায় বিচলিত করিতে পারে কিনা? তবেই দ্বৈতবাদী বুঝিবে—নতুবা অদ্বৈতবাদ প্রচার নিষ্ফল।

সার কথা এই, যিনি যে মত লইয়া আছেন, সেই মত লইয়া তাহার একটা চূড়ান্ত করুন। উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। বাগবিতণ্ডা যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের সময় আসিয়াছে। আমরা এখন কার্য্যে মতের পরিচয় লইব—বাক্য বন্ধ করিব।

যতই উন্নত দৃষ্টি হইতে থাকে, ততই সংসার যে শুধু জড়শক্তির

ক্রীড়াক্ষেত্র নহে, ইহা উপলব্ধি হয়! প্রথমে চৈতন্যকে জড়জগতের কারণ ও জড় জগৎকে চৈতন্যপ্রসূত মনে হয়। ক্রমশঃ উহাকে চৈতন্যের এক অংশ মাত্র ও শেষে চৈতন্যমাত্র এক অবাঙ্মনস-গোচর পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হয়। তখন আর ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব গোলমাল, কোলাহল কিছু থাকে না, তখন কেবল অনিন্দ্য আনন্দ বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ম্যাক্‌সমুলার।

ব্রহ্মবাদিন্ সম্পাদক মহাশয়,

যদিও আমাদের ব্রহ্মবাদিনের পক্ষে কর্ম্মের আদর্শ চিরকালই থাকিবে ; কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নয়, কিন্তু কোন অকপট কর্ম্মীই কিছু না কিছু তত্ত্বালোক না পাইয়া কখনই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন না।

আমাদের কার্য্যের আরম্ভ খুবই মহৎ হইয়াছে আর আমাদের বন্ধুগণ এ বিষয়ে যে দৃঢ় আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, তাহার শতমুখে প্রশংসা করিলেও পর্য্যাপ্ত বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না। অকপট বিশ্বাস ও সৎ অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে আর এই দুই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও নিশ্চয়ই সর্ব্ব বিঘ্নকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবে।

কপট অলৌকিক জ্ঞানাভিমানিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। অলৌকিক জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব, তাহা নয়, তবে এই জগতে যাহারা এইরূপ জ্ঞানের দাবী করে, তাহাদের মধ্যে পনের আনার কাম কাঞ্চন যশঃস্পৃহারূপ গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, আর বাকি এক আনার মধ্যে তিন পাই লোকের অবস্থা ডাক্তার কবিরাজের বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণের নহে।

আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—চরিত্র গঠন—যাহাকে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা বলা যায়। ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজেও তদ্রূপ। জগৎ প্রত্যেক নূতন উদ্যমের উপর এমন কি, ধর্ম্মপ্রচারের নূতন উদ্যমের উপরও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে বলিয়া বিরক্ত হইও না। তাহাদের অপরাধ কি? কত বার কত লোক

তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। যতই সংসার কোন নূতন সম্প্রদায়ের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, অথবা উহার প্রতি কতকটা বৈরিভাবাপন্ন হয়, উহার পক্ষে ততই মঙ্গল। যদি এই সম্প্রদায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন অভাব মোচনের জন্যই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই নিন্দা প্রশংসায় এবং ঘৃণা প্রীতিতে পরিণত হয়। আজকাল লোকে প্রায় ধর্ম্মকে কোনরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপে লইয়া থাকে। এ বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম কেবলমাত্র সাংসারিক সুখের উপায় স্বরূপ, তাহা আর যাহা হউক, ধর্ম্ম নহে। আর অবাধে ইন্দ্রিয় সুখভোগ ব্যতীত মনুষ্য জীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা বলিলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করা হয়।

সত্য, পবিত্রতা ও নিস্বার্থপরতা, যে ব্যক্তিতে এই গুলি বর্ত্তমান, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে এমন কোন শক্তি নাই যে, উহাদের অধিকারীর কোন ক্ষতি করিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেও এক ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্ব্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ করিতে যাইও না। আমার এ কথা বলিবার ইহা উদ্দেশ্য নহে, যে কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে, কিন্তু সুখই হউক, দুঃখই হউক, নিজের ভাব সর্ব্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মত গুলিকে অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অপর আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি এখন কোন সাহায্যকারী না পাও সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কি? সব মহৎ কার্য্যের আরম্ভের সময়ই উহার অস্তিত্বই যেন বুঝা যায় না—কিন্তু তখনই বাস্তবিক উহাতে যথার্থ কার্য্যশক্তি সঞ্চিত থাকে।

কে ভাবিয়াছিল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ—এই কয়েক বর্ষের মধ্যে এমন দূরদেশের লোকে জানিতে পারিবে, যাহার কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বপ্নেও কখন ভাবেন

নাই ? আমি ভগবান রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক্ ম্যাক্সমুলার 'নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরো বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন ? অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, প্রকৃত পক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম, কারণ, যে কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাল বাসেন, তিনি স্ত্রীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে কোন সম্প্রদায়, মত বা জাতি ভুক্ত হউন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে পাওয়া আমি তীর্থ যাত্রা তুল্য জ্ঞান করি। মদ্ভক্তানঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ, আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইহা কি সত্য নহে ?

অধ্যাপক প্রথমে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্ত্তন কি শক্তিতে হইল, তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন ও উহাদের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না ত, কাহাকে পূজা করিবে ?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্ত্তি বিশেষ। তিনি ষ্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকালয় দেখাইলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত ত আর প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় না।' এ বাস্তবিক আমি নূতন কথা শুনিলাম। সুন্দর উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম সত্ত্বেও সেই স্থির প্রসন্নানন বালকবৎ মসৃণ ললাট, রজত শুভ্র কেশ, ঋষিহৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্ব সূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমুদয় জীবনের সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্ম্মিণী,

(যে জীবন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ, উহার প্রতি লোকের বিরোধ ও ঘৃণা অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রদ্ধা উৎপাদনরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল) তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধভাব ও নির্ম্মল আকাশ এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমায় প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের যুগে লইয়া গেল; যখন ভারতে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের উচ্চাশয় বাণপ্রস্থগণের অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবের নিবাস ছিল।

আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিৎ বা পণ্ডিতরূপে দেখিলাম না, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত আপন একত্ব অনুভব করিতেছেন, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব সমূহের বিচাররূপ মরুতে দিশাহারা হইয়াছে, সেখানে তিনি এক অমৃত কূপ খনন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই সুরে সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে, "তমেবৈকং জানিথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ," সেই এক আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

যদিও তিনি একজন ব্রহ্মাণ্ড আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া আত্মসাক্ষাৎকারে সক্ষম করিয়াছে, তাঁহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরাবিদ্যা লাভে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত বিদ্যা। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরাৎপরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

আর ভারতের উপর তাঁহার কি অনুরাগ! যদি আমার তাহার শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস করিয়াছেন; পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ সমুদয় তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে।

ম্যাক্সমুলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদান্তের সুরা বেসুরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্ম্মই যাহার কার্য্যে পরিণতি মাত্র। আর রামকৃষ্ণপরমহংস কি ছিলেন, তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার অবয়ব স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ—সকল জাতির নিকট আধ্যাত্মিক আলোকবাসেস্বরূপ। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে তাই বলি ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য ঋষি ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্রের উদয় হইলেই, ভারতবাসীগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বেই উহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থ ভাবে লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তথাকার প্রত্যেক হৃদয়ই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হইবে।' বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নির্গত প্রায় হইল—মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল—ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি বাহির হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; তোমাদের আমাকে সেখানে দাহ করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানব হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয় ত কবি যাহা বলিয়াছিলেন, এ তাই—

> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং।
> ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥

তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতভাবে হৃদয়াদৃষ্টনিবদ্ধ পূর্ব্ব জন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন।

তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গল স্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন যেন বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনেক অনেক বর্ষ যায়।

ইতি

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জের রাস্তা,
লণ্ডন, দক্ষিণ পশ্চিম।
৬ই জুন, ১৮৯৬।

আপনার ইত্যাদি
বিবেকানন্দ।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

২য় প্রস্তাব।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি)

মানুষের পাঞ্চভৌতিক শরীর পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত। জন্ম গ্রহণ কালে কেহ পরিপুষ্ট-দেহ, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ পুরুষানুগতবীর্য্যসম্পন্ন, কেহ পিতৃরোগের অধিকারী। এই সম্বল লইয়া, ইহ-সংসারে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত, আমরা জড়জীবশক্তিময়ী প্রকৃতির সহিত, জীবন ক্রীড়ায় ব্যাপৃত। রসরক্ত-ইন্দ্রিয়-আশয়াদি বিবিধ উপাদানে গঠিত মনুষ্যদেহ, জলবায়ু, আলোক-উত্তাপ, স্থূল-সূক্ষ্ম জীব-সমন্বিত বহিঃপ্রকৃতির উপযোগী হইতে অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। যতক্ষণ জলবায়ু প্রভৃতি মনুষ্যদেহের অনুকূল, ততক্ষণ দেহের স্বাস্থ্য এবং যতদিন আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আপনাকে তাহার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে সমর্থ, ততকাল সে সুস্থ। একদিকে মানুষের বয়স বংশ ও ব্যক্তিগত শারীরিক সবলতা বা দুর্ব্বলতা, অপর দিকে সেই দেহে কার্য্যকারী চতুর্দ্দিকস্থ শুভকর বা অনিষ্টকর প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ—উভয়ই তাহার স্বাস্থ্যের নিয়ামক। শুভকর শক্তির পোষণ ও সঞ্চয় এবং অনিষ্টকর শক্তির পরিবর্জ্জন ও দূরীকরণের উপর মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

জীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল। জীবনের পর মুহূর্ত্তে কি হইবে, স্থিরতা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত হইলেও বহুলোকসমষ্টিসমাজপরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি, অঙ্কগণনা দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। সমষ্টির পরমায়ু সম্বন্ধে এরূপ স্থিরতা আছে বলিয়াই জীবন-বিমা (Life Insurance) ব্যবসায়ীরা জীবনপণ্য ব্যবসায়ে কখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ইহা লইয়া সকল সভ্যসমাজে যে কত কোটী টাকার ব্যবসায় চলিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি ব্যষ্টির স্বাস্থ্যের ফল। যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষ সুস্থকায় বলিতে গেলে, পীড়া বা শারীরিক বৈলক্ষণ্যের অভাব অনুমান করা যায়, সেই রূপ জাতি বা সমাজ বিশেষের স্বাস্থ্যের

পরিমাণ, রোগ ও মৃত্যু সংখ্যার অল্পতা। বিভিন্নবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা, তাহাদের উপজীবিকা, সামাজিক অবস্থাদি, দেশের জলবায়ু শৈত্য উষ্ণতা প্রভৃতি দুই স্থানে সমভাবাপন্ন হইলে, যে সমাজে প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে বাৎসরিক অল্পসংখ্যক লোক পীড়িত ও মৃত হইয়া থাকে, তাহাই সমধিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছে, বলা যায়। সুতরাং সমাজবিশেষের স্বাস্থ্য পরিমাণ করিতে হইলে, তাহার জনসংখ্যা এবং বিভিন্নবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এক বৎসরে কত জীবিত, পীড়িত ও মৃত নির্দ্ধারণ আবশ্যক। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভিত্তি এই সকল উপাদান, ইহার আলোচ্য স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, জীবন ও মৃত্যু। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক গত হইল, যবনদূত মেগেস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে, কি ধনী, কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নির্দ্ধারণের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যতীত ইহার অপর উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিদেশীয় তুলিকায় অঙ্কিত ভারতের অতীত রাজধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মের ঈদৃশ অনেক অপরিস্ফুট চিত্রের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ কঠিন ; অনেক স্থলে যাহা নূতন ভাবিয়া শিখিতেছি, তাহা পুরাতনেরই আবৃত্তি। আজ কাল সকল সভ্য সমাজে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহার্থ, নির্দ্দিষ্টকালে লোক গণনা (আদম সুমারি) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এতৎসম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অবধারিত হয়। এই লোকসংখ্যা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মূলধন। প্রতিবৎসর জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার হিসাব করিয়া ইহার আয় ব্যয় নিরূপিত হইয়া থাকে। মূলধনের হ্রাস বৃদ্ধি ও অধিকাংশের স্বাস্থ্যভোগরূপ বাজার সম্ভ্রমের উপর, সমাজজীবনের উন্নতি ও অবনতি বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডে ১৮০১ সালে প্রথম লোকগণনার সূত্রপাত। উত্তরোত্তর ইহার প্রয়োজনীয়তা লোক সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইলেও জ্ঞানালোকদীপ্ত ইংলণ্ড এ বিষয়ে এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এদেশে এতৎসংক্রান্ত আবশ্যকীয় বিবরণ সংগ্রহ কত দুরূহ, সহজেই বুঝা যায়। জন-সাধারণ এ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে ; তাহাতে অধিকাংশের বয়স, উপজীবিকাদি ঠিক করিয়া বলিবারও জ্ঞানাভাব। জন্ম ও মৃত্যু গোপন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও দায়িত্ব বোধের অভাবে সংবাদ দানে কৃপণতা বশতঃ, ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

রাজধানী কলিকাতায় শতকরা পঞ্চাশ-জন বিনা চিকিৎসায় ইহলোক পরিত্যাগ করে! দরিদ্র বঙ্গে কয়জন পীড়িতাবস্থায় চিকিৎসকের সাহায্য পাইয়া থাকে? বাঙ্গালায় কি কি রোগের প্রাদুর্ভাব, তাহাদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কারণ কি কি ও তজ্জনিত কিরূপ মৃত্যুর আধিক্য, সুদক্ষ চিকিৎসকের অভাবে জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যে রোগনির্ণয়রূপ একতম-স্তম্ভের উপর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, এ দেশে তাহার সূচনা বহুদূর। সরকার বাহাদুরের প্রকাশিত বাৎসরিক স্বাস্থ্যবিবরণী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে দোষপরিশূন্য হইলেও উল্লিখিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানাভাবে ইংরাজ অধিকারে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার উন্নতি বা অবনতি নিরাকরণ করা সুকঠিন। কেবল মাত্র স্বাস্থ্যোন্নত দেশবিশেষের সহিত তুলনায়, ইহার স্থান স্থূলভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রকৃত পরিমাণ স্বাস্থ্যবিদেরা পরমায়ুতালিকার সাহায্যে করিয়া থাকেন। যেমন তাপমান যন্ত্রে তাপের ন্যূনাধিক্য বুঝা যায়, সমাজবিশেষের পরমায়ু, স্বাস্থ্যের তারতম্যে, হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা পরমায়ুতালিকার সাহায্যে জানা যাইতে পারে। লোকগণনা ও মৃত্যুসংখ্যার অপূর্ণতা হেতু, বাঙ্গালা সম্বন্ধে এই তালিকা নির্ভুল না হইলেও বহুসংখ্যা লইয়া গণনা হওয়াতে ভ্রম এত সামান্য যে, মোটামুটি ইহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বাঙ্গালা ও ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যের বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

পরমায়ু তালিকা।

বৎসর বয়সে	বাঙ্গালাদেশ। ১৯০১ সাল — প্রতি দশলক্ষ প্রসূতের মধ্যে কত জীবিত থাকে	পরমায়ু	ইংলণ্ড। ১৮৯০ সাল — প্রতি দশলক্ষ প্রসূতের মধ্যে কত জীবিত থাকে	পরমায়ু	ইংলণ্ড ও বাঙ্গালার পরমায়ুর প্রভেদ
	পুরুষ	বৎসর	পুরুষ		বৎসর
০	১০০০০০০	২৮	১০০০০০০	৪৩·৭	২৫·৭
১	৭৩৮২৮০	৩২·১	৮৩৮৯৬৪	৫১·০	১৮·৯
৫	৫৮৫৫৮২	৩৪·৯	৭৫১৪৯৪	৫২·৮	১৭·৯
১০	৫৩৫৮২৩	৩২·৯	৭৩১৪৭৭	৪৯·০	১৬·৪
১৫	৪৯৯৬৭৪	৩০·১	৭২৬১৯৪	৪৪ ৫	১৪·৪
২০	৪৫৮০৬১	৩০·১	৭১২৫৫৫	৪০·৩	১০·২
৩০	৩৮০০১০	২৫·২	৬৬৯২৭৯	৩২·৫	৭·৩
৪০	৩০৬৬৭৪	২০·১	৬০৪৯২৩	২৫·৪	৫·৩
৫০	২৩৩৯৪১	১৪ ৮	৫১৭৬১৯	১৮ ৮	৪·০
৬০ ও তদূর্দ্ধ	১৫৮১৭০	৯ ৫	৩৯১৪০০	১২·৯	৩·৪
					গড় ১২·৫

এ দেশের স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, সমকালজাত দশ লক্ষ বালক, জীবনপথে অগ্রসর হইতে, বিভিন্ন বয়সে কি পরিমাণে জীবিত থাকিবে, উপরে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে বাঙ্গালায় ঐ সংখ্যার অর্দ্ধাংশ মাত্র জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইংলণ্ডে সেই অর্দ্ধাংশের জীবিত-কাল কিঞ্চিদূন পঞ্চাশৎ বৎসর। বাঙ্গালায় পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কের জীবনকাল ত্রিংশবৎসর, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার সমবয়স্কেরা দেড়-গুণ অধিক পরমায়ু লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালা ও ইংলণ্ডের পরমায়ুর গড় প্রভেদ দ্বাদশ বৎসর। কিন্তু যখন দেখা যায়, কতশত প্রতিভাবান স্বাস্থ্যবিদের প্রবর্ত্তনায়, ধনকুবের প্রজাবর্গের অগণন অর্থব্যয়ে, অখণ্ড-প্রতাপ রাজশক্তির আশ্রয়ে, গত অর্দ্ধশতাব্দীর স্বাস্থ্যোন্নতির ফলে, ইংলণ্ডে পরমায়ু গড় আড়াই বৎসর মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন উল্লিখিত বিভিন্নতা বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীনতার কিরূপ ভয়ঙ্কর নিদর্শন, সহজে বুঝা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উভয় দেশের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত। এক

দিকে ধন, জন, বল, বুদ্ধি ; অপরদিকে দারিদ্র্য, অকাল-মৃত্যু, কাপুরুষতা ও ঘোর অজ্ঞানান্ধকার।

কোন কল্পিত লোক সংখ্যা, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায়, কীদৃশ পরমায়ু লাভ করিতে পারে, তাহা দেখা গেল। এখন এদেশে প্রতি বৎসর প্রকৃত কত মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, বিভিন্নবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তাহার পরিমাণ, ও ইংলণ্ডের তুলনায় ইহা বাঙ্গালার কিরূপ অবস্থা সূচনা করে, ২য় তালিকায় দেখান যাইতেছে।

২য় তালিকা।

বৎসর বয়সে	বাঙ্গালাদেশ ১৯০১		ইংলণ্ড ১৮৯৯	
	প্রতিসহস্র জীবিতের মধ্যে মৃত্যুহার			
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০-৫	৯১ ৮০	৭৬·৪৬	৬০·৪	৫০·৭
৫-১০	১৭·৭৬	১৪ ৮৮	৩ ৮	৩·৯
১০-১৫	১৩·৯৭	১২·৮২	২·২	২·৩
১৫-২০	১৭·৩৯	১৭ ১১	৩·৬	৩·৩

বিশ বৎসর বয়সের পর উভয় দেশের বয়স সম্বন্ধে সমতা না থাকায়, আমরা তুলনা করিলাম না। তথাপি উভয়ের পার্থক্য এত অধিক যে, স্বাস্থ্যের তারতম্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বৎসর বয়সে	বাঙ্গালাদেশ		ইংলণ্ড		বৎসর বয়সে
	প্রতিসহস্র জীবিতের মধ্যে মৃত্যুহার				
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	
২০-৩০	১৮ ৬৮	১৭ ৬৭	৫·৩	৪·৩	২০-২৫
৩০-৪০	২১·৪৪	১৯·০০	৭ ১	৬ ১	২৫-৩৫
৪০-৫০	২৭·০৭	২২ ২৯	১২ ৩	১০ ০	৩৫-৪৫
৫০-৬০	৩৯·১৩	৩৫ ২২	২০·০	১৫·৪	৪৫-৫৫

২য় তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, বাঙ্গালায় পঞ্চবর্ষের অনধিক মৃত্যুসংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় দেড়গুণ। অবশ্য, ভৌতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর দেশের জন্ম-মৃত্যু অনেকাংশে নির্ভর করে। সকল বিষয়ে এক অবস্থাপন্ন না হইলে দুই বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুলনা সমীচীন হয় না।

সুতরাং হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ঐ সকল অবস্থাগত পার্থক্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড অপেক্ষা বাঙ্গালায় জন্মের হার এক ষষ্ঠাংশ অধিক এবং স্বভাবতঃ শৈশবে মৃত্যুর আধিক্য হয় বলিয়া এ দেশে শৈশব-মৃত্যু সেই পরিমাণে অধিক হইতে পারে। অপর দিকে বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ; এখানে শতকরা ৯৫ জন গ্রামবাসীর স্থানে, ৫ জন মাত্র নগরবাসী বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইংলণ্ডে নগর-বাসীর সংখ্যা শতকরা ৭৭ জন। সকল দেশেই জনপূর্ণ নগরে শৈশব-মৃত্যুর আধিক্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইংলণ্ডে ঐ মৃত্যুহার অধিক হওয়া সম্ভব। উভয়ের সামঞ্জস্য করিলে বাঙ্গালায় শৈশবে মৃত্যুর আধিক্যের কারণ যে স্বাস্থ্যহীনতা, ইহাই পরিচয় দেয়। কিন্তু জীবনের যে সময়ে স্বভাবতঃ দেহের পরিপুষ্টতা, বীর্য্যের উন্মেষ, স্বাস্থ্যের লাবণ্য, ব্যাধি ক্ষীণপ্রভাব, বাঙ্গালায় সেই পক্ষ হইতে বিংশ বয়স্কের মৃত্যুসংখ্যা, চতুর্গুণেরও অধিক। এ দেশে অকালমৃত্যুর আর কি প্রমাণান্তর আবশ্যক?

১৯০১ সালের লোকগণনায় প্রকাশ, বাঙ্গালায় মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা অধিক বলিয়া ১৮৯১ হইতে দশবৎসরে এ দেশে ৩৩৫৮৫৭৬ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। বিভিন্ন বয়সে এই বৃদ্ধি বিভাগ করিলে দেখা যায়, পঞ্চবর্ষের অনধিকবয়স্ক বালক ও ষষ্ঠি বর্ষাধিক বৃদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়াছে। শৈশব ও যৌবন মৃত্যুর আধিক্য বশতঃ, লোকে যে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেছে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। অবশ্য এ দেশের লোক গণনার অসম্পূর্ণতা এবং কেবল দশ বৎসরের প্রমাণ লইয়া কোন স্থির মতামত প্রকাশ ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু অকালমৃত্যুর অপরাপর নিদর্শনের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহাও যে অর্থশূন্য নহে, এ বিশ্বাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ৩য় তালিকায় ইহা প্রতীয়মান হইবে।

৩য় তালিকা।

বাঙ্গালার লোক সংখ্যা।

বয়স	লোক গণনা ১৮৯১ পুরুষ	লোক গণনা ১৮৯১ স্ত্রী	লোক গণনা ১৯০১ পুরুষ	লোক গণনা ১৯০১ স্ত্রী	হ্রাস বা বৃদ্ধি পুরুষ	হ্রাস বা বৃদ্ধি স্ত্রী
০-৫	৪৯৯২০২৮	৫৩৮৮৫০৮	৪৯৪২২৭২	৫৩০৯৯৪৭	—৪৯৭৫৬	—৭৮৫৬১
৫-১০	৫৪৫৯৩০৪	৫২৪৯৪৩৯	৫৬৬০৩৬৬	৫৫৪৪৬৬৬	+২০১০৬৪	+২৯৫২২৭
১০-১৫	৪৩০৩১৫৪	৩৪৫৯১০৪	৪৬৪২৯৫১	৩৭৬১১১১	+৩৩৯৭৯৭	+৩০১৯৭৭
১৫-২০	২৮৮৫৩৩৪	২৯৯৫২৬৪	৩১৮৬৭৬১	৩৩৩৫২৫১	+৩০১৪২৭	+৩৩৯৯৮
২০-৩০	৫৩৭১০৫৪	৬১২১৯৫৪	৬১৪১২৬৬	৬৬৫৮৪৬৬	+৭৭০২১২	+৫৩৬৫১২
৩০-৪০	৫১২০২০৪	৪৯২৭৬০৪	৫২৮৫২৬৬	৪৯৪৮৮৫১	+১৬৫০২২	+২১২৪৭
৪০-৫০	৩৪৯৪১৩৯	৩৩৩৫৩৪৪	৩৬১০৬৩১	৩৪০০৭৪৬	+১১৬৪৯২	+৬৫৪০২
৫০-৬০	২০০৫০৭৪	২০৮৮৩৫৪	২০৮২৯৯১	২১৩৩৯৭৬	+৭৭৯১৭	+৪৫৬১২
৬০ ও তদধিক	১৬৮৭৮০৪	২১৮৫৯০৪	১৬৭০২৯১	২১১২৩৯১	—১৭৫১৩	—৭৩৫১৩

বঙ্গে অকালমৃত্যুর যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইল, তাহাতে নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে, বঙ্গের সমাজশরীর দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত। এই অকালমৃত্যু স্থান বা কাল নির্ব্বিশেষে কি এই দেশের নৈসর্গিক অবস্থা? বাঙ্গালার জলবায়ু স্বভাবতঃ কলুষিত বলিয়া কি চিরকাল অতিমৃত্যুর প্রবাহ বহন করিতেছে, বা ইহার সমাজদেহ কোন মহাদোষের সংক্রামণে অকালে জীর্ণ হইতেছে? এই মহারোগের মূল কি এবং কি উপায়ে বা ইহার শান্তি হইতে পারে, ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

স্বাধীনতা।

(স্বামী পরমানন্দ।)

মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়েই স্বাধীনতার বীজ নিহিত। এই জগতে দাসত্বকে কে না ঘৃণা করে এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে কাহার না হৃদয় আকুল হয়? একটী সামান্য কীট হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুন্নতচেতা মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়ই এই স্বাধীনতাতরঙ্গে তরঙ্গিত। এই স্বাধীনতার হীনতায় অতি নিকৃষ্ট বুদ্ধিহীন জীবও প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। একটা সামান্য বন্য পক্ষীকে লইয়াও দেখিতে পার (যাহাদিগকে আমরা সর্ব্বতোভাবে বিচারশক্তিবিহীন মনে করিয়া থাকি) যে, তাহার ভিতরেও এই স্বাধীনতার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। বন হইতে একটী পক্ষীকে ধরিয়া আনিয়া তুমি অতি যত্নে সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তাহাকে উত্তম উত্তম আহার প্রদান কর, যাহা সে বনে থাকিলে কখনই পাইতে পারিত না, কিন্তু দেখিবে, সে এ সকল কিছুই পছন্দ করিবে না। তোমার সোনার খাঁচায় বাস তাহার পক্ষে ভয়ানক বন্ধন বলিয়া বোধ হইবে। এবং তোমার দেওয়া উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী তাহার বিষময় বলিয়া বোধ হইবে। তাহার কাছে এ সব কিছুই ভাল লাগিবে না। কেন না, সে চায় স্বাধীনতা। সে সমস্ত দিনের পরিশ্রমলব্ধ সামান্য একটী ফল বা অন্য কোন জিনিষ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে স্বীকৃত, তবু তোমার সুবর্ণপিঞ্জরে বাস করিয়া উত্তম খাদ্য খাইতে নারাজ। বনে থাকিয়া সে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ এবং ঝড় বৃষ্টির প্রবল তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত, তবু তোমার অমন সুবর্ণপিঞ্জরে বাস করিতে সর্ব্বতোভাবে অনিচ্ছুক। তোমার কাছে সোণার খাঁচা একটী আদরের জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কাছে ইহা কারাগার এবং বন্ধন বই আর কিছুই নয়।

এই ত গেল সামান্য বুদ্ধিহীন জীবের দৃষ্টান্ত। আবার উন্নতচেতা মনুষ্যের ভিতরও এই ভাবই খেলিতেছে। একজন দরিদ্রব্যক্তি তাহার দরিদ্রতা ঘুচাইবার জন্য প্রাণপণ যত্নবান। সে কি চায়? না, দরিদ্রতারূপ বন্ধন ঘুচাইয়া স্বাধীনতা ধন লাভ করিতে—ধনাঢ্য হইতে। আবার ধনাঢ্য

ব্যক্তি চান কি? না, ধনাঢ্যতর হইতে, ধনাঢ্যতর ব্যক্তি আবার চান ধনাঢ্যতম হইতে। এইরূপে যিনি যত বড়ই হউন না কেন, সকলেই চান কিনা, তিনি যাহার অধীন, তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে। আবার একজন রোগী ব্যক্তি চান কি? না, তাঁহার রোগরূপ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে। একজন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি চান কি? না, তাঁহার জরারূপ বন্ধন ঘুচাইয়া দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট নবযৌবন লাভ করিতে। পৃথিবীর সম্রাট চান কি? না, জরা মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া চিরকাল সুস্থকায়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রতিপালন করিতে। আবার ঐ যে সাধু ব্যক্তি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা নিজের শরীরকে পাত করিতেছেন, উনিও চান ঐ স্বাধীনতা লাভ করিতে। কিন্তু উঁহার ভাব স্বতন্ত্র। উনি বুঝিয়াছেন যে, এই জগতের যত কিছু জিনিস সবই অকিঞ্চিৎকর। সুখও যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুঃখও তেমনি এবং একটীকে নিলে আর একটীকে নিতেই হবে। এই সকল জানিয়া মনকে ঐ সমস্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইতে টানিয়া লইয়া এমন কোন স্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন, যেখানে গেলে আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং চিরকালের জন্য স্বাধীন হওয়া যায়। ইহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা গেল যে, অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুন্নতচেতা মোক্ষাভিলাষী মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক গতিই এই স্বাধীন হইবার ইচ্ছা। এ ধরাধামে এমন কে অধম আছে যে, দাসত্বকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে না? সকলেই আজ্ঞাকারী হইতে চায়, কে আর আজ্ঞা পালন করিতে ভালবাসে? রাজাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্য স্বাধীন রাখিবার জন্য নিজ নিজ প্রাণকে পর্য্যন্ত হেয় জ্ঞান করিয়া স্বসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন। পুরাতন ইতিহাসে ইহার অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মা বসুন্ধরা কত শতবার এই স্বাধীনতার প্লাবনে নররক্তে প্লাবিত হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন! মানুষ নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নয়, তবু দাসত্ব করিতে নারাজ। দাসত্ব এত ঘৃণার জিনিস কেন? কারণ এই যে, দাসত্ব মানুষের উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ। মানুষ যত দিন অপরের দাসত্ব করে, সে ততদিন নিজের কোন সৎ ইচ্ছা হইলেও তাহা পূর্ণ করিতে পারে না, তাই আবহমান কাল হইতে দাসত্বে ঘৃণা এবং স্বাধীনতায় ভালবাসা, এই রীতি চলিয়া আসিতেছে।

সাধারণ চক্ষে হেমনির্ম্মিত সিংহাসনোপবিষ্ট পার্ষদগণ এবং অসংখ্য দাসদাসী পরিসেবিত স্বর্ণমুকুটধারী পৃথিবীর সম্রাটই স্বাধীন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাকে কোন মতেই স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। কারণ, সম্রাটকেও তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগ শোক তাপে ভুগিতে হয় এবং শেষে মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হয়। ইহাতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যাহা সম্রাটকেও চালাইতেছে। স্বাধীনপদবাচ্য কে? যাহার কোনরূপ বন্ধন নাই, এমন পুরুষ। এক জন দরিদ্র ব্যক্তি, যাহার কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দিনাতিপাত করিতে হয়, তুলনায় সমৃদ্ধি-শালী রাজপুরুষকে কোন অংশেও তাহা অপেক্ষা উচ্চ বলা যাইতে পারে না। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তিও যেমন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থার ভিতর দিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, রাজাও তেমনি। রাজাও যেমন শোক দুঃখে অধীর, দরিদ্র ব্যক্তিও তদ্রূপ। রাজাও যেমন কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতেছেন, দরিদ্র ব্যক্তিও তদ্রূপ। তবে প্রভেদ এই মাত্র যে, রাজা যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ অনায়াসে অহরহ করিতেছেন, দরিদ্র ব্যক্তির সে সকল তাহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রমেও হওয়া অসম্ভব, কিন্তু শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়সুখভোগ এবং ভোগের ইচ্ছাকে জীবের পাশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ইহারা যে স্বাধীন নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ অনাবশ্যক।

মানুষ ভুলক্রমে অনেক সময় মনে করে, যাহার অনেক বৈভব আছে এবং যাহার অনেক আজ্ঞাবহ দাস-দাসী আছে এবং যাহার কার্য্যে বাধা দিবার কেহই নাই, এরূপ ব্যক্তিই স্বাধীন। বাস্তবিক উচ্চপদ, বৈভব, দাসদাসী এ সব কিছুতেই মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতা লাভের উপায় অন্যরূপ। ইহা লাভে রাজারও যেমন অধিকার, একজন দরিদ্র ব্যক্তিরও তেমন অধিকার; একজন ব্রাহ্মণেরও যেমন অধিকার, একজন চণ্ডালেরও তেমন অধিকার। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, ইহা লাভে সকলেরই সমান অধিকার। এই অমূল্য ধন আজও পর্য্যন্ত কেহ অর্থসাহায্যে বা রাজশাসনে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই এবং কেহ কখন পারিবেন কি না সন্দেহ। মানুষের প্রথম বিচার করা উচিত যে, সে কাহার অধীন? এ জগতে এমন কি জিনিষ আছে, যাহাতে তাহার উপর

আধিপত্য করিতে পারে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, "মাত্রা-স্পর্শাস্তু কৌন্তেয়, শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ, আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।" হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত বিষয়ের যে সংযোগ, তাহাই শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির কারণ এবং ইহা উৎপত্তিনাশশীল, অনিত্য পদার্থ। অতএব হে ভারত, এ সকল তুমি সহ্য কর। স্বাধীন কে? যাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। যিনি সর্ব্ব অবস্থাতেই স্থির থাকেন, যিনি অচল, অটল, সুমেরুবৎ। অতএব যিনি দুঃখে কাতর এবং সুখে উৎফুল্ল, প্রশংসায় আনন্দিত এবং নিন্দায় ক্রোধান্বিত, তিনি কখনই স্বাধীনপদবাচ্য হইতে পারেন না।

তবে স্বাধীন কে? "যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥" হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল সুখ দুঃখে যাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমভাবাবলম্বী ধীর পুরুষই অমরত্ব লাভ করেন। অতএব বাহিরের কোন জিনিষের সাহায্যে যে অমরত্ব লাভ করা যায় না, ইহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই যে মানুষের একমাত্র সুখদুঃখ শান্তি অশান্তির কারণ, ইহাও বেশ প্রমাণ করা যায়। প্রথমে দেখা যাক যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কি প্রকারে সংযোগ হয়। বিষয় ত বাহিরের জিনিষ। এ আবার কি প্রকারে মানুষের ভিতর প্রবেশ করে এবং কি করিয়া বা তাহাকে সুখদুঃখভাগী করে? সুরূপ দেখিলে তোমার প্রাণে আনন্দ হয় এবং কুরূপ দেখিলে ঘৃণা হয়। আচ্ছা, এই আনন্দ ও নিরানন্দ উৎপন্ন করাইবার কারণ কে? রূপ দুইটীইত বাহিরে। আচ্ছা, একটী অন্ধ ব্যক্তিকে লইয়া ঐ সুরূপ এবং কুরূপ দেখাও এবং সে কি বলে শোন। তাহার কাছে সবই সমান, অতএব তাহার সুরূপ দেখে আনন্দ এবং কুরূপে ঘৃণা জন্মে না, ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, আমাদের দশ-নেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ বিষয় দুইটীকে আমাদের ভিতর লইয়া যাই এবং এক-টীতে ঘৃণা জন্মাইয়া ও আর একটীতে আনন্দ জন্মাইয়া দেয়। ঐরূপ মধুর স্বর এবং কর্কশ স্বর শুনিয়াও তোমার সুখদুঃখ জন্মে, কিন্তু একজন বধির ব্যক্তির তাহা হয় না। এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়, সকলেই বিষয়ের সহিত সংযোগে সুখ দুঃখ, হিংসা দ্বেষ, কাম ক্রোধ ইত্যাদি মনের বৃত্তি সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

মানুষ ভুলক্রমে মনে করে, তাহার শত্রু বাহিরে। বাস্তবিক তাহা নহে। তাহার শত্রু এই পঞ্চেন্দ্রিয়। সে আর কাহারও অধীন নহে। এক-মাত্র এই পাঁচটীর। ইহারাই মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে, ইহারাই মানুষকে কর্ম্মচক্রে ঘুরাইতেছে এবং ইহারাই মানুষের স্বস্বরূপ ভুলাইয়া দিতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সংগস্তেষূপজায়তে।
সংগাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তাহার উপর আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সংমোহ (হিতাহিতবিবেচনাশক্তিরাহিত্য) হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মানুষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যেমন কোন একটী সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে কবিতে মনে মনে তাহার উপর আসক্তি জন্মে এবং আসক্তিব সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মে, ঐ ইচ্ছার পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে কোনরূপ বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইলেই ভয়ানক ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রোধের সময় মানুষ একেবারে হিতাহিত বিবে-চনা শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মানুষ এত কর্ম্ম করে কেন? একমাত্র তাহার কামনা পরিপূর্ণ করি-বার জন্য, এবং ঐ ইন্দ্রিয় জন্ম কামনাই তাহার যত দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণার কারণ। ইহাতে বেশ দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয়গণই একমাত্র মানু-ষের বন্ধনের কারণ। ইহাদিগকে জয় করাই একমাত্র স্বাধীন হইবার উপায়। এখন ইন্দ্রিয়গণকে কি করে জয় করা যায়, তাই দেখা যাক্। চক্ষুর স্বাভাবিক ধর্ম্মই ত রূপ দর্শন করা। এর আবার নিরোধ করা কি প্রকার? তবে চক্ষুকে কি নষ্ট করিতে হবে? না, তা নয়। অন্ধ হইবে কেন? কামনা পরিত্যাগ কর, চক্ষু যেন তোমার উপর আধিপত্য কবিতে না পারে, তুমিই উহার উপর আধিপত্য কর, উহাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার দাস কর। কর্ণকেও বধির করিতে হইবে না,

তবে উঁহার দাসত্ব করিতে যেন তোমার না হয়। যেন সর্ব্বদাই তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় সুস্বর শুনিতে লালায়িত না হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকেও তোমারই অধীনে রাখ, যেন তাহারা তোমার উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত চালাইতে না পারে। যিনি এইরূপ প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক ধীর। তিনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সব সময়েতেই স্বাধীন। তাঁহাকে আদরই কর বা অনাদরই কর, তাঁহাকে নিন্দাই কর আর স্তুতিই কর, তিনি সব অবস্থাতেই সমভাবাবলম্বী থাকেন। ভগবান ব্যাসতনয় এই অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে জ্ঞানলাভার্থ জনক রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জনক রাজার ঘরে প্রায় দুই তিন দিন অনশনে অনিদ্রায় উপবিষ্ট ছিলেন। পরে জনক রাজা যখন সংবাদ পাইয়া অতি সমাদরে রাজসভায় লইয়া গিয়া পূজাদি করিলেন, তখনও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে রহিলেন। কারণ, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আর সাধারণ লোকের ন্যায় বিষয়ের সংযোগে সুখ দুঃখ উৎপন্ন করিতে পারিল না। কেন না, তিনি উহাদিগকে জয় করিয়া নিজেরই পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এক দিন যীশুখ্রীষ্ট এই স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও সম অবস্থায় রহিলেন এবং অত্যাচারীদের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যেন শিক্ষা দিলেন যে, ইন্দ্রিয় জয় করিলে আর মানুষের শত্রু থাকে না। ইন্দ্রিয়ই মানুষের একমাত্র শত্রু। বালক তথাগত একদিন জরামৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য রাজ্যসুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে কঠোর তপস্যার দ্বারা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ নামে পরিচিত হইয়া এই অমূল্য ধন প্রতি জনে জনে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তিতে দস্যুর হৃদয় পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল এবং তিনি বহুকাল হইতে জগতের অধিকাংশ লোকের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

জগৎপূজ্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী এই স্বাধীনতার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি বেদ বেদান্তের সার মর্ম্ম সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া জীবকে এই পরম ধন লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কাহিনী আজ ঘরে ঘরে

আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুনা যায়। শাস্ত্রে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, ইন্দ্রিয় দমন না করিলে কোন মতে স্বাধীন হওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় দমন করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়; মনে হয়, মানবদেহ ধারণ করেও ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই মহাপুরুষ বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়জিৎ ছিলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি কখন তাহাদের দাসত্ব করেন নাই। রমণীর রূপলাবণ্য দর্শনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয় তাহাকে বাতুলের ন্যায় করিয়া তোলে। কিন্তু এই মহাপুরুষের দর্শনেন্দ্রিয় তাঁহাকে বাতুল করা দূরে থাকুক, আরও স্থির ধীর করিয়া তুলিত। তিনি যেন ঐ কামিনীর ভিতরে কি এক মহা দেবভাব দেখিতে পাইতেন। কারণ এই যে, তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে তাঁহার অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাই ইচ্ছানুযায়ী চালাইতেন। যাঁহারা অর্থাভাবের জন্য অপরের দাসত্ব করিতে হয় বলিয়া আমি পরাধীন বলিয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই মহাপুরুষের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারেন যে, অর্থ সাহায্যে বা পার্থিব কোন জিনিসের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব। তাহা হইলে এই নিরক্ষর কাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ কখনই জগতের আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া গণিত হইতে পারিতেন না। অতএব আত্মজয় করাই যে একমাত্র স্বাধীন হইবার উপায়, তাহা এই মহাপুরুষের জীবন হইতেই বেশ বুঝা গেল।

এই সকল চরিত্রকে আদর্শ করিয়া প্রাণপণে জিতেন্দ্রিয় হইতে চেষ্টা করাই একমাত্র মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানবজীবন পেয়ে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা তো কাপুরুষের কার্য্য। ভাই, তুমি নিজেকে বীর বলিয়া মনে করিতেছ ও ঢাল তরোয়াল লইয়া শত্রু বিনাশে অগ্রসর হইতেছ, কি তোমার ভ্রম। যে নিজের দেহের ভিতরের শত্রুকে জয় করিতে অক্ষম, তাহার বাহিরের শত্রু জয় করিতে যাওয়া কেবল বাতুলতামাত্র। ধাতু-নির্ম্মিত ঢাল তরোয়াল নিয়ে কি আর শত্রু জয় করা যায়? ঐ আদর্শ মহাপুরুষদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে এখনই তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ঐ মহাপুরুষেরা আত্মজয় করিয়াছিলেন, তাই সমস্ত জগৎ তাঁহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তুমিও আত্মজয়

কর, দেখিবে, সমস্ত জগৎ আপনাপনি তোমায় নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। তবে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে হইবে। ঐ মহাপুরুষেরাও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট সয়তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য মহাপুরুষকেও ঐরূপ কত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল; তুমিও যুদ্ধ কর, জয়ী হইবে, নিঃসন্দেহ। ও ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রে ভিতরের শত্রুকে নিহত করিতে পারিবে না। বিচারের তীক্ষ্ণ খড়্গে অন্তর্নিহিত শত্রুগণকে প্রাণপণে আঘাত কর এবং ধৈর্য্যঢালে তাহাদের প্রতিঘাত সহ্য কর, কখনও ভগ্নোৎসাহ হইও না। যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে না আনিতে পার, ততদিন উঁহাদিগকে কোনও মতে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিও না। একবার স্বাধীন হইতে পারিলে আর তোমার কিসের ভয়? তখন তুমি ত চিরকালের জন্য তৃপ্ত হইবেই এবং কতশত নরনারীকেও তৃপ্ত করিবে। অতএব সকলেই এই চিরতৃপ্তিকর অমৃততুল্য স্বাধীনতালাভে যত্নবান হও। জয় পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য করিও না। পরাধীন জীবন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করা ত বীরের কর্ম্ম।

প্রেম।

(স্বামী পরমানন্দ।)

সমগ্র জগৎকে জগৎপিতার আবাসভূমি মনে করা এবং সমস্ত নরনারীকে তাঁহার সন্তান সন্ততি জ্ঞানে ভাই ভগিনীর ন্যায় ভালবাসা বাস্তবিকই অতি উচ্চ কথা, এবং যাঁহারা ঐরূপ দৃষ্টিতে জগৎকে এবং জগতের সমস্ত নরনারীকে দর্শন করেন, তাঁহারা যে বাস্তবিকই অতি হৃদয়বান প্রেমিক পুরুষ, তাহা নিঃসন্দেহ।

কথাটী কিন্তু মুখে বলা যত সোজা, কার্য্যে পরিণত করা তেমন নয়, আবার কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে মুখে বলা আর না বলা সমানই কথা। আজকাল প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মুখে যতটা, কার্য্যে ততটা পরিণত হচ্চে কি না, সে বিষয় একটু বিচার করে দেখা যাক। খ্রীষ্ট প্রচার করে গেলেন, "হে

নরনারীগণ, তোমরা সকলে হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে সকলকে ভালবাস্তে শেখ, তোমার দক্ষিণ গালে কেহ চড় মারিলে, তাহাকে তুমি তোমার বাম গাল ফিরাইয়া দাও।” খ্রীষ্ট নিজের জীবনে ওটী বেশ দেখিয়ে গেলেন, ক্ষমার চূড়ান্ত, শত্রু মিত্রকে সমভাবে আলিঙ্গন দিলেন এবং জগতের আদর্শ মহাপুরুষ হইলেন, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাও কতক কতক তাঁহাদের নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টীয়ান দল আর নিজেদের জীবনে বিশেষ কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌লেন না, কেবল মুখে ঐ ধুয়া ধরিলেন, “সকলকে ভালবাস্‌তে শেখ ;” কিন্তু লোকে তা শুন্‌বে কেন ? তুমি নিজে কাজে কচ্ছ এক রকম, আর মুখে বল্‌ছ তার ঠিক উল্‌টো ; মুখে বল্‌ছো হিংসা দ্বেষ ভুলে যেতে, কিন্তু নিজে সেই হিংসা দ্বেষের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বসে আছ, সকলকে উপদেশ দিচ্ছ, “সমস্ত নরনারীকে জগৎপিতার সন্তান সন্ততি জ্ঞানে ভাই ভগিনীর ন্যায় ভালবাস্তে শেখ।” কিন্তু তোমার নিজের কার্য্য কি প্রকার ? তোমার ও ভাই ভগিনী ভাব কেবল মুখস্থ কথা।

তোমার নিজের সমাজের সমমতাবলম্বী গুটীকতক লোককে তুমি ভালবাস, কিন্তু বাহিরের লোক, যে তোমার নিজ ধর্ম্মাবলম্বী নয়, যে তোমার মতবিরোধী, তাহার প্রতি তোমার কি ব্যবহার ? তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এমন কি ভীষণ অত্যাচার আছে, যাহা তুমি করিতে প্রস্তুত নও ? এই কি তোমার সর্ব্বজীবে সমান ভালবাসা ? এই কি তোমার ভ্রাতৃভগিনীভাব ? কাজে কাজেই তোমার শিষ্যগণও তোমারই অনুকরণ করিতেছে। তুমি হচ্চ উপদেষ্টা, তুমি যা কর্‌বে, তাহারাও তাই অনুকরণ কর্‌বে।

বুদ্ধদেব “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” প্রচার করে গেলেন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য নরনারী তাঁহার মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অতি অল্পলোকেই ঐটী কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেন ; তথাপি ধুয়াটী কেউ ছাড়্‌লে না। রাত্রিবেলা আহার করবে না, পাছে অজ্ঞাতসারে কোন কীটাণুর হিংসা করিতে হয়। এদিকে একজন ভিন্নমতাবলম্বী বিদেশবাসী নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত নন! ইহাকে কি আর অহিংসা বলা যাইতে পারে, না, প্রেম বলা যাইতে পারে ? কায়মন এবং বাক্য দ্বারা কাহা-

রও অনিষ্ট না করার নাম অহিংসা। শরীরের বলপ্রয়োগ দ্বারা কাহা-রও উপর অত্যাচার করার নাম কায়িক হিংসা। মনে মনে কাহা-রও অনিষ্ট চিন্তা করার নাম মানসিক হিংসা; যেমন, কাহারও উন্নতি দেখিয়া মনে মনে ক্ষোভ করা বা অমুকের সর্ব্বনাশ হউক, এইরূপ ইচ্ছা করা।

কাহাকেও কটু কথা বলা এবং এমন কোনও কথা প্রয়োগ করা, যাহাতে তাহার অনিষ্ট হয়, এইরূপ করার নাম বাচিক হিংসা। অত-এব ইহার একটি মাত্র থাকিলেও মানুষ অহিংসক হইতে পারে না এবং অহিংসক না হইতে পারিলে তিনি কখনই প্রেমিকপদবাচ্য হইতে পারেন না।

আজকাল অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এই পবিত্র প্রেমের ভাবকে বড়ই সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা নিজের পরিবারবর্গকে এবং নিজের মতাবলম্বী গুটী কতক স্ত্রী পুরুষকে ভালবাসিয়া এবং তাহাদের সাহায্য করিয়া প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু নিরাশ্রয় উপায়হীন দূর-দেশবাসী একটী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে ভালবাসা দূরে থাকুক, তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য কোন নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতেও কুণ্ঠিত নন! ইহাকে কি আর প্রেম বলা যাইতে পারে? এ ত স্বার্থপরতা! তোমায় যে ভালবাসে, তাহাকে তুমি ভালবাস এবং তোমায় যে নিন্দা করে, তাহাকে তুমি পীড়ন কর। এ ত পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে; তবে আর তুমি তাহাদের অপেক্ষা কিসে উচ্চ? প্রেম অতি উচ্চ জিনিষ, সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসার নাম প্রেম। প্রেমে স্বার্থ সিদ্ধির ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না এবং প্রেমিক পুরুষের এ জগতে কেহই শত্রু নাই। তিনি নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষদিগকেও যেরূপ চক্ষে দেখেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তিকেও ঠিক তেমনই দেখেন। তিনি তাঁহার পরম অত্যাচারী শত্রুকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদকে একই ভাবে আলিঙ্গন করেন। "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ" এইটী হচ্চে প্রেমিক পুরুষের লক্ষণ। অতএব স্বার্থত্যাগই একমাত্র প্রেমবান হইবার উপায়। সাধা-রণ মানুষ, যাহা দ্বারা তাহার স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এমন লোক-কেই কেবল ভালবাসিতে পারে। কাজে কাজেই যেখানে তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, সেখানে অপমান নিন্দা, সেখানে তাহাদের অস্ত্র

মূর্ত্তি, সেখানে তাহারা ভালবাসা দূরে থাকুক, বিপক্ষদের প্রাণ নাশ করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু প্রেমিক পুরুষে ঠিক ইহার উল্‌টো ভাব। তাঁহার সব সময়েই সমভাব; তুমি মানই দাও, আর অপমানই কর, আদরই কর আর অনাদরই কর, নিন্দাই কর আর স্তুতিই কর, সব অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট ও সমভাবাপন্ন। তিনি জানেন যে, সকলেই সেই এক প্রেমময়ের সন্তান এবং সকলেই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেছে। এই জ্ঞানে তিনি শত্রু মিত্রকে সমভাবে ভালবাসিতে পারেন এবং মান অপমানে ও স্তুতি নিন্দাতেও সন্তুষ্টচিত্তে স্থির থাকিতে পারেন। কিন্তু এরূপ প্রেমিক মহাপুরুষ জগতে বড়ই দুর্ল্লভ। দুর্ল্লভ হইলেও পৃথিবী ঐ অমূল্য ধন হইতে একেবারে বঞ্চিত নন। তাঁহারাই এই জগতের একমাত্র আদর্শ মহাপুরুষ। আজ একটি মহাপুরুষের কথা বলিব, যিনি বাস্তবিকই প্রেমপূর্ণ ছিলেন, যাঁহার হৃদয়ে সাম্প্রদায়িক ভাব একেবারেই ছিল না, যাঁহার বিশাল হৃদয়ে সর্ব্বমতাবলম্বী সমভাবে স্থান পাইয়াছিলেন, যাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেম আজ জগৎ ব্যাপিয়া ঘোষিত হইতেছে, যিনি নিরক্ষর হইয়াও আজ জগৎপূজ্য, সেই পূজ্যপাদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই এই প্রেমের আদর্শ।

আজকাল প্রেম শব্দটী একটা কথার কথা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক প্রেম যে কি অপূর্ব্ব জিনিষ, তাহা এই মহাপুরুষের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন তাহার পরিবারবর্গকে এবং বড় জোর তাহার ধর্ম্মভাইগুলিকে ভালবাসিতে পারে। এমন কি, হয়ত তাহাদের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ। যিনি তাঁহার ধর্ম্মভুক্ত নন, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ বলিতেন যে, শুধু নিজের ভাই বোন পিতা মাতা প্রভৃতিকে ভালবাসার নাম মায়া, এমন কি, শুধু দেশের লোক স্বজাতি বা নিজ ধর্ম্মাবলম্বী লোকগুলিকে ভালবাসার নামও মায়া, কিন্তু সকল দেশের লোককে, সকল জাতিকে এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীকে সমান ভাবে ভালবাসার নাম প্রেম। সাধারণতঃ আমরা কি দেখিতে পাই? হিন্দুদিগের ভিতরে যাহারা বৈষ্ণব, তাহারা তাহাদিগের বৈষ্ণব ভাইগুলিকে ভালবাসে, কিন্তু একজন শৈব

বা অন্য কোন দেবতার উপাসককে ভালবাসা দূরে থাকুক, প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা বৌদ্ধ, তাহারা ঐ "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" মতাবলম্বী ভাই কটী ছাড়া কোন বিধর্ম্মীকে নিষ্পেষিত করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। খ্রীষ্টানগণ তাহাদের ধর্ম্মভাইগণ ব্যতীত সকলকে ঘোর অজ্ঞানান্ধ মনে করিয়া থাকে। মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্মকে একমাত্র সার জ্ঞানে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের রক্তে স্নান করিতেও কুণ্ঠিত নন, আর যত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই পরস্পর পরস্পরকে পদানত করিতে যত্নবান। এই ঘোর ঈর্ষ্যানলের ভিতর ঐ প্রেমিক মহাপুরুষ করপ্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। আচার্য্যগণ নিজ নিজ মত সমর্থন পূর্ব্বক মহা বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ বা মুখে সকলকে ভাই ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু সকলেই কূপমণ্ডুকের ন্যায় নিজ নিজ গর্ত্তে বসিয়া আছেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মকেই একমাত্র জগতের সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু এই নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ বাস্তবিকই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহার নিকট নানা মতাবলম্বী অসংখ্য নরনারী আসিয়াছিলেন এবং সকলেই সমানভাবে সমান আদর পাইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে জগন্মাতার সন্তান বলিয়া জানিতেন এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যতকিছু ঘটনা ঘটিয়া থাকে ও যত কিছু মতভেদাদি আছে, তাহা সকলই জননীর ইচ্ছানুযায়ী মনে করিতেন, তাই তিনি সকলের ভিতরই সেই এক মহাশক্তির বিকাশ দেখিতে পাইতেন।

আমাদের কি ভ্রম। আমরা মনে করি যে, বিজাতীয় বিধর্ম্মী বিদেশীয়গণ এক জগন্মাতার সন্তান নহে, আমরাই তাঁহার প্রিয়পুত্র হইয়া বসিয়া আছি। হৃদয়ের কি সংকীর্ণতা! কি অজ্ঞানান্ধতা! কিন্তু এই আদর্শ প্রেমিক মহাপুরুষ আমাদের অজ্ঞান নাশের নিমিত্ত জ্ঞানালোক লইয়া দণ্ডায়মান। সকলকেই দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন, "তোমার যা মত, ইহা অতি সত্য। উহাতে দৃঢ় হইলেই তোমার সিদ্ধবস্তু লাভ হইবে। কিন্তু আর যত মতাবলম্বী আছে, দেখো, তাহাদিগকে যেন ঘৃণা করিও না, মনে করিও না যে, তাহাদের ধর্ম্ম মিথ্যা। তোমার ধর্ম্ম যেমন সত্য, তাহারও তেমনি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথ সেই একই স্থানে পৌঁছিবার জন্য। অতএব কাহাকেও ঘৃণা

করিও না। নিজ মতে দৃঢ় থাকিয়া যত পার, অপরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা কর। সেই তিনিই এই সমস্ত মতভেদের অধিষ্ঠাতা। যদি কোনও মতে কিছু ভুল থাকে, তাহা হইলে তিনিই তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। তোমার কর্ত্তব্য হচ্চে, কিছুতে দোষ দর্শন না করিয়া কেবল ভালবাসা।" ধন্য প্রেমিক। ধন্য শিক্ষা! যাঁহারা ইহাকে জীবনের আদর্শ করিয়াছেন বা করিবেন, তাহারাও ধন্য! কেন না, তাঁহারাও এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচাইয়া প্রেমবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

জ্বালামুখী যাত্রা।

(স্বামী প্রকাশানন্দ।)

জ্বালামুখী হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ। উক্ত আছে, ভবানীপতি দক্ষ-যজ্ঞে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ঘুরাইয়াছিলেন। তাহাতে সতীর অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। যে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ ৫২ টী পীঠস্থান আছে। শুনা যায়, জ্বালামুখীতে দেবীর জিহ্বা পড়িয়াছিল। পীঠস্থান দেবীর বিশেষ প্রকাশ বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস। সম্বৎসর ধরিয়া, বিশেষতঃ, নবরাত্রির সময় শত শত হিন্দু এই তীর্থ দর্শনে গিয়া থাকেন।

অনেক দিন হইতেই জ্বালামুখী দর্শনের ইচ্ছা ছিল। দুইটী গুরু-ভাইকে জ্বালামুখী দর্শনে উৎসুক জানিয়া ফাল্গুন মাসে রাত্রি ১০॥০ টার গাড়ীতে তিন জনে নর্থওয়েষ্টারণ রেলওয়ের জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সে সময়ে জলন্ধরে খুব প্লেগ। ষ্টেশনেই আমাদের নাম, আস্তানা, গন্তব্যস্থান ইত্যাদি লিখিয়া লইল। আমরা ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগে যাত্রীদিগের বিশ্রাম স্থানেই সে রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে রেলের রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম দিকে প্রায় ৫।৬ মিনিট যাইবার পর জ্বালামুখী যাইবার রাস্তা দেখিতে পাইলাম। রাস্তাটী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। জলন্ধর হইতে প্রায় ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে জ্বালামুখী-ক্ষেত্র অবস্থিত। জলন্ধরে জ্বালামুখী যাইবার জন্য একা, ঘোড়া, প্রভৃতি

পাওয়া যায়। জলন্ধর হইতে প্রায় ৩০ মাইল সমতল, তার পর পাহাড়। একা বরাবর জ্বালামুখী পর্য্যন্ত যায়। পার্ব্বতীয় পথ ব্যতীত অমৃতসর দিয়া আর একটী পথ আছে। অমৃতসর হইতে শাখালাইন দিয়া পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে গিয়া তথা হইতে একাযোগে বা ঘোঁড়ায় নুরপুর, কাঙ্ড়া উপত্যকা হইয়া জ্বালামুখী যাওয়া যায়। পাঠানকোট হইতে জ্বালামুখী প্রায় ৭০ মাইল হইবে। এ পথটী খুব ভাল, কারণ, ধর্ম্মশালা পাহাড়ে টঙ্গা যাইবার এই রাস্তা। এই পথে চারিদিকে পাহাড়ের শোভা, বিশেষতঃ, কাঙ্ড়ার নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। দূরে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান দুগ্ধফেননিভ তুষারাচ্ছন্ন ধর্ম্মশালা পাহাড় ও নিম্নে সুদূরব্যাপিনী শস্যশ্যামলা কাঙ্ড়া উপত্যকা। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। আমরা জলন্ধরের পথে জ্বালামুখী যাইয়া অমৃতসরের পথ দিয়া নামিয়া আসিয়াছিলাম।

আমরা ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল যাইবার পর রুণ্ডসী নামক একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এ পথে বরাবর সরকারী মাইলষ্টোন আছে। ২।৩ মাইল অন্তর এক একখানি গ্রাম। গ্রাম-প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীরের (ধর্ম্মশালা) বারান্দায় আমরা আশ্রয় লইলাম। পঞ্জাবাঞ্চলে প্রায় প্রতিগ্রামেই সাধু অতিথিদিগের জন্য একপ একটী আশ্রয়স্থান থাকে। গ্রামবাসিগণ অনেক সময়ে রুটী, ঘোল, গুড় ইত্যাদি আহারীয় ঐ স্থানে দিয়া যায়। অত্যন্ত গরীব হইলেও ইহারা সাধু অতিথিদিগকে বেশ যত্ন ও সেবা করে। ভিক্ষার সময় গ্রামমধ্যে যাইয়া একটা বাটীতে অনেক লোকের জনতা দেখিলাম। শুনিলাম গ্রন্থসাহেবের পূজা। ভিক্ষার জন্য আমাদেরও অপেক্ষা করিতে বলিল। দেখিলাম, একটী ছাদের উভয় পার্শ্বে দুটী লম্বা চাদর বিছান হইয়াছে। একই চাদরের উপর দুদিকে দুসার লোক বসিয়াছে। প্রথমে একব্যক্তি বড়ঘটী করিয়া জল ও একটী বড় বাটী লইয়া আসিলে সকলে সেই বাটীতে হাত ধুইতে লাগিল। পরে রুটী, ডাল, তরকারী, কড়াপ্রসাদ (গ্রন্থসাহেবের বিশেষ ভোগ—হালুয়া) ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য একেবারে পরিবেশন করা হইলে "ওয়া গুরু কি ফতে" বলিয়া ভোজন আরম্ভ করিল। আমরা কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া চলিয়া আসিলাম। গ্রামে বড় বড় কূপ আছে। পানীয় ও ক্ষেতের জন্য জল ইহা হইতেই সংগৃহীত হয়। কোন কোন কূপে জল তুলি-

বার সাদাসিদে অথচ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। কূপের অনতিদূরে হাঁড়ী-কাঠের ন্যায় দুটী লম্বা কাঠ মাটিতে পোতা আছে। মধ্যে একটী লম্বা কাঠ একটী ক্ষুদ্র কাঠ দ্বারা পার্শ্বের দুটী কাঠে সংলগ্ন আছে। মধ্যের কাঠখানি ইচ্ছামত উঠান ও নামান যাইতে পারে। মধ্যের কাঠখানির একপ্রান্ত অত্যন্ত মোটা ও ভারী। অপর প্রান্তে লোহার শিকল বা মোটা দড়ী দ্বারা জল তুলিবার পাত্র ঝুলান আছে। শিকল বা দড়ী ধরিয়া জলপাত্র কূপের ভিতর নামাইয়া দিয়া অপর প্রান্ত অপেক্ষাকৃত ভারী থাকায় অনায়াসে কূপ হইতে জল উঠান যায়। আমাদের আশ্রয় স্থানের অনতিদূরে একটী কূপ হইতে একব্যক্তি জল তুলিতেছিল। ২।৩টী বালিকা তথায় দাঁড়াইয়াছিল। তথায় যাইয়া কিঞ্চিৎ জল চাহিলে আমার দিকে চাহিয়া বালিকাগণ 'এ নাঙ্গাশির' বলিতে লাগিল। আমার মাথায় পাগড়ী বা টুপী ছিল না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক সকল বিভিন্ন প্রকারের শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকে। সকল দেশেই কোন না কোন রূপ শিরস্ত্রাণ আছে। কেবল বাঙ্গালীর কোন বিশেষ শিরস্ত্রাণ নাই।

পরদিন প্রত্যুষে প্রায় ৬ মাইল চলিয়া আদমপুর নামক একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। এই গ্রামটী অপেক্ষাকৃত বড় ও গ্রামবাসিগণ তত গরীব নহে। এ গ্রামে কয়েক খানি ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতল ও ত্রিতল বাটী, মসজিদ, শিবমন্দির, পোষ্টআফিস, সরকারী-দাতব্য চিকিৎসালয় ও নানা-রকমের দোকান ইত্যাদি আছে। আমরা গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী কূপে স্নান করিয়া লইলাম। এখানে ক্ষেতের জন্য জল তুলিবার সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিলাম। কূপের পাড়ের উপর ঠিক মাঝামাঝি একটী চাকা এড়ো ভাবে অবস্থিত আছে, এই চাকার সঙ্গে সংলগ্ন একটী কাঠ গরুর ঘাড়ে দেওয়া আছে। তার পর কূপের ঠিক উপরে লম্বা দিকে একখানি চাকা পূর্ব্বোক্ত চাকার সহিত ঘড়ীর চাকা সকল যে ভাবে সংলগ্ন থাকে, সেই ভাবে সংলগ্ন আছে। গরু তার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর যেমন ঘুরিতেছে, পূর্ব্বোক্ত চাকাটীও ঘুরিতেছে ও তার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চাকা-টীও ঘুরিতেছে। তার পর দ্বিতীয় চাকাটীর উপর জল পর্য্যন্ত লম্বমান একটী কলসীর মালা ঝুলান আছে। কলসীগুলির মুখ সব ভিতর দিকে। যেমন চাকাটী ঘুরিতেছে, কলসীগুলিও জলপরিপূর্ণ হইয়া ঘুরিতেছে। জলপরি-পূর্ণ কলসীগুলি যখন উপরে আসিতেছে, তখন কলসীগুলির মুখ নিম্নদিকে

হওয়ায় কাঠের বা লোহার একটী বড় নালীর উপর জল পড়িয়া কূপের বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে ও তথা হইতে নালী দিয়া ক্ষেতের ভিতর যাইতেছে। এইরূপে ধারার বিরাম নাই।

আমরা একটী শিবমন্দিরের সংলগ্ন দ্বিতল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। আমরা ধর্ম্মশালায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে একব্যক্তি আসিয়া বলিল, "মহারাজ, ভোজন"? আমরা সম্মতি প্রকাশ করিলে যথাসময়ে রুটী, ডাল ইত্যাদি দিয়া গেল। এখানে সত্যবাবা নামে একটী সাধু প্রায় ২৪ বৎসর বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় সত্য বাবার সহিত একটী ভক্ত মুষলমান আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে ব্যক্তি জড় সড় হইয়া অনেক দূরে বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরা নিকটে বসিতে বলিলে বলিল, "আমি মুষলমান।" আমরা বলিলাম, "হিন্দু ও মুষলমানে তফাৎ কি? হিন্দু ও মুষলমান একই আল্লা বা ভগবানের সন্তান, আমরা সকলেই পরস্পর ভাই ভাই, এত সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই"। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমাদের মুখে উহার ভাবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। যাইবার সময় আমাদের পরদিবস থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা তাহার প্রীতিব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পাছে সে ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে পরদিন এই স্থানেই থাকিতে স্বীকৃত হইলাম। রাত্রিতে আমাদের জন্য দুগ্ধ ও পরদিন দোকান হইতে পুরী, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

আমরা প্রাতে গ্রামের বাহিরে একটী কূপে স্নান করিতে যাইলাম। ঐ কূপের নিকট একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে। এখানে একটী গোরক্ষনাথপন্থী সাধু প্রায় ১৭ বৎসর বাস করিতেছেন। গ্রাম হইতে ভিক্ষাদি করেন। কখন কখন গ্রামবাসিগণ রুটী, ঘোল, তরকারী ইত্যাদি দিয়া যায়। বৈকালে ধর্ম্মশালার নীচে শিবমন্দিরের সম্মুখে একদল তুলসীদাসী মণ্ডলীর গান হইবার আয়োজন হইতেছে দেখিলাম। দল প্রাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাদের দলে ২।৩টী ছোট ছোট ছেলে থাকে। তাহারা সুন্দর পোষাক পরিয়া ও পায়ে ঘুমুর দিয়া সারঙ্গ, তবলা ইত্যাদির সহিত গান করে ও মাঝে মাঝে নাচে। এ দেশে যাত্রার পরিবর্ত্তে এরূপ নাচ-গানের দল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। একব্যক্তি কিছু বায়না দিয়া গান আরম্ভ করাইয়া দেয়, তাহার পর শ্রোতৃগণ সামর্থ্যানুসারে ২।৪।৮ আনা

পেলা দিয়া থাকে। ইহারা এক এক গ্রাম হইতে মন্দ রোজগার করে না। শিবমন্দিরের সম্মুখে কম্বল, চাদর বিছাইয়া গান আরম্ভ হইল। তিনটী ছেলে নানারূপ হাবভাবের সহিত নাচ গান করিয়া মজলিশ জমকাইয়া তুলিল। গ্রাম হইতে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সব আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। গায়কগণ পেলার উপর পেলা পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় এখানে গান বন্ধ করিয়া বাজারে সমস্ত রাত্র ধরিয়া গান হইল।

পরদিন প্রায় বেলা ১০টার সময় মুসলমান ভক্তটী আসিয়া আমাদের হুঁসিয়ারপুর পর্য্যন্ত একার বন্দোবস্ত করিয়া গাড়োয়ানকে একেবারে ভাড়া চুকাইয়া দিল। আদমপুর একার একটী প্রধান আড্ডা। এ স্থান হইতে হুঁসিয়ারপুর প্রায় ১৪ মাইল ও শেয়ারে একা ভাড়া তিন আনা মাত্র। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছের সার ও দুধারে বিস্তৃত মাঠ। বহু দূরে মেঘের ন্যায় পাহাড় দেখা যাইতেছে। আমরা এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ১১ মাইল যাইলে পথটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে দেখিলাম। দক্ষিণদিকের পথটী দিয়া মুকেত, মণ্ডী, মণিকরণ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় পথটী দিয়া প্রায় ১২ টার সময় হুঁশিয়ারপুরে পৌঁছিলাম। আমরা শিখদিগের সুন্দর একটী দোতালা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানে এরূপ অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। বৈকালে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া সহরের চারিধার দেখিয়া লইলাম। রাস্তার দুসারি নানাবিধ দ্রব্যের দোকান, দোতালা, তেতালা বড় বড় বাড়ী, মসজিদ, মন্দির, সুন্দর সুন্দর বাগান, নানারকমের শস্য ও কপি, কলাইশুঁটী প্রভৃতি বিবিধ তরকারীর ক্ষেত্র সকল, সজনে, আম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। এখানে তিনটী এণ্ট্রান্স স্কুল আছে—একটী সরকারী, একটী আর্য্যসমাজী, আর একটী সনাতনী। ইহার পূর্ব্বদিকে বাহাদুরপুর নামে অপেক্ষাকৃত ছোট একটী নগর আছে। এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস। আমরা পরদিন প্রাতে বাহাদুরপুরে যাইলাম। এখানে ফরেষ্ট বিভাগের পেন্সনপ্রাপ্ত মোতিরাম সিং নামক একটী ভদ্রলোকের বাগানে আমরা তিন দিন ছিলাম। বাগানটী গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত ও খুব নির্জ্জন। তুঁত, আম, কমলানেবু প্রভৃতি সুস্বাদু ফল এবং যুঁই, মোতিয়া, বেল, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষে বাগানটী সুশোভিত। বাগানে একটী সুন্দর কূপ আছে।

স্নানীয় ও পানীয় জল ইহা হইতেই সংগৃহীত হয়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর স্নানাগার আছে। গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক এই বাগানে স্নানের জন্য আসিয়া থাকে। থাকিবার উপযুক্ত দুটী ছোট ঘর আছে। একটী ঘরে গ্রন্থসাহেব স্থাপিত। সিংহজী প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন। প্রাতে স্নান করিতে আসিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকগণ অনেক সময় গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনিয়া যায়। গ্রন্থসাহেবের পার্শ্বের ঘরে আমাদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। বাহাদুরপুর অতি সুভিক্ষ স্থান। গ্রামের বাহিরে সাধু সন্ন্যাসিগণ মাঝে মাঝে আসিয়া কিছুদিনের জন্য বাস করেন। গ্রামবাসিগণ রুটি, ডাল, মাখন, তরকারী, মিষ্টান্নাদি দিয়া সাধুদিগের সেবা করিয়া থাকে। অনেক সময় সাধুগণ কখন আসিবেন বলিয়া রুটি, মিষ্টান্নাদি লইয়া দ্বারদেশে বসিয়া থাকে। সাধুদিগের প্রতি এত সার্ব্বজনীন প্রীতি পঞ্জাব ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। বৈকালে সিংহজী গ্রন্থসাহেব হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইলেন ও তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। যেটুকু পড়িলেন, কেবল বৈরাগ্যের কথা, সব অনিত্য, একমাত্র ভগবান সত্য, অতএব বৃথা কার্য ছেড়ে কেবল ভগবদ্ভজন কর ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে একটী ভদ্রলোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইনি একজন ট্রেজরী বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন, এক্ষণে অবসর লইয়াছেন। ইঁহার সহিত ইংরাজীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক আলাপ হইল। লোকটী অতি অমায়িক। আমাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইয়া খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমরা মাধুকরী ভিক্ষা অধিক পছন্দ করি শুনিয়া আর অধিক জেদ করিলেন না। আমার গুরুভাইদ্বয় ইঁহার সহিত গ্রামের অনতিদূরে নদীর অপরপারে জঙ্গলে সাধুদিগের সমাধিস্থান দেখিতে যাইলেন। শুনিলাম, সমাধিস্থানগুলি অতি প্রাচীন। সিংহজীর সহিত বৈকালে একটী পণ্ডিত আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। পণ্ডিতটী খুব ভাল লোক, কেবল পণ্ডিত নহে, যথার্থ ভক্ত। আমাদের লইয়া নগরের চারিধার দেখাইয়া আনিল। এখানে অনেক বড় বড় বাউড়ী আছে, মাটীর ভিতর হইতে জল উঠিতেছে। চারিধারে সুন্দর পাথর দিয়া বাঁধান। সাধুদিগের থাকিবার অনেক নির্জ্জন স্থান আছে। উদাসীদের এক ভারী আখাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মোহান্তের সঙ্গে আমা-

দের আলাপ° হইল। আমাদিগকে রাত্রি-ভোজন ও তথায় রাত্রিবাসের জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা ধন্তবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিন পণ্ডিত আমাদিগকে তাহার বাটীতে ভিক্ষার জন্য লইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ প্রথমে ব্যঞ্জনাদি খাইয়া পরে মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করে, পঞ্জাবাঞ্চলে সাধারণতঃ প্রথমে মিষ্টান্নাদি তৎপরে ব্যঞ্জনাদি খাইয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে বাহাদুরপুর হইতে রওনা হইলাম। এস্থান হইতে প্রায় ৪॥০ মাইল দূরে পাহাড আরম্ভ হইযাছে। ঠিক যেখান হইতে পাহাড় আরম্ভ হইযাছে, সেখানে একটী চটী আছে। পাহাড়ে প্রায় ৫ মাইল চড়াই করিয়া মঙ্গুরা নামক চটীতে পৌঁছিলাম। চটীতে চাল, কলাই, মশুর দাল, মশলা, ঘৃত, দুগ্ধ, মিছরী, বাতাসা ও পকৌড়ী অর্থাৎ ফুলুরী পাওয়া যায়।

পরদিন প্রাতে ৭ মাইল চলিয়া গংগ্রোটা নামক চটীতে পৌঁছিলাম। এখানে ডাক-বাঙ্গালা, পোষ্টাফিস ও পুলিষ ষ্টেশন আছে। আমরা একটী সরাইয়ে আশ্রয় লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষার জন্য গমন করিলাম। এ সময়ে চারিধারে প্লেগ, সেই জন্ত সরকার বাহাদুর নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, গ্রামের মধ্যে বাহির হইতে কোন লোক প্রবেশ না করে। ভয়, পাছে প্লেগ সকল গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামবাসিগণ আমাদিগকে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে দিল না। গ্রাম হইতে রুটী তৈয়ার করিয়া গ্রামের বাহিরে দিয়া গেল। এই চটীর অদূরে শোণভদ্রা নদী, এ সময় গ্রীষ্মকাল বলিয়া জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। শুনিলাম, যখন বর্ষাকালে নদীর জল বাড়ে, তখন নদী প্রায় আধ মাইল চওড়া হয় ও দেখিতে অতি মনোরম হয়। পরদিন আমাদের শোণভদ্রার উপর দিয়া যাইতে হইল। প্রায় ১॥০ মাইল সমতল রাস্তায় যাইবার পর পুনরায় চড়াই আরম্ভ হইল। প্রায় ৭ মাইল চলিবার পর কিম্বেরি নামক চটীতে পৌঁছিলাম। এখানে একটী শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন সরাই ও দোকান আছে। এখানে একটী নাথযোগী বাস করিত। অদূরে খড়ে একটী সুন্দর বাঁধান বাউড়ী আছে। আমরা ইহাতে স্নান করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম।

সে রাত্রি এখানে যাপন করিয়া পরদিন ৩ মাইল দূরে ফুলী নামক

স্থানে মন্দির ও সরাই দেখিতে পাইলাম। এই তিন মাইল পথ কিছু সমতল। তার পর চড়াই আরম্ভ। ৫ মাইল চড়াই করিবার পর পয়সাই নামক স্থানে রাস্তা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে দেখিলাম। বাম পথ দিয়া ২ মাইল যাইলে চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দিরে যাওয়া যায়। পয়সাই নামক স্থানে পুলিষ ষ্টেশন, সব ডিবিজন অফিসারের কোয়ার্টার, ডেপুটী কমিসনারের ডাক বাঙ্গালা ও জেল আছে। আমরা অপর পথটী দিয়া প্রায় ৪ মাইল যাইবার পর একটী ক্ষুদ্র চটী দেখিতে পাইলাম। এখানে সে বৎসর বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া বড় জলকষ্ট হইয়াছে। কূপে জল তুলিতে যাইয়া দেখি, জল নাই। একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এ পথে বড় জলকষ্ট। ভাল জল প্রায় পাওয়া যায় না।

এইখানে আহারাদি করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। ৪ মাইল যাইবার পর একটী গুদড় সাধুদের স্থান দেখিতে পাইলাম। এ স্থান হইতে ব্যাস নদী একটী সাদা রেখার ন্যায় দেখা যায়। যত চলিতে লাগিলাম, ব্যাস নদীর কল কল শব্দ ততই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। দূর হইতে মন্দীভূত নদীর কল কল শব্দে এমনি এক মাধুর্য্য আছে যে, শ্রোতার মনকে যেন এক অজানিত রাজ্যে লইয়া যায়। ব্যাস নদীর উপর নৌকার পোল। পোল পার হইলে ১ পয়সা মাশুল দিতে হয়। ব্যাস নদীর অপর পারে ডেরা গ্রাম। নদীর ধার পর্য্যন্ত লম্বমান বড় বড় পাথরের সিঁড়ি সকল, মন্দির, বাটী সকল প্রভৃতি অপর পার হইতে ঠিক ছবির মতন দেখায়। এখানে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। নদীর জল বড় ঘোলা, সেই জন্য বাউড়ী হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়। আমরা একটী ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় লইলাম। হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমরা আজ প্রায় ১৭ মাইল চলিয়া আসিয়াছি। এই ধর্ম্মশালার অনতিদূরে একটী মন্দির আছে। শুকদেব নামে একটী নাথ সাধু এখানে প্রায় ১১ বৎসর বাস করিতেছে। অভ্যাগত সাধু সন্ন্যাসীদিগকে অত্যন্ত যত্ন করে। আমরা ডেরায় ২ দিন ছিলাম।

ডেরা হইতে এক্কার ভাল পথ ছাড়িয়া পাহাড়ী পথে চলিলাম। এক্কার পথে অনেক ঘোর, অল্পপথে জ্বালামুখী ৭ মাইল মাত্র। পথে যাইতে গ্রামপ্রান্তে কতকগুলি পাথর পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। ২।৩ খানি লম্বা ভাবে ও তাহার উপর একখানি এড়োভাবে সাজান রহিয়াছে। কোন কোন পাথরের উপর দুটী পা খোদা রহিয়াছে।

শুনিলাম, পাহাড়ীদিগের ইহা দৈবস্থান। গ্রামবাসিগণ কখন কখন আসিয়া এখানে পূজা ও গান করে। প্রায় ৪ মাইল উৎরাই করিবার পর সুবর্ণবর্ণ জ্বালাদেবীর মন্দিরচূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। দূর হইতে পাহাড়ের গায়ে জ্বালামুখী গ্রাম অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই লোকসমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্কা হইতে নামিয়া যাত্রিগণ কোথাও বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা আহারের উদ্যোগ করিতেছে, কোথাও বা দেবীদর্শনে চলিয়াছে। এ স্থানে অনেক বড় বড় বাড়ী আছে, কিন্তু অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায় পতিত ও লোকজনশূন্য। শুনিলাম, পূর্ব্বে এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় বড় আখাড়া ছিল ও অনেক মোহান্ত বাস করিত। এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক মোহান্ত বাস করে। আমরা একটী নিরঞ্জনী আখাড়ার ভগ্নাবশিষ্ট বাটীতে আশ্রয় লইলাম। এখানে একটী মৌনী ব্রহ্মচারী ছিল। ব্রহ্মচারীজী বড় ভাল লোক। অতি প্রীতির সহিত আমাদের আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিত। সাধু সন্ন্যাসীদিগের জন্য এখানে তিনটী সদাব্রত আছে।

আমরা স্নানাদি করিয়া দেবী দর্শন করিতে যাইলাম। দ্বারদেশে মাঝে মাঝে সুমধুর লয় তানে নহবৎ বাজিতেছে। মন্দিরের ভিতর ও বাহির মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। মন্দিরের ভিতর ও বাহিরে সুন্দর শোভা হইয়াছে। যাত্রিগণ দেবীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন ও মাঝে মাঝে বড বড ঝুলান ঘণ্টা বাজাইতেছেন। মন্দির ভিতরে তিন চারি স্থান হইতে লকলক করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। যাত্রিগণ ভক্তিগদ্গদ হইয়া ঘৃত, বিল্বপত্র প্রভৃতি দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। কেহ বা চণ্ডী পাঠ, কেহ বা দেবীস্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা মন্দিরস্থ হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছে। যেন চারিদিকে ভক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত। সে সময়ে আবার দোল। যাত্রিগণ দেবীকে আবির নিবেদন করায় ভিতর বাহির চারিধার লালে লাল হইয়াছে। দুপুর বেলা দেখি, মন্দিরপ্রাঙ্গনে সেই তুলসীদাসী মণ্ডলীর গীত আরম্ভ হইয়াছে। জ্বালাদেবীর মন্দিরের নিকটেই আর একস্থান হইতে এইরূপ অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পাণ্ডারা ইহাকে গোরক্ষ দেবী বলে। এ স্থানের ভৈরব অম্বিকেশ্বর। কিছু চড়াই করিয়া অম্বিকেশ্বরের মন্দিরে যাইতে হয়। উপর

হইতে জলধারা পড়িয়া মন্দিরপ্রাঙ্গনের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটী বড় কুণ্ডের ন্যায় হইয়াছে।

একটী কথা,—যে ধর্ম্মে উঠিতে, বসিতে, জীবনের প্রতি ক্রিয়ার সহিত ধর্ম্মভাব জড়িত, উষ্ণ প্রস্রবণ, ঝরণা, জলপ্রপাত, নদী, পাহাড় প্রভৃতি স্থান, যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও শক্তির বিশেষ প্রকাশ, সে স্থানের সহিত দেব বা দেবী ভাব বিজড়িত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্থানে প্রকৃতির বিশেষ শক্তির বিকাশ, সেই স্থানে দেবীর বিশেষ প্রকাশ বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস। আমি একদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেবীদর্শন করিতেছিলাম। দেখিলাম, পাণ্ডাগণ মন্দির মার্জ্জন করিতেছে। যে যে স্থান হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে, তাহা একে একে নিবাইয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া পুনরায় জ্বালাইয়া দিল। পড়িয়াছিলাম, কোন কোন পাহাড় হইতে এক প্রকার গ্যাস বাহির হয়, উহা ইচ্ছামত জ্বালাইয়া ও নিবাইয়া দেওয়া যায়। মনে হইল, যাহাকে পাণ্ডাগণ দেবী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এ সেই গ্যাস নাকি! মন্দিরের মধ্যে যে কুলুঙ্গি, যে স্থানে একটী ক্ষুদ্র শিখা জ্বলিতেছে, যাহাকে পাণ্ডাগণ দেবীর জিহ্বা বলে এবং যাহার কথা বাল্য কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, কিছু ভোগ দিলে দেবীর জিহ্বা অগ্নিশিখারূপে লক লক করিয়া খাইয়া ফেলে, একদিন সেই জিহ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একমনে দেখিতেছিলাম যে, কোন প্রকার ভোগ দিলে দেবী যথার্থ গ্রহণ করেন কি না? একটী যাত্রী আসিয়া বাতাসা ও পেঁড়া দিলে, ভিতরে লোহার উপর বাতাসা পড়িলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরীক্ষা করিয়া জানিলাম যে, একধারে ত পাহাড় আছেই, আর একধারে লোহার পাত দিয়া পাণ্ডাগণ একটী গর্ত্তের ন্যায় করিয়াছে। বাতাসা বা পেঁড়া দিলে তাহার ভিতর পড়িয়া যায় ও পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে দেবী গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়।

যাহা হউক, পাণ্ডাগণের এরূপ জুয়াচুরী সত্ত্বেও আমরা দেবীর বিশেষ প্রকাশ বলিয়া মানি। যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র আছে বটে, কিন্তু যেমন পাখা নাড়িলে সে স্থানে বায়ুর প্রকাশ হয়, জলীয় বাষ্প সর্ব্বত্র আছে বটে, কিন্তু শীতলতা প্রযুক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইলে সে স্থানে জলের বিশেষ প্রকাশ বলা যায়, সেইরূপ শত শত ভক্ত ও সাধু মহাত্মাগণ বহুকাল

হইতে যেখানে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগের সহিত দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন, সে স্থানে দেবীর বিশেষ প্রকাশ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিকই দেবী-স্থানে যেন সর্ব্বদা ভক্তির কম্পন বহিতেছে। ভক্তদিগের সে ভক্তিগদগদভাবে পূজা দেখিলে পাষণ্ডের মনও ক্ষণিকের জন্য জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার ভুলিয়া দেবভাবে পূর্ণ হয়।

জাপানদর্শন।

আমরা উদ্বোধনের পাঠকগণকে জানাইয়াছি, গত জুলাই মাসে বেলুড় মঠের স্বামী সদানন্দ জাপানদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। তিনি চীন ও জাপান হইতে এতদুভয় দেশের আচার ব্যবহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

১ম।

১৫ য়োকু চোম,—হংগো, টোকিয়ো

পিনাংএর পর আর তোমাকে চিঠি লিখি নাই। তাহার পর সিঙ্গাপুর,—ইংরাজ রাজের কি কারখানা, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। যেমন শ্রী, তেমনি দৃশ্য। ব্যবসা, ব্যবসা, ব্যবসা, কত দেশের কত জাহাজ আস্‌ছে, কত আমদানি, কত রপ্তানি, দেশের লোকের মুখে কিন্তু অন্ন নাই। তাঁরা Jinrikshwa টেনে মর্‌ছেন। তার পর হংকং চীনের দেশ, কিন্তু ইংরাজের রাজ্য। ব্যবসা সবই ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসি প্রভৃতির হাতে, চীনেরা কেবল নৌকা টানে, Jinrikshwa ও পাল্কি বয়, আর কুলিগিরি করে, ব্যবসার মধ্যে শূকরের মাংস বিক্রি, আর ভাব্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমাদের দেশে যে জুতা বিক্রি, এখানেও তাই। তার পর সাংহাই। ইহাও চীনের বন্দর, কিন্তু ইংরাজের হাতে। বৃটিশপ্রধান, তবে সবদেশের কনসলগণ আছেন। তাঁহারা একত্র বসিয়া যাহা আইন করেন, তাহাই হয়। জাহাজ, জাহাজ আর জাহাজ—আস্‌ছেন আর যাচ্ছেন। ইংরাজ, জর্ম্মান, ফ্রান্স, ইটালি ইত্যাদি।

এবার চীনের দেশ ছাড়িলাম, চংও বদলাইল। এ বন্দরের নাম মোজি—জাপানের প্রথম বন্দর ও inland সমুদ্রের প্রবেশদ্বার। দুই দিকে পাহাড়ের কি শোভা, মাথাগুলি প্রায় সবই তোপে সাজান। চীন আর জাপানে মানুষের ভেদ এত—ঠিক যেন বাঙ্গালিতে আর উড়েতে। চীনের প্রকৃতি আগাগোড়া উড়ের মত। তেমনি আফিং খায়, জুয়া খেলে

তেমনি চেঁচামেচি করে ও তেমনি নোংরা। জাপানি আগাগোড়া সাহেব। তাঁহাদের উপরে বিলাতি ইউনিফরম। কাপ্তেন, প্রথম অফিসার, দ্বিতীয় অফিসার এরা অবশ্য বিলাতি, অন্য সব জাপানি। ইহারা অল্প অল্প ইংরাজি কয়, কিন্তু জার্ম্মান ভাষায় খুব ব্যুৎপত্তি আছে। এখানকার স্কুলে জাপানি ভাষাতে সব Higher subjects পড়ান হয়। তার পর কলেজ,— কলেজে জার্ম্মান না শিখিলে কিছু হইবার যো নাই। এখানকার সব Applied chemistry ও Mechanics. বড় বড় যাঁরা, তাঁরা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১০।১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে অবস্থানান্তর ভূয়োদর্শন লাভ করিয়া এখানকার Director অধ্যাপক প্রভৃতি হন এবং উত্তম উত্তম গ্রন্থ Chemistry ও Mechanics সম্বন্ধে লিখেন ও শিক্ষা দেন, তাইতে দেশ এত উন্নত। আমাদের দেশের ছেলেদের পক্ষে একটু কষ্টকর, কারণ, যাহা শিখিয়া আইসেন, তাহা এখানকার উপযুক্ত নয়। বলিয়াছি, স্কুলেতেই Higher Mathematics জাপানি ভাষায় শেষ হয়। Elementary Science ও অন্যান্য সকল বিষয়ই স্কুলে শেষ হয়, যথা, Botany, Chemistry, Physics, Zoology, Geology, Psychology ইত্যাদি। কলেজে কেবল Practical ও Applied science শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাষা শেখবার জন্য নয়, সবই Practical. পুস্তক এ সব সম্বন্ধে জাপানি ও জার্ম্মান ভাষায়। বলুন আমাদের দেশের B A. M A. এখানে আসিয়া কি করিবেন? * * সত্যসুন্দর দেব বলিয়া একটী ব্রাহ্ম বালক আসিয়াছেন, অতি সুন্দর ছেলে। তিনি drawing জানেন, কি করিয়া Porcelain প্রস্তুত হয়, শিখিতে আসিয়াছেন। বেচারাকে আগাগোড়া জার্ম্মান ভাষায় শিখিতে হইবে। আসিয়া বুঝিলাম, জীবনটা নষ্ট হইয়াছে মাত্র, আর আমাদের দেশের লোকও কিছু জানে না। এখানে মেয়ে পুরুষে খাটে। সবাই শিক্ষিত, কুলিরা পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে। শতকরা ৬০ জন শিক্ষিত বলিয়া প্রবাদ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অল্প খরচে ভদ্রলোক সবাই, কারণ, ব্যক্তিবিশেষে অর্থের ন্যূনাধিক্য নাই (Distribution of wealth)। মনে করিবেন না, ১০।১২ টাকা মাসে আয়ের লোক এখানে থাকিতে পারে। বেকসুত গেলেই জুতা চাই, নহেৎ পুলিষ। গুটীকতক বালক খেলা করিতেছিল; একটীর পায়ে জুতা ছিল না, পুলিষ আসিতেছে দেখিয়া মা তৎক্ষণাৎ আসিয়া জুতা পরাইয়া দিল—বুঝিবে কি কড়াকড়। আর লোকের বিশেষ অভাব নাই, ভিক্ষা সাধু ভিন্ন অপরের নিষেধ। তাহাদেরও পরিচ্ছদ পরিষ্কার; জাপান স্বাধীন, একটী সামান্য লোকের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। ইতর ও ভদ্র নাই, স্বভাব যেন ছাঁচে ঢালা। বলিবে, তা কি হয়? সেটা তোমাদের বুঝিবার দোষ। আমরা ভাল আছি। আমার ভালবাসা সকলকে জানাইবে—

(২)　　　　২২ শে Sept

এখানে ১৪।১৬ বৎসরের ছেলেরা সব Dynamics, Physics Inorganic ও Organic Chemistry প্রভৃতি পড়িতেছে, ইংরাজীতে নহে, জাপানীতে। আশ্চর্য্য নহে কি? আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষা শিখিতেই প্রাণ বাহির হয়। আর তার পর কি থাকে বল? ইহাদের মধ্যে যাহারা খুব ভাল হয়, তাহাদিগকে রাজ সরকার হইতে বৃত্তি দিয়া জার্ম্মানিতে পাঠাইয়া দেয় আর যাহারা মধ্যবিৎ, তাহারা এই খানেই ব্যবসা

করিয়া বাহির বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান হয় না। এ বৎসর আসিতে অকুলান, কারণ, কর-মোজা, চীন, ফিলিপাইন, কোরিয়া হইতেও ছাত্রেরা আসিয়াছে। তুমি হয়ত ভাবচো, জাপানে এখন বড় বড় চিমনি, Flywheel, কল কারখানা, যাহাতে লাখ লাখ টাকা ব্যয়, তাহা নয়। সকলেরই বাটীতে, যাহারা ভদ্রলোক, ছোট খাট কারবার আছে। অর্থাৎ দুই চারিটী হাতকল রাখিয়া কেহ মোজা বুনিতেছেন, কেহ অল্প স্বল্প Painting করিতেছেন, কেহ Brush, কেহ tin এর কোটা, পাখা, মাথার ফুল, চিরুণী, মাদুর ইত্যাদি সামান্য সামান্য জিনিষ প্রস্তুত করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। বড় কারখানা ত বিশেষ দেখি নাই। গালার কাজ, Lacquered work, porcelain ইহাও অনেকে করিতেছে। এখানে কাচের দ্রব্যাদি এরূপ সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে যে, দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়ায়। সে সমস্ত কলিকাতার বাজারে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Porcelain এর ত কথাই নাই। ২।৪।৫ শত টাকা দামের একটী Vase। এ দেশের chemistরা নিজের দেশের গাছপালা, ছাল, মূল, ঘাস হইতে লাখ লাখ টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। সামান্য বাঁশ ছুলিয়া ৫।৭ টাকা দামের টুপি হইতেছে। ধানের খড় bleach করিয়া তাহারও টুপি, যাহা সাহেবেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন ও আধুনিক বাঙ্গালিরা মাথায় দিয়া কৃতার্থ হন। অবশ্য বুনিবার তারিফ আছে। আমাদের দেশে বাঁশেরও অভাব নাই, খড়েরও অভাব নাই, পাটেরও অভাব নাই, কেবল করবার মত লোকের অভাব। কি রকমে bleach করতে হয়, কি করলে রেশমের মত হয়, এই জ্ঞানের অভাব। পাটের দড়ি এমন ধুয়ে রং দেয় এবং মোলায়েম ও ঠিক রেশম করিয়া ফেলে—ইহাকেই বলে Science ছোট ছোট অনেক জিনিষ আছে, যাহা আমাদের দেশে অনায়াসে লোকে করিতে পারে, আর তাতে বেশ দু পয়সা হয়।

* * * * * * *

১লা কার্ত্তিকের ভ্রমশুদ্ধি।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১৩	ফুটনোট	বসুপাড়া	রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট
৫৩৮	২৪	মতগতীয়	সজাতীয়
৫৩৯	২৩	দাও	থাক
৫৪০	৫	অনিন্দ্য	আনন্দ
৫৪২	২২	রোজলিয়ান	বোডলিয়ান
৫৪৪	৬	আলোক বাস স্বরূপ	আলোকবাহকস্বরূপ
ঐ	২১	জননান্তর সৌহৃদানি	জননান্তরসৌহৃদানি

বিবর্ত্তবাদ।

(শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

কার্য্য মাত্রেরই কারণ অনুমেয়; আবার কারণ মাত্রই কার্য্য-প্রসূ। ইহা ভূয়োদর্শনের দ্বারা জানা যায়। স্থূলকার্য্য হইতে কারণ সূক্ষ্ম। অথবা কার্য্যই কারণের স্থূলাবস্থা। কাল (time) এবং দেশের (space) জ্ঞান হইতেই কার্য্যকারণ-প্রবাহের অনুমান হয়। যেখানে দেশ কালের জ্ঞান নাই, সেখানে কার্য্যকারণ-প্রবাহের ধারণা হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য আছে; সুতরাং কালজ্ঞান না থাকিলে পৌর্ব্বাপর্য্য বোধ কিরূপে হইতে পারে? আবার যে স্থানে কার্য্য-কারণের ক্রিয়া হইতেছে, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সেখানে স্থানজ্ঞানেরও পূর্ব্বাভাস অবশ্যই আছে। সেই জন্য নিমিত্ততা (causation) জ্ঞান দেশ-কাল-জ্ঞানাপেক্ষী। এই দেশকালনিমিত্ততা লইয়াই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতেছে—যত কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান সমস্তই এই দেশকাল নিমিত্ততা অবলম্বনে উদিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যান্ট এই দেশকালনিমিত্ততার প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া শ্রুত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন অস্মদ্দেশীয় দর্শনাদি পাঠ করা গেল, তখন জ্ঞাত হইলাম, ক্যান্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার পর্য্যাপ্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টিরহস্য-প্রসঙ্গে শারীরক ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"ন স্বভাবতঃ বিশিষ্ট-দেশকালনিমিত্তোপাদানাৎ" অর্থাৎ "কার্য্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট দেশ, কাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্রব্যাদির বিশিষ্ট নিয়ম নিয়মিত থাকায় স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি হয়, এ কথা বা নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সে যাহা হউক, এই দেশ কাল নিমিত্ততাই কার্য্য কারণ জ্ঞানের মূল কারণ, ইহা এক প্রকার বুঝা গেল। কার্য্য দেখিলেই যে কার্য্য করিয়াছে, এবং যে উপাদানে কার্য্য করা হইয়াছে, এই উভয়বিধ কারণ যুগপৎ অনুমিত হয়। ঘট দেখিয়া ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ও ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারকে মনে হয়। এই দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা উপাদান ও কুম্ভকার নিমিত্ত

[illegible] বেদান্ত শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [illegible] ইহাই আবার ত্রিবিধ অবান্তর ভেদে কথিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক পণ্ডিতগণ [illegible] জন্ম কার্য্যের প্রতি ত্রিধা কারণ সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। যথা, সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের সহিত ঘটকপালের বা ঘটাংশের যে সম্বন্ধ, তাহা ঘটের সমবায়ী কারণ; ঘট প্রস্তুতের উপযোগী কুলালচক্র ও দণ্ডাদি ঘটের অসমবায়ী এবং কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। বেদান্ত-শাস্ত্রমতে ব্যবহার কল্পে উক্ত ত্রিবিধ কারণই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণরূপে দ্বিধা উক্ত হইয়াছে। কারণ, সমবায়ী ও অসমবায়ী উভয় কারণই বেদান্তমতে উপাদান কারণে নিহিত আছে।

এই উপাদান কারণ আবার ত্রিধা কল্পিত হইয়াছে। যথা, আরম্ভক উপাদান, পরিণামী উপাদান, ও বিবর্ত্ত উপাদান। আরম্ভকবাদী নৈয়ায়িকের মতে তন্তু হইতে বস্ত্রোৎপত্তি আরম্ভক উপাদানের দৃষ্টান্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যের মতে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তি পরিণাম উপাদানের দৃষ্টান্ত। মায়াবাদী বেদান্তীর মতে মন্দান্ধকারে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বিবর্ত্ত উপাদানের দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশীকার বলিতেছেন, "অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ। নিরংশেহপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥" অর্থাৎ স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত কারণ বলে; যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম। এ প্রকার বিবর্ত্ততা নিরবয়ব পদার্থেও কল্পিত হইতে পারে। যেমন আকাশে তল মলিনতাদি কল্পনা অর্থাৎ ইন্দ্রনীলকটাহতুল্যত্ব ভাবনা। শ্রুতি বলেন, সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মই ব্যাবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রজালকার্য্য—জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে শক্তি এই জগদিন্দ্রজালের প্রকটনকরী, তাহার নাম মায়া। পঞ্চদশী বলিতেছেন, "মায়া শক্তিঃ কল্পিকাস্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ" অর্থাৎ মায়াই তাঁহাতে (ব্রহ্মে) জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল কল্পনা করে।

বেদান্তবাদী বলেন, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বলে এই অধ্যাস প্রশমিত হয়। যে মায়াশক্তি বশতঃ এই জগদ্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন জগদ্ভ্রম নিঃশেষরূপে বিলুপ্ত হয়, তখন মায়ার অস্তিত্বও থাকে না। সুতরাং মায়া শক্তি সত্যও হইতে পারে না। মায়া একেবারে মিথ্যা না হইলে

জগৎও একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ, ব্যবহারপ্রবর্ত্তক [illegible] আমরা প্রত্যেকে অবলোকন করিয়া থাকি। তবে গুরূপদেশগম্য সাধন পথে অগ্রসর হইয়া বিচার করিতে, করিতে এ জগদ্ভ্রমের নিবৃত্তি পায়। এই জগদ্ ভ্রম-নিবৃত্তি-সূচক আপ্তবাক্য আমরা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে শতশঃ জ্ঞাত হইয়াছি। মনন ভিন্ন কেবল তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উচ্চারণেই যে জগদ্-ভ্রম অপনীত হয়—তাহা নহে। জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য তাই বলিতেছেন, "অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ। বাহ্যশব্দৈঃ কুতোমুক্তিরুক্তি-মাত্রফলৈর্ণৃণাম" অর্থাৎ দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিলয় ব্যতিরেকে এবং আত্মতত্ত্বের অনুভব ভিন্ন কেবল কথামাত্রফল অথচ অকার্য্যকারী বাহ্য শব্দাড়-ম্বর দ্বারা কখনও মানবের মুক্তিলাভ হয় না। আত্মতত্ত্ব অনুভূত হই-লেই ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মে কল্পিত জগদিন্দ্রজাল বুঝিতে পারা যায়। তখনি জগ-দর্শীকত্বে জীব আর প্রতারিত হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় এই প্রত্যক্ষ জগৎকে নিতান্তই ভ্রান্তির আস্পদ মনে হয়। তখনি বিবর্ত্তবাদ সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সমগ্র শ্রুতি একবাক্যে বলিতেছেন, একভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন ইহাতে নানাত্ব অবলোকন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশতাপন্ন হন। যদি বস্তুতঃ নানাত্ব নাই থাকে, অথচ নানাত্ব আপাত প্রতীয়মান হয়, তবে সেই নানাত্বকে কল্পনাপ্রসূত ভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব? অথবা ভাষান্তরে বলিব, কোন অঘটনঘটনপটীয়সীশক্তিবলে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত হইয়া নানাত্বরূপ ইন্দ্রজালে পরিণতের ন্যায় হইয়াছেন। এই নানাত্বের প্রতিষেধ থাকিলেও পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎজ্ঞান ও অবান্তর নানাত্ব জ্ঞান সাধারণ জীবের কখনও অপনীত হয় না।

বামদেবাদি দুই একজন নিত্যসিদ্ধ ঋষিব্যতীত এমন লোক জগতে দৃষ্ট হয় নাই, যিনি জগতের নানাত্বে প্রতারিত হন নাই। জগৎ নাই, একথা সাধারণ জীবের ধারণার অবিষয়। তাই প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী পথে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিরূপ বিচারে জীবকে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। জগৎ ভ্রমকে সত্য ধরিয়া লইয়া পরিশেষে জগৎ নাই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার প্রণালীকে ব্যতিরেকী ন্যায় বলে অর্থাৎ যাহা মিথ্যাকে সত্য মানিয়া লইয়া বিচারক্রমে মিথ্যাত্বের নিরোধপর। এই জন্যই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে সূত্রকার ব্রহ্মকে তটস্থ লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন। 'নেতি' 'নেতি' রূপ

স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম বিচারিত হন নাই। কারণ, বিচারপ্রবর্ত্তক শাস্ত্র জীবের জন্য। স্বরূপ ব্রহ্মের বিচার হয় না। সেখানে ভাব নাই, ভাষা নাই, কেবল স্বয়ংজ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ।

যাহা হউক, ব্যবহারিক জ্ঞানে জগৎ চিরদিন ছিল, আছে ও থাকিবে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানের অপর নাম বন্ধন। তাহাই সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপপুণ্যরূপ দ্বন্দ্বাধ্যাসের আবাসভূমি। এই দ্বন্দ্বাধ্যাসের নিরাকরণ করার নামই মুক্তি। বেদান্ত বলেন, সে মুক্তি তোমার পড়িয়াই আছে। মুক্তিই তোমার স্বভাব। তবে ব্যবহারিক দ্বন্দ্বাধ্যাস তোমাকে বন্দীর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু এ দ্বন্দ্বাধ্যাস বিদ্যাদ্বারা অপনীত হয়। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, "সংসারপরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি। ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যয়েষা নিবর্ত্ততে"। অর্থাৎ এই সংসারই পরম পদার্থ এবং পরমাত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার বিবেচনা-রূপ যে ভ্রান্তি, তাহারই নাম অবিদ্যা। বিদ্যা বা পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। এই অবিদ্যার আবরণশক্তি ব্রহ্মকে অপ্রকাশিত করে এবং বিক্ষেপশক্তি বশতঃ ব্রহ্ম জগদ্রূপে ব্যাবর্ত্তিত বোধ হন। কিন্তু অবিদ্যা জীবের স্বভাব নহে, তাহা হইলে মুক্তিত্বের ব্যাঘাত হয়। এই অবিদ্যা নাশের উপায় শাস্ত্রে দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, মনের প্রসন্নতা চাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা" অর্থাৎ যাহার রূপ রসাদিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বহির্ম্মুখ হয়, সেই বাহ্যজগতে আসক্তি চলিয়া গেলেই মনঃশুদ্ধি হয়। স্ববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির পালন ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে মনের প্রসন্নতা হয়। অপরোক্ষানুভূতি মুখে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ। সাধনং জায়তে পুংসাং বৈরাগ্যাদি-চতুষ্টয়ম্॥" অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালন, তপস্যা ও হরিতোষণা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে বিচারাদি সাধনচতুষ্টয় লাভ হয়। এই জন্য "সদা বিচারয়েত্তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ। জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥" অর্থাৎ মন প্রসন্ন হইলে সর্ব্বদাই জগৎ, জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচার আসে। বিচার করিতে করিতে জীবের ও জগতের নশ্বরত্ব দৃঢ় ধারণা হয়, এবং ঐ ভাব হৃদগত হইলেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখনই ব্যাবর্ত্তিত কারণ লুপ্ত হইয়া স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্ম আপনার প্রভায়

আপনি জ্যোতির্ম্ময় অনুভূত হয়। যাহাদের আত্মা অনুভূত হয়, অথচ পূর্ব্বাহিতবেগ সংস্কার বশতঃ দেহ পতন হয় না, তাহাদিগকে শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলে।

দ্বিতীয়তঃ। পূর্ব্বকথিত প্রণালীর অনুসরণ ব্যতীত সাধনান্তর দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্র প্রমাণে ইহাও অসকৃৎ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের নিয়ত উচ্চারণ ও তদর্থানুচিন্তা করিতে করিতে মনের প্রসন্নতা উপস্থিত হয় এবং কালে আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়। অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিতেছেন, "মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভি-মান্যপি। কিম্বদন্তীতি সত্যোয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥" যাহার সর্ব্বদা মুক্তি অভিমান, সেই মুক্ত, যে নিজকে সর্ব্বদা বদ্ধ মনে করে, সেই বদ্ধ। জ্ঞানগুরু বিবেকচূড়ামণিমুখে বলিতেছেন, "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। মনই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন যে, নিজেকে যে জীব ভাবে, সে জীব; যে নিজেকে শিব ভাবে, সে শিবই হয়। প্রথমকথিতসাধনবশে চিত্তশুদ্ধি হইলে যেমন তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের ধারণা হইতে থাকে, পক্ষান্তরে সেই সকল মহাবাক্যের প্রতি-নিয়ত উচ্চারণ ও তাহাদের অর্থানুচিন্তনে ক্রমে মনের ঐকতানবৃত্তি প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে বিচার বশে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভূত হয়। শেষোক্ত সাধনা উচ্চাধিকারীর প্রতি সমধিক প্রযোজ্য হইলেও এ পন্থাও সাধকের পক্ষেও অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

চিত্তশুদ্ধিজনিত বিচার দ্বারা অভেদে ব্রহ্মোপলব্ধি হইলে তখন বুঝিতে পারা যায়, এ জগৎ পূর্ব্বে যেমন দেখা গিয়াছিল, এখন আর তেমন নাই। "ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ। অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥" এই জগৎ মায়া, এই মাত্র দেখা গিয়া-ছিল, তাহা কোথায় গেল? কি আশ্চর্য্য, এই ছিল, আর এই নাই!!! তখন সে বুঝিতে পারে যে, এক অখণ্ড সমরস অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপন প্রভায় আপনি বিরাজ করিতেছেন। তখনি দেশ কাল নিমিত্ততার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখনই নানাত্বের পরপারে অবস্থিত হইয়া জীব বলে "সোঽহং ব্রহ্মাস্মি" আমি সেই ব্রহ্ম। ইহাই বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অননুভূতাত্মতত্ত্ব মাদৃশ জনের বিবর্ত্তবাদ প্রবন্ধ লিখা ধৃষ্টতা কি না? শাস্ত্র বলিতেছেন, "পরোক্ষাচাপরোক্ষেতি

বিদ্যা বেধঃবিচারজা। তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে।” অর্থাৎ বিচার হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দ্বিধা জ্ঞান জন্মে। তার মধ্যে পরোক্ষ বা শাস্ত্রজন্ম জ্ঞান হইলেও যতদিন না অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানে বিচার শেষ হইবে। অনুভব না করিয়াও সৎ শাস্ত্রের আলোচনা দোষাবহ হয় না। মদ্‌গুরু শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীপাদ তাঁহার জ্ঞানযোগ বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—“There is generally one great idea in India which militates against it. It is this. It is all very well to say, I am the pure, the blessed. But I cannot show it always in my life. That is true, the ideal is all very hard. Every child that is born sees the sky over head very far away; but is that any reason why we should not strike towards the sky? Would it mend matters to go towards superstition? If we cannot get nectar, would it mend matters for us to drink poison? Would it be any help for us because we cannot realize truth immediately to go into darkness, weakness and superstition?” “ভারতবর্ষে একথার এইরূপ বিরুদ্ধবাদ শ্রুত হওয়া যায়। নিজেকে পবিত্র, মুক্ত বা সোঽহং মুখে বলা সহজ। কিন্তু কার্য্যে আমরা সর্ব্বদা তাহা দেখাইতে পারি না। এই আদর্শ লাভ করা বড়ই কঠিন। বালক জন্মিয়াই বহুদূরে আকাশ দেখিতে পায়। কিন্তু দূরে আছে বলিয়া আমরা কি আকাশের দিকে হাত পা ছুঁড়িব না? কেবল কু-সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইলেই কি ভাল হয়? অমৃত পাই না বলিয়া কি বিষ খাইতে হইবে? আমরা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুর্ব্বলতা, মূর্খতা ও কু-সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইলে কি আমাদের কিছু কল্যাণ হইবে? কখনই নহে।” কথায় বলে, ভাল কথার ঝুটাও ভাল। এই সকল গভীর তত্ত্বালোচনায় বঞ্চিত হইয়া আমরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি।

রশ্মি-বিশ্লেষণ (Spectrum Analysis)

(শ্রীঅনাথনাথ পালিত।)

প্রকৃতির যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, নানাবর্ণরঞ্জিত দ্রব্যরাজি আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে। ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ, তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ—নিম্নে কোথাও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও ফলপুষ্পশোভিত তরুলতাসমূহ, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন নীলিমপূর্ণ বীচি-বিক্ষুব্ধ বারিধি, কোথাও বা কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, দর্শকের চক্ষুঃ রঞ্জন করে। ভাবুকের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য একটি ভাবের উৎস। কবি প্রাকৃতিক বর্ণ-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া স্রষ্টার শিল্পনৈপুণ্য চিন্তা করিতেছেন, আবার বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে কি, গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার নিরূপণে তন্ময় হইতেছেন। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 'বর্ণ' কি, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

সকলেই জানেন যে, স্থির জলাশয়ে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে উহার জল আন্দোলিত হইয়া চারিদিকে গোলাকারে বিস্তৃত হইয়া যায়। বেহালার তারে আঘাত করিলে যে ঐ তার কাঁপিতে থাকে, ইহাও বোধ হয়, অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এই কম্পন বা আন্দোলন বায়ু-রাশিতে সঞ্চালিত হইয়া উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহকে স্পন্দিত করিলে শব্দের কারণ উহাতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই তরঙ্গ আবার আমাদের কি? কর্ণকুহরস্থিত পটহকে স্পন্দিত করে। এই স্পন্দন কর্ণ-বিবরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুজালের সাহায্যে মস্তিষ্কে যে অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাই শব্দের কারণ। এ স্থলে 'আন্দোলন' বলিলে কি বুঝাইল, তাহার সম্যক্ ধারণা করা উচিত। ঘড়ীর পেণ্ডুলাম দুলিতে দুলিতে একবার দক্ষিণ পার্শ্বে আবার বাম পার্শ্বে যায়, কিন্তু যেরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বার দুলিতে থাকে অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে একবার আন্দোলিত হয়, সেইরূপ বায়ুরাশি কোন কারণে আহত হইলে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় স্পন্দন করিবে—কোন কারণে এক সেকেণ্ডে এক শত বার কোন কারণে বা দুই শত, তিন শত ইত্যাদি বার স্পন্দন করিতে পারে। স্পন্দন-মাত্রার অল্পতা বা আধিক্য অনু-

সারে সুর নিম্ন বা উচ্চ হয়। চড়া সুর বলিলে স্পন্দন-মাত্রা অধিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বর্ণভেদ বুঝিতে হইলে আলোক-তত্ত্ব জানা উচিত। বৈজ্ঞানিকেরা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈথর নামক এক পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। কি শূন্য প্রদেশ, কি পরমাণুসমূহের মধ্যস্থিত স্থান, কি বায়ুমণ্ডলের সীমাতীত আকাশ-প্রদেশ, সর্ব্বত্রই এই অদ্ভুত পদার্থ বিরাজমান আছে। এই ঈথর-স্পন্দনে উৎপন্ন তরঙ্গ আমাদের চক্ষে আঘাত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরীণ স্নায়ুসাহায্যে মস্তিষ্কে যে অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাই আলোকের কারণ। এখন দেখা যাইতেছে যে শব্দ ও আলোক উভয়ই অনুভূতি মাত্র। ঈথরের স্পন্দনের মাত্রার তারতম্য বর্ণভেদের কারণ। পণ্ডিতেরা যে শুদ্ধ এই ঈথরের অস্তিত্ব

আলোকও বর্ণের কারণ কি?

কল্পনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা ঈথরতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করিতে পারিয়াছেন। অবশ্য এই তরঙ্গগুলি মাপিতে হইলে আমাদের প্রচলিত মানদণ্ড (যেমন ১ গজ বা ১ ফুট) ব্যবহার করিলে চলিবে না। মানদণ্ড খুব ক্ষুদ্র হওয়া চাই; কেন না, যে সকল ঈথরতরঙ্গ রক্ত-পীত-হরিৎ-নীলাদি প্রাকৃতিক বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহারা এক ইঞ্চির তিন অযুতাংশের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। স্পন্দনের মাত্রা বা সংখ্যা যত অধিক হইবে, তরঙ্গগুলি তত হ্রস্ব হইবে।

এই বিশ্বব্যাপী ঈথরের কল্পনা বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। আলোকরহস্য বুঝাইবার জন্যই যে কেবল পণ্ডিতেরা ঈথরের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা নহে, তাঁহাদের অনেকের ধারণা যে, তাড়িত এবং আলোকবহ ঈথর অভিন্ন। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাড়িতের ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় চৌম্বকশক্তির বিকাশ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আলোক, তাড়িত এবং চৌম্বকতত্ত্ব ঈথরের সহিত কোন না কোন প্রকারে অনুস্যূত রহিয়াছে।

এতক্ষণে আমরা তিনটি তথ্য নিষ্কাশন করিতে পারিলাম। (১) শব্দ ও আলোক উভয়ই অনুভূতি; প্রথমটি বায়ুহিল্লোলের এবং দ্বিতীয়টি ঈথরতরঙ্গের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। (২) বায়ুর স্পন্দনের ন্যূনাধিক্য সুরের তারতম্যের কারণ; ঈথর-স্পন্দনের অল্পতা বা আতিশয্য বর্ণভেদের কারণ। (৩) স্পন্দনমাত্রা যত অধিক, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য তত অল্প।

সকলেই জানেন যে, সূর্য্যের শ্বেত আলোক মৌলিক বর্ণ নহে, প্রত্যুত রক্তপীতাদি সপ্তবর্ণের মিশ্রণসম্ভূত। একটি অন্ধকারময় গৃহের বাহিরে দর্পণ দ্বারা সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া, গবাক্ষের একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ঐ আলোক আনিয়া একটি ঝাড়ের কলম বা ত্রিশিরা কাচখণ্ডে ফেলিলে অনায়াসে দেখা যায়, যে, আলোক বিবর্ত্তিত (refracted) হইয়া কাচ হইতে নির্গত হইয়াছে ও সম্মুখীন দেওয়ালের উপর ইন্দ্রধনুর ন্যায় সাতটি (লোহিত, রক্তাভ লোহিত, পীত, হরিৎ, নীল, গাঢ়, আনীল বা ভায়লেট্) বর্ণরঞ্জিত এক চিত্র উৎপাদন করিয়াছে। এই বিচিত্রবর্ণ ছবিটিকে 'বর্ণপট্টিকা' (Spectrum) বলা যায়। ছিদ্র ও কাচখণ্ডের মধ্যে একখানি 'উত্তান' বা অন্তঃস্থূল গোলাকার কাচ (আতসী কাচ) (convex lens) ধরিলে, এই ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে দেখা যাইবে। এই স্থলে আর একটি বিষয় লক্ষিত হইবে যে, লোহিতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং ভায়লেট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবর্ত্তিত হইয়া দেওয়ালে পড়িয়াছে অর্থাৎ শ্বেত সৌররশ্মি যে রেখাপথে ত্রিশিরা কাচে প্রবেশ করে, বিশ্লিষ্ট হইয়া উহা হইতে নির্গত হইলে বর্ণগুলি সেই রেখা হইতে ভিন্ন ভিন্ন পথে অপসৃত হইয়া যায়। অবশ্য প্রান্তবর্ণদ্বয়ের (লোহিত ও ভায়লেট্) বিচ্ছেদ (dispersion) বা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কোণের পরিমাণ, ত্রিশিরা কাচ বা উহার সমধর্ম্মী অন্য স্বচ্ছ ঘন পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। একাধিক ত্রিশিরা কাচ ব্যবহার করিলে প্রান্তবর্ণদ্বয়ের অবকাশ বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু কাচখণ্ডগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ আলোক শোষিত হওয়ায় বর্ণপট্টিকার উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়।

সৌররশ্মি বিশ্লেষণ

এই সাতটি বর্ণ যে মৌলিক অর্থাৎ ত্রিশিরা কাচ দ্বারা অবিভাজ্য, তাহা সহজে পরীক্ষা করা যায়। একখানি পেষ্টবোর্ড বা পাত্‌লা কাঠে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ঐ পথে বিশ্লিষ্ট বর্ণরাজির যে কোনটিকে প্রবেশ করাইয়া উহাকে আর একখানি ত্রিশিরা কাচে ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, উহা বিবর্ত্তিত হইয়া দেওয়ালে পতিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় নাই।

সৌররশ্মির বর্ণপট্টিকায় কতকগুলি কৃষ্ণ বা অনুজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পীতাংশে একটি। এই গুলির অস্তিত্বের কারণ আলোচনা অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়াছে।

কোন পদার্থে তাপ প্রযোগ করিলে উহার পরমাণুগুলি স্পন্দিত হইয়া তন্মধ্যস্থ ঈথর-পরমাণুকে আন্দোলিত করে। এইরূপে ঈথরে তরঙ্গ জন্মে। তাপ যত অধিক দেওয়া যাইবে, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য তত কমিবে অর্থাৎ প্রথমে দীর্ঘ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় পরে তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ হ্রস্ব হইয়া যায়। এইরূপে পদার্থ প্রথমে উত্তপ্ত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে; এই অবস্থাকে 'লোহিতোত্তপ্ত' (red-hot) অবস্থা বলা গেল ; পরে এত উত্তপ্ত হয় যে, উহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়, এই অবস্থার নাম 'শ্বেতোত্তপ্ত' (white-hot) অবস্থা। পদার্থ কঠিন, তরল বা বায়বীয় যেরূপই হউক না কেন, তাপ সহযোগে ইহার এইরূপ শ্বেতোত্তপ্ত বা 'ভাস্বর' (incandescent) অবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভবপর। মনে করা যাউক, কোন পদার্থকে এইরূপ শ্বেতোত্তপ্ত করা হইয়াছে এবং উহার বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণপট্টিকায় পীতবর্ণ বিদ্যমান আছে। এখন যদি সূক্ষ্ম ছিদ্র ও ত্রিশিরা কাচের মধ্যে সোডিয়ম (আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য লবণের একটি উপাদান) নামক ধাতুর বাষ্প রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, যে, বর্ণপট্টিকার পীতাংশটি নিষ্প্রভ হইয়া উহাতে কৃষ্ণ রেখা পড়িয়াছে। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সৌরমণ্ডল সোডিয়ম প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থের বাষ্পে পরিবেষ্টিত এবং সূর্য্যের আলোক ইহার অভ্যন্তরীণ মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আসিবার সময় ঐ বহিঃস্থ বাষ্পস্তরভেদ করায় তাহার কতকগুলি বর্ণ আংশিক শোষিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্লিষ্ট সৌররশ্মিতে কৃষ্ণরেখাসমূহের সত্তার ইহাই কারণ।

বর্ণপট্টিকা তিন প্রকার। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র সমূহ হইতে বিকীর্ণ আলোকের বর্ণপট্টিকা 'কৃষ্ণরেখা'চিহ্নিত। শ্বেতোত্তপ্ত কঠিন বা তরল পদার্থসম্ভূত রশ্মিতে লোহিতাদি একাধিক বর্ণ থাকায় ইহাদের বর্ণপট্টিকাকে 'নিরবচ্ছিন্ন' বর্ণপট্টিকা কহে। আর শ্বেতোত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ হইতে বিকীর্ণ আলোকের বর্ণপট্টিকায় কেবল কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা থাকে বলিয়া উহাকে 'উজ্জ্বল রেখা' চিহ্নিত বলে। দ্বিতীয় প্রকার বর্ণপট্টিকা কোনরূপ কৃষ্ণ বা উজ্জ্বল রেখা দ্বারা বিভক্ত থাকে না।

বর্ণপট্টিকা মোটামুটি পরীক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বে যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলেই চলিবে, কিন্তু বর্ণপট্টিকার রেখাসমূহকে বিশদভাবে দেখিতে হইলে 'রশ্মিবীক্ষণ' (spectroscope) নামক যন্ত্রবিশেষের

সাহায্য লইতে হইবে। ইহার তিনটি অঙ্গ (১) একটি নল (২) বিশ্লেষক ত্রিশিরা কাচ বা সমধর্ম্মী স্বচ্ছ ঘন পদার্থ (৩) দূরবীক্ষণ। যন্ত্রটির দুই প্রান্তে নল ও দূরবীক্ষণ, এইরূপ ভাবে অবস্থিত যে, তাহাদের অক্ষরেখাদ্বয় (axes), মধ্যবর্ত্তী বিশ্লেষকের দুই পৃষ্ঠের সহিত সমভাবে অবনত। নলটির একপ্রান্তে একখানি উত্তান কাচ, অপর প্রান্তে উহার 'অধিশ্রয়ণী' (focus) বিন্দুস্থানে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র। কোন দ্রব্যের বর্ণপট্টিকা পরীক্ষা করিতে হইলে উহার কণামাত্রকে এই যন্ত্রের ছিদ্রমুখে রাখিয়া শ্বেতোত্তপ্ত করিতে হইবে। তন্নিঃসৃত কিরণসমূহ ছিদ্রপথে উত্তান কাচে আসিয়া সমান্তরালভাবে নির্গত হইয়া বিশ্লেষকের উপর পতিত হইবে, পরে ঐ বিশ্লিষ্ট রশ্মিসমূহকে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেই উহার বর্ণপট্টিকা নিরবচ্ছিন্ন কি তাহাতে উজ্জ্বল রেখা আছে, ইহা জানা যাইবে।

রশ্মিবিশ্লেষণপ্রক্রিয়া প্রকৃতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণাপক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কোন যৌগিক পদার্থের অতি সূক্ষ্মতম অংশকে শ্বেতোত্তপ্ত করিয়া তন্নিঃসৃত আলোককে বিশ্লিষ্ট করিলে যে বর্ণপট্টিকা উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ পদার্থের এক বা বহু উপাদানের বর্ণপট্টিকার সমবায় মাত্র। অতএব ইহার সাহায্যে কোন অজ্ঞাত যৌগিক পদার্থের উপাদান পরীক্ষা অতি সহজ ব্যাপার; কেবল অনেকগুলি জ্ঞাত ধাতুর বর্ণপট্টিকার চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই হইবে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অপেক্ষা এই প্রক্রিয়ায় সুবিধা অধিক, কেননা অতি অল্পমাত্র যৌগিক পদার্থ লইলেই পরীক্ষা করা চলিবে। এই পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতেরা অনেক নূতন ধাতু পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন।

কোন পদার্থ বিশুদ্ধ কি দূষিত, তাহাও এই প্রক্রিয়া দ্বারা অনায়াসে নিরূপণ করা যায়। মনে করা যাউক, যে, কোনও পদার্থের বর্ণপট্টিকা প্রস্তুত হইয়াছে; এখন যদি ঐ পদার্থসম্ভূত আলোক ও রশ্মিবিশ্লেষক যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্যে কোনও তরল পদার্থ (যেমন জল মিশ্রিত রক্ত) স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বর্ণপট্টিকার রূপান্তর ঘটে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তন মধ্যস্থিত তরল পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এইরূপে আমরা বর্ণপট্টিকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া পদার্থের প্রকৃতিগত বৈষম্য জানিতে পারি। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রশ্মিবিশ্লেষকের সাহায্যে রক্ত দূষিত কি বিশুদ্ধ, মূত্র স্বাভাবিক কি দোষাক্রান্ত ইত্যাদি ব্যাপারের পরীক্ষা কিরূপ সহজ।

এই প্রক্রিয়াদ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও অনেক তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। কোনও জ্যোতিষ্কের বর্ণপট্টিকাস্থ কৃষ্ণরেখার ভায়লেট্ বা লোহিত প্রান্ত অভিমুখে অবনতি দেখিয়া জ্যোতির্বিদেরা বলিতে পারেন যে, উহা পৃথিবীর নিকটে আসিতেছে বা তাহা হইতে দূরে যাইতেছে; শুদ্ধ তাহা নহে, তাঁহারা এইরূপ গতির বেগ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন।

কৃষ্ণরেখার লোহিত প্রান্তাভিমুখে অবনতি বর্ণপট্টিকার ঐ অংশের ভঙ্গুরতা (refrangibility) হ্রাসের চিহ্নমাত্র এবং ভায়লেট্ প্রান্তে অবনত হওয়া ভঙ্গুরতাবৃদ্ধির পরিচায়ক। আমরা আরও জানি যে, বর্ণপট্টিকার যে অংশের ভঙ্গুরতা অল্প, সেই অংশের স্পন্দনসংখ্যাও অল্প, যে অংশের ভঙ্গুরতা অধিক, তাহার স্পন্দনসংখ্যাও অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি কোনও কৃষ্ণরেখা ভায়লেট্ প্রান্তে অবনত হয়, তাহা হইলে আমাদের চক্ষে অধিকতর ঈথরতরঙ্গ আসে আর যদি লোহিতপ্রান্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে অল্পতর তরঙ্গ চক্ষুকে আঘাত করে। এস্থলে আর একটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জাহাজ স্থির থাকিলে যতগুলি নদী বা সমুদ্রতরঙ্গ কাটিয়া যায়, চলিবার সময় তাহা অপেক্ষা অধিক তরঙ্গ ভেদ করে; আবার কোনও রেলওয়েট্রেণ ষ্টেসনের নিকটে আসিবার সময় উহার এঞ্জিনের বাঁশীর শব্দটি ষ্টেশনস্থিত লোকের কর্ণে অতিশয় উচ্চ বা চড়া বোধ হয়, কিন্তু উহা চলিয়া যাইবার সময় তত চড়া বোধ হয় না; কেন না ট্রেণ যখন ষ্টেশনের নিকটে আসে, তখন অধিকতর বায়ুতরঙ্গ কর্ণপটহকে আঘাত করে এবং ট্রেণ চলিয়া যাইবার সময় তরঙ্গসংখ্যা কমিয়া যায়। এই-রূপে দেখা যাইতেছে যে, কোনও আলোকময় পদার্থ দর্শকের নিকটে আসিলে অধিকতর ঈথর তরঙ্গ এবং তাহা হইতে অপসৃত হইবার কালীন অল্পতর তরঙ্গ চক্ষুকে আঘাত করে। সুতরাং কৃষ্ণরেখার লোহিতপ্রান্তে অবনতি জ্যোতিষ্কটির পৃথিবী হইতে অপসরণ এবং ভায়লেট্ প্রান্তে অবনতি পৃথিবীর নিকটে আগমন সূচনা করে।

পূর্ণসৌরগ্রাসকালে চন্দ্রমণ্ডল বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতশ্রেণী বা মেঘমালার ন্যায় শোভমান যে স্তূপাকার উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায়, তাহার কারণ নিরূপণে রশ্মিবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্য কিরণের প্রধান অংশ একটি অভ্যন্তরীণ মণ্ডল হইতে আসিতেছে ইহাকে 'আলোকমণ্ডল' (photosphere) কহে। ইহা বাষ্পস্তর

বেষ্টিত। এই বহিঃস্থ অংশকে 'বর্ণমণ্ডল' (chromosphere) কহে। বর্ণমণ্ডলটি আলোকমণ্ডল অপেক্ষা স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল। পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ কালে এই বর্ণমণ্ডলের অংশবিশেষ 'সৌর-স্ফীতি' (solar prominence) রূপে প্রতীয়মান হয়। অনেক গুলি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে সৌরমণ্ডল পরীক্ষা করিলে উহার অন্তঃস্থ মণ্ডলের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণপটিকা বহির্ভাগের বর্ণপটিকার তুলনায় নিষ্প্রভ হইয়া যায়; সুতরাং বহিঃস্থ বাষ্প-স্তরের যে কোনও অংশের পরীক্ষা ব্যাপার সহজ হইয়া পড়ে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বর্ণমণ্ডলে উদজন বায়ু (hydrogen) বিদ্যমান আছে, কেননা, উদজনের বর্ণপটিকাস্থ উজ্জ্বলরেখা বর্ণমণ্ডলের বর্ণপটিকায় পাওয়া যায়।

সাধুসঙ্গ।

(শ্রী শিশিরকুমার বর্দ্ধন।)

যথার্থ মানুষ হওয়াই মানুষের দরকার। যথার্থ মানুষ কাকে বলি? মানুষের মত হাত পা মুখ চোক থাক্‌লেই হয় না; খুব মস্ত পণ্ডিত হলেও হয় না; আর খুব গায়ে জোর থাক্‌লেই যে মানুষের মত মানুষ বল্‌ব, তার মানে কি? এগুলো যে খারাপ, তা বল্‌চি না—গুণ বটে—তবে কথা হচ্চে যে, ও সব গুণ ছাড়া এমন একটী জিনিষ আছে, যাহাতে মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সেটী হচ্চে চরিত্র। চরিত্র না থাক্‌লে কিছুই হোলোনা—হাজারই লেখা পড়া শেখা থাক্ না কেন, আর হাজারই ধনবান্ হইনা কেন, সবই বৃথা। তাই বল্‌চি যে, প্রথমে আমাদিগকে চরিত্র গঠন কর্‌তে হবে, রিপুকুল ধ্বংস কর্‌তে হবে, ইন্দ্রিয় গুলোকে দমন কর্‌তে হবে। কথাটা ভারি সহজ; দুই কথায় সারা যায়, কাজে করাই বড় শক্ত। আপনাকে জয় কর্‌তে হোলে রীতিমত যুদ্ধ কর্‌তে হবে। কামান বন্দুক নিয়ে যুদ্ধের চেয়ে ঢের শক্ত। এই যুদ্ধ যিনি জিত্‌তে পারেন, তিনিই মহাবীর, প্রকৃত যোদ্ধা, প্রকৃত বলবান্।

আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান প্রভৃতির নাম ইতিহাসে খুব শুন্‌তে পাওয়া যায়। এরা খুব বড় দরের যোদ্ধা বোলে খ্যাত, কেহ কেহ আবার

"জগদ্বিজেতাহ বলে পরিচিত ; কিন্তু হোলে হবে কি ? এরাও রিপু জয় কর্‌তে পারেনি। আলেকজাণ্ডার ত ভয়ানক দুর্বৃত্ত ছিল। একসময় একটা যুদ্ধ জয়ের পর আলেকজাণ্ডার এক অতি প্রিয় বন্ধুর সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হন—ভয়ানক মাতাল—হিতাহিত জ্ঞান নাই। সামান্য কথা নিয়ে বন্ধুর সহিত ঝগড়া বাঁধ্‌ল ; আলেকজাণ্ডার বন্ধুর প্রাণ বধ কর্‌বো বোলে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন। বন্ধু ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু কি হবে ? ক্রোধের দাস, ক্ষমা কর্‌বে কি করে ? আলেকজাণ্ডারের নিষ্ঠুর তরবারি বন্ধুর হৃৎপিণ্ড ছেদন করিল। সত্য বটে, এরা খুব বলবান, বুদ্ধিবলে বলীয়ান, সদ্‌গুণও খুব ছিল, শারীরিক কষ্টে কাতর হোতো না, কিন্তু এসব থাক্‌তেও আসল জিনিষ যে চরিত্র, তাই তাদের ছিলনা, সেই জন্য বড় হোয়েও হোতে পার্‌লে না।

এখন যে যুদ্ধের কথা হচ্চে, সেখানে তলওয়ার, কামান, বন্দুক, বারুদে কিছু হবেনা। এখানকার অন্য রকম সরঞ্জাম। প্রথমতঃ, ইচ্ছা (সৎইচ্ছা) তার পর মনের বল, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি আর সাধুসঙ্গ হোচ্চে এ যুদ্ধের প্রধান সহায়। ইচ্ছার দরকার কি ? ইচ্ছা না হোলে কোন কাজ আরম্ভ কর্‌তে পারা যায় না, আবার ইচ্ছা থাক্‌লে কোন কাজই আট্‌কায় না। ইংরাজীতে আছে,—Where there is a will, there is a way অর্থাৎ মতি থাক্‌লেই গতি হয়। বাস্তবিক একটা কাজ কর্‌বার জন্য যদি যথার্থ ইচ্ছা হয়, তবে সে কাজ নিশ্চয়ই সম্পন্ন হবে। আজ না হয়, কাল না হয়, দুদিন বাদেও হবে—কিন্তু হবেই হবে। যাহার ভাল হবার ইচ্ছা আছে, সে চায় কোথায় ভাল লোক আছে, কোথায় দুটো ভাল কথা হোচ্চে, এ সব জিনিষ তখন তার খালি ভাল লাগে। আবার যাদের ইচ্ছা নাই, তাদের হাজার বলা যাক্ না কেন, সাড় নেই, মড়ার মত গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্চে ; ভাল বোঝ্‌বার শক্তি নাই, আর বুঝ্‌তেও চায় না। তাই বল্‌চি, সৎকার্য্যের ইচ্ছা হওযাটাই সুলক্ষণ।

তার পর, মনের বল বল্‌চি কেন ? না, রিপু দমন অথবা চরিত্র গঠন :অতি কঠিন ব্যাপার ; পদে পদে বিপদ, পরাজয় ও পতনের সম্ভাবনা ; ঈশ্বরের খুব দয়া না থাক্‌লে বড় একটা কেউ সফল হোতে পারে না। এখানে ধৈর্য্য চাই, অধ্যবসায় চাই, মনের বল ছাড়া এ সব ত কিছুই হোতে পারে না। আর এসব না থাক্‌লে এক পা এগোবারও যো নাই। হয়ত একবার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু যেই পার্‌লুম

না, আমি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বোলে বসি, মানুষমাত্রেই ইন্দ্রিয়ের অধীন, সে ইন্দ্রিয় জয় করা দুঃসাধ্য, অতএব চেষ্টা বৃথা। তাহোলে এই অবধি শেষ; উন্নতির আশা এইখানে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যদি হৃদয়ে বল থাকে, তবে এসব বিঘ্নাদি কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। তাই বলে কি যাদের মনের বল নাই, তারা চুপ কোরে বসে থাক্‌বে? কিছু কর্‌বে না, বা পার্‌বে না? না, তা নয়। তারা নিশ্চয়ই পার্‌বে, নিশ্চয়ই কর্‌বে। কারণ, তাদের ইচ্ছা আছে, আর পূর্ব্বেই বলেছি যে, ইচ্ছা থাক্‌লে, কিছুতেই এসে যায় না, সবই হোয়ে যায়। তারা যত দূর পারে করুক, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করুক।

ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহ না থাক্‌লে কিছুই হবে না। যত বড়ই লোক হোক্ না কেন, তাঁর যে পতন হোতে পারে না, একথা কেমন কোরে বিশ্বাস কোর্‌বো? অনেক অনেক মহাপুরুষের পতন হোয়ে গেছে। এখানে কারও গুমোর কর্‌বার যো নাই। এমন কি, পরমহংসদেবের মত মহাত্মাকেও ভুগ্‌তে হয়েছে। শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, কোন এক সময়ে পরমহংসদেবের মনে হোয়েছিল যে,আমি একজন ভারী সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়। তারপরই তাঁর মনে এমন পাপ ভাব এল যে, তাঁর মত সংযমীও বহু চেষ্টা করেও সে পাপ ভাব মন থেকে তাড়াতে পার্‌লেন না। তখন কোন উপায় ঠিক কর্‌তে না পেরে শেষ কালীমন্দিরে গিয়ে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন ও বল্লেন, "মা, এমন ভাব আমার কেন হলো? মা, বড় কষ্ট হচ্চে; তুই মা এ ভাব শীঘ্‌-ঘির কোরে দূর কোরে দে।" তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি শান্তিলাভ কল্লেন। এঁদের মতন লোকেরও এমন অবস্থা হোতে পারে,যখন ভগবৎকৃপা ভিন্ন মনের বলেও কিছু কর্‌তে পারে না; তখন দীন-অতিদীন অতি হীন আমাদের ত তাঁহার কৃপা ব্যতীত গতি নাই। আমাদের একমাত্র সম্বল হচ্চেন ভগবান। তাঁহাতে বিশ্বাস চাই, ভক্তি চাই, তাঁহাতেই নির্ভর কর্‌তে হবে, তাঁকেই রাত্রি দিন ডাক্‌তে হবে, প্রাণের ব্যথা জানাতে হবে, বল্‌তে হবে, "প্রভু, শক্তি দাও, বল দাও, আমরা অতি দুর্ব্বল" তা হোলে পর তিনিই সমস্ত ঠিক কোরে দেবেন, আমাদের যা যা দরকার, তা তিনিই যুগিয়ে দেবেন; যা হোলে ভাল হয়, সে রকম বন্দোবস্ত কোরে দেবেন। এই রকম স্থির বিশ্বাস চাই।

তার পর বলেছি, শুধু বিশ্বাস হোলেই হবে না; তাঁকে ডাক্‌তে হবে, এমন ভাবে ডাক্‌তে হবে যে,কেবল ঈশ্বর চিন্তা,সৎচিন্তা ছাড়া অন্য কোনরকম চিন্তা

আর মনে স্থান পাবে না। এ রকম কিছুদিন কর্‌বার পর দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, মন আগেকার মতন সহজে কুপথে যেতে চায় না, কেমন একটা মনে মনে ভয় হয়,আর পাপে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সকলের ত আর চট্‌করে এরকম বিশ্বাস ভক্তি হয় না ; কেননা, সকলেইত আর চৈতন্যদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক হোয়ে জন্মায়নি। কিন্তু যাতে হয়, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। আর সেই জন্যই সাধুসঙ্গের আবশ্যক।

চলিত কথায় আছে, "সৎসঙ্গে কাশীবাস, আর অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" দেখা যাক্ কথাটা কতদূর সত্য। মানুষ মাত্রেই অনুকরণনিপুণ ; যা দেখে, তাই শিখে, ভালই হোক আর মন্দই হোক। চোরের সঙ্গে থাক্‌লে চোর হোতে হবে আর সৎএর সঙ্গে থাক্‌লে সৎ হব। এর কারণ হচ্চে এই যে, যদি চোরের সঙ্গে থাকি, তাহোলে প্রথমতঃ তাদের আচার ব্যবহার, তারা কেমন করে চুরি করে, চুরি কোরে কেমন কোরে পালায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম দেখ্‌ব, আরও দেখ্‌ব যে, খালি আমিছাড়া আর সকলেই (কেননা আমার এখানে সঙ্গী সব হচ্চে চোর) এই কাজে ব্যস্ত, আর তার মধ্যে আবার যারা একটু পাকা, তারা আবার বাকি চোর ভাইদের কাছ থেকে বাহবা নিচ্চে। এইমত দেখে শুনে অনুকরণ কর্‌বার ইচ্ছা হবে। আর ইচ্ছা হোলেই কার্য্যও আরম্ভ হোলো, তার পর ক্রমে এক পাকা চোর হয়ে দাঁড়ালুম। আচ্ছা, যদি অনুকরণও না করি, তাহোলেও নিস্তার নেই। আমার বন্ধুরা তখন আমাকে নিজেদের মত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন, কখন আমাকে এক রাত্রে বড়লোক হবার লোভ দেখাবেন, কখন কখন আবার আমাকে বোকা বোলে তিরস্কার কর্‌বেন। এত চেষ্টা, এত আগ্রহে, মানুষের মন আর কতক্ষণ স্থির থাক্‌বে ? ক্রমে মন টলে গেল আর আস্তে আস্তে তাদের দলে গিয়ে মিশ্‌লাম।

সৎসঙ্গেও ঠিক এই রকমে মন বদ্‌লে যায়, কিন্তু এখানে ভাল দিকে যাওয়া যায়, এই টুকুই লাভ। সেই জন্যই লোকে বলে থাকে, "যদি না পড়াস্ পো, তো সহবতে থো।" অর্থাৎ যদি কাহারও লেখাপড়া শেখ্‌বার উপায় না থাকে, কিন্তু যদি সে সৎসঙ্গে মিসে, তা হলেই তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হবে। এর মানে এই যে, একটা চুম্বুকের কাছে একটা লোহা যদি কিছুদিন পোড়ে থাকে, তা হোলে সেটা যেমন চুম্বুক হয়ে যায়, ঠিক সেইরকম একটা ভাল লোকের কাছে যদি কেউ থাকে, তা হোলে সেও দিনকতক বাদে

সেইরকম ভাল হয়ে দাঁড়ায়। আরও দেখা যায় যে, পূর্ব্বো কথিত ঈশ্বরোপাসনা আর এই সাধুসঙ্গ এ দুটী ফলে একই দাঁড়ায়। কারণ, সাধুসঙ্গের দ্বারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়। এসম্বন্ধে একটী বেশ গল্প আছে। কোন একজন লোক একটী সাধুকে একসময় জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, বৈকুণ্ঠ কোথায়?" তাহাতে তিনি বল্লেন, "যেখানে ভগবান বাস করেন, সেইটী বৈকুণ্ঠ; ভগবান আবার ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন, কারণ, ভক্ত দিনরাত্র ঈশ্বর চিন্তা করেন, অতএব ভক্তহৃদয়ই বৈকুণ্ঠ।" ভগবানও একজায়গায় বলেছেন, "যে আমার চেয়ে আমার ভক্তের সেবা করে, সে উত্তম।" এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সাধুসঙ্গের দ্বারা অনেকটা ঈশ্বরোপাসনার ফল হয়, কারণ, অন্ততঃ যতক্ষণ সৎসঙ্গে থাকা যায়, ততক্ষণও ত মনটা পবিত্র থাকে, আর খানিক খানিক ঈশ্বরের ভাব ত মনে আসে।

কিন্তু সে যাহা হোক, অসৎ হবার চেয়ে সৎ হওয়াটা কিছু কঠিন কিম্বা বিলম্বে হয়। কারণ কি? কারণ এই যে, আমাদের মন হচ্ছে জলের মত। জল সদাই নীচু দিকে আপনিই গাড়িয়ে যেতে চায়, উঁচু দিকে ওঠ্বার চেষ্টা প্রায় নেই, তবে খুব জোরে গরম কল্লে বাধ্য হয়ে বাষ্প হলে উপরে উঠ্তে হয়। আবও দেখ্তে পাওয়া যায় যে, পাহাড়ে চড়াইএর চেয়ে ওৎরাইটা সহজ অর্থাৎ পাহাড়ে ওঠাটা কিছু শক্ত ও কাজেই একটু কষ্ট পেতে হয়, কিন্তু পাহাড় থেকে নামাতে কিছুই কষ্ট নেই, পা বাড়ালেই হোলো। ভাল ও খারাপ হওয়াটাও ঠিক এই রকম। অসৎ পথের মুখপাত্‌টার যে একটা সুখ পাওয়া যায়, আর যে ক্ষণিক ও বিষকুম্ভং পয়োমুখং সুখে মুগ্ধ হয়ে লোকে ঐ পথে দৌড়ুচ্চে, সে রকম সুখ সৎপথে পাওয়া যায় না— তা ছাড়া এখানে প্রথমটা একটু কষ্ট পেতে হয়, কেন না, কাদা মাখার চেয়ে কাদা ধোয়াটা একটু কষ্টকর। কিন্তু যে মহাত্মা এইটুকু ধৈর্য্য ধরে পার হতে পারেন, শেষ তাঁরই জিত, কারণ, তখন অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম।

সে যাহা হউক, এখন দেখা যাক্, সাধুসঙ্গ কি কি উপায়ে হতে পারে। এক হচ্চে মৃত মহাত্মাদিগের সঙ্গ আর এক হচ্চে জীবিত সাধুর সঙ্গ। মৃত সাধুর সঙ্গ আবার কোথায় পাব? মৃত মহাত্মাদিগের সঙ্গ পেতে হলে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত কিম্বা তাঁদের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাদি পড়্তে হবে। যদিও তাঁদের দর্শনলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, তবুও

তাঁদের জীবনী পড়ে জান্‌তে পারবো, তাঁহারা কেমন কোরে ইহ-জীবনে উন্নতিলাভ করেছিলেন—কেমন কোরে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছিলেন। তাঁদের চরিত্র, তাঁদের ধৈর্য্য, তাঁদের অধ্যবসায় প্রভৃতি কত শত সদ্‌গুণের বিকাশ দেখ্‌তে পাব। তাঁহারা সামান্য মানুষের মত জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু আপনাদের গুণে এই জগতে এত উচ্চ হয়েছিলেন। মানুষের ভিতর শ্রেষ্ঠ যাঁরা, সেই মহাত্মাদিগকে আমাদের জীবনের আদর্শ করতে হবে, তাঁদের ছবি মনের ভিতর এমন করে আঁক্‌তে হবে যে, বোধ হবে যেন দিন রাতই তাঁরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাহলে পর পাপে আর মন যাবে না, কিসে তাঁহাদের মত হতে পারব, তখন এই ভাব প্রাণে জেগে উঠ্‌বে। এখন তাঁদের মত হতে গেলে তাঁদের গ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে। শুধু পড়্‌লে হবে না, তাঁদের উপদেশ মত কাজ করতে হবে। তাঁহারা অনেক দিন দেখে শুনে ঠেকে ঠেকে যে জ্ঞান পেয়েছিলেন, এই উপদেশগুলি সেই জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিসে কি হয়, এ তাঁরা ভাল রকমই জান্‌তেন। তাই বল্‌ছি যে, তাঁহাদের উপদেশ পড়্‌তে হবে আর জীবনে পরিণত কর্ত্তে হবে।

এতে কাজ হবে বটে, কিন্তু জীবিত সাধুদের সঙ্গ অপেক্ষা এর ফল কিছু ধীরে ধীরে ও বিলম্বে ফল্‌বে। জীবিত মহাপুরুষদের একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে—তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লে, তাঁদের চরণ স্পর্শ করলে দেহ মন প্রাণ পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু মৃত সাধুদের সঙ্গের এই টুকুই হচ্ছে অভাব। প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে যেমন মনে সাহস, বল, দৃঢ়তা আসে, পরের মুখে শুন্‌লে বোধ হয়, তত দৃঢ় হয় না। কোন্ কালে কোন্ মহাপুরুষ এসেছিলেন কি না, এ বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ হতে পারে। কারণ হচ্ছে এই যে, যখন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো, তখন খুব একটা হুলস্থুল পড়ে গেল, তাঁর শক্তিতে সবই বদ্‌লাতে লাগ্‌লো সবই নূতন হলো। সেই শক্তিতেই দ্বিগুণ বেগে কার্য্য হতে লাগ্‌লো, কিন্তু তাঁদের দেহত্যাগের পর তাঁদের শক্তি, তাঁদের প্রভাব ক্রমে ক্রমে মিশিয়ে গেল। তার পর ক্রমে সন্দেহ হতে লাগ্‌ল, তাঁদের কার্য্যে অবিশ্বাস। তখন মনে হতে থাকে যে, তাঁরা যে সব মহৎ কার্য্য করেছিলেন, সে সব মিথ্যা, যেহেতু অমানুষিক। সে যা হোক, জীবিত মহাত্মাদের নিকট এটুকু হবার যো নাই—চোখের

উপর যখন তাঁদের কার্য্য দেখ্‌ছি, ত্যাগ ভক্তির অলন্ত দৃষ্টান্ত সব দেখ্‌ছি, তখন এ সব যে মানুষে কর্‌তে পারে না, এ বিষয়ে কেমন কোরে সন্দেহ কর্‌ব?• এঁদের জীবনবৃত্তান্ত যেমন আমাদের পড়্‌বার দরকার হয় না, পরের মুখে শুন্‌বারও দরকার হয় না, তেমি এঁদের উপদেশ ইত্যাদি অন্ত কোন লোকের কাছে জান্‌বার দরকার করে না।

যা হোক্‌, এখন একটা কথা হচ্ছে যে, আমাদের গুরুর প্রয়োজন আছে কি না, আর তার জন্ত চেষ্টা কর্‌তে হবে কি না। গুরু দরকার সকলেরই আর সকল কাজেই আছে। গুরু ছাড়া কোন পথে প্রায়ই যাওয়া যায় না—গুরু হচ্ছেন পথপ্রদর্শক—তিনি তাঁহার পথটিতে ভাল করে চলেছেন, তিনি সেই পথ কেমন, আর সেই পথে কোথায় কি আছে, সে সমস্তই ভাল জানেন। অতএব তিনি তাঁহার শিষ্যকে কি রকম কোরে তার পথ দিয়ে যেতে হয়, তা বলে দেবেন আর শিষ্যও যদি ভাল কোরে চলে, তা হলে তাকে কোন বিপদ বিঘ্নাদি পেতে হবে না। তাই বলে কি অমি একেবারে গুরু গুরু করে ঘুরে বেড়াতে হবে? সেটা মনের ভুল, কেন না, গুরু খোঁজ্‌বার আগে শিষ্য হবার উপযুক্ত হতে হবে। এ সম্বন্ধে একটা কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়—

গুরু মিলে লাখেলাখ,
চেলা নাহি মিলে এক।

গুরু অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য পাওয়াই কঠিন। উপযুক্ত পাত্র না হলে গুরুর সকল উপদেশ, সকল চেষ্টা বিফল হবে। আর শিষ্য হবার উপযুক্ত হতে হলে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি রেখে তাঁকে ডাকৃতে হবে। তার পর যখন আবশ্যক হবে, তখন তিনিই জুটিয়ে দেবেন। পরমহংসদেবের জীবনে আমরা এ সম্বন্ধে একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই। তিনি কখনও গুরু খুঁজ্‌তে যান নাই—তিনি তাঁর নিজের কর্ত্তব্য যা, তাই কর্‌তে লাগ্‌লেন—মন প্রাণ এক কোরে ঈশ্বরোপাসনা কর্‌তে লাগ্‌লেন তার পর কিছু দিন বাদে কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী উপস্থিত হলেন—তিনিই নাকি পরমহংসদেবকে যোগ-শিক্ষা দেন—তার পর তোতাপুরী নামক আর একজন মহাসাধু কোথা থেকে পুরী যাবার পথে তাঁর কাছে এসে পড়্‌লেন। এই মহাপুরুষের কাছেই পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—ইনিই নাকি এঁকে

বেদান্ত শিক্ষা দেন। শুন্‌তে পাওয়া যায়, তোতাপুরী কোথাও তিন দিনের অধিক বাস কর্‌তেন না, কিন্তু এই পরম পবিত্র ও উপযুক্ত শিষ্যের গুণে মোহিত হইয়া ইনি প্রায় ১১ মাস কাল শিষ্যের সহিত বাস করেন। এ দ্বারা বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, গুরু অন্বেষণের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কার্য্যের—কার্য্য কর্‌তে হবে—ফাঁকি দিলে চল্‌বে না—কারণ, এ যে কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়া বইত কিছুই নয়।

মোটের উপর কথা এই যে, ঈশ্বরোপাসনা হচ্ছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গ। সকলকেই ভগবানকে ডাক্‌তে হবে, কারণ, এ রকম সঙ্গ আর কোথাও নাই। তার পর মানুষের সঙ্গ—না কর্‌তে পার্‌লেই ভাল, কিন্তু তা যখন হয়ে উঠে না, তখন সৎ-সঙ্গই করা উচিৎ। শেষ সৎ আর অসৎ লোক চেনা; এ সম্বন্ধে গোড়াতেই এক রকম বলা হয়েছে। খুব নামজাদা লোক হলেও হবে না, দেখ্‌তে হবে, সে কিসের জন্য বড—তাহার যশের ভিত্তি কি? সে হয়ত আগাগোড়া বিশ্ববিদ্যালযে সব চেয়ে ভাল হয়ে এসেছে, তারমত হয়ত ইংরাজী বল্‌তে কি লিখ্‌তে কেউ পারে না, কিন্তু হয়ত তার চরিত্র অতি জঘন্য, হয়ত খুব মাতাল, নয় বেশ্যাসক্ত, নয় মিথ্যাবাদী, অর্থলোভী, স্বার্থের জন্য হয়ত সব কর্‌তে পারে—এ রকম লোককে "মণিনা ভূষিতঃ" সর্পের মত পরিত্যাগ করা উচিৎ। অতএব যে ব্যক্তি, তিনি বিদ্বানই হউন, আর মূর্খই হউন, যদি সচ্চরিত্র হন, তবে কেবল মাত্র তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনীয়। আপাততঃ শঙ্করাচার্য্য-লিখিত সেই সুন্দর শ্লোকটী এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি স্বরূপ গৃহীত হইল—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং ;
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"

প্রলাপ না সত্য ?

(শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

একটী গল্প আছে যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত মাটী খনন করিতে করিতে, মাটীর নীচে সমাধিস্থ একজন মহাপুরুষকে পান। মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনিয়া, সমাধিভঙ্গের নানাবিধ চেষ্টা হয়, কিন্তু কিছুদিন কোনও রূপে সমাধি ভঙ্গ হইল না। ক্রমে নানা উপায়ে সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ কথা পরমহংসদেবের নিকট উঠিয়াছিল। এক ব্যক্তি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, এ কিরূপ হইল ? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের অশুচি অবস্থায় দেহ ত্যাগের কারণ কি ?" পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, সে সমাধিস্থ মহাপুরুষের দেহের আর আবশ্যক ছিল না। উপমা দিলেন যে, বৈদ্যেরা বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করে—যখন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে।

সাময়িক কথার উত্তর হইল, কিন্তু সে কথার যত আন্দোলন করা যায়, ততই মনুষ্যদেহধারী জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরজ্ঞানলাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন। ঈশ্বরজ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তু জ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয়প্রলোভনে মন সুখ আশে ব্যাকুল হয়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রলোভনে মুগ্ধ না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন, যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফারণ পূর্ব্বক, যতই জড় নিয়মের জ্ঞান লাভ করুন, মানসিক চিন্তার দ্বারা যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিন্তায় বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার কদাপি জন্মে নাই।

সুবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন, "রামকো যো জানা নেই, সো জানা হ্যায় কেয়া রে!" যদি তত্ত্ব লাভের জন্যই চেষ্টা করুন, পুনঃ

পুনঃ অসার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না অথচ শোনেন, ঈশ্বর আছেন, পুনর্জ্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থিরনিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন, কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন।

কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যন্ত্রণায় আকুল হন, নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছেন, কৈ সে নিরপেক্ষ জ্ঞান তো জন্মিল না। কি করিব? কোথায় যাব? কে পথ বলিয়া দেবে? নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন; এ একথা বলে, সে সে কথা বলে, শাস্ত্র পাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন, মনুষ্য নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে? বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন, লোকের মুখেও শোনেন। কখনো বলেন মিথ্যা, কখনো সন্দেহে জড়িত হয়ে বলেন, কৈ দেখিলাম না তো। ভাবেন, যাক্ আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু সম্মুখে মৃত্যু—ভাবেন, হায়, চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না! কোথায় কে আমায় উপায় বলিয়া দেবে? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা তো তিনি করিয়াছেন।

যখন একান্ত আকুল, কি এক আশ্চর্য্য নিয়ম সংসারে চলে, এমন কথা তাঁর কাণে আসে, এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির করেন, এ ব্যক্তি যা বলে শুনিব, দেখি, এ পথে কি হয়! তাঁর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তাঁর প্রার্থনা বিফল হয় নাই, যদিচ অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর; আরো কিছু অগ্রসর হইলে আলো পাইবেন। সেই পথে চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রুচি প্রভেদ। যে সকল পান ভোজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক ছিল, সে সকল আর তৃপ্তিকর নয়, এমন কি, দেহের অসুখপ্রদ।

দেখিতে পান, যে সকলে মনের রুচি ছিল, যে সকল আলোচনা করিতেন, সে সকল নীরস এবং যৎকালীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন যে সকল বিষয় নীরস ছিল, এক্ষণে তাহা ব্যতীত আর সরস জিনিস নাই। পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞান লাভে তিনি ভাবিতেন যে, আমি উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা বুঝেন উন্নতি নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এক বিষয় মীমাংসা করায় শত সহস্র মীমাংসার বিষয় উদয় হয়। ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, পাতাল-তত্ত্বের এক বিষয়ের প্রশ্ন পূর্ণ না হইতে শত সহস্র প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়। ঐ "একঘেয়ে", একই রকম। সে সকলে আর রস থাকে না। কেবল ঐ যে একটী কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মন বিষয় চিন্তা হইতে অন্তর করিয়া অন্ত চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাই সরস।

এখন সত্য সত্যই তাঁহার দেহের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই কেন? সুখ ইচ্ছা নাই কেন? অপর চিন্তা নাই কেন? দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের বিকার না জন্মিলে ইন্দ্রিয়েরা সতেজ থাকে, তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে এ কি বিকার উপস্থিত? এ কি পীড়া? স্থূল দৃষ্টিতে পীড়াই বটে। মস্তিকের বিকার,—নচেৎ অত বড় পণ্ডিত, অত বড় বিজ্ঞ, অত বড় মানী, সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, দীন-হীনের ন্যায় পরের চরণ সেবা করিতে ব্যাকুল, দিবারাত্র রোদন করে, রোদনের ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাসিকার দিকে চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষের অপর কোণ হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের দ্রব্য ভোগ করা দূরে থাকুক্, স্পর্শ করাইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কাল সর্পের ন্যায় জ্ঞান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র-যন্ত্রণা বোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে সকলে ব্যাকুল হয়, তাহাতে তিলমাত্র কাতর নয়—যেন অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর। অধিক সুরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইরূপ বিভোর।

দেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আর কিছু নয়, ও Clairvoyance—একটা রোগবিশেষ। এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য, তবে ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। এ কি বলা যায় না, রোগের প্রলাপ অবস্থার ওরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু স্বতন্ত্র,—এ কি সব বলে?—প্রলাপ?—প্রলাপই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—শাস্ত্রে এরূপ অবস্থার কথা আছে। জ্ঞানীর

এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার একটী কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্যই যে সব অতীন্দ্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে মিল থাকে না,—আজ এক রকম, কাল এক রকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো ভবিষ্যৎ কথা শোনা যায়—সত্য হইতেও দেখা যায় ; কিন্তু ইহার এক আবটা নয়, যাহা মিলান যায়, তাহার সমস্তই সত্য। আবার কতকগুলি শক্তির বিকাশও দেখা যায়,—এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসে, মৃত্যুভয় দূর হয়, এ এক অদ্ভুত পাগল। এ পাগল যথায় যায়, তথায় ইষ্ট। গ্রাম মাতায়, দেশ মাতায়, ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কি সত্য ?—সত্য। আমরা এ পাগল দেখিয়াছি, এবং যে পাগল তাহাকে পাগল করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্য বোতল ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে? পরমহংসদেব বলিতেন, নিশ্চিত। সে কথায় নিশ্চিত ধারণা কেন না করিব? —যে কথায় যমভয় দূর হয়, যে কথায় সংসারসাগরতরঙ্গে বিচলিত করে না, যে কথার ফলিত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি,—সে কথায় কেন না নির্ভর করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়, সে পথে কেন না চলিব? আরে বাতুল, তুমি আমায় বাতুল বল? অহঙ্কার করিয়া বলিব,—অহং তাঁহার—আমায় নয়, অহঙ্কার করিয়া বলিব—আমি বাতুল নই। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় পাইয়াছি—মনুষ্যত্ব লাভ করিব।—মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে, বোতল যাক্ না :—জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জয়।

রামকৃষ্ণ মিশন।

আমেরিকা।

নিউইয়র্ক।

বিগত ১৫ই অক্টোবর তারিখে বেলুড় মঠের স্বামী নির্ম্মলানন্দ কবাটিমো নামক ইটালিয়ান ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া বোম্বাই হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ প্রায় ৭ বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হইয়াছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দ যাইয়া তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করিবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ ও সাধন ভজন করিয়া ইঁহার জীবন বিশেষ ভাবে গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ইংরাজী-বিদ্যায়ও ইঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি। ইনি বেলুড়মঠের ছাত্রবৃন্দকে অনেক দিন হইতে উপনিষদ্, গীতা, বেদান্ত প্রভৃতি সভাষ্য পড়াইয়া আসিতেছিলেন। হিন্দী ভাষায় দৃষ্টান্তসমুচ্চয় নামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কয়েকটী উপদেশ প্রচারিত হয়, ইনি তাহার সংকলনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং হিন্দীভাষিগণের মধ্যে কিছু কিছু প্রচারও করিয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইঁহার পবিত্র ও উন্নত জীবনের আলোকে এবং হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার সাহায্যে আমেরিকা-বাসিগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো।

বিগত ১০ই জুন, ১৯০৩ এর লস্ এঞ্জেলস্ হেরাল্ড নামক আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশ,—স্বামী ত্রিগুণাতীত গতকল্য ব্রেন্ট্‌স্ হলে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় অগণ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"প্রাচ্যভূমিতেই সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে। এসিয়াই সকল বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য ও অবতারগণের জন্মভূমি। অপর দিকে পাশ্চাত্য জগৎ ভৌতিক, বৈজ্ঞানিক ও মানসিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন; এখন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মিলনের সময় আসিয়াছে। আমাদের এক্ষণে আদান প্রদানের সময়

সমুপস্থিত। এই কারণেই পাশ্চাত্য জগৎ এক্ষণে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং সুদূরবর্ত্তী প্রাচ্য জাতি সমূহ ভৌতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। আমরা যীশু, বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সকলে বলে, ও সকল অনেক প্রাচীন যুগের কথা, তাঁদের ন্যায় জীবনকে নিয়মিত করা এখন অসম্ভব। আমি তোমাদিগকে এমন এক জনের কথা বলিব, যিনি সে দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও আমি তাঁহার শিষ্য-গণের অন্তর্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের একটী সামান্য পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার প্রবল পিপাসা, সর্ব্বত্যাগ ও তপস্যা বলে তিনি এমন কতকগুলি ক্ষমতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্য জগৎ এ যুগে লাভ করা অসম্ভব বলিয়া অনুমান করে। তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি আসিত, তিনি তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবন ও উপদেশ দ্বারা জগৎকে দুইটী অতি উচ্চ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রথম, বেদোক্ত ধর্ম্ম কার্য্যে—জীবনে—পরিণত করা যাইতে পারে; দ্বিতীয়, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ভিতর কতকগুলি মহান্ সত্য আছে। সকল গুলিই এক স্থানে যাইবার জন্য বিভিন্ন পথ মাত্র। এই পথের বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়াই আমাদের প্রত্যেকের নিকট আমাদের গম্যস্থান পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক সকলগুলিই সেই এক ঈশ্বরে লইয়া যাইতেছে।"

কনখল।

এই সেবাশ্রম হইতে গত অগষ্ট মাসে ১২৬ জন সাধু ও ২০১ জন গরিব গৃহস্থ ঔষধ লইয়া গিয়াছেন। ৪ জনকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। এই মাসে আলমোড়ায় লালা বদরি শা ১০৲ কলিকাতাবাসী বাবু বিপিনবিহারী দে ৫৲ শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী ৪৲ ডি, এইচ, ওয়াল-ডিকার ২০৲ ও বি, এন, দসান ১০৲ সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং রুগ্ন ও দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত লাহোরের দেওয়ান চাঁদ বর্ম্মার নিকট ৩১সের ৪ ছটাক আটা, এক সের ৬ ছটাক লবণ, ⁄৫‌৷৹ সের ডাল, ⁄৫৷৹ সেঃ দুগ্ধ, ⁄৭৸৹ চাল, ⁄৷৷⁄১০ ছটাক ঘৃত ও

চিনি এবং বোম্বাইএর শ্রীমতী নাথি ভাইএর নিকট হইতে এক বাক্স এলোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য, ঔষধ, পোষ্টেজ, মাহিনা আদি হিসাবে এই মাসে ৫৩৮৵০ খরচ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূর্ব্বের ন্যায় মান্দ্রাজের বিভিন্ন পল্লীতে ক্লাস করিতেছেন। কিছু দিন হইল, তিনি মান্দ্রাজের অন্তর্গত ময়লাপুর পল্লীর এথিনিয়ম হলে, 'শক্তি-পূজা' সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করেন।

বাঙ্গালোর।

বাঙ্গালোর সহরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহার কার্য্য হইবে, তাহার নাম 'বিবেকানন্দ আশ্রম।' রাজকীয় জীবাণুতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীনিবাস রাও এম, এ, ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। রামস্বামী আয়াঙ্গার ও পি, বি, পিল্লায় ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ এবং এম, কল্লাপ্পা ইহার কোষাধ্যক্ষ। এই আশ্রমের সহিত একটী অনাথাশ্রম স্থাপিত হইবে। অনাথগণকে ইংরাজী, সংস্কৃত ও কানারিজ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী যোগেশ্বরানন্দ এক্ষণে তথায় নিয়মিত ভাবে গীতা শিক্ষা দিতেছেন।

বারাণসী।

স্বামী শিবানন্দ বারাণসী আশ্রম হইতে স্বামী বিবেকানন্দের জগদ্বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। উহা এক্ষণে যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। হিন্দী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলি প্রচারে হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহার উপদেশের মর্ম্মাস্বাদনে সমর্থ হইবে। ইতিপূর্ব্বে তামিল, তেলুগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলি অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে।

এই আশ্রমের সাহায্যার্থ বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায় ৫৲ টাকা, লালা বদ্রি শা ২০৲ টাকা ও বিসলপুরের বাসুদেব শাস্ত্রী ১০৲ টাকা দিয়াছেন।

বারাণসী সেবাশ্রমের কার্য্যও অতি সুন্দররূপে চলিয়াছে। গত জুলাই মাসে ৭২ জন বাহির হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছেন এবং আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন ১৬ জন। বাড়ী বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া তিন মন দশ সের এক ছটাক চাউল সংগ্রহ হইয়াছে। খরচ খরচা বাদ হস্তে ৮৬৮।০১৫ আছে।

এলাহাবাদ।

শুনিয়া সুখী হইলাম, বেলুড় মঠের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, (যিনি এক্ষণে এলাহাবাদ ব্রহ্মবাদিন্ ক্লবে অবস্থিত করিতেছেন) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী ও উপদেশ হিন্দী ভাষায় সংকলন করাইয়া মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সমগ্র হিন্দুস্থানে বিস্তারিত হউক।

বর্দ্ধমান।

গত ১০ই শ্রাবণ হইতে বর্দ্ধমানে 'রামকৃষ্ণ সমিতি' নামক একটী সভার প্রতি রবিবার অধিবেশন হইতেছে। অদ্য পর্য্যন্ত সভার দ্বাদশটী অধিবেশন হইয়াছে ও বর্দ্ধমানের শিক্ষিত ও মাননীয় বহু লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। সভাতে গীতা, বিবেকচূড়ামণি, শ্রীম—কথিত কথামৃত প্রভৃতি পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কাশীনিবাসী বাবু রামলাল দত্ত, যিনি এক্ষণে বর্দ্ধমানের অধিবাসী হইয়াছেন, তিনি এ সভায় ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

কলিকাতা।

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি।

এই সমিতির সভ্যবৃন্দ আর এক নূতন সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া যাহারা পাঠশালার শিক্ষায় পর্য্যন্ত বঞ্চিত, এমন বালকগণকে লইয়া একটী বিদ্যালয় গঠন করিয়াছেন। তথায় প্রায় প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া ছাত্রগণকে বাঙ্গালা, শুভঙ্করী, মুখে মুখে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অনেক ছাত্র এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতেছে যে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সমিতির সভ্যগণের এই উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয়। যদিও তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং শক্তিও সামান্য, তথাপি তাঁহারা এই কার্য্যে একটী নূতন বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আশা করি, দেশের গণ্যমান্য নেতৃগণ বালকগণের এই কার্য্য হইতে প্রকৃত কার্য্যের যথেষ্ট সঙ্কেত পাইবেন। ৫৩ নং বোসপাড়া লেনে এই শিক্ষালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি।

বিগত ২১শে কার্ত্তিক এই সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য গণিতাধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ পালিত বিজ্ঞান-বিষয়িণী এক বক্তৃতা দেন। বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সকল জনসাধারণে প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। এখন হইতে প্রায় প্রতি শনিবার অনাথ বাবু মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে এই বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বাগবাজার লাইব্রেরি।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে বাগবাজার লাইব্রেরির চর্চ্চাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির অন্যতম সভ্য বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তি-যোগ পুস্তকখানির ভাব সংকলন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ অতি মনোরম হইয়াছিল।

ধর্ম্মতলা।

কিয়দ্দিবস গত হইল, স্বামী সারদানন্দ অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট নিবাসী পি, এন, বোস মহাশয়ের গৃহে একটী পারিবারিক সভায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর প্রচার।

বিগত ৯ই কার্ত্তিক সোমবার ১৭ নং বোসপাড়া লেনে রমণীগণের উপকার জন্য স্বামী সারদানন্দ একটী গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রায় ৫০।৬০ জন অন্তঃপুরচারিণী বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হন। মিসেস ওলবুল (বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের বিধবা পত্নী—স্বামী বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত) হারমোনিয়ম বাজাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রতি মঙ্গলবার বেলুড়মঠের স্বামী বোধানন্দ গীতাব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক হইতে এ স্থানেই বয়স্কা স্ত্রীলোকগণের জন্য স্ত্রী-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার ইহা খোলা থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস্ ক্রিষ্টিনা গ্রীনষ্টাইডল্ সেলাই ও অধ্যাপক জগদীশ বসুর ভগিনী লেখাপড়া শিখাইবেন। এতদ্ব্যতীত পরমহংসদেবের স্ত্রীলোক ভক্তগণ আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থিনিগণকে বিদ্যালয়ের গাড়ী করিয়া আনা ও রাখিয়া আসা হইবে।

বহুবাজার।

বহুবাজার রামকৃষ্ণসমিতির কার্য্যও সুন্দর চলিয়াছে। তথায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, সাধুসঙ্গ এবং অদৃষ্ট ও পুরুষকার-সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। 'সাধুসঙ্গ' নামক বক্তৃতাটি অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

কাঁকুড়গাছি।

বিগত জগদ্ধাত্রী পূজার দিবস শ্রীরামকৃষ্ণসেবক ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জন্ম উপলক্ষে এক উৎসব হয়। উৎসবক্ষেত্রে কাঙ্গালী ভোজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের একটী প্রস্তাব সমালোচনার্থ পাইয়াছি। মহামণ্ডল একটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় করিতে চাহেন। করিতে পারিলে ভারতের পরম কল্যাণ, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে এই অর্থকরী বিদ্যার চর্চ্চার দিনে বিপুল অর্থসংগ্রহ ব্যতীত ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, বলিতে পারি না। তবে শুনিতে পাই, ইহার নেতা স্বামী জ্ঞানানন্দ ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সৎকার্য্যের উদ্যমও প্রশংসনীয়।

সেপ্টেম্বরের প্রবুদ্ধ ভারতে শিবাজী স্বাক্ষরকারী জনৈক ব্যক্তি ভারতের উন্নতির জন্য অনেকগুলি নূতন নূতন উপায়ের কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার যতদূর সাধ্য প্রজাবর্গের হিতচেষ্টা করিতেছেন। প্রজাগণ এক্ষণে যদি নিজেরা একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সাহায্য করেন, তবেই দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভব। আমরা এই প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণকে একবার পাঠ করিয়া প্রবন্ধলেখকের কথিত উন্নতির উপায় সকল সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

গোদাবরী হিন্দুসমাজ একটী পরীক্ষা করিয়া ৭ জন কৃতকার্য্য ছাত্রকে ৭৫৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ৩০৲ টাকা ও ২০৲ টাকার পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দুইটী প্রশ্নপত্র থাকিবে ও প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে তিন ঘণ্টা করিয়া সময় দেওয়া হইবে। প্রথমটী তেলুগু ভাষায় ভগবদ্গীতার প্রথম ছয় ও

একাদশ অধ্যায়ের উপর এবং দ্বিতীয়টী ইংরাজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত বক্তৃতা ও পত্রগুলির উপর—(১) চিকাগো বক্তৃতা (২) মাদ্রাজ অভিনন্দন পত্রের উত্তর, (৩) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যে পরিণতি (৪) ভারতীয় সাধুগণ (৫) আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ও (৬) ভারতের ভবিষ্যৎ।

কালিকা স্তোত্র।

জয় মা শঙ্করী, ভুবন ঈশ্বরী,
জলদ বরণ কায়া।
জয় মা তারিণী ত্রিতাপ বারিণী
জয় মহেশ্বর জায়া॥
জয় ক্ষেমঙ্করী, শুভে শুভঙ্করী,
ত্রিনেত্রভালিনী ভীমা।
জয় নারায়ণী, ভুবন পালিনী,
পতিতপাবনী শ্যামা॥
জয় মহেশ্বরী, কৈলাস ঈশ্বরী,
পরমা প্রকৃতি তারা।
জয় মা সুখদা, অন্তিমে মোক্ষদা,
দীন-জন-দুঃখ-হরা॥
জয়দে জয়দে, বরদে বরদে,
চারুচন্দ্রমনোহারী।
দীনে দয়া কর, বরাভয়কর,
জয় জয় মহেশ্বরী॥

কে তুমি জননী গো?

কে তুমি জননী গো?
নব জলধর জিনি বরণের আভা।
করাল কুন্তল জাল, গলে দোলে মুণ্ডমাল,
ভালে শোভে ত্রিনয়ন অতি মনলোভা॥

কে তুমি জননী গো ?
যোগিনী সঙ্গিনী লয়ে শ্মশানেতে খেলো।
দশ নখে দশ ইন্দু, জিনিয়া শারদ ইন্দু,
রূপের প্রভায় দিক করিয়াছে আলো।
কে তুমি জননী গো ?
চতুর্ভুজ, বরাভয়, খড়্গামুণ্ডকর,
দিগম্বরী তব বেশ, নাহিক লাজের লেশ,
পদতলে পড়ে আছে বাঘাম্বর হর।
কে তুমি জননী গো ?
চতুর্দ্দিকে দেবগণ করিতেছে স্তব।
দীন চারুচন্দ্র গায়, তব লীলা বোঝা দায়,
হেন সাধ্য আছে কার বুঝে মায়া তব।

প্রার্থনা।

রত্ন-রাজিবিভূষিত সুবর্ণ দেউলে
তোমার আসন, দেব ! দেয় ধনী জন ,
দীন হীন অতি আমি, নাহি কিছু মোর,
হৃদয় কাননে মম লওহে আসন !
রসনার তৃপ্তিকর সুখাদ্য অনেক
বিলাসী নৈবেদ্য, ধনী করে নিবেদন ;
দীন, হীন অতি আমি, নাহি কিছু মোর,
হৃদয়ের ভক্তি শুধু করহ গ্রহণ।
দাস দাসী কত শত, রক্ষী অগণন,
তোমার সেবায় রত, ধনীর আজ্ঞায়,
দীন হীন অতি আমি, নাহি কিছু মোর,
সঁপিয়াছি মন প্রাণ তব সাধনায়।
বিপদে সম্পদে সদা হইয়া সহায়,
উদ্যম তরিতে দেব ! হোয়ে কর্ণধার,
অবহেলি অনায়াসে তরঙ্গ-উত্তাল
করো পার মোরে নাথ, এ ভব সংসার।

পূর্ব্বস্মৃতি।

(শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

কেন স্মৃতি জাগাও আমারে
সে দুর্দ্দিন স্মরণের তরে ?
হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আমার,
যেদিন করিয়ে অন্ধকার—
ছাড়ি গেল মর-পুর, না জানি সে কতদূর,—
কোথায় সে দেবকায়, আমি বা কোথায়।
গুরুদেবে আর নাহি হেরিব ধরায় !!!

স্মরণে হৃদয় ফেটে যায়,
আষাঢের সায়াহ্ন বেলায়,
সুস্থকায় মঠে ফিরি,
জপমালা করে ধরি,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি,
সে ঘোর নিশায়,
কোথায় চলিয়া গেলে,
কারে কিছু না বলিলে,
শুধু সূর্য্য-লোক ভেদী সে দৃষ্টি প্রভায়
বুঝা গিয়েছিল তুমি সমাধি শয্যায় ॥

জেনেছিলে যাবে সেই দিন,
তাই শ্রীমন্দিরে সমাসীন—
ধ্যানে কি চকিতে হেরি, সুকণ্ঠে সুতান ছাড়ি,
"হৃদিপদ্ম কোকে আলো মা কালী আমার"
বলি শেষ মধুবীণা করিলে ঝঙ্কার ॥

জেনেছিলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে,
লীলা শেষ করিবে জগতে,

প্রভাতে শিষ্যের প্রতি, যজুঃ খোল অনুমতি,
তাইত "মধুমঃ সূর্য্যরশ্মি" ব্যাখ্যাছলে।
মরধাম ছাড়ি যাবে বুঝালে কৌশলে॥

কালী-পূজা হৃদয়ে মনন,
পূজার নাহিক আয়োজন,
শেষপূজা না করিলে,
একদিনো না রহিলে,
এত প্রেম এত স্নেহ মুহূর্ত্তে কাটিলে॥
তোমার সাধের মঠে শ্রীহীন করিলে॥

নাহি পারি যেতে সেই বিল্বমূলে আর;
বাঁধাইলে মূলদেশ যতনে যাহার।
যথায় আনন্দে বসি,
পূর্ব্ব আস্য হাসি হাসি,
গেয়েছিলে "বিল্বমূলে দেবীর বোধন।"
সেদিনের স্মৃতি মোর জাগ্রত স্বপন॥

কতমতে এদীনের পক্ষ সমর্থন—
করিতে, স্মরিলে হয় হৃদি বিদারণ;
বাঙ্গাল সন্তানে লয়ে,
আহ্লাদে মগন হয়ে,
কত কি বলিতে স্নেহ-প্রবল-হৃদয়।
সে দীনে কি এবে প্রভো! আর মনে হয়?

কত শাস্ত্র, কত বেদ, কত কি ব্যাখ্যান,
শুনিয়া ধিক্কার হোত স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞান।
শুধু রহিতাম ধ্যানে,
মুখচন্দ্র সুধাপানে,
শ্রীপদপরশে মোর জাগিত পূরব স্মৃতি।
চিনেছিনু একদিন কে তুমি—কোথায় গতি॥

বলিব না সে বারতা কি কায বলিয়ে তায়।
প্রত্যক্ষানুভূতি দিতে, শিক্ষা না ছিল কথায়।
নিজে মানি ভাগ্যবান্
ধন্য সে জনম স্থান
বিবেক আনন্দ শিষ্য জনমে যথায়।
কোটি নতি মোর গুরুভ্রাতৃগণ পায়॥

গুরুমন্ত্র কৃপাবলে ভেঙেছে স্বপন ঘোর,
"মা ভৈষ বিদ্বান্" কানে অনাহত বাজে মোর।
ভাবিলে দর্শন পাই,
কেমনে বলিব তাই,
গুরু মোর নাহি ভবে? মিথ্যা উক্তি অসংশয়।
বিবেক আনন্দ নামে হোক্ ভবে জয় জয়॥

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ঃ।

(বাঙ্গালোরে পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা।)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মশরণম্।

শ্রীমদ্ভগবদনুগ্রহাদেব সুধীবর্য্যাঃ ভবদ্বিধৈঃ সদ্ভিঃ সহ অস্মদ্বিধানাং ক্ষুদ্রানাং সমাগমো ভবতি। সৎসঙ্গাদেব তত্ত্বজিজ্ঞাসা জায়তে, তত্ত্বঞ্চ প্রকাশতে, তত্ত্বজ্ঞানাদেব পুংসাং ত্রিবিধদুঃখানামত্যন্তনিবৃত্তিতঃ নিঃশ্রেয়সাধিগমো ভবতি। অসদ্বিষয়সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, সৎসঙ্গাত্তু কামো বিনশ্যতি। উক্তঞ্চ— সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং, নিঃসঙ্গত্বে নির্ম্মোহত্বং, নির্ম্মোহত্বে নিশ্চলতত্ত্বং, নিশ্চলতত্ত্বে জীবন্মুক্তিঃ। অতঃ সৎসঙ্গ এব মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকর ইতি কিমু বক্তব্যম্?

বর্ত্তমানকালে অস্মিন্ ভারতখণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়কর্ত্তারঃ সঞ্জাতাঃ। তে সর্ব্বে দাক্ষিণাত্যং অলঙ্কুর্ব্বন্তঃ অবতেরুঃ। সাক্ষাচ্ছঙ্করমূর্ত্তিঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যস্তেষাং প্রথমঃ। তেন মহাত্মনা "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপর" ইতি সম্যক্ নির্ণীতম্। অক্ষরং পরমহংসব্রহ্মৈব নিত্যং সর্ব্বগতমচলং দেশকালনিমিত্তাতীতং সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ অস্মৎ দেশকালনিমিত্তজন্যং জগৎ মিথ্যা

অনিত্যমেব। মিথ্যাশব্দেন সাদিসান্তম্ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিবৎ অশাশ্বতম্ ন তু শূন্যমিতি শ্রীমচ্ছঙ্করাম্নুমোদিতার্থোগ্রাহ্যঃ সর্বত্র। তদ্বৈস্থৈব জীবস্য স্বরূপম্। জীবোঽয়ং অনাদিভ্রান্তিবশাৎ দেহে আত্মাভিমানিতয়া স্থূলোঽহং স্থবিরোঽহং কাণোঽহং কুব্জোঽহং মনসি চ আত্মাভিমানিতয়া সুখী অহং দুঃখী অহং ইত্যাকারমূঢভাবগ্রস্তঃ স্বরূপমজ্ঞাত্বা জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষসঙ্কুলে বিষয়বিষযুক্ততৃষ্ণাতোয়পূর্ণে সংসারকূপে সংপতন্ অশেষবিধদুঃখানি অনুভূয় পশ্চাৎ লোকক্ষয়কৃতা কালেন গ্রস্যতে। কালকবলিতোঽপি স্বকর্ম্মবশাৎ তত্রৈব সংপতন্ অশেষবিধানি দুঃখানি পুনঃ পুনরনুভবতি। কদাপি সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ তস্য যদি সদ্ভিঃ সমাগমোর্ভবতি, তদা তেভ্যোলব্ধ্বা সাধনচতুষ্টয়ং শনৈঃশনৈরজ্ঞানং ত্যজতি। সূর্য্যোদয়ে যথা তমঃ, জ্ঞানোদয়ে তথা তস্য ভ্রান্তিজন্যমশেষদুঃখং তদা বিলয়ং যাতি। সতাং সেবনং বিনা তু জ্ঞানং কদাপি ন লভ্যতে। শ্রীমদ্ভগবতাপি উক্তং, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" স্বরূপাববোধানন্তরমযমাত্মানমখণ্ডং সচ্চিদানন্দমদাহ্যমক্লেদ্যমশোষ্যং নিত্যং সর্ব্বগতং স্থাণুমচলং সনাতনং মত্বাত্র সংসারকূপে ন পুনরাবর্ত্ততে। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীন্ গ্রন্থান্ সম্যক্ বিচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈরিতি বিনিশ্চিতম্।

কালক্রমাৎ তৎসম্প্রদায়ভুক্তানামদ্বৈতমার্গগামিনাং সৎসঙ্গপরিত্যাগাৎ সাধনচতুষ্টয়াপ্রাপ্তেস্তত্ত্বজ্ঞানং ন সম্ভূতম্। অতএব মোহাদজ্ঞানাচ্চ মহাবাক্যানাং ভিন্নার্থপরিকল্পনাৎ তে অশুচৌ নরকে পতিতবন্তঃ। ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারেণ তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদীনাং মহাবাক্যানাং অর্থমবিশোধ্য পদমাত্রমবলম্ব্য বিরুদ্ধার্থং কৃত্বা তে সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতং দুঃখময়মজ্ঞানজন্যং আসক্তিপাশবদ্ধং সংসারিণং নামরূপপরিচ্ছিন্নমাত্মানং অক্ষরং অসঙ্গং পরমাত্মানং মত্বা সর্ব্বান্ বিধিনিষেধান্ বিহায় চণ্ডালবদাচরন্তঃ নরপশুত্বমাপন্নাঃ। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ তান্ সমুদ্ধর্ত্তুং লোকগুরুর্জগৎপিতা বিষ্ণুঃ, "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥" ইতি স্বপ্রতিজ্ঞাপালনায় মহাভূতপূর্ব্যাং শ্রীমদ্রামানুজরূপেণ উড়ুপ্যাঞ্চ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরূপেণাবততার। লোকান্ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকপরিশূন্যান্ ইহামুত্রার্থফলভোগলিপ্সূন্ শমদমাদিষট্সম্পত্তিরহিতানমুমুক্ষূন্ দৃষ্ট্বা তেষাং জীব-ব্রহ্মণোরৈক্যজ্ঞানায় নহ্যস্ত্যধিকার ইতি মত্বা তাৎকালিকমিথ্যাব্রহ্মোপাসনা উভাভ্যামেব ভৃশং শিবস্কৃতা, নিন্দিতা, উপহাসাস্পদতাং নীতা চ।

শ্রীমদ্রামানুজেন ঈশ্বরস্য নিত্যমেব চিদচিদ্বিশিষ্টত্বং প্রতিপাদিতং। অতএব তন্মার্গগামিনাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীত্যভিধেয়ানাং মতে অসংখ্যকল্যাণগুণসমন্বিতো হেয়গুণরহিতো নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলো বিষ্ণুরূপধরো ভগবান্ শেষিতয়া নির্ণীতঃ, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তাঃ চিৎসংঘাঃ শেষত্বেন প্রতিপাদিতত্বেন। শেষাঃ সর্ব্বাঃ ভগবতো নিত্যকিঙ্করাঃ। মোহবশাৎ বিষয়ভোগবাসনাবশাচ্চ তে শ্রীমদ্ভগবৎকৈঙ্কর্য্যং বিহায় কামকিঙ্করাঃ সন্তঃ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুসংসারসাগরে পতন্তি। সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ ভগবৎকৃপয়া যদা কামকৈঙ্কর্য্যং বিহায় তে স্বীকুর্ব্বন্তো ভগবদ্দাস্যং নিরহঙ্কারতাং গচ্ছন্তি, তদা স্বানামপোরণীয়স্ত্বং বিভোশ্চ মহতো মহীয়স্ত্বং পরিজ্ঞায় তস্মিন্ পরমানুরক্তিবশাৎ তদনন্যাশ্রয়দাসাপাস্তবিচেষ্টাঃ সন্তঃ পরমানন্দভোগভাজো ভবন্তি। তদা "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যাৎ ন পুনরাবর্ত্ততে ন পুনরাবর্ত্ততে।

শ্রীমন্মধ্বমুনিনাপি ভগবদ্দাস্যং সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠাপিতং চিদচিদীশ্বরাণাং তেষাং সংবন্ধানাং চ নিত্যত্বং প্রতিপাদিতং, ন তু ঈশ্বরস্য চিদচিদ্বিশিষ্টত্বমঙ্গীকৃতং তেন মহামুনিনা। ইন্দ্রিয়লোল্যং মনশ্চাঞ্চল্যঞ্চ নিগৃহ্য যদি কশ্চিৎ ভগবৎকৃপাধারেণ বিষয়ভোগবাসনাং কামকৈঙ্কর্য্যঞ্চ ত্যক্ত্বা ভগবৎকৈঙ্কর্য্যং কুর্ব্বীয়াত্তে, তদা তস্য নিখিলদুঃখাদীনাং অত্যন্তনিবৃত্তির্ভবতি, পরমপুরুষার্থশ্চ তং ভাগ্যবন্তং বৃণোতি। শ্রীমদ্ভগবৎপাদমূলং লব্ধ্বা স ন পুনরাবর্ত্ততে ন পুনরাবর্ত্ততে।

ত্রয় এব মহাত্মানঃ মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি অপুনরাবর্ত্তনং লক্ষ্যত্বেন নির্ণীতবন্তঃ, কেনোপায়েন তল্লব্ধুং শক্যতে ইত্যুপায়নির্ণয়বিষয়ে যদ্যপি সর্ব্বেষাং তেষামনৈকমত্যং বিভিন্নমার্গৈঃ পরিস্ফুটং প্রতিভাতি, তথাপি সর্ব্বেঽপি তে ভুবনস্য পারং গন্তুকামাঃ, ভুবনপতিপ্রাপ্ত্যর্থং, তৎপ্রাপ্তৈ্যব ত্রিবিধদুঃখানামত্যন্তানবৃত্তিসম্ভবাৎ। ভুবনস্য পারে কেন গন্তুং শক্যতে, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনাম্।" "নির্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা। অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ॥ দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥" "জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন।" ইন্দ্রিয়জয়ং জগৎ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

ইত্যুপনিষদুক্তসোপানদ্বারেণ ভুবনস্য পারং গত্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" লভতে শান্তো দান্ত উপরতেন্দ্রিয়-কর্ম্মা বিজিতাত্মা।

স্বশক্ত্যা ঈশ্বরশক্ত্যা বা ভক্ত্যা বা জ্ঞানেন বা লব্ধ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এব নিখিলদুঃখবন্ধাৎ মোক্ষং দদাতি। ইতি ন কেবলমস্মদীয়ানামৃষীনাং মতং হূনানাং যবনানামপি অত্রৈকমত্যম্। নৃণাং সত্ত্বরজস্তমোগুণতারতম্যাৎ পন্থানো ভিন্না লক্ষ্যন্ত একমেব। "ত্রয়ী সংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি। প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" পন্থানশ্চ রুচীনাং ভিন্নতয়া যদ্যপি বিভিন্নাঃ প্রতিভান্তি লক্ষ্যৈকতয়া সর্ব্বেষামপি তেষাং সমীচীনত্বং স্ফুটমেব। যথা প্রভিন্নপ্রস্থানা ব্যাসার্দ্ধাঃ একং কেন্দ্রং প্রতি-গচ্ছন্তি, প্রভিন্নাঃ ধর্ম্মমার্গা অপি তথা একং বিভুং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারং লোকগুরুং চরাচরপিতরং নিখিলদুঃখধ্বান্তরবিং সর্ব্বভূতহৃদ্দেশনিবাসিনং সর্ব্বকর্ত্তারং গুহাশয়ং সর্ব্বময়ং দেবং প্রতিগচ্ছন্তি। শ্রীমদ্ভগবতাপি উক্তঞ্চ,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" কৃকলাসো যথা স্বেচ্ছয়া স্ববর্ণং পরিবর্ত্ততে, কদাপি বা অবর্ণো ভূত্বা অবতিষ্ঠতি, শ্রীভগবানপি তথা ভক্তানুগ্রহায় বহুরূপৈরাত্মানং প্রকা-শয়তি। সমকালমেব স সাকারো নিরাকারশ্চ, কর্ত্তা অকর্ত্তা চ, "তস্য কর্ত্তার-মপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়মিতি" ভগবদুক্তেঃ। ভক্তিস্তৎপাদমূলং সুলভী-করোতি। "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়োবৈশ্যা-স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং॥" সা ভক্তি-র্ভারতখণ্ডে এবাস্তি অন্যত্র নাস্তি ইতি ন বক্তব্যং, হূনযবনানাং ভক্তিমার্গানু-সারিত্বাৎ। বৌদ্ধানামপি বুদ্ধভক্তিদৃশ্যতে। "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি-জাতম্। সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।" ইত্যত্র শ্রীজয়দেবেন বুদ্ধস্যাবতারত্বং স্বীকৃতম্। শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণে পূর্ব্বম্ প্রতিপাদিতত্বাৎ। অতএব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ শ্রীমদ্ভগবৎপাদমূলং প্রতি গন্তুং ক্ষমাঃ। অনেন তু "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ" ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যং।

এবং সতি যঃ স্বকীয়স্য ধর্ম্মস্যৈব কেবলং সত্যত্বং সমীচীনত্বং অন্যধর্ম্মাণাং অসত্যত্বং অসমীচীনত্বং স্বীকরোতি, প্রমাণ্ডুং যততে চ, স মূঢ়ঃ শোচ্য এব।

দম্ভাভিমানমদান্ধতয়া স কেবলমাত্মানং ভগবৎপ্রিয়তমং মন্যতে। "কোঽন্যো ঽস্তি সদৃশো ময়া" ইত্যজ্ঞানবিমোহিতঃ সন্। এতান্ পাষণ্ডান্ পঙ্গপালবৎ ধরণীবক্ষে সমাকীর্ণান্ ভ্রাতৃশোণিতাক্তকলেবরান্ ক্রূরান্ নরপশূন্ উদ্দিধির্ষুঃ শ্রীমৎবিবেকানন্দস্বামিবর্য্যস্য গুরুবরো দেশিকরাজঃ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাখ্যঃ কশ্চিদতুলনীয়ো জ্ঞানভক্তিময়বিগ্রহঃ পুরুষোত্তমো শ্রীমদ্বঙ্গদেশমলঙ্কুর্ব্বন্ বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় ইদানীমেব প্রাদুরাসীৎ। সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদাৎ ভিন্নরুচীনাং অতএব ভিন্নমার্গানুসারিণাং প্রয়োজনায় বহুবিধধর্ম্মাণাং অবস্থাভাবিত্বং সমীচীনত্বং সম্যক্ প্রতিপন্নং, প্রতিপাদিতঞ্চ তেন মহাত্মনা। সনাতনধর্ম্মরূপেণ তেন সনাতনধর্ম্মস্য সার্ব্বভৌমিকত্বং সর্ব্বকালং সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয়ত্বং সম্যক্ দৃষ্টং। স্থূলদৃশাং সঙ্কীর্ণমনসাং দৃষ্টৌ তু সনাতনঃ সার্ব্বভৌমিকোঽপি বেদমূলোঽয়ং ধর্ম্ম কস্যচিৎ সম্প্রদায়স্য প্রয়োজনসিদ্ধার্থমেব বিধাতৃবিহিতো, ন তু সর্ব্বেষাং রক্ষণায়। শাস্ত্রজ্ঞানাভাব এব এতৎসঙ্কীর্ণতায়াঃ কারণং। শাস্ত্রে সম্যক্ অধীতে চিন্তিতে চ ন কস্যাপি অস্মিন্নপসিদ্ধান্তে রুচির্ভবতি।

ভবন্তঃ পণ্ডিতবর্য্যাঃ, সর্ব্বশাস্ত্রকুশলাঃ, পরদুঃখাসহিষ্ণব ইতি মত্বা দাসোঽহং ভবৎসকাশমদ্যাগতবান্। শাস্ত্রানামধ্যয়নাদেব সর্ব্বলোকহিতচিকির্ষূণামার্য্যবংশসম্ভূতানাং বর্ত্তমানবংশধরাঃ ক্ষুদ্রচিত্তাঃ সঙ্কীর্ণমনসঃ সন্তঃ ইদানীং ভৃশং শোচ্যাঃ ভবন্তি। ভবতাং করুণাকটাক্ষাদেব তেষাং সুমতির্ভবিষ্যতি ইতি মন্যমানোঽহমদ্য তেষাং স্বাধ্যায়াধ্যাপনার্থং ভবতঃ প্রার্থয়ে। দানেনৈব বিদ্যায়াঃ উপচয়ো ভবতি। জ্ঞানখলাঃ শোচ্যা এব। ভবতাং সকরুণকটাক্ষং প্রতীক্ষ্য অধুনা তুষ্ণীং তিষ্ঠামি। হরিঃ ওঁ।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মশরণং।

হে সুধীশ্রেষ্ঠগণ, শ্রীমদ্ভগবানের অনুগ্রহেই আপনাদের তুল্য সাধুগণের সহিত আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ হইতেই লোকের মনে তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছা হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ও হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হইতেই লোকের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পরম কল্যাণ

স্বরূপ মুক্তিলাভ হয়। অসদ্বিষয়ের সঙ্গে লোকের কামনা উৎপন্ন হয়, সৎসঙ্গের দ্বারা কামনার নাশ হয়। শাস্ত্রে উক্তও হইয়াছে যে, সৎসঙ্গ হইতে মানুষ নিঃসঙ্গত্ব লাভ করে; নিঃসঙ্গ হইলে তাহার মোহের নাশ হয়; মোহ নাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞানে নিশ্চল ভাবে স্থিতি হয়; এই স্থিতি হইতেই জীবন্মুক্তিলাভ হয়। অতএব সৎসঙ্গই যে মোক্ষদ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়, ইহা কি আর বলিতে হইবে?

বর্ত্তমানকালে এই ভারতবর্ষে তিনজন তত্ত্বনির্ণয়কার জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্য ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ শঙ্করমূর্ত্তি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। সেই মহাত্মা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে," এই তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে নির্ণয় করেন। সেই ক্ষয়রহিত পরমব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সর্ব্বব্যাপী, অচল, দেশ কাল ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অতীত এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আর দেশকাল নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন জগৎ মিথ্যা—অনিত্য স্বরূপ। মিথ্যা শব্দের অর্থ যাহার আদি ও অন্ত আছে, যাহা শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদির ন্যায় অনিত্য, মিথ্যা বলিতে শূন্যমাত্রকে বুঝায় না—এই অর্থই সর্ব্বত্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনুমোদিত, অতএব মিথ্যা শব্দে এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। এই জীব অনাদি ভ্রান্তি বশে দেহে আত্মাভিমান করিয়া আমি স্থূল, আমি বৃদ্ধ, আমি কানা, আমি কুঁজো, এবং মনে আত্মাভিমান করিয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপ মূঢ়ভাবগ্রস্ত হইয়া নিজের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ দোষ যুক্ত, বিষয় বিষ মিশ্রিত তৃষ্ণারূপ সলিলপূর্ণ সংসারকূপে পতিত হইয়া নানাবিধ দুঃখ অনুভব করিয়া শেষে লোকক্ষয়কর কালের কবলে পতিত হয়। কালকবলিত হইয়াও নিজকর্ম্মবশে সেই স্থানেই পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নানাবিধ দুঃখ অনুভব করে। কখনও সৎকর্ম্মবশে যদি তাহার সাধুসঙ্গ হয়, তখন তাঁহার নিকট সাধনচতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানমুক্ত হয়। যেমন সূর্য্য উঠিলে অন্ধকার নাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে তাহার ভ্রমজনিত নানাদুঃখের নাশ হয়। সাধুসেবা ব্যতীত কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রণাম, প্রশ্ন ও তাঁহার সেবা করিয়া সেই জ্ঞান অবগত হইবে; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।" জীব নিজ স্বরূপ জানিতে পারিলেই আপনাকে অদ্বয়,

অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিয়া এই সংসারকূপে আর পতিত হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ সম্যক্ প্রকারে বিচার করিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই স্থির করিয়াছেন।

কালক্রমে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতপথানুসারিগণ সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের আর সাধনচতুষ্টয়ের শিক্ষা রহিল না, সুতরাং তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানেরও অভাব হইল। এই হেতু তাহারা মোহ ও অজ্ঞান বশে মহাবাক্য সমূহের ভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়া অশুচি নরকে পতিত হইল। ভাগত্যাগ লক্ষণা (১) দ্বারা "তত্ত্বমসি," "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য সমূহের অর্থ শোধন না করিয়া কেবল কথাগুলিমাত্র ধরিয়া বিপরীত অর্থ করিয়া এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, দুঃখময়, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, আসক্তিপাশবদ্ধ, নামরূপপরিচ্ছিন্ন সংসারী (২) আত্মাকে অক্ষয়, অনন্ত পরমাত্মা জ্ঞান করতঃ সমুদয় বিধিনিষেধ ত্যাগ করিয়া চণ্ডালের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল, সুতরাং তাহারা নরদেহে পশুতুল্য হইয়া উঠিল। এই মৃত্যুর আগার স্বরূপ সংসার-সমুদ্র হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য লোক-গুরু জগৎপিতা বিষ্ণু,—গীতায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি," এই নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মহাভূত নগরীতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যরূপে এবং উড়ুপী নগরীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, জনগণ নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকশূন্য, ইহপরলোকের ফলভোগকামী, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিরহিত এবং মুক্তিকাম নয়, সুতরাং তাহাদের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে অধিকার

---

(১) ভাগত্যাগলক্ষণা—বেদান্তীরা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করেন, যথা, 'তৎ' শব্দে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ঈশ্বর বা মায়া উপাধিযুক্ত চৈতন্য। আর 'ত্বম্' পদে অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ জীব। এই 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের উপলক্ষিত মায়া উপাধিযুক্ত চৈতন্য ও অবিদ্যোপহিত চৈতন্য হইতে যথাক্রমে মায়া ও অবিদ্যা এই দুইটী উপাধি বাদ দিয়া কেবল চৈতন্যাংশে উভয়ের একত্ব—ইহাই 'অসি' বাক্যের তাৎপর্য্য। ইহারই নাম ভাগত্যাগলক্ষণা। বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য 'বিবেক-চূড়ামণি' প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থে অনুসন্ধান করুন।

সং।

(২) 'সংসারী' অর্থে আমরা সাধারণতঃ পুত্রকলত্রাদিপরিবৃত গৃহী ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। শাস্ত্রে কিন্তু এই শব্দ 'জন্মমরণশীল জীবাত্মা' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নাই; এই মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই তখনকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাকে পুনঃ পুনঃ খণ্ডন, নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজ ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই চিৎ এবং অচিৎ বিশিষ্ট (১) ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই জন্য তন্মতানুসারিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে। অনন্ত অশেষ শুভগুণবিশিষ্ট, অশুভগুণশূন্য, সমুদয় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার লীলা স্বরূপ, এরূপ বিষ্ণুরূপধারী ভগবানকে তিনি শেষী বলিয়া এবং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমুদয় চিৎ বা চেতন জীব সমূহকে তিনি শেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই শেষগণ ভগবানের নিত্যদাস। তাহারা মোহ ও বিষয়ভোগবাসনাবশে শ্রীমদ্ভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া কামনার দাস হইয়া পুনঃ পুনঃ এই মৃত্যুগ্রস্ত সংসার সাগরে পতিত হয়। সৎকর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় যখন তাহারা কামনার দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করে, তখন তাহারা নিরহঙ্কার হয়, তখন তাহারা আপনাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও বিভুকে মহৎ হইতেও মহান্ জানিতে পারিয়া সেই ভগবানে পরমানুরক্তি লাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে তদ্গত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করে; তখন "হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিয়া তাহারা আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না," এই শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যানুসারে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না, আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না।

শ্রীমন্মধ্বমুনিও ভগবদ্দাস্যকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। তিনি চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের এবং তাহাদের সম্বন্ধ সমূহের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর যে চিৎ অচিৎ বিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করেন নাই। যদি কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও মনের চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া ভগবৎকৃপাবলে বিষয়-ভোগবাসনা ও কামনার দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের দাসত্ব করে, তবে তাহার সমুদয় দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখনই সেই ভাগ্যবানের পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়। সে শ্রীমদ্ভগবানের পাদমূল লাভ করিয়া আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

---

(১) শ্রীশ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের মতে জগতে তিনটী তত্ত্ব আছে,—যথা, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। 'চিৎ' শব্দে চৈতন্যবান জীবাত্মা, অচিৎ অর্থে জড়া প্রকৃতি বুঝায়। ঈশ্বর ইঁহাদের অন্তর্যামী ও ইঁহাদের মধ্যে অনুস্যূত সত্তা। চিৎ ও অচিৎ ঈশ্বরেরই পরিণাম, যেমন দধি—দুগ্ধের পরিণাম। অতএব উঁহারাই যেন তাঁহার শরীরবিশেষ।

এই তিন জন মহাত্মাই মৃত্যুগ্রস্ত সংসারে অপুনরাবর্ত্তনই জীবের প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায়, তাহার নির্ণয়ে যদিও তাঁহাদের সকলেরই বিভিন্ন মত দেখা যায়, যেহেতু তাঁহারা বিভিন্ন মার্গেরই প্রবর্ত্তন করাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তথাপি তাঁহারা সকলেই এই সংসারের অপর পারে গমনে ইচ্ছুক—তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য জগৎপতিকে লাভ, কারণ, তাঁহাকে পাইলেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সংসার পারে কে গমন করিতে পারে?—"যাঁহার পরমাত্মায় প্রগাঢ় ভক্তি এবং যেমন পরমাত্মায় ভক্তি, গুরুতেও তদ্রূপ, মহাত্মাগণের কথিত এই সকল উপদেশ তাঁহাদের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়।" "অভিমান ও মোহশূন্য, আসক্তিদোষরহিত, কামনাশূন্য, সুখদুঃখ রূপ দ্বন্দ্ববিমুক্ত অধ্যাত্মপরায়ণ জনগণই জ্ঞানলাভ করিয়া সেই নিত্য পদ লাভ করেন।" "জগৎকে কে জয় করিয়াছেন? না, যিনি মনকে জয় করিয়াছেন"—এই জগৎ ইন্দ্রিয়জনিত "ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ স্থূল ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে আবার পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, ইনিই সকলের সীমা এবং ইনিই পরমগতি।" এইরূপ উপনিষদুক্ত সোপান পরম্পরা দ্বারা শান্ত, দান্ত, নিবৃত্তকর্ম্মা, বিজিতাত্মাগণ সংসারের পারে গমন করিয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদলাভ করেন, "যেখান হইতে বাক্য মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়।"

ঈশ্বর শক্তিতেই হউক বা নিজশক্তি বলেই হউক, ভক্তি দ্বারাই হউক বা জ্ঞানের দ্বারাই হউক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহা হইতেই নিখিল দুঃখরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহা কেবল যে আমাদের ঋষিগণের মত, তাহা নহে, হূন, যবনাদিরও এ বিষয়ে একমত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্য বশতঃ যদিও মানুষের পথ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক পথ একই। "বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে কেহ একটীকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটীকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, এইরূপ রুচিভেদে সরল কুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিও তদ্রূপ একমাত্র গম্য।" যদিও এই সকল পথ রুচিভেদে বিভিন্ন প্রতিভাত হয়, তথাপি

ঐ সকলগুলিরই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া সকলেই যে সমীচীন মার্গ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যেমন বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া ব্যাসার্দ্ধ সকল এক কেন্দ্রের দিকে গমন করে, সেইরূপ ধর্ম্মমার্গ সকল বিভিন্ন হইলেও তাহারা সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, লোকগুরু, চরাচরপিতা, সর্ব্বভূতের হৃদয় নিবাসী, সর্ব্বকর্ত্তা, হৃদয়গুহাবাসী, সর্ব্বময়, এক, সর্ব্বব্যাপী দেবের নিকট যাইতেছে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "যিনি আমাকে যেরূপে ভজনা করেন, আমিও তাহাকে তদ্রূপে ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারেই আমার পথের অনুসরণ করিতেছে।" যেমন বহুরূপী নিজের ইচ্ছায় আপনার বর্ণ পরিবর্ত্তন করে, কখনও বা তাহার কোন বর্ণই থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে নানারূপে প্রকাশ করেন। এক-সময়েই তিনি সাকার ও নিরাকার, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা। ভগবানও বলিয়াছেন, "তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।" ভক্তিতে সহজে তাহার পাদমূল লাভ করা যায়। "হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপজন্মা, এমন স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র পর্য্যন্ত পরঃ গতি লাভ করে। পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি? এই অনিত্য ও অসুখকর জগতে আসিয়া আমার ভজনা কর।" সেই ভক্তি কেবল ভারতবর্ষেই আছে, আর কোথাও নাই, একথা বলিবেন না, কারণ, হূন ও যবনগণও ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন। বৌদ্ধগণেরও বুদ্ধে ভক্তি দেখা যায়। "হে বুদ্ধদেহধারী বিষ্ণো, আহা, তুমি দয়ার্দ্র-হৃদয় হইয়া পশুহত্যারূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম সঙ্কুল বলিয়া যজ্ঞবিধানাত্মক বেদসমূহকে নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ, হে হরে, তোমার জয় হউক।" এখানে শ্রীজয়দেব বুদ্ধদেবের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সকল উহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সকল ধর্ম্মই শ্রীভগবানের পাদমূলে যাইতে সমর্থ। একথা বলা হইল বলিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ", একথা যেন কেহ ভুলিবেন না।

যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তখন যে ব্যক্তি কেবল নিজ ধর্ম্মেরই সত্যত্ব, ও অন্য ধর্ম্ম সমূহের অসত্যত্ব ও অসমীচীনত্ব প্রতিপাদন করেন ও তাহা প্রমাণ করিতে যত্ন করেন, সেই মূঢ়ের জন্য দুঃখ হয়। দম্ভ, অভিমান ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমার মত আর কে আছে, এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া সে কেবল আপনাকেই ভগবানের প্রিয়তম মনে করে। এই

সকল ক্রূর, নিজ ভ্রাতার শোণিতে আর্দ্র কলেবর, পঙ্গপালের ন্যায় পৃথিবী-তলে সমাচ্ছন্ন পাষণ্ডগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দ স্বামীজির গুরুদেব, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাখ্য কোন অতুলনীয়, জ্ঞানভক্তিময়-বিগ্রহ, বঙ্গভূমির অলঙ্কার স্বরূপ পুরুষোত্তম বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সম্প্রতিহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভেদে ভিন্ন-রুচি অতএব ভিন্নমার্গানুসারিগণের প্রয়োজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম যে অবশ্যম্ভাবী, অতএব সকলই সমীচীন, ইহা প্রসিদ্ধই, সেই মহাত্মাও ইহা প্রতিপাদন করেন। সেই সনাতনধর্ম্মরূপী তিনি সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্ব-ভৌমিকত্ব ও সর্ব্বকালে সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টি সঙ্কীর্ণমনাগণ কিন্তু এই সনাতন, সার্ব্বভৌমিক, বেদমূলক ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই বিধাতা বিধান করিয়াছেন, সকলের রক্ষার জন্য নয়, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞানাভাবই এই সঙ্কীর্ণতার কারণ। উত্তমরূপে শাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা করিলে কাহারও এই অপসিদ্ধান্তে রুচি হইবে না।

আপনারা মহাপণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রকুশল এবং পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না, ইহা মনে করিয়া দাস আমি আপনাদের সমীপে আসিয়াছি। কেবল শাস্ত্র পাঠের অভাব বশতঃই সর্ব্বলোকহিতাকাঙ্ক্ষী আর্য্যবংশধরগণের বর্ত্ত-মান সন্তানগণ ক্ষুদ্রচিত্ত ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়া এক্ষণে অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। আপনাদের করুণাকটাক্ষের দ্বারাই কেবল তাঁহাদের সুমতি হইবে, ইহা মনে করিয়া আজ আমি তাঁহাদের শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইবার জন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দানের দ্বারাই বিদ্যার উৎ-কর্ষ হয়। যাঁহারা জ্ঞানদানে কৃপণ, তাঁহারা শোকের পাত্র। আপনাদের সকরুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষা করিয়া এক্ষণে তূষ্ণীম্ভূত হইলাম। হরিঃ ওঁ।

ঐ সকলগুলিরই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া সকলেই যে সমীচীন মার্গ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যেমন বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া ব্যাসার্দ্ধ সকল এক কেন্দ্রের দিকে গমন করে, সেইরূপ ধর্ম্মমার্গ সকল বিভিন্ন হইলেও তাহারা সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, লোকগুরু, চরাচরপিতা, সর্ব্বভূতের হৃদয় নিবাসী, সর্ব্বকর্ত্তা,হৃদয়গুহাবাসী, সর্ব্বেশ্বর, এক, সর্ব্বব্যাপী দেবের নিকট যাইতেছে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, 'যিনি আমাকে যেরূপে ভজনা করেন, আমিও তাঁহাকে তদ্রূপে ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারেই আমার পথের অনুসরণ করিতেছে।" যেমন বহুরূপী নিজের ইচ্ছায় আপনার বর্ণ পরিবর্ত্তন করে, কখনও বা তাহার কোন বর্ণই থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে নানারূপে প্রকাশ করেন। এক-সময়েই তিনি সাকার ও নিরাকার, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা। ভগবানও বলিয়াছেন, "তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।" ভক্তিতে সহজে তাঁহার পাদমূল লাভ করা যায়। "হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপজন্মা, এমন স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র পর্য্যন্ত পরম গতি লাভ করে। পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি ? এই অনিত্য ও অসুখকর জগতে আসিয়া আমার ভজনা কর।" সেই ভক্তি কেবল ভারতবর্ষেই আছে, আর কোথাও নাই, একথা বলিবেন না, কারণ, হূন ও যবনগণও ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন। বৌদ্ধগণেরও বুদ্ধে ভক্তি দেখা যায়। "হে বুদ্ধদেহধারী বিষ্ণো, আহা, তুমি দয়ার্দ্র-হৃদয় হইয়া পশুহত্যারূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম সঙ্কুল বলিয়া যজ্ঞবিধানাত্মক বেদসমূহকে নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ, হে হরে, তোমার জয় হউক।" এখানে শ্রীজয়দেব বুদ্ধদেবের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সকল উহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সকল ধর্ম্মই শ্রীভগবানের পাদমূলে যাইতে সমর্থ। একথা বলা হইল বলিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ", একথা যেন কেহ ভুলিবেন না।

যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তখন যে ব্যক্তি কেবল নিজ ধর্ম্মেরই সত্যত্ব, ও অন্য ধর্ম্ম সমূহের অসত্যত্ব ও অসমীচীনত্ব প্রতিপাদন করেন ও তাহা প্রমাণ করিতে যত্ন করেন, সেই মূঢ়ের জন্য দুঃখ হয়। দম্ভ, অভিমান ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমার মত আর কে আছে, এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া সে কেবল আপনাকেই ভগবানের প্রিয়তম মনে করে। এই

সকল ক্রূর, নিজ ভ্রাতার শোণিতে আর্দ্র কলেবর, পশুপালের ন্যায় পৃথিবী-তলে সমাচ্ছন্ন পাষণ্ডগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামীজির গুরুদেব, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাখ্য কোন অতুলনীয়, জ্ঞানভক্তিময়-বিগ্রহ, বঙ্গভূমির অলঙ্কার স্বরূপ পুরুষোত্তম বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সম্প্রতিই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভেদে ভিন্ন-রুচি অতএব ভিন্নমার্গানুসারিগণের প্রয়োজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম যে অবশ্যম্ভাবী, অতএব সকলই সমীচীন, ইহা প্রসিদ্ধই, সেই মহাত্মাও ইহা প্রতিপাদন করেন। সেই সনাতনধর্ম্মরূপী তিনি সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্ব-ভৌমিকত্ব ও সর্ব্বকালে সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টি সঙ্কীর্ণমনাগণ কিন্তু এই সনাতন, সার্ব্বভৌমিক, বেদমূলক ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই বিধাতা বিধান করিয়াছেন, সকলের রক্ষার জন্য নয়, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞানাভাবই এই সঙ্কীর্ণতার কারণ। উত্তমরূপে শাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা করিলে কাহারও এই অপসিদ্ধান্তে রুচি হইবে না।

আপনারা মহাপণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রকুশল এবং পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না, ইহা মনে করিয়া দাস আমি আপনাদের সমীপে আসিয়াছি। কেবল শাস্ত্র পাঠের অভাব বশতঃই সর্ব্বলোকহিতাকাঙ্ক্ষী আর্য্যবংশধরগণের বর্ত্ত-মান সন্তানগণ ক্ষুদ্রচিত্ত ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়া এক্ষণে অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। আপনাদের করুণাকটাক্ষের দ্বারাই কেবল তাহাদের সুমতি হইবে, ইহা মনে করিয়া আজ আমি তাহাদের শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইবার জন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দানের দ্বারাই বিদ্যার উৎ-কর্ষ হয়। যাঁহারা জ্ঞানদানে কৃপণ, তাঁহারা শোকের পাত্র। আপনাদের সকরুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষা করিয়া এক্ষণে তূষ্ণীভূত হইলাম। হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে।

আজ ৺ কালীপূজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার। রাত ১০।১১ টার সময় কালীপূজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন ভক্ত এই গভীর অমাবস্যা নিশিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই ত্বরা করিয়া যাইতেছেন। মাষ্টার রাত্রি আন্দাজ ৮ টার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যান মধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত হইয়াছে, মাঝে মাঝে রসুনচৌকি বাজিতেছে, কর্ম্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এ স্থান হইতে ওস্থানে যাতায়াত করিতেছে। আজ রাসমণির কালীবাড়ীতে ঘটা হইবে, দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসীরা শুনিয়াছেন। আবার শেষ রাত্রে যাত্রা হইবে। গ্রাম হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্ব্বদা আসিতেছে।

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতেছিল—রাজনারাণের চণ্ডীর গান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন। আজ আবার জগতের মার পূজা হইবে। ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন।

রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিয়া মাষ্টার দেখিলেন, ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন,—বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের একটী

---

* প্রথম ভাগ ২য় সংস্করণ, সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত সমেত। রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, বাবু শান্তিরাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩।২, গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন শ্রীচারুগুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধান মূল্য পাঁচসিকা।

আত্মীয় ছোকরা ও এঁড়েদার আর একটী ছেলে। রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন।

নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটী ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন— ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁড়েদার দ্বিতীয় ছেলেটীও প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, ঐ সঙ্গে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি)। তুমি কবে আসবে?

ভক্ত। আজ্ঞে, সোমবার—বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আগ্রহের সহিত)। লণ্ঠন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভক্ত। আজ্ঞে না, এই বাগানের পাশে—আর দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (এঁড়েদার ছোকরাটীর প্রতি)। তুইও চল্লি?

ছোকরা। আজ্ঞে, সর্দ্দি—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও।

ছেলে দুটী আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঠাকুর ভজনানন্দে)

গভীর অমাবস্যা নিশি। আবার জগতের মার পূজা হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বালিসে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর্মুখ। মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটি দুইটী কথা কহিতেছেন।

হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন,—আহা, ছেলে-টীর কি ধ্যান!

(হরিপদের প্রতি)। কেমন রে? কি ধ্যান!

হরিপদ। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক কাষ্ঠের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রতি)। ও ছেলেটীকে জান? নিরঞ্জনের কি রকম ভাই হয়।

আবার সকলেই নিঃশব্দ। হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বৈকালে চণ্ডীর গান শুনিয়াছেন। প্রানের স্ফুট উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে গাইতে লাগিলেন,—

গান।

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁর মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ;
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন॥

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। আজ মায়ের পূজা—মায়ের নাম করিবেন।

আবার উৎসাহের সহিত গাইলেন,—

গান (২)

এ সব খেপা মেয়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা।
কিরূপ কি গুণ ভঙ্গী কি ভাব কিছুই যায় না বলা॥
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন। বলিলেন, "এ সব মা তালের ভাবে গান।" বলিয়া গাইতে লাগিলেন,—

গান (৩)।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা, গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মাখেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি,আমি খাই তার তাটায় একটা কোরে যাব।

তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্ভার চড়াব।
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন,বাঁধবে কোসে,সেই কালী তার মুখে দিব।
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরাম প্রসাদ ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥

গান (৪)

তাই তোমাকে সুধাই কালী ইত্যাদি

গান (৫)

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন রাখ, তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি॥

গান (৬)

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার পাপ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাব কি বারাণসী তায়?
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে, শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥

গান সমাপ্ত হইল। এমন সময় রাজনারাণের ছেলে দুটী আসিয়া প্রণাম করিল। যখন নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারাণ চণ্ডীর গান গাইয়াছিলেন, ছেলে দুটীও সঙ্গে সঙ্গে গাইয়াছিল। ঠাকুর ছেলে দুটীর সঙ্গে আবার গাইতে লাগিলেন—' এ সব খেপা মেয়ের খেলা' ইত্যাদি।

ছোট ছেলেটী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলিলেন,—ঐ গানটী একবার যদি—

"পরম দয়াল হে প্রভু"—

ঠাকুর বলিলেন, "গৌর নিতাই তোমরা দুভাই"—এই বলিয়া গানটী গাইতে লাগিলেন।

গান (৭)

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে,
ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে (আমি চিনেছি হে পরব্রহ্ম)
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
(তোমাদের মত)
তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই।
(সেরূপ লুকায়ে)
ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।
(হরি বোল বোলে, প্রেমে মত্ত হায়)
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল।
(ওহে প্রাণ গৌর)
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল চেনা আছে দুটী নয়ন বাঁকা।
(ওহে দয়াল গৌর)
তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়েছি মনে।
(ওহে পতিত পাবন)
বড় আশা কোরে এলুম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।
(ওহে দয়াল গৌর)
জগাইমাধাই তরে গেছে, প্রভু, সেই ভরসা আমার আছে।
তোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর)

গান সমাপ্ত হইল। রামলাল ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, একটু গা, আজ পূর্ণা। রামলাল গাইলেন।

গান (৮)

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।

এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণপ্রকাশে রঙ্গিনী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয়সিন্ধু, হেরিয়ে ইন্দু মলিন, একোন্ মোহিনী।
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব।
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী।

গান (৯)

কে রণে এসেছে বামা নীরদবরণী।
শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নলিনী ইত্যাদি—

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন,—

গান (১০)

মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা শ্যামা পদ নীল কমলে।
(শ্যামাপদনীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে)
বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামাদি কুসুম সকলে।

ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

গান চলিতে লাগিল,—

চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
সুখ দুখ সমান হোলো আনন্দ সাগর উথলে।

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা আবার সকলে মেজেতে বসিলেন। ঠাকুরও ছোটখাটটীতে বসিলেন।

মাষ্টারকে বলিলেন,—তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হোলো!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন। কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া নির্জ্জনে

নিঃশব্দে নাম জপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা। মহানিশা। জোয়ার সবে আসিয়াছে—ভাগীরথী উত্তরবাহিনী। তীরস্থ দীপালোকে এ ক একবার কালো জল দেখা যাইতেছে।

রামলাল পূজাপদ্ধতি নামক পুঁথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার আসিলেন। পুঁথিখানি মন্দির মধ্যে রাখিয়া দিবেন। একটি ভক্ত ঠাকুরকে সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আস্‌বেন কি? ভক্তটী অনুগৃহীত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মা বেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে দুই সেজ; উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিল্ব। নানাবিধ পুষ্পমালায় বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। ভক্তটী দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যজন করেন। তখন তিনি সঙ্কুচিত ভাবে রামলালকে বলিতেছেন, 'এই চামরটী একবার নিতে পারি?' রামলাল অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই।

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বেণীপাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী কল্য সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু তারিখে ভুল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। বেণীপাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এ রকম লিখ্‌লে কেন বল দেখি?

মাষ্টার। আজ্ঞে, লেখাটা ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে লেখেন নাই।

ঠাকুর দাঁড়াইয়া। বাবুরাম কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ।

ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সমাধিস্থ মহাপুরুষকে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—*গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুঞ্চিত।* বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটী রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। তখনও দাঁড়াইয়া। এই বার গালে হাত দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব দেখ্‌লুম—কার কতদূর এগিয়েছে। রাখাল (ক), ইনি (মাষ্টার), সুরেন্দ্র, বাবুরাম অনেককে দেখ্‌লুম!

হাজরা। এখানকার? (খ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ।

হাজরা। বেশী কি বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না।

হাজরা। নরেন্দ্রকে দেখ্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখি নাই—কিন্তু এখনও বল্‌তে পারি—একটু জড়িয়ে পড়েছে—কিন্তু সব্বায়ের হয়ে যাবে দেখ্‌লুম। এঁকে দেখ্‌লুম, সব দেখ্‌লুম, ঘুপ্‌টী মেরে রয়েছে!

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দৈববাণীর ন্যায় এই সকল অদ্ভুত সংবাদ শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু একে (বাবুরামকে) ছুঁয়ে ওরূপ হোলো।

হাজরা। ফাষ্ট (first) কে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পরেই বলিলেন,—

"নিত্যগোপালের মত গোটা কতক হয়!"

আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আবার বলিতে লাগিলেন,—

"অধর সেন—যদি কর্ম্মকাজ কমে—কিন্তু ভয় হয়—সাহেব আবার বক্‌বে। যদি বলে, এ ক্যা হ্যায়। (সকলের ঈষৎ হাস্য)

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিলেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটীতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া)। আজ যে সব খুব সেবা।

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও অতিশয় ভক্তিভাবে

(ক) রাখাল তখন বৃন্দাবনে ছিলেন।
(খ) এখানকার অর্থাৎ আমার।

ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন।

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি)। তবে আমি আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওঁ কালী, ওঁ কালী, সাবধানে পূজা কোরো আবার মেড়াবলি দিতে হবে—

মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে গিয়াছেন। মার কাছে গিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে লাগিলেন। এইবারে বলি হইবে—লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের সে অবস্থা নয়—পশুবধ দেখিতে পারিবেন না।

রাত দুইটা পর্য্যন্ত কোন কোন ভক্ত মা কালীর মন্দিরে বসিয়াছিলেন। হবিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাক্‌ছেন, খাবার সব প্রস্তুত।

ভক্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন।

ভোর হইল—মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে। মার সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে। মা যাত্রা শুনিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর বৃহৎ পাকা উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আসিতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন—ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন তুমি এখন যাবে ?

মাষ্টার। আজ আপনি সিঁতিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বাড়ীতে একবার যাচ্ছি।

কথা কহিতে কহিতে মা কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। অদূরে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে। মাষ্টার সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণবন্দনা করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, আচ্ছা, এসো। আর দুখানা আটপৌরে নাইবার কাপড় আমার জন্য এনো।

শিল্প।

গ্রীক শিল্পের মূলমন্ত্র প্রকৃতির অনুকরণ—এতদূর অবিকল অনুকরণ যে, তাহাকে দেখিয়া বাস্তব বলিয়া ভ্রম হইবে। গ্রীকশিল্পী হয়ত এক টুক্‌রা মাংস এত নিখুঁত ভাবে আঁকিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্য মাংসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সদৃশ করিবার জন্য এত মাথা ঘামাইতেছেন, এত খুঁটি নাটির দিকে তাঁর নজর যে, যখন মাংসখণ্ড আঁকা হইল, তখন কে বলিবে, উহা অঙ্কিত? কে বলিবে, উহা সত্য মাংসখণ্ড নয়? কুকুর প্রলুব্ধ হইয়া সেই মাংসখণ্ডের আস্বাদ গ্রহণের জন্য ধাবধান হইয়াছে। ইহাই গ্রীক শিল্পের আদর্শ।

ভারতীয় শিল্পের গতি বিপরীত দিকে—উহা বাস্তব রাজ্য ছাড়িয়া আদর্শ রাজ্যে বিচরণ করিতে চাহে। যাহা এই স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, সেই সকল বিষয়কে উহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

উভয় প্রণালীতেই দোষ আছে। যাহা বাস্তব সত্তা, তাহার নকলে তোমার এত প্রাণপণ প্রয়াস কেন? কুকুরকে একখণ্ড সত্য মাংস দিলেই ত গোল চুকিয়া যায়! এ অনর্থক বাহাদুরীতে লাভ কি? অপর পক্ষে, ভারতীয় শিল্প অতীন্দ্রিয় বস্তু সমূহকে বাস্তব জগতে দেখাইতে গিয়া এমন অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। এই উভয় দোষই পরিহার্য্য।

প্রকৃত শিল্পকে একটি কমলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কমল যেমন জলে উৎপন্ন ও জল হইতেই আবশ্যকীয় রস সংগ্রহ করে, অথচ উহা যেমন জল ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে, প্রকৃত শিল্পও তদ্রূপ। প্রকৃতির সহিত উহার নিত্য যোগ থাকা আবশ্যক। জীবন্ত শিল্প চাই—নতুবা অস্বাভাবিক হইয়া যাইবে—তাহা শিল্পের ঘোর অবনতি। অপর দিকে, যদি বাস্তব জগতের উপরের একটু চিত্র, শিল্প না দেখাইতে পারিল, যদি এই দুঃখক্লিষ্ট তাপিত জগতের নরনারীকে কল্পনার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ উচ্চ ভূমির আভাস দিতে না পারিল, তবে উহার কার্য্যকারিতা কি?

কারণ, সৌন্দর্য্যপ্রকাশই শিল্পের উদ্দেশ্য। তোমাদের সম্মুখে এই

আন্লাটী রহিয়াছে—উহাতে কিছুমাত্র শিল্প নাই, কেবল মাত্র উহাতে কার্য্যকারিতা বা প্রয়োজন আছে বলিতে পারা যায়। অর্থাৎ উহার দ্বারা কাপড় চোপড় রাখা রূপ প্রয়োজন সাধিত হয়। যদি উহাতে কিছু খোদাই কার্য্য থাকিত, যাহাতে মনে প্রীতিরসের সঞ্চার হইত, তবে উহাকে শিল্প নাম দিতে পারিতাম। এই বাটীখানি রহিয়াছে। ইহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির থাকা রূপ প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ করিতেছে ; উহাতে প্রাণ নাই, উহা কোন ভাব প্রকাশ করে না। যদি এই গৃহ এমন ভাবে নির্ম্মিত হয় যে, উহাতে কোন এক বিশেষ ভাবের প্রকাশ করে, তবে তাহাকে শিল্প আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা—ইহাই শিল্প।

শিল্প সকল বিষয়েই হইতে পারে। সঙ্গীত, ভাষা,: এমন কি, ভোজন পানরূপ সাধারণ কার্য্য গুলিতেও নিপুণ শিল্পী অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদের জীবনে অনেক সময় বীভৎসরসের মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। ঐ বীভৎসের মধ্যেও আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে, উহার মধ্যেও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিল্পের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক।

ফরাসি জাতি সৌন্দর্য্যবোধে, শিল্প সকলের অগ্রণী। ইংরাজ জাতি সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য বা শিল্পের মূল্য কমই বুঝিয়া থাকে। ইংরাজ প্রধানতঃ প্রয়োজনবাদী ; যাহা কাযে আসিবে, তাহাই করিতে চায়। হয়ত একটী প্রাচীন শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন স্মৃতিস্থান ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে একটী ব্যারাক করিবে।

জাতীয় শিল্পের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। প্রধানতঃ শিল্পের অবনতিতেই আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে। আমরা মহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছি। কল্পনাপ্রিয় হইয়া বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের সঙ্গীতে, আমাদের ভাষায়, আমাদের আহারে,পরিচ্ছদে সর্ব্বত্র এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। এখন উন্নতির উপায়,—প্রাচ্য আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া তাহাতে পাশ্চাত্যের জীবনীশক্তি সঞ্চার করা।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২।

অন্বয়ঃ। সুরগণাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) মহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়শ্চ) মে প্রভবং (উৎপত্তিং) ন বিদুঃ, হি (যস্মাৎ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) আদিঃ (কারণম্)। ২।

মূলানুবাদ। সুরগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না, যেহেতু আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্ব প্রকারেই কারণ। ২।

ভাষ্য। কিমর্থমহং বক্ষ্যামীত্যত আহ—ন মে বিদুঃ ন জানন্তি সুরগণাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ। কিং তে ন বিদুঃ? মম প্রভবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ং, অথবা প্রভবং প্রভবনং উৎপত্তিং। নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ। কস্মাত্তে ন বিদুরিত্যুচ্যতে—অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাৎ দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ। ২।

ভাষ্যানুবাদ। কেন আমি বলিব?—ইহার উত্তর বলা হইতেছে যে, "সুরগণ" ব্রহ্মাদি দেবগণ আমায় জানেন না। তাঁহারা কি জানেন না? আমার "প্রভব" প্রভাব (অর্থাৎ) প্রভুশক্তির সীমা (তাঁহারা জানেন না) অথবা প্রভব শব্দের অর্থ প্রভবন—উৎপত্তি। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও জানেন না। কেন তাঁহারা জানেন না? ইহার উত্তর বলা হইতেছে যে, যে কারণ আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সকল প্রকারেই কারণ। ২।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩।

অন্বয়। যঃ অসংমূঢ়ঃ (সন্) মাং অজং অনাদিং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং বেত্তি স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি মোহ-পরবশ না হইয়া আমাকে অনাদি (অতএব) জন্ম-রহিত (এবং) সকল লোকেরই পরমেশ্বর এই বলিয়া বুঝিয়া থাকে, মর্ত্ত্যগণের মধ্যে সে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য। কিঞ্চ—যো মাং অজং অনাদিঞ্চ যস্মাৎ অহমাদির্দেবানাং মহর্ষীণাং চ ন মমান্য আদির্বিদ্যতে, অতোঽহং অজোঽনাদিশ্চ, অনাদিত্বং

অজত্বে হেতুঃ, তং মামজমনাদিং চ যো বেত্তি বিজানাতি। লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং তুরীয়ং অজ্ঞানতৎকার্য্যবর্জ্জিতং. অসংমূঢ়ঃ সম্মোহবর্জ্জিতঃ স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতৈঃ প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) যে কারণ আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি এবং আমার আদি (কারণ) কেহই নাই, সেই জন্য আমি অজ ও অনাদি, আমার আদি কেহই নাই বলিয়াই আমি অজ (জন্মরহিত) সেই অনাদি এবং জন্ম-রহিত আমাকে যে ব্যক্তি "অসংমূঢ়" সম্মোহবর্জ্জিত হইয়া লোকমহেশ্বর বলিয়া জানিয়া থাকে, লোকমহেশ্বর শব্দের অর্থ লোক সমূহের মহান্ ঈশ্বর (অর্থাৎ) সেই তুরীয়, অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যের সহিত অসম্বদ্ধ (ব্রহ্ম) সে ব্যক্তি "মর্ত্ত্য" মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ৩।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। মত্ত এব ভূতানাং বুদ্ধিঃ জ্ঞানং অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ং, চ অভয়ং (এব চ) অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, (চ ইত্যেতে) পৃথগ্‌বিধা ভাবা ভবন্তি। ৪-৫।

মূলানুবাদ। আমা হইতেই প্রাণিগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশঃ ও অযশঃ এই সকল নানাবিধ ভাব উদিত হইয়া থাকে। ৪-৫।

ভাষ্য। ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাং—বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং। তদ্বন্তং বুদ্ধিমান্ ইতি হি বদন্তি। জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ। অসম্মোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ। ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অবিকৃতচিত্ততা। সত্যং যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চ আত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমাণা বাক্ সত্য-

মুচ্যতে। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ। শমোঽন্তঃকরণস্য। সুখং আহ্লাদঃ দুঃখং সন্তাপঃ। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপর্য্যযঃ। ভয়ং চ ত্রাসঃ। অভয়মেব চ তদ্বিপরীতম্।

অহিংসেতি। অহিংসা অপীড়া প্রাণিনাং। সমতা সমচিত্ততা। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু। তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং। দানং যথাশক্তি সংবিভাগঃ। যশোধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ। অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তাকীর্ত্তিঃ। ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ো ভূতানাং প্রাণিনাং মত্ত এবেশ্বরাৎ পৃথগ্বিধাঃ নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ।৪—৫।

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেও আমি লোকসমূহের মহেশ্বর—(যে কারণ) আমা হইতেই প্রাণিগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ) নানাপ্রকার ভাব সকল কর্ম্মানুসারে উৎপত্তি লাভ করে (সেই সকল ভাব কি, তাহাই বলিতেছেন যে) "বুদ্ধি" মনের সূক্ষ্মপ্রভৃতি ততোর্দ্ধ বস্তু নিচয়ের বোধানুকূল শক্তি। কারণ, এই শক্তি যাহার আছে, তাহাকেই লোকে বুদ্ধিমান বলিয়া থাকে। "জ্ঞান" আত্মাদি পদার্থের বিশেষ বোধ। "অসম্মোহ" বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা বুঝিয়া বিবেক পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্তি। "ক্ষমা" কেহ আক্রোশ করিলে বা তাড়না করিলে মনের অবিকার। "সত্য" নিজে যে ভাবে কোন বিষয় দেখা যায় বা শুনা যায়, ঠিক সেই ভাবে সেই বিষয়টী অপর কাহাকেও বুঝাইবার জন্য যে বাক্যের উচ্চারণ করা যায়, তাহাকেই সত্য বলা যায়। "দম" বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ; "শম" অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। "সুখ" আহ্লাদ। "দুঃখ" সন্তাপ। "ভব" উৎপত্তি। "অভাব" উৎপত্তির বিপর্য্যয়। "ভয়" ত্রাস। "অভয়" ভয়ের বিপরীত। (অহিংসা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ) "অহিংসা" প্রাণিগণকে পীড়া না দেওয়া।

"সমতা" সমচিত্ততা। "তুষ্টি" সন্তোষ যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। "তপ" ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক শরীরকে পীড়ন করা। "দান" নিজ শক্তি যেমন, সেইরূপ স্বীয় ধনের অপরকে বিতরণ করা। "যশঃ" ধর্ম্মনিমিত্ত কীর্ত্তি। "অযশঃ" অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন নিন্দা। ৪—৫।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ। ৬।

অন্বয়। মদ্ভাবাঃ পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। ৬।

মূলানুবাদ। আমার প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী সাত জন মহর্ষি এবং চারি জন মনু আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান লোকে স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় প্রকার জীবই যাঁহাদের প্রজা। ৬।

ভাষ্য। কিঞ্চ মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ পূর্ব্বেঽতীতকালসম্বন্ধিনশ্চত্বারঃ মনবস্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ। তে চ মদ্ভাবা মদ্গতভাবনা বৈষ্ণবেন সামর্থ্যেনোপেতাঃ মানসা মনসৈবোৎপাদিতা, ময়া জাতা উৎপন্না যেষাং মনূনাং মহর্ষীণাং চ সৃষ্টিলোক ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঃ প্রজাঃ। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং সাবর্ণ নামে প্রসিদ্ধ চারি জন মনু (ইহাঁরা সকলেই) পূর্ব্বকালবর্ত্তী (এবং) "মদ্ভাব" মদ্ভাবনাপর, বৈষ্ণবীশক্তিসম্পন্ন ও সকলেই আমার মন হইতে (উৎপাদিত হইয়া পরে জগতে) উৎপন্ন হইয়াছেন। যে মনুগণ ও মহর্ষিগণের সৃষ্টি এই লোকে স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়বিধ প্রজা। ৬।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৭।

অন্বয়। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে (ইতি) অত্র সংশয়ঃ ন (অস্তি)। ৭।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি ও যোগকে যথার্থভাবে জানিতে পারে, সে দৃঢ়যোগযুক্ত হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৭।

ভাষ্য। এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগং চ যুক্তিং চ আত্মনো ঘটনং অথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগ উচ্যতে। মম মদীয়ং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ। সোঽবিকম্পেন অপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্দর্শনস্থৈর্য্যলক্ষণেন যুজ্যতে সংবধ্যতে, নাত্র সংশয়ঃ নাস্মিন্নর্থে সংশয়োঽস্তি। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। এতাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এই (অর্থাৎ) পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইল, আমার "বিভূতি" বিস্তার (অর্থাৎ বিভুত্ব) এবং "যোগ"

যুক্তি—আমার আত্মঘটনা, অথবা যোগের দ্বারা উৎপাদিত যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্য (অর্থাৎ) সর্ব্বজ্ঞত্ব এই স্থলে যোগ শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি ও যোগকে "তত্ত্বতঃ" যথাযথরূপে জানে, সে অবিকম্প যোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৭।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮।

অন্বয়। ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইতি মত্বা মাং ভজন্তে। ৮।

মূলানুবাদ। "আমি (বাসুদেব) সকল পদার্থের উৎপত্তিহেতু এবং সকল জগৎও আমা হইতে প্রবৃত্তি লাভ করে" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ভক্তিমান পণ্ডিতগণ আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। ৮।

ভাষ্য। কীদৃশেন অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ইত্যুচ্যতে। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিঃ মত্তএব স্থিতিনাশক্রিয়া-ফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগততত্ত্বার্থা ভাবসমন্বিতা ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভি-নিবেশস্তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। কীদৃশ অবিকম্প যোগ দ্বারা যুক্ত হয়, তাহাই বলা হই-তেছে যে, "আমি" বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই সকল জগতের "প্রভব" উৎপত্তি, এবং আমা হইতেই স্থিতি বিনাশ ও ক্রিয়াফলোপভোগরূপ বিকারময় সকল জগৎ প্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকার ভাবিয়া আমাকে ভজনা করিয়া থাকে (কে ভজনা করে?) "বুধগণ" তত্ত্বজ্ঞানিগণ (তাহারা কি প্রকার) "ভাবসমন্বিত" ভাব শব্দের অর্থ ভাবনা—পরমার্থ তত্ত্বে অভিনিবেশ। তাহা যাহাদের আছে, তাহারাই ভাবসমন্বিত। ইহাই তাৎপর্য্য।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ৯।

অন্বয়। মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ পরস্পরং মাং বোধয়ন্তঃ কথয়ন্তশ্চ নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ৯।

মূলানুবাদ। (সেই বুধগণ) মদ্গতহৃদয় ও মদ্গতপ্রাণ এবং পরস্পর আমার বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক এবং আমারই গুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন এবং পরম রতি লাভ করিয়া থাকেন। ৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ—মচ্চিত্তাঃ ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ মাং গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্গতপ্রাণা ময্যুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ। অথবা মদ্গতপ্রাণা মদ্গতজীবনা ইত্যেতৎ। বোধয়ন্তঃ অবগময়ন্তঃ পরস্পরং অন্যোন্যং কথয়ন্তো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টং মাং, তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি রমন্তি চ রতিং প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) "মচ্চিত্ত" আমাতেই যাহাদের চিত্ত সংলগ্ন থাকে, তাহারা মচ্চিত্ত, "মদ্গতপ্রাণ," যাহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ আমাতেই যাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি উপসংহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই মদ্গতপ্রাণ কহা যায়। অথবা মদ্গতপ্রাণ এই শব্দের অর্থ মদ্গতজীবন। (এই প্রকার বিশেষণ-যুক্ত পণ্ডিতগণ) আমাকেই পরস্পর (মিলিত হইয়া পরস্পরের) বোধ বিষয় করাইয়া থাকেন এবং বল বীর্য্য জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত আমারই কথা পরস্পর কহিয়া থাকেন, (এইরূপে) তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং (স্ত্রীগণ) প্রিয় সমাগমে যে রূপ রতি-লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ উৎকট প্রীতিরূপ রতিকে লাভ করিয়া থাকেন। ৯।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।

অন্বয়। প্রীতি-পূর্ব্বকং ভজতাং সততযুক্তানাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি যেন তে মামুপযান্তি। ১০।

মূলানুবাদ। প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাপর সেই সততযুক্ত সাধকগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

ভাষ্য। যে যথোক্তপ্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ—তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাং নিবৃত্তসর্ব্বাহৈষণানাং ভজতাং সেবমানানাম্, কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন নেত্যাহ প্রীতিপূর্ব্বকং প্রীতিঃ স্নেহঃ তৎপূর্ব্বকং ভজতামিত্যর্থঃ। দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং তেন যোগঃ বুদ্ধি-যোগঃ তং বুদ্ধিযোগং। যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্দর্শন-লক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতমাত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে কে তে? যে মচ্চিত্তত্বাদিপ্রকারৈর্মাং ভজন্তে। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে উপায় বলা গিয়াছে, সেই উপায় দ্বারা যাহারা ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা করে—তাহাদের (তাহারা কি প্রকার?) "সততযুক্ত" নিত্যাভিযুক্ত, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে যাহাদের সকল প্রকার কামনা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারাই সততযুক্ত। তাহারা কি তবে অন্য কোন প্রার্থনার বশে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে? না, ইহাই বলিতেছেন যে প্রীতি-পূর্ব্বক, প্রীতি শব্দের অর্থ স্নেহ, তাহারা স্নেহপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধিযোগের প্রসাদে তাহারা আমাকে (অর্থাৎ) সকলের আত্মভূত পরমেশ্বরকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিযোগ এই শব্দটীর অর্থ এই প্রকার যে, বুদ্ধি শব্দের অর্থ পরমেশ্বর বিষয় যথার্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধই বুদ্ধিযোগ শব্দের অর্থ। তাহারা কে? (যাহারা এই প্রকার বুদ্ধিযোগের অধিকারী হয়?) পূর্ব্বে মচ্চিত্তত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে—সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানপর হইয়া যাহারা আমাকে ভজনা করে (তাহারাই ঐ বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকে।) ১০।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১।

অন্বয়। অহং তেষাং এব অনুকম্পার্থং আত্মভাবস্থঃ (সন্) ভাস্বতা জ্ঞান-দীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি। ১১।

মূলানুবাদ। তাহাদিগের উপরই দয়াপরবশ হইয়া আমি তাহাদের

অন্তঃকরণে আত্মসত্তার প্রকাশ পূর্ব্বক, দীপ্তিময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজনিত তমোগুণকে নষ্ট করিয়া থাকি। ১১।

ভাষ্য। কিমর্থং কস্ত বা তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং মদ্ভক্তানাং দদামীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—

তেষামেব কথং নাম শ্রেয়ঃ স্যাৎ ইত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোঃ অহমজ্ঞানজং অবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়ামি আত্মভাবস্থঃ আত্মনো ভাবোঽন্তঃকরণাশয়ঃ তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্। জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তি-প্রসাদ-স্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্ত্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেন ইত্যর্থঃ। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। তোমাকে পাইবার প্রতিবন্ধক কোন বস্তুর নাশক সেই বুদ্ধিযোগ তোমার ভক্তগণকে কিসের জন্যই বা দান করিয়া থাক, এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিবার জন্য (ভগবান) বলিতেছেন যে—তাহাদিগেরই কি প্রকারে মোক্ষ লাভ হইবে? এই প্রকার ভাবনায় অনুগ্রহ করিবার জন্য আমি "অজ্ঞানজ" অবিবেক হইতে উৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানরূপ "তম" মোহান্ধকারকে "আত্মভাবস্থ" অন্তঃকরণাশয়স্থিত হইয়া বিনষ্ট করিয়া থাকি। (কিসের দ্বারা নষ্ট করি?) জ্ঞানদীপের দ্বারা (সেই জ্ঞানদীপ কি রূপ?) ভক্তিজনিত চিত্তের প্রসাদরূপ তৈলের দ্বারা সেই বিবেকবোধরূপ জ্ঞান-দীপ অভিষিক্ত, ঈশ্বরভাবনাভিনিবেশ বায়ু দ্বারা তাহা প্রথমে উদ্দালিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন দ্বারা জনিত সংস্কারের সহিত মিলিত প্রজ্ঞাই সেই প্রদীপের বর্ত্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সেই দীপের আধার, রাগ ও দ্বেষের উদয়ে যাহা কলুষিত হয় না, সেই বিষয়চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ যে আবৃত গৃহ, তাহাতে সেই দীপ নিকম্পভাবে জ্বলিতে থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমান যে একাগ্রতা এবং ধ্যান, তাহা দ্বারা উৎপাদিত যে যথার্থ জ্ঞান-রূপ প্রভা, তাহা দ্বারা সেই জ্ঞান-দীপ সর্ব্বদা উদ্ভাসিত। এইরূপ দীপ্তিময় জ্ঞান-দীপের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকারকে আমিই নষ্ট করিয়া থাকি। ১১।

আপ্তপুরুষ ও অবতারকুলের জীবনানুভব।

(স্বামী সারদানন্দ।)

বেদই হিন্দুর জাতীয় ধন; হিন্দুর আচার ব্যবহার বিশ্বাস আস্তিক্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভিত্তি। ইহকালে সে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অন্য সকল দেশের, অন্য সকল জাতির, অন্য সকল ধর্ম্মের আচারাদি অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং দেহাবসানে মৃত্যুর মোহান্ধকার আসিয়া যখন ইহ-জগতের চিরপরিচিত সুখ দুঃখ, লাভ লোকসান, যশ অপযশ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমূহের একপ্রকার সাময়িক সমতা আনিয়া দেয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত কল্পনায় করালায়িত পরকালের ছবি দেখিতে সে, বেদোক্ত বিশ্বাস ও শিক্ষা সহায়েই আশায় নির্ভর করিয়া "তপ্তা বৈতরণী"তে ঝম্প প্রদান করে।

বলা যাইতে পারে, একথা কিরূপে সত্য হইতে পারে? কোথায় সে আহুতিসমুত্থিত পর্জ্জন্য প্রসবকারী যজ্ঞীয় ধূম? কোথায় সে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সমূহ? কোথায় সে সোমরসপানে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র যজমান-কল্যাণকারী মিত্র মরুৎ পূষণ ভগ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণ? কোথায় সে সত্যনিষ্ঠ অপ্রতিগ্রাহী ক্রিয়াপ্রাণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ? কালরাত্রির গভীরান্ধকারে এরূপ লুক্কায়িত যে, কোন কালে অস্তিত্ব ছিল কি না, এবিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়।

উত্তরেও বলা যাইতে পারে, যুগবিপর্য্যয়ে পরিবর্ত্তনের খরস্রোত ঐ সমস্ত পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া অভিনব রূপ এবং ভাবে গড়িলেও মধ্যে মধ্যে এমন নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছে, যাহা দ্বারা বেশ বোধ হয়, হিন্দুর এখনকার আচার ব্যবহারাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগানুষ্ঠিত আচারাদির উপর ভিত্তি-স্থাপন করিয়াই দণ্ডায়মান। একটির অপটির সহিত সাদৃশ্য—বর্ত্তমান বংশধরের অতিবৃদ্ধপিতামহাদির সহিত জাতি, বংশ এবং গুণগত সাদৃশ্যের ন্যায়। বর্ত্তমান ভাষার সহিত পূর্ব্বকার ভাষারও ঠিক সেই সম্বন্ধ। প্রাচীন তত্ত্ব সকল দিন দিন যতই আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই একথা চির-সুদূর মরীচিকার রাজত্ব হইতে ইন্দ্রিয়োপলব্ধ প্রত্যক্ষ রাজ্যের নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে।

অতএব হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার আশা-ভরসার স্থল যে বেদ, একথা স্বতঃই প্রমাণিত। আমরা উৎকৃষ্টই হই বা পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্টই হই, আমাদের জাতীয়ত্বের মূল ঐ বেদেই রহিয়াছে। ঐ বেদ লইয়াই আমরা পূর্ব্বে উঠিয়াছিলাম এবং যদি আবার উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ মূলাবলম্বনেই উঠিতে হইবে।

বৃক্ষশরীর হইতে নিত্যবিগলিত শুষ্ক পত্র রাশির ন্যায় ধর্ম্মশরীর হইতে নিয়ত পরিত্যক্ত আচার রাশির কথা এখন দূরে থাক্। ধর্ম্ম-শরীরের যে অংশগুলি যুগে যুগে একরূপ থাকে, তাহাই চিরকাল আমাদের জাতীয়ত্বের মূল থাকিয়াছে ও থাকিবে। এবং ঐ মূল কোন-রূপে বিনষ্ট হইলে আমাদের জাতীয় জীবনও চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। মনে কর, হিন্দুর সমাধি অবলম্বনে জ্ঞানের উচ্চ ভূমিতে আরোহণে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ভোগ সুখ এবং বংশবিস্তারে ব্যয়িত শক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহে এবং ঐ উপায়ে ইহ জীবনেই মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তি বিষয়ক ধারণা, আত্ম সংযমেই জাতিগত এবং ব্যক্তি-গত পুরুষার্থ, ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ, আত্মার পূর্ণত্ব, অব্যয়ত্ব ও অবিনাশিত্ব, কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রভৃতি বিশ্বাসনিচয়, যাহা বৈদিক যুগ হইতে এখনও পর্য্যন্ত সমভাবে বংশ হইতে বংশানুগত হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে, সে সকলের লোপ হইলে আমাদের জাতীয়ত্ব বা অপর জাতি হইতে পার্থক্য আর কোথা রহিবে? এবং ঐরূপ হইলে সমগ্র ধর্ম্ম-শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না?

প্রশ্ন হইতেছে, এখন বেদের বেদত্ব কি লইয়া? কোন্ শক্তি প্রভাবে উহা সমগ্র হিন্দু-মনে আবহমান কাল ধরিয়া এই অদ্ভুত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান? যোগিজননিষেবিত, মুক্তি-অলক্তক-রঞ্জিত কমনীয় শ্রুতি-পদে কেনই বা সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত প্রভৃতি অশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তিনম্রশিরসমূহ সর্ব্বদা নত রহিয়াছে? কেনই বা নিরীশ্বরবাদী কপিলাদি মহামুনিগণ স্বকীয় প্রতিভা প্রভাবে সকল বিষয় অতিক্রম করিয়াও বেদের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই? ইহার নিশ্চিৎ কোন গূঢ় কারণ আছে, কোন অপূর্ব্ব সর্ব্বজনমিলনভূমি সাধারণ সত্য আছে, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই সেশ্বর নিরীশ্বরাদি অতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ীরাও এককালে একবাক্যে ইহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেটি কি?

হিন্দুর বিশ্বাস,—বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যরচিত নহে—পুরুষনিঃশ্বসিত অর্থাৎ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ; অতএব নিত্য অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানাদি কালত্রয়েরও পূর্ব্ব হইতে ঈশ্বরের সহিত সদা বর্ত্তমান, ঈশ্বরের স্বরূপবিশেষ। বেদরাশিলিপিবদ্ধ জ্ঞান, ঐশ্বরিক জ্ঞানের মানববুদ্ধিগ্রহণযোগ্য আংশিক বিকাশ মাত্র। অতএব ঐশ্বরিক জ্ঞানকে যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে কখন ভিন্ন করা যায় না, সেইরূপ বৈদিক জ্ঞানও তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বেদের অপর একটি নাম আপ্তবাক্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বর স্বরূপ, সমাধি অবলম্বনে সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যাঁহারা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য বা শিক্ষা।

ভারতের সকল দার্শনিকেরাই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সমাধিই সত্য লাভের একমাত্র পথ। সমাধির সাধারণ অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। এই চিত্তের একাগ্রতার আবার তারতম্য আছে। সেই তারতম্য অনুসারে মহামুনি পতঞ্জলি সমাধির সবিকল্প ও নির্বিকল্প এই দুই বিভাগ করিয়াছেন। অপরাপর বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহসমূহকে তৎকালের নিমিত্ত তিরোহিত বা স্থগিত করিয়া একবিষয়ক চিন্তা-প্রবাহে মন কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাকে সবিকল্প সমাধি কহা যায়। মনের এই অবস্থায় যে বিষয়ক চিন্তাতরঙ্গে মন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সেই বিষয়ক সত্য উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কবিত্ব, শিল্প, ঔষধ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অদ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা সহায়ে মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে ঐরূপ কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে। ধর্ম্মবিষয়ক সত্য উপলব্ধি করিতে যেমন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, ঐ ঐ বিষয়েও তদ্রূপ। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদার্থ নিচয়ের উপর এবং ঐ সকল বিভিন্ন বিষয়ে তত্তৎ বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থ সমূহ লইয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হয়, এই মাত্র ভেদ। রাসায়নিক তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া নাম-জপাদি করিলে হইবে না বা ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্বের উপলব্ধির নিমিত্ত যন্ত্রসহায়ে পদার্থ নিচয়ের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণাদিতে নিরত রত থাকিলে চলিবে না। ইত্যাদি।

সবিকল্প সমাধি নানাভাব নানাদ্বিষয় লইয়া নানাপ্রকারের হইলেও

নির্ব্বিকল্প সমাধি একই প্রকার। উহাতে একবিষয়ক চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা না থাকিয়া কেবল মাত্র একটি চিন্তা বর্ত্তমান থাকে এবং গাঢ়াবস্থায় তাহারও জ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, যাহা মানব মনের প্রত্যেক উপলব্ধির দৃঢ়-ভিত্তি-স্বরূপ, তাহাও একত্রে মিলিয়া যায় এবং এক ব্যতীত অন্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে একের জ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাকেই যোগীর নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ হইয়া সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অবস্থান বলে। তখন শরীর জড়বৎ, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ব্যাপারশূন্য, মন বুদ্ধি এককালে স্তব্ধ এবং জগতের কোলাহল সুদূর পরাহত হইয়া থাকে।

ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকেরা উক্ত সমাধি অবস্থায় শরীরেন্দ্রিয়াদির জড়বৎ অবস্থিতি এবং কোন কোন শারীরিক রোগবিশেষের সহিত বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া উহাকে মানবসাধারণের চৈতন্যাবস্থা হইতে নিম্ন ভূমির অবস্থা বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত সমূহের যখন ঐরূপ ধারণা, তখন ভোগলোলুপ সকাম কর্ম্মৈকপ্রাণ সাধারণ পাশ্চাত্য মানব যে উক্তাবস্থা লাভ ভীতির চক্ষে দেখিবে বা কাহারও উক্তাবস্থার বিন্দুমাত্র লাভ হইলে তাহাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাশ্চাত্য দেশ সমূহ ভ্রমণকালে বর্ত্তমান লেখককে নিত্য এই প্রশ্নের বারবার উত্তর দিতে হইত যে, প্রাচ্যদর্শননিবদ্ধ সমাধি অবস্থা জড়াবস্থা নহে বা গাছ পাথরের মত হইয়া সুখ দুঃখের হাত অতিক্রম করা নহে ; যে, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভিতর দিয়া যে জ্ঞান চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা ঐ তিনের একত্র মিলিতাবস্থায় অনুভূত জ্ঞান চৈতন্যের অপেক্ষা সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট ; যে, এখনও পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবান ভারতে লাভ করিয়া থাকেন, এবং জড় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহাদের ভিতর দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোমুখী অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে এবং জ্ঞানের চরম সীমায় অদ্বৈত বোধে উপনীত হওয়ার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু চির সংস্কারের প্রবল প্রভাবে সে কথা ধারণা হইবে কেন ? আবার পরদিন সেই ব্যক্তিই পুনরায় সেই প্রশ্নের সমুত্থান করিত। একদিন একজন দার্শনিক বন্ধু সমাধি এবং অদ্বৈতবোধ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া এবং

অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ কিছু মাত্র নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ঐরূপ সমাধিস্থ পুরুষ একজনও জন্মে না। সেজন্যই আমাদের ওকথা হৃদয়ঙ্গম হওয়া এত কঠিন।" শুনিয়া মনে হইল, সত্যই বটে। চির-পদদলিত ভারত এ বিষয়ে সকল দেশাপেক্ষা এখনও ধনী! জড়বাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদাদি চার্ব্বাক মতসকল চূর্ণ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মালোক দিবার শক্তি ভারতেই রহিয়াছে। ভারতই তাহা পূর্ব্বে অপরাপর দেশবাসীকে দিয়াছে এবং এখনও মুক্তহস্তে ঐ ধন বিতরণ করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবে! নিরাশায় আশার সঞ্চার হইল! মনে হইল, দরিদ্র এবং বিজিত হইলেও আমাদের এ বিষয়ে কেহ পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের ধর্ম্মবীরগণেরই পদপ্রান্তে নত হইয়া এই অপূর্ব্ব আলোক সকল দেশবাসীকে লইয়া যাইতে হইবে।

অকুতোসাহস হিন্দু দার্শনিক অপরিবর্ত্তনীয় দেশকালাতীত সর্ব্বকারণ-কারণ নিত্য সত্যের উপলব্ধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা অসম্ভব দেখিয়া "মনো-নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ" রূপ তীর্থবর্য্য মণিকর্ণিকার অনুসন্ধানে নির্গত হই-লেন এবং তদাবিষ্কারে স্বয়ং ধন্য হইয়া অপর সাধারণকে কৃতার্থ করিলেন। সমাধি অবলম্বনে উপলব্ধি করিলেন যে, মানব সাধারণের সসীম জ্ঞান ও চৈতন্য, দেশকালাতীত এক অসীম জ্ঞান চৈতন্যের আপেক্ষিক বিকাশ মাত্র এবং আরো উপলব্ধি করিলেন যে, সেই জ্ঞান চৈতন্যের আরো নিম্ন ভূমির বিকাশ রহিয়াছে গো মহিষাদি পশু সমূহে, তরুগুল্ম লতা-দিতে এবং জড় হইতে জড় বলিয়া যাহাদের সম্বন্ধে মানবের ধারণা, ধাতু-লোষ্ট্রাদি পদার্থ নিচয়ে। অনন্তভাবে বিভক্ত জগত তখন তাঁহার চক্ষে এক নূতন আলোকে আলোকিত ও প্রতিভাসিত হইল এবং 'নিত্যো-নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্' পদার্থের উপলব্ধি করিয়া তিনি শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হইলেন! কামকাঞ্চনপ্রসূত গাঢ় অমানিশার অন্ধকারে সংযতেন্দ্রিয় সুসারথি তিনই একমাত্র জাগ্রত রহিলেন এবং মোহমুগ্ধ অপর জনসাধারণকে জাগ্রত করিবার জন্য অভয় আশ্বাস-বাণী প্রদান করিলেন! ইন্দ্রিয়াদির অতীত পদার্থ দর্শন করিয়াই তিনি ঋষি হইলেন এবং দেশকালাতীত পূর্ণানন্দ পরমধামের সাক্ষাৎ সত্য সংবাদ দেওয়াতেই তাঁহার বাক্য বেদ অথবা ঐশ্বরিক জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে, সমাধি সহায়ে উপলব্ধ বিষয় যে মস্তিষ্কের ভ্রমমাত্র অথবা রোগ বিশেষ নহে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তরে বলা যায়, সমাধি-লাভের পূর্ব্বে তোমার যেরূপ জ্ঞান, সংযম, ইচ্ছাশক্তি, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ছিল, সমাধিলাভের পর যদি সেই সকলের বিন্দুমাত্র হ্রাস না হইয়া শতগুণে বৃদ্ধি দেখিতে পাও, তাহা হইলে ঐ অবস্থাকে কি বলিতে চাও? তারপর শান্তি—যে শান্তির জন্য নানা প্রকার অভাব পূরণের চেষ্টায় জনসাধারণ দিবা রাত্রি ছুটাছুটি করিয়াও পূর্ণ-মাত্রায় কখন পাইতেছে না, সেই শান্তি যদি তোমার সদা সর্ব্বক্ষণ বিদ্য-মান থাকে, তাহা হইলে সে রোগবিশেষ যে প্রার্থনীয়!

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, বেদ পুরাণাদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যেন কোন জিনিষের—যথা সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নাদির—তালিকা বিশেষ। যদি তুমি সেই পদার্থের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত থাক, তাহা হইলে মিলাইয়া লইতে পার, সেই পদার্থের কোন্ কোন্ রূপের সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রূপের সহিত বা হয় নাই। তখন যে যে রূপের উপলব্ধি হয় নাই, তাহাদের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে পার। অতএব বেদ যে শুদ্ধ সমাধি অবস্থার উপলব্ধি সমূহ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের নিম্নাৎ নিম্নস্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরের চরম সীমা নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত উঠিবার কালে সাধক মানবের শরীর এবং মনে যেরূপ পরিবর্ত্তন, অনুভব এবং তৎফল স্বরূপ ধর্ম্মমত, আস্তিক্য ও বিশ্বাসাদি আসিয়া উপস্থিত হয়, জগতের কল্যাণের জন্য তৎসমুদায়েরও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের লাভালাভ কি? মনুষ্য মাত্রকেই ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইতে গেলে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন, নানাপ্রকার মতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস, নানাপ্রকারের ধারণা, বহির্জ্জগতের নানাপ্রকার পদার্থ সাহায্যের জন্য অব লম্বন প্রভৃতির ভিতর দিয়া গমন করিয়া নিত্য সত্য পদার্থ লাভ করিতে হইবে। ভিতরের ও বাহিরের এই সকল পরিবর্ত্তন বৃক্ষবিশেষের প্রতি পত্রের রূপের ন্যায় প্রতি মানবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও সাধারণতঃ সর্ব্ব কালেই একরূপ থাকিবে। কারণ, এই সৃষ্টির নিয়ম—বহুর মধ্যে একের বিকাশ, একের অনুস্যূততা—যাহা হইতে মানবীয় সর্ব্ব প্রকার

জ্ঞান অনুভবপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমার অনুভূত বিষয় সকলের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ অনুভূত এবং বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থনিবদ্ধ অনুভবের যদি সমতা পাইতে থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দিহান চিত্তে তুমি স্বীয় পথে অগ্রসর হইয়া উদ্দেশ্য লাভে কৃতকৃতার্থ হইবে।

ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইতে সাধকশরীরমনে যে কি আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিগণ, ঐতিহাসিক যুগের সিদ্ধ ও সাধকগণ এবং বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মবীরগণের জীবনী আলোচনায় বিশেষ উপলব্ধি হয়। নচিকেতার যমসদনে যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, সত্যকাম জাবালের অগ্নি উপাসনার ফলে আচার্য্যত্ব প্রাপ্তি, মিথিলাধিপতি জনকরাজের রাজ্যশাসন করিতে করিতে বিদেহত্ব বোধ ইত্যাদি সিদ্ধপুরুষোপলব্ধ অনুভবের ভিতর অথবা পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়ে কিশোর কালেই অদ্বৈতবোধ স্ফূর্ত্তি এবং তৎপরে ধীরে ধীরে সেই জ্ঞান অপরকে প্রদান করিবার শক্তি বিকাশ, মহামতি ঈশার চল্লিশ দিন উপবাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গয়াধামে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হইতে ধর্ম্ম শক্তি প্রকাশ, এবং বর্ত্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবশরীরে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যাদির পর অদ্ভুত ধর্ম্মসমন্বয় শক্তি বিকাশাদির ভিতর তত্তৎ জগদ্গুরুর মহান্ হৃদয়ে কত দেবাসুরের সংগ্রাম ও জয় পরাজয়, কত উত্তম আশা ও নিরাশা, কত আনন্দ ও বিরহ, কত যুগান্ত পরিবর্ত্তনের পর চিত্তের সমতাবস্থালাভ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ দেবপ্রতিম শুদ্ধ সত্ত্ব শরীরে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার ইতিহাসের কতটুকু আমরা পাইয়াছি বা রাখিতে পারিয়াছি? যতটুকু রাখিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য জগৎ আজ কত ধনী, কত ধন্য হইয়াছে; আবার সেই ইতিহাসের অধিকাংশই কি ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থে নাই? জগৎ জুড়িয়া একটা রব উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায় না, ইতিহাস লিখিতে ভারতের লোক জানিত না! আরে মূর্খ! রাম শ্যামকে মারিয়া রাজা হইল, তৎপরে রামের দশটি সন্তান হইল, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন অর্থাৎ কতকগুলি আইন চালাইলেন, কাহাকেও পুরস্কার এবং কাহাকেও বা দণ্ড দিলেন, খাইলেন, শুইলেন, বিবাদ করিলেন, আনন্দ করিলেন, কষ্ট সহিলেন এবং মরিলেন—এই কি তোমার ইতিহাস? এ ইতিহাস রহিল বা না রহিল, তাহাতে জগতের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কিন্তু ইতিহাস অর্থে যদি—যে

সকল মহাপুরুষের চিন্তাস্রোত সমগ্র দেশবাসীর মনের উপর আধিপত্য করিয়া তাহাদের নূতন ভাবে গড়িয়াছে, যে সব মহান্ হৃদয়ের ভালবাসা আপামর সাধারণ মানবকে নিঃস্বার্থ হইতে শিখাইয়াছে, যে সকল মহৎ চরিত্রের আদর্শ দেশবাসীর চক্ষের ভিতর দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তিবৎ চিরজাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে—সেই সকল মহাপুরুষের প্রাণের উপলব্ধির ইতিহাস হয়, তাহা হইলে ভারতই যে তাহা বিশেষ ভাবে রাখিয়াছে। তাহা হইতেই কি বর্ত্তমান যুগে জাগতিক ধর্ম্মজ্ঞান বুঝিবার বিশেষ সহায়তা হইতেছে না ?

উন্নতোদার চিন্তাতরঙ্গপরম্পরা হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে মানব-শরীরমনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। বর্ত্তমান যুগের সকল পণ্ডিতেরাই উহা একবাক্যে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানচর্চ্চা যতই অধিক হইতেছে, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইতেছে এবং তৎফলস্বরূপ জার্ম্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহে অপূর্ব্ব অভিনব উপায়ে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা Experimental Psycholgy। প্রত্যেক মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাবের এক এক শারীরিক অনুরূপ এবং প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্ত্তনের সহিত চিরসম্বদ্ধ এক এক মানসিক প্রতিকৃতি বাহির করাই ইহার উদ্দেশ্য। এক জন বন্ধু বলিয়াছিলেন, ঔষধ, রাজনীতি এবং ধর্ম্ম, ইহাদের মা বাপ নাই; বয়স হইলে সকলেরই আপনা আপনি হয়; যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয় না। কোনস্থানে ঐ তিন বিষয় সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন যদি উপস্থিত হয়, ত সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই ঐ প্রশ্ন সিদ্ধান্ত করিয়া দিতে অধীর হইবে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এতদিন ঠিক ঐরূপ ছিল—বিশেষতঃ অপরাপর দেশে। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ততই কল্পনার আলোকান্ধকারমিশ্রিত ভ্রান্তিছায়া মনোবিজ্ঞানের অধিকার হইতে দূরাপসৃত হইয়া মানসিক গঠন এবং কার্য্যপ্রণালীর যথাযথ তত্ত্বসমূহ যথার্থ আলোকে আলোকিত হইতেছে এবং মনোবিজ্ঞান যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্যত্ব লাভ করিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্যান্য শাস্ত্রনিচয়ের সমকক্ষ হইতেছে।

প্রত্যেক মানসিক ভাবের একটি একটি শারীরিক প্রতিকৃতি আছে। আবার তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্ত্তন এক একটি মানসিক

পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, ইহাও সত্য। বহিঃস্থ শক্তিবিশেষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় পথে পাঁচ প্রকারের শারীরিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করাতেই ঐ সকলের মানসিক প্রতিকৃতিস্বরূপ রূপরসাদি পাঁচ প্রকারের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। আবার বিষয়বিশেষে গাঢ় মনোনিবেশ করিলে ঘর্ম্ম নিঃশ্বাসমান্দ্যাদি হওয়াও সকলের প্রত্যক্ষ। নিষ্ঠুর চিন্তাপরম্পরা সর্ব্বক্ষণ মনে জাগরুক থাকাতে চোর ঘাতকাদির বিকট মুখশ্রী এবং উদারভাবপ্রবাহ হৃদয়ে নিয়ত ধারণের ফলে সাধুর সৌম্যদর্শনাদিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা স্থূল স্থূল কতকগুলি পরিবর্ত্তনের কথাই এখানে উল্লেখ করিলাম। নতুবা বহিঃশক্তি ইন্দ্রিয়পথে আঘাত করিয়া স্নায়ুমণ্ডলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত করিলে সমুদ্রাভিমুখী নদীসকলের ন্যায় স্নায়ুতরঙ্গ সকল মস্তিকাভিমুখে গমন করে; এবং চন্দ্রমাতাড়িতসমুদ্রস্ফীতির তরঙ্গাকারে নদীগর্ভ প্রবেশের ন্যায়, আত্মাতাড়িত অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় প্রথমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া স্থূলতর রূপ ধারণ করে। তৎপরে স্নায়ুমণ্ডলে স্পন্দন উৎপন্ন করিয়া স্নায়বিক তরঙ্গাকারে শরীরেন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ করিয়া বিভিন্নপদার্থবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মায়, ইত্যাদি অনেক কথা বলা যাইতে পারিত। স্নায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের ঐ সকল তরঙ্গরাজি শারীরবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। পাঠকের কৌতূহল হইলে শারীরবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থে উহার অনুসন্ধান করিতে পারেন। অন্তঃকরণতরঙ্গনিচয় আবিষ্কার করা এবং যথাযথ পাঠ করাই মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবের সকল অবস্থাই ঐরূপে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্ত্তনের ফলে অনুভূত হয়। মানব আপন বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা উন্নত বা অবনত যে অবস্থাতেই উপনীত হউক না কেন, উহা তাহার শরীর মনে পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন তরঙ্গ পরম্পরার ফলেই আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ কথা নিশ্চিৎ। ঐ সকল পরিবর্ত্তন রাজির প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ হইতে পারে। প্রথম,—যে গুলি আদর্শস্থানীয় আপ্ত পুরুষদিগের শরীর মনে অনুভূত হওয়াতে মানবমনের বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, দ্বিতীয়,—যে গুলি জনসাধারণের নিয়ত প্রত্যক্ষ বা অনায়াসপ্রত্যক্ষ হওয়ায় সাধারণ উন্নতি পরিচায়ক এবং তৃতীয়, যে গুলি যোগী, দস্যু, লম্পটাদি নিম্নস্থানীয় মানবশরীরমনে নিয়তানুভূত হওয়াতে উহাদের নীচত্বপরিচায়ক। উহাদের মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত

পরিবর্ত্তনরাজি, নির্ণয় করা শারীরবিজ্ঞানের বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তগুলি আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের অধিকারের ভিতর এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত গুলি বেদাদি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের একটু বিশেষত্ব আছে। উহা প্রথম শ্রেণীর পরিবর্ত্তন গুলিকে মনুষ্যোপলব্ধ নিত্য ঐশ্বরিক-জ্ঞান বলিয়া এবং ঐ প্রকার অবস্থা লাভ করাই, সমগ্র সৃষ্টি ও মানব জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়া দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কিয়দংশ-ভুক্ত পরিবর্ত্তন রাজি যথাযথ পাঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের দার্শনিক সেইজন্যই বেদনিবদ্ধ ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনরাজি বা অনুভব সমূহের ইতিহাসকে "পুরুষ-নিঃশ্বসিত, আপ্তবাক্যাদি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের দর্শন সেইজন্য সাধারণ মানবের উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন না করিয়া অলস্তমহিম মহাপুরুষদিগের উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান। ভারতের দর্শনও সেই জন্য কেবল কল্পনানুমান সহায়ে রচিত না হইয়া অন্যান্য দেশের দর্শনসমূহের ন্যায় প্রত্যক্ষীকৃত অনুভবনিচয়ের উপরেই রচিত হইয়াছে। ইউরোপীয় দার্শনিক ভারতের দর্শন সমূহ কল্পনানুমানপ্রসূত ইত্যাদি বলিয়া যতই ঘৃণার চক্ষে দেখুন না কেন, উহা তাঁহারই আপ্ত পুরুষের অবস্থাবিষয়ক অজ্ঞতা এবং আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক মাত্র।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মগ্রন্থসমূহনিবদ্ধ জগতের যাবতীয় ধর্মবীরগণের অনুভব সমূহ অশেষ প্রকারে বিভিন্ন; ঐ সকলের ভিতর এমন কোন সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ সাধারণ ভূমি আছে কি, যাহার উপর মনোবিজ্ঞান ভিত্তি স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে? বিভিন্নতার ভিতর একতা যতক্ষণ আবিষ্কৃত না হইবে, ততক্ষণ কোন বিষয় বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী কেমনে হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, নির্ব্বিকল্প সমাধি অনুভূত প্রত্যক্ষ এবং তাৎকালিক শরীরাবস্থান সর্ব্বকালে সর্ব্ব পুরুষের একরূপই হইয়াছে, ইহা ধর্মেতিহাসপ্রসিদ্ধ। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন সব শিয়ালের এক রা" (এক প্রকার আওয়াজ) সেইরূপ নির্ব্বিকল্প অবস্থায় অনুভূত বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় ঋষি এবং অবতারকুল এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এখানে "নানা মুনির নানা মত" নাই। সকলেরই এক মত। বৈদিক ঋষিগণ-সেবিত "মহাবাক্য চতুষ্টয়", অমিতাভ বুদ্ধ প্রচারিত "মহানির্ব্বাণবিদ্যা," শিবাবতার শঙ্কর ঘোষিত "সোঽহংজ্ঞানাবস্থান," মধুর বৃন্দারণ্যে মাধবপদে

উৎসর্গীকৃতসর্ব্বস্ব তন্ময়প্রাণা গোপীগণের আপনাতে শ্রীকৃষ্ণবোধ, বাৎসল্য ভাবের অনন্ত নিদর্শন মহাত্মা ঈশার জগৎপিতার সহিত একত্ববোধ ইত্যাদি সকলই উপাস্য ও উপাসকের মিলনসম্ভূত দ্বৈতবিবর্জ্জিত এক অবস্থাবিশেষকেই যে লক্ষ্য করিতেছে, ইহা স্পষ্ট। ঐ অবস্থাবিশেষ এক হইলেও উহাতে উপনীত হইবার পথ নানা। একথার আভাসও উদারচরিত বৈদিক ঋষিগণ এবং যাবতীয় অবতারগণও দিয়া গিয়াছেন। যাস্কক্ত নিরুক্তে আপ্ত পুরুষ সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, দ্বৈতবর্জ্জিত অবস্থানুভব করিয়া আপ্তত্ব লাভ, আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়জাতীয় পুরুষই নির্ব্বিশেষে করিতে পারে।

আপ্তবাক্যের যথার্থ অর্থ কি, তাহা আমরা এতক্ষণে বুঝিলাম। এবং ম্লেচ্ছজাতীয় পুরুষের বাক্যও যে বেদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহাও ঋষিগণ বলিয়াছেন, দেখিলাম। আর একটি কথাও সত্যতাও এখানে অনুমিত হয় যে, নির্ব্বিকল্প অবস্থা উপলব্ধ বিষয় এক হইলেও ইহাতে উপনীত হইবার পথের নানাত্ব ও ভিন্নত্ব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে। জগৎ কখনই একধর্ম্মমতাবলম্বী হইবে না, কিন্তু কালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচারিত "যত মত তত পথ" বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিবে।

ভারতের দর্শন যেমন মহাপুরুষকুলের প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান, ধর্ম্মও তদ্রূপ। সেই জন্যই ভারতে দর্শন এবং ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভারতের ঋষি ধর্ম্মকে সংসার হইতে বিভিন্ন করিয়া মানব উহা করিলেও করিতে পারে, না করিলেও পারে, এ ভাবে দেখেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সমগ্র সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্যই ধর্ম্ম বা মুক্তিলাভ করা। প্রতি মানব নিজ জীবনে প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যে যে অনুভূতি করিতেছে, সে সকল তাহাকে ঋজু কুটিল পথ দিয়া ঐ উদ্দেশ্য লাভের দিকেই অগ্রসর করিতেছে। ধর্ম্ম এক অবস্থাবিশেষ, মানবের সখের বিষয় নহে। ভাল মন্দ উভয় প্রকার কার্য্যের ভিতর দিয়া, সুখ দুঃখ উভয় প্রকার অনুভবের ভিতর দিয়া, আস্তিক্য নাস্তিক্য প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্বাস ও ধারণার ভিতর দিয়া অবশেষে চরমোন্নতির ফলস্বরূপ মানবজীবনে ধর্ম্ম বা মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং তখনই মানব নিজে ধন্য হইয়া জগৎ পবিত্র করে!

আপ্ত পুরুষের জীবনানুভব আলোচনায় যে বিশেষ ফল আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞান যে বিষয়েরই হউক না কেন, মানবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের কিয়দংশ দগ্ধ করিয়া দেয়। কারণ, সংস্কার বা পূর্ব্বানুষ্ঠিত অভ্যাসই মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং সংস্কারবিশেষের উৎপত্তি আবার বস্তুবিশেষের বিপরীত ধারণা হইতে জন্মিয়া থাকে। সর্পের দংশনস্বভাব না জানিয়াই অজ্ঞ বালক সম্মুখস্থ সর্পধারণে সযত্ন হয়। ইন্দ্রিয়পঞ্চক এবং মনের সসীম স্বভাব না জানাতেই মানব উহাদের সহায়ে নিত্য সত্য উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করে। অবিমিশ্র সুখ লাভ অসম্ভব না জানিয়াই আমরা উহার অন্বেষণে সতত ছুটাছুটি করি। ইত্যাদি। অতএব সেই বিপরীত ধারণার স্থানে সেই বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানের যদি কোনরূপে উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সংস্কার এবং তৎপ্রসূত পূর্ব্ব চেষ্টাদিরও যে নাশ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এবং পূর্ণ জ্ঞানানুভবে যে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার এবং তৎপ্রসূত নিখিল কর্ম্ম সমূহের একান্ত নাশ হইবে, ইহাও স্পষ্ট। এজন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। অতএব "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" মানবকে পবিত্র করিতে জ্ঞানের সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। বস্তুবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানই আবার মানুষকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনে কর, চৌর লম্পটাদির নীচপ্রবৃত্তিনিচয় তত্তৎ শরীর মনে কেন উপস্থিত হয়, এ বিষয়ের কারণানুসন্ধানে তুমি নিযুক্ত হইলে। প্রথমতঃ দেখিলে যে, যে বিষয় লইয়া তাহাদের ঐ সকল জঘন্য প্রবৃত্তির উদয় হয়, সেই সেই বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের শরীরস্থ বহিরন্তরবার্ত্তাবাহী স্নায়ুসমূহ চির-অভ্যাস বশতঃ হৃদয়াদি শারীর যন্ত্রের ন্যায় মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তৎফল স্বরূপ, তাহারা তত্তৎ জঘন্য কার্য্য করিতে যাইতেছে, ইহা বিশেষরূপে জানিবার পূর্ব্বেই ঐ সকল করিয়া বসে। আরো দেখিলে যে, তাহারা ঐ সকল কার্য্যই বিশেষ পুরুষত্ব-পরিচায়ক বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে, এবং তত্তৎ কার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ লাভ হইবে ধারণা করিয়া আছে। এবং পরিশেষে দেখিলে যে, ঐ প্রকার ধারণা হইতে তাহাদের তত্তৎ কার্য্য অকরণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। ঐ সকল বিষয় বুঝিবামাত্রই তোমার বোধ হইল যে, তাহাদের ঐ সকল কার্য্য ত্যাগ করাইতে হইলে তাহাদের বিপরীত অভ্যাস সমূহ করিতে

শরীরকে শিখাইতে হইবে। উহা করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে, এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যেখানে প্রলোভনের বিষয় সকল সহজে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত না হয়। তৎপরে তোমার বোধ হইল যে, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত ত্যাগ, তত্তৎ কার্য্য সমূহ পুরুষত্ব পরিচায়ক ও বিশেষ আনন্দজনক এই ধারণা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে। তুমি দেখিলে যে, তত্তৎ বস্তু বিষয়ক ভুল ধারণা হইতেই ঐ প্রকার কার্য্য করিতে তাহারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। অতএব উহাদিগকে ঐ সকল ত্যাগ করাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল ভুল ধারণাস্থলে ঐ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান যাহাতে আসে, তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। মনে কর, ঐ সকল কার্য্য করণে অবশ্যম্ভাবী দুঃখ সকল দেখাইয়া তুমি কালে তাহাদের ধারণা সমূহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে। তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ তাহাদের ঐ সকল কার্য্যও যে কালে ত্যাগ হইবে, সে বিষয় কি আর বুঝাইতে হইবে? বৃক্ষের প্রধান মূল ছিন্ন হইলে উহার জীবন যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ঐ মূল ধারণা ত্যাগে ঐ সকল কার্য্যের অস্তিত্বও নষ্ট হইল। অতএব ঐ সকল নীচ মানবমনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞানই যে তোমায় ঐ সকল মন পরিবর্ত্তনের শক্তি সম্পন্ন করিল, ইহা স্পষ্ট।

আপ্ত পুরুষের অনুভব স্বভাব ও চেষ্টাদির আলোচনাও আমাদিগকে ঠিক ঐ প্রকার শক্তি-সম্পন্ন করে এবং জগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধিনী কি প্রকার ধারণা হইতে তাঁহাদের ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ চেষ্টাদি হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইয়া দেয়। অশান্তিপূর্ণ মানব জীবনে তাঁহাদের অপূর্ব্ব শান্তি এবং শোক দুঃখ আনন্দাদিতে অদ্ভুত অবিচলতা দেখিয়া তদবস্থালাভে আমাদের অনুরাগী করে এবং তাঁহাদের জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-প্রকাশ, তাঁহাদের অবস্থা যে সাধারণ মানবের অবস্থা হইতে অনেক উচ্চ ভূমির অবস্থা এ কথা বুঝাইয়া দিয়া মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে। তবে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের জীবন আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, শ্রদ্ধাই কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শ্রদ্ধাবিরহিত মন ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করিবে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—শ্রদ্ধাবিরহিত সংশয়পূর্ণমন অজ্ঞান মানব নষ্ট হয় অর্থাৎ সত্য লাভে সমর্থ হয় না। কারণ,

শ্রদ্ধার অভাবেই নানাপ্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মানবকে জ্ঞান লাভ করিতে দেয় না।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করিব না? যে যাহা বলে, তাহাই চোখ্ কান বুজিয়া বিশ্বাস করিব? না, তাহা করিতে হইবে না। সত্য লাভ করিব, এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল বিষয় অনুশীলন কর এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পার, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলাইয়া পাও, ততক্ষণ নানাপ্রকার প্রশ্ন ও চেষ্টাদি করিও। উহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে না। পরীক্ষা না করিয়াই কোন বিষয় মিথ্যা বলিয়া ধারণা করা এবং অগ্রাহ্য করাই এস্থলে সংশয় শব্দের অর্থ। উহা না করিলেই হইল।

আর এক কথা, শাস্ত্র বলেন, আপ্তাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে মানব জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শনে সমর্থ হয়—অপরের জানিবার বিষয় নহে। উহা সর্ব্বতোভাবে স্বসংবেদ্য। যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জানিতে ও বুঝিতে পারেন। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেন যে, আপ্তপুরুষের বাহ্যিক প্রকাশ দেখিলে তাঁহার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমরা জানিতে পারি। এবং তাঁহাদের অনুভবাদির আলোচনাই যে অজ্ঞ মানবের তদবস্থা লাভের প্রধান সহায়, এ কথা পতঞ্জলি প্রভৃতি সমগ্র ঋষিকুল এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে যতদিন না আমাদের তদবস্থা লাভ হইবে, ততদিন যে আমরা তাঁহাদের মানসিক গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না, এ কথায় আর সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রমুখ অবতার কুলের জীবনানুভব আবার আপ্তপুরুষাপেক্ষাও সমধিক বিচিত্র এবং উচ্চ ভূমিকারূঢ়। তজ্জন্য তাঁহাদের চেষ্টাদিকে ঋষিগণ "লীলাবিলাসাদি" নামে এবং তচ্চেষ্টাদির অধিষ্ঠান ভূমি—তাঁহাদের শরীরেন্দ্রিয়াদিও শুদ্ধ সত্ত্ব গুণনির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন খাদ না হলে গড়ন হয় না, অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু নিচয়ে অলঙ্কারাদি গঠন করিতে হইলে তাহাতে তাম্রাদি নিকৃষ্ট ধাতু সকল মিশ্রিত করিতে হয়, নতুবা গঠন টেকে না—সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণের কিয়দংশ না থাকিলে মনুষ্য শরীর হওয়া অসম্ভব"। অতএব অবতার শরীর গঠনে রজঃ তমো-

শুধু স্বল্প মাত্রায় বর্ত্তমান, ইহা সত্য। কিন্তু উহা এত অল্প যে, ঐ ভাগ লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের শরীর মনের চেষ্টাদি শুদ্ধ সত্বগুণ প্রসূত বলিতে পারা যায়।

আবহমানকাল ধরিয়া মানব বিশ্বাস করিতেছে, অবতারকুল, জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরের অংশ হইতে উৎপন্ন অতএব ঐশীশক্তিসম্পন্ন। তাঁহারা মানব শরীর ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-জগতের চরম তত্ত্বে উপনীত হইবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া উহা উন্নতাবনত অবস্থাপন্ন সর্ব্ব প্রকারে বিভিন্ন-প্রকৃতি মানবের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দেন। ঐ সকল নূতন পথাবিষ্কারে সবিশেষ শক্তির প্রয়োজন। তজ্জন্য তাঁহাদের শরীরেন্দ্রিয়াদির গঠনও তদুপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও অনুভবাদিও উহাতে ধৃত এবং যথাযথ গঠিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের সাধনোদ্যমাদিও অমানুষীচেষ্টাসম্পন্ন এবং জগতের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত। কারণ, সংযম, প্রেম, মুক্তি বা মনুষ্যোপলব্ধ এমন কোন সদ্‌গুণই নাই, যাহা তাঁহাদের "অনবাপ্তমবাপ্তব্যং"—লাভ হয় নাই অতএব লাভ করিতে হইবে। তথাচ তাঁহারা ঐ প্রকার অদ্ভুত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাধারণ মানবের ত কথাই নাই, তাঁহারা মনুষ্যশরীরে দেবপ্রতিম আপ্ত-পুরুষকুলেরও আদর্শস্থানীয়। আপ্তপুরুষেরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াই আপ্তত্বাদি অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের সমস্ত জীবনানুভব আপ্তপুরুষদিগেরও হয় না; কেন না, ধর্ম্মজগতের নূতন তত্ত্ব ও পথাদি আবিষ্করণ জন্য তাঁহাদের জন্ম গ্রহণ নহে। অতএব অবতার কুলের শরীর মনের অনুভবাদি যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের প্রভেদ শক্তির বিকাশ লইয়া হইয়া থাকে; নতুবা নির্ব্বিকল্প সমাধিলব্ধ জ্ঞান উভয়ের এক রূপই হইয়া থাকে।" একজন মায়া-প্রসূত কামকাঞ্চনাদি হইতে কোনরূপে আপনাকে বাঁচাইয়া মুক্তি লাভ করিয়া প্রস্থান করেন; অপর জন অপরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বন্ধনের উপর বন্ধনাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদেরও বন্ধন মোচন করিয়া দেন এবং আপনার বন্ধনও ইচ্ছামাত্র মোচন করিয়া ফেলেন! ভারতের পুরাণ সমূহ আর কিছু করুক্ না করুক্, তাঁহাদের অনুভবাদির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া মনুষ্যকে অমূল্য ধনে ধনী করিয়াছে।

প্রত্যেক ঈশ্বরাবতার বা আপ্তপুরুষচরিত্র আমিরা তিনভাবে আলোচনা করিতে পারি। অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার চক্ষে তাঁহাদের কার্য্যকলাপাদি দেখিয়া বা শুনিয়া উহা ভণ্ডধূর্ত্তাদির মিথ্যাকল্পনা প্রসূত বা মানবের রোগ-বিশেষ বলিয়া বিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি। অথবা বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রণোদিত হইয়া ঐ সকল পুরুষের মানবকুল হইতে সম্পূর্ণ জাতিগত পার্থক্য অনুমান করিয়া তাঁহাদিগকে এক অপূর্ব্ব জীববিশেষ বলিয়া ধারণা করিতে পারি। অথবা তাঁহাদের অস্তিত্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া অসক্তবুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের চক্ষে তাঁহাদের কার্য্যকলাপা-দির বিশেষ অনুধাবন ও পরীক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ক যথাযথ-জ্ঞান লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

প্রথম দৃষ্টি অবলম্বন করিলে মানবের যাবতীয় ধর্ম্মেতিহাসই মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়। এবং মিথ্যা বিশ্বাসাদিও যেমন কখন কখন গৌণভাবে মানবের উপকারে আসিয়াছে, যাবতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসাদিও পূর্ব্ব যুগে সেই ভাবে মানবের উন্নতির সহায় হইলেও এখন আর তাহাদের আবশ্যকতা নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

২য় দৃষ্টিতে ঐ সকল মহাপুরুষ উপলব্ধ অবস্থা ও অনুভবনিচয় তাঁহা-দেরই একায়ত্ত সম্পত্তিবিশেষ বলিয়া স্থির করিতে হয়। এবং উহা মানব সাধারণের জীবনে কখনই অনুভূত হইবার নহে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এবং ভক্তিলাভের উপায়মাত্র ভিন্ন অন্য কোন কারণে তদালোচনার নিষ্ফলতা প্রমাণ করে অথবা তাঁহাদিগকে নিগ্রহানু-গ্রহসমর্থ জীববিশেষ বলিয়া ধারণা করাইয়া মানবকে কেবল তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিতে শিক্ষা দেয়। কিম্বা ক্রোধনস্বভাব দণ্ডদাতা উৎকোচগ্রাহী দেবতাবিশেষ বলিয়া ধারণা করাইয়া সকাম মানবকে দুর্ব্বলতার পথে দিন দিন অগ্রসর করে।

৩য় দৃষ্টি তাঁহাদিগকে অসাধারণ হইলেও মানব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাদের অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া মানবকে আশা ভরসা এবং বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন করে। তাঁহাদের উচ্চগতি দেখিয়া মানব আপনার উচ্চগতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত অতএব সকল ধনের অধিকারী বলিয়া আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করিয়া

দাঁড়াইতে শিখে। এই দৃষ্টি অবলম্বনে মহাপুরুষ চরিত্রালোচনার ইচ্ছা বারান্তরে রহিল। এখন ভাগীরথীনিষেবিত পঞ্চবটী তলে যাঁহার অলৌকিক জীবন বেদাগম পুরাণাদি, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থনিবদ্ধ সমগ্র অবতার কুলেরও অনুভবাদি অতিক্রম করিয়া উচ্চতর ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছিল, যাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশের আরম্ভমাত্র দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে, যাঁহার অপূর্ব্ব জীবনালোক কালরাত্রির ঘনান্ধ ক্রোড়ে লুক্কায়িতপ্রায় বেদাদির অর্থবোধে বাসনাপ্রাণ ভোগলোলুপ বর্ত্তমান কালের মানবের একমাত্র সহায়, কামকাঞ্চনপূতিগন্ধপূর্ণ শোকদুঃখময় স্বার্থপর সংসারে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" যাঁহার বারবার আগমন, উদ্বোধন! আইস, আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব জগদ্গুরু সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারই জীবনানুভব সময়ে সময়ে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি এবং ধন্য হই।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

৩য় প্রস্তাব।

১। ম্যালেরিয়া জ্বর।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি)

১৯০১ সালের স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ, ঐ বৎসর বাঙ্গালায় তেইশ লক্ষ দশ হাজার মোট মৃত্যুর মধ্যে, ষোল লক্ষ সতের হাজার মৃত্যুর কারণ জ্বর রোগ। আমরা দেখিয়াছি, এ দেশে চিকিৎসকের অভাবে অধিকাংশ স্থলে রোগ নির্ণয় হয় না এবং সন্তাপ, অনেক রোগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া সাধারণ লোকের নিকট, বিবিধ স্বতন্ত্র ব্যাধি জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ সংবাদদাতার উপর নির্ভর করিয়া এ দেশে মৃত্যুবিবরণী সংগৃহীত হয়, এজন্য অধিকাংশ স্থলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। সুতরাং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জ্বর রোগের প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা কত, জানিবার উপায় নাই। বহুদর্শী চিকিৎসকগণের মতে এদেশে বহুবিধ জ্বর রোগের প্রাবল্য থাকিলেও অধিকাংশ মৃত্যু ম্যালেরিয়াসম্ভূত। আয়ুর্ব্বেদ মতে, অতি প্রাচীন কাল হইতে

ম্যালেরিয়া লক্ষণাক্রান্ত জ্বর রোগ আর্য্যাবর্ত্তে বর্ত্তমান। আয়ুর্ব্বেদ-প্রকাশ-কর্ত্তা মহর্ষি চরকের নাম পাণিনি ব্যাকরণে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পাণিনি, শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সুদূর অতীতে বৃদ্ধ চরক, বিষম জ্বরের যে সকল ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত এখনকার ম্যালেরিয়া জ্বরের কোন বিভিন্নতা নাই। সন্ততজ্বর (Malarial Remittent) সতত জ্বর (Double Quotidian) অন্যেদ্যুষ্ক (Quotidian) তৃতীয়ক (Tertian) চাতুর্থক (Quartian) বিষমজ্বর, সেকালে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। সেকালেও ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে যে সময়ে সময়ে দেশ জনশূন্য হইত, চরকের জনপদোদ্ধংসন মহামারীর বর্ণনায় অনুমান হয়। স্বাস্থ্য বিদেরা অবগত আছেন, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, ওলাউঠা, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কালবিশেষ আছে। এদেশে বর্ষাকালেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, এ সময়ে অপর কোনরূপ সংক্রামক রোগের প্রাবল্য থাকে না। গ্রীষ্মকালের শেষে বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য দৃষ্টে, যে জনপদোদ্ধংসন সম্বন্ধে মহর্ষি পুনর্ব্বসু, প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বর্ষাকালোৎপন্ন ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিশিষ্ট কারণজ্ঞানের অভাবে, এরূপ বহুপ্রাণিসংহারক বিষমজ্বর "ভূতাভিষঙ্গোত্থং" ভূতাদির দৃষ্টি জন্য, কেহ কেহ বিশ্বাস করিতেন, এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বিষম জ্বর যে অনেক সময়ে ত্রিদোষজ, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

প্রায়শঃ সন্নিপাতেন পঞ্চ স্যুর্ব্বিষমজ্বরাঃ। চরক।

বঙ্গদেশের ভূমির নৈসর্গিক অবস্থা ম্যালেরিয়া উৎপাদনের প্রবল সহায়। পঞ্চসপ্ততিসহস্রবর্গক্রোশব্যাপী বঙ্গের সমতল ক্ষেত্র, সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে অনেক স্থানে তিন হইতে সাত হাত মাত্র উচ্চ; পঞ্চবিংশতি হস্তের অধিক উচ্চতা কোথাও নাই। সাগরগামী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বহুমুখী শাখা বেষ্টিত ভূখণ্ড অসংখ্যখালবিলসমাকীর্ণ; বৎসরের ছয়মাস কাল জলমগ্ন, স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ উচ্চ ভূমে গ্রাম ও নগরের সন্নিবেশ। নদ, নদী সতত পরিবর্ত্তনশীল, কখন বদ্ধ স্রোতে শীর্ণকায়, কোথাও নূতন পথে বেগবতী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ বিস্তার। বর্ষাগমে নদী-স্রোত পরিপূর্ণ হইয়া তীরভূমি অতিক্রম করতঃ বহুদূর প্লাবিত করিয়া থাকে। গ্রাম ও নগর হইতে বৃষ্টিজল নিম্ন ভূমির মধ্য দিয়া বিল জলা প্রভৃতিতে

প্রবাহিত হয়। যেমন হেমন্তাগমে নদীজল অপসৃত হইতে থাকে, বিল ও জলা ভূমি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র খাল পথে জল আকর্ষণ করিয়া উহাদিগকে শুষ্ক করে। বর্ষার কয়েক মাস নিম্নভূমি জলপ্লাবিত থাকে বলিয়া শস্যশালিনী বঙ্গদেশে চিরকাল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিন্তু যে বৃষ্টিজল নিম্ন ভূমিতে সঞ্চিত হইয়া ধান্যের জীবন স্বরূপ হয়, গ্রামাদি হইতে নির্গত না হইলে মানুষের জীবনসংহারক ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রাম ও নগর সকল কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূমে অবস্থিত বলিয়া জলনির্গমন অল্পাধিক উন্মুক্ত থাকে সুতরাং জলনির্গমন বন্ধ না হইলে ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখনই গ্রামাদি হইতে বর্ষাজল বহির্গত হইতে না পারিয়া আবাসভূমির আর্দ্রতা উৎপাদন করে, তখনই ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া জনপদধ্বংসনে প্রবৃত্ত হয়। কতশত সমৃদ্ধ নগরী ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শ্রীহীন ও পরিত্যক্ত হইয়াছে, বঙ্গের বিভিন্ন অংশে তাহার সাক্ষ্য বিদ্যমান। এই নিমিত্ত চরক লিখিয়াছেন—আনুপমহিতদেশানাং—অহিতজনক দেশের মধ্যে জলা ভূমি প্রধান।

ঐতিহাসিক সময়ে দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবুল-ফজল তাঁহার প্রসিদ্ধ আইনি আকবর গ্রন্থে বাঙ্গালা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, —"বাঙ্গালার বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে বর্ষাঋতু ছয়মাসেরও অধিক-কালব্যাপী। এ সময়ে উচ্চ জাঙ্গাল ব্যতীত, সমস্ত নিম্ন সমতল ভূমি জলপ্লাবিত হয়। বহুকাল ধরিয়া বর্ষাবসানে বাঙ্গালার বায়ু এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে যে, কি মানুষ কি পশু উভয়ই পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।"

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজীবের নিকট হইতে, বাঙ্গালার বাণিজ্য অধিকার লাভ করিবার কিছু কাল পরে (১৬৮৬ সালে) সুবা সায়েস্তা খাঁর শাসন কালে ফৌজদারদিগের হস্তে ইহাদের বাণিজ্যের বিস্তর ক্ষতি হয়। অনন্যোপায় হইয়া হুগলি কুটির অধ্যক্ষ জব চার্ণক সসৈন্যে ভাগিরথীর পশ্চিম তীরস্থ সুবার অধীন সমস্ত লবণ ও ধান্যের গোলা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া হিজলি পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া চার্ণক বর্ষা অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করাতে, পশ্চাদ্বর্ত্তী নবাবসৈন্যের হস্ত

হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই এক দারুণ জ্বররোগে তাঁহার অর্দ্ধভাগেরও অধিক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হইল।

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিলে যে সকল ইংরাজ যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে নগর পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন, বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ, ফল্‌তার সন্নিকটে মাস্রাজ হইতে সাহায্য প্রতীক্ষায়, তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন। সকল জাহাজই লোকপূর্ণ। বর্ষাকাল, স্থানাভাবে অনাচ্ছাদিত ডেকের উপর রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া বহুসংখ্যক লোক দিনপাত করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালে ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্মে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"গঙ্গার দুই শাখার মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালার দক্ষিণ ভূখণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রদেশ। শীঘ্র এক দূষিত জ্বররোগ সমস্ত পোতে সংক্রামিত হওয়াতে অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল।"

বাঙ্গালার স্থানবিশেষের স্বাস্থ্যহীনতা সম্বন্ধে যেরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যকর স্থানবিশেষ, কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া মারীভয় উৎপাদন করিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

যে সময়ে বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পাঠানদিগের হস্তচ্যুত হইয়া নবোদিত মোগল সাম্রাজ্যের করতলগত, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, সমৃদ্ধ গৌড়নগরও এক মহামারীর পীড়নে জনশূন্য হইয়া হিংস্রজন্তুর আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। এই মহামারীর কারণ যে ম্যালেরিয়া জ্বর, তাহা অনুমান করিবার বিশিষ্ট নিদর্শন আছে। গৌড়ের পূর্ব্ব ভাগে বিস্তীর্ণ বিল অবস্থিত থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, নগরের জল নির্গমন পথ ঐ নিম্ন জলাভূমি অভিমুখে ছিল। আইনআকবরিতে লিখিত আছে, "রাজধানী গৌড়ের পূর্ব্বদিকে যে সুন্দর গড় বিরাজিত, তাহার পূর্ব্বে বহুদ্বীপ শোভিত একটী বিস্তৃত বিল দেখা যায়। বর্ষাকালে বিলের জলবৃদ্ধি হইয়া জাঙ্গাল ভগ্ন হইলে সমস্ত নগর জলমগ্ন হইয়া থাকে।" পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নৃপতি নাসির সাহ রাজধানীর চারিদিকে উচ্চ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে জল নির্গমনের উপায় থাকাতে যদিও জলপ্লাবন সম্পূর্ণ নিবারিত হইত না কিন্তু নগরের বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হয় নাই। পরবর্ত্তী নৃপতিগণের সময় জলপ্লাবননিবারণোদ্দেশে অপর একটী জাঙ্গাল নির্ম্মিত হয়। ইহার ফলে ভূমির আর্দ্রতা

দুষ্ট হইয়া রাজধানী এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল যে, সুলেমান সা ১৫৬৫ সালে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী খাসপুর-ট্যাংরায় রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লীশ্বর আকবরের সেনাপতি মনিম খাঁ ১৫৭৫ সালে বাঙ্গলার শেষ পাঠানরাজ দাউদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া পরিত্যক্ত গৌড় নগর দর্শন মানসে তথায় আগমন করেন। গঙ্গার পশ্চিমকূলে যোজনব্যাপী সুদৃঢ়দুর্গরক্ষিত নগরের বিচিত্র হর্ম্মাবলী, মনোহর মিনারশোভিত বিবিধ উপাসনাগার, সুন্দর পান্থনিবাসাদি পূর্ব্বৈশ্বর্য্য সকল তাঁহাকে এরূপ মুগ্ধ করিল যে, তৎকালে বর্ষার আতিশয্য সত্ত্বেও পুনর্ব্বার গৌড়ে রাজধানী স্থাপনোদ্দেশে প্রজা ও সামন্ত পরিবৃত স্কন্ধাবার, সত্বর আনয়নে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সত্বরই এক ভীষণ মহামারীর আক্রমণে বিজেতা মোগলসৈন্য ও বিজিত প্রজাকুল অবসন্ন হইতে লাগিল। প্রতিদিন শত সহস্র মৃতদেহে গঙ্গাগর্ভ পূর্ণ হওয়াতে জল স্থল দূষিত হইয়া উঠিল। শাসনকর্ত্তা মনিম খাঁ ব্যাধির হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলেন না, দশদিন রোগভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপবৎ গৌড়ের সৌধাবলী ক্ষণিক আনন্দ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া চিরদিনের মত নীরব হইল।

মুসলমান রাজত্বের শেষ রাজধানী মুরশিদাবাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কাসিমবাজার, কালকাপুর, সৈদাবাদ, ফরাসডাঙ্গা, চুণাখালি, ভাটপাড়া প্রভৃতি অনেক গুলি জনপদ শতবর্ষ পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে ভাগীরথীস্রোত পশ্চিমাভিমুখী হওয়াতে ঐ সকল স্থান এখন নদী হইতে বহুদূর। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ ও আরমানি বণিকগণ, ঐ সকল স্থানে আপনাদিগের কুটি নির্ম্মাণ করিয়া রেশম ও বস্ত্রাদির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইঁহারা যেরূপ সম্পৎশালী হইতে লাগিলেন, ব্যবসাসূত্রে বহুলোক সমাগমে জনপদের আয়তনও তদ্রূপ বহুবিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। কেবল কাসিমবাজারে শতাধিক উত্তমর্ণাগার তেজারতি কার্য্যে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তৎকালে লোকে স্থানীয় ভাগীরথীস্রোতকে কাসিমবাজারের গঙ্গা বলিত। সৈদাবাদে তখন এরূপ বর্দ্ধিষ্ণু তন্তুবায়কুলের বাস যে, ক্রোশব্যাপী সংলগ্ন অট্টালিকাশ্রেণী নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিস্তৃত ছিল। প্রসিদ্ধ খাগড়াই বাসনের ব্যবসায়ে শত শত লোকের

জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যেমন ভাগীরথী নগরসীমা পরিত্যাগ করিলেন, ঐ সকল প্রাচীন নগরও ম্যালেরিয়া উৎপীড়নে জনশূন্য হইয়া গেল। এরূপ মহামারী আরম্ভ হইল যে, শবদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার অবসর ছিল না। শকট পূর্ণ করিয়া মৃত দেহ স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। গৌড়ের ধ্বংসস্মৃতি এই স্থানে পুনরায় জাগিয়া উঠে।

১৮৩৫ সালে কোম্পানি বাহাদুর ফরিদপুর হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা (ঢাকা রোড) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। অন্যূন সাত শত বন্দী এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ১৮৩৬ সালে যখন নির্ম্মাণকার্য্য মধুমতী নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত মহম্মদপুরের নিকট অগ্রসর, সহসা ম্যালেরিয়া মহামারী প্রাদুর্ভূত হওয়াতে ন্যূনাধিক দুই শত বন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্রমে ব্যাধি নিকটস্থ গ্রাম সমূহে সংক্রামিত হইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করে। এই মহম্মদপুর নগর দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভূষণার জমিদার প্রসিদ্ধ সীতারাম রায় কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রাকার বেষ্টিত দুর্গ, বিস্তীর্ণ জলাশয়, ইষ্টকে খোদিত বিচিত্র স্থাপত্য কার্য্য মণ্ডিত দেবালয় ও অট্টালিকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। কোম্পানির রাজত্বের প্রথম ভাগে ইহা ভূষণার প্রধান নগর ছিল। সাত বৎসর ব্যাপী ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে মহম্মদপুর একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমস্ত যশোহর জেলায় মহামারী ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ১৮৪৬ সালে পীড়া এরূপ ভীষণাকার ধারণ করে যে, যশোহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ক্ষেত্রপূর্ণ ধান্য, লোকাভাবে সংগৃহীত হয় নাই। এইরূপ বিশ বৎসর ধরিয়া মহামারী যশোহর জীর্ণ করিয়া নদিয়ায় প্রবেশ করে। ১৮৫৬ সালে বর্দ্ধিষ্ণু বীর নগর (উলা) ও সন্নিকটস্থ গ্রাম সকল নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরে উত্তরে হাঁসখালি দক্ষিণে চাকদহ ও পশ্চিমে শান্তিপুর লইয়া বিস্তৃত ভূভাগে, ম্যালেরিয়া বিভীষিকা সর্ব্ব সাধারণকে অভিভূত করিতে থাকে। ১৮৬৪ সালে নদিয়ার প্রধান সহর কৃষ্ণনগরে পীড়াক্রান্ত অর্দ্ধেক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এক সময়ে কৃষ্ণনগর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস এইস্থানে তাঁহার উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপে নদিয়া ও যশোহরের অনেক স্থান লোকশূন্য করিয়া মহামারী চব্বিশ পরগণার উত্তর

ভাগ অধিকার করে। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, ইছাপুর, হালিসহর প্রভৃতি জনাকীর্ণ স্থান সকল ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে উৎসন্ন হইয়া যায়। ইহার সমকালে (১৮৬৪—৬৫ সালে) ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ ত্রিবেণী, বংশবাটি (বাঁশবেড়ে), বলাগড়, সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, পূর্ব্বস্থলী, কালনা প্রভৃতি বিদ্যাসম্পৎপূর্ণ প্রাচীন নগর সকল আক্রান্ত হয়। এক সময়ে ত্রিবেণী ও গুপ্তিপাড়া, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের ন্যায়, সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইত। ত্রিবেণীতে ত্রিংশদধিক চতুষ্পাঠি বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই ত্রিবেণী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বংশবাটীতে ১২।১৪টি চতুষ্পাঠী ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এখন এই সকল স্থান নীরব ও পরিত্যক্ত, ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদি পূর্ণ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর অবলম্বন করিয়া যে ম্যালেরিয়া মহামারী হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলায় অতিমৃত্যুর বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল, এখনো তাহার বেগ সম্পূর্ণ মন্দীভূত হয় নাই। ইহার দ্বারা কিরূপ রোগ ও মৃত্যুর আধিক্য হইয়াছিল, তাহা গণনার বহির্ভূত, লেখনী বর্ণনায় অক্ষম। দ্বারবাসিনীর ন্যায় অসংখ্য গ্রাম পথে শৃগাল কুক্কুর শকুন্যাদি ভুক্ত গলিত শবদেহ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নয়নগোচর হইত। ডাক্তার ইলিয়ট লিখিয়াছেন, "চকদিঘির নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে চারি বৎসর পীড়ার আক্রমণে লোক সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট। সাধারণতঃ প্রতি গ্রামে শতকরা ৮৫ জন পীড়ায় শয্যাগত—অনেক স্থলে মৃত্যুসংখ্যা যে অর্দ্ধাংশ, তাহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক গ্রাম জনশূন্য, মহামারীর হস্ত অতিক্রম করিয়াছে এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়।" ১৯০১ সালে বাঙ্গালার লোক গণনার তত্ত্বাবধারক গেট সাহেব প্রকাশিত বিবরণীতে দেখা যায়, কেবল হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া মহামারী অন্যূন সার্দ্ধ ছয় লক্ষ মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৭২ হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত আরও লক্ষাধিক লোক এই রোগে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে হুগলি জেলায় প্রায় ষষ্ঠি সহস্র ও যশোহরে চতুর্ণবতি সহস্র লোক হ্রাস হইয়াছে। হুগলি ও যশোহরের ন্যায় নদিয়া, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ণিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি এখনো ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত

হইতেছে। অধিকাংশ স্থানে অতিমৃত্যুর আতিশয্য বশতঃ লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নাই। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা পীড়ার তেজ মন্দীভূত, কিন্তু নিঃশব্দে ও নিঃসংশয়ে ইহা ধ্বংস সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিতের জীবনীশক্তি শোষণ করিতেছে। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রতি বৎসর মোট মৃত্যুর অর্দ্ধাংশ—সংখ্যায় প্রায় দশলক্ষ—যে ম্যালেরিয়া সম্ভূত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া মহামারী বাঙ্গলার কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, উল্লিখিত বৃত্তান্ত তাহার কথঞ্চিৎ মর্ম্মাবধারণ হইবে। এক্ষণে বঙ্গে অকালমৃত্যুর অন্যান্য কারণ সকলের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

স্বামীজির পত্র।

(পূজ্যপাদ মদ্গুরু শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ অমেরিকা ইংলণ্ড ও পরিভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানাস্থানে অবস্থান কালে এ দাসকে সংস্কৃত ভাষায় অনেক চিঠি পত্র লিখিতেন। গত ১লা আশ্বিনের উদ্বোধনে স্বামীজির যে শিবস্তোত্র বাহির হইয়াছে, তাহাও তিনি ১৮৯৭ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে আল্মোড়া হইতে আমাকে লিখিয়া পাঠান। ঐ স্তবের দুই একটী স্থান বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় আমি উহা স্বামীজিকে দেখাই। তিনি বুঝাইয়া দিয়া নিজের নিকটেই তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন। অধুনা তাহা জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া স্বামীজির কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াছে। স্বামীজির হস্তাক্ষরলিখিত খামখানি এখনও আমার নিকট আছে।

স্বামীজির স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র, যাহা আমি আমার জীবনের বহুমূল্য বস্তু বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার কয়েকখানি সংস্কৃত পত্র আমি ক্রমশঃ উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। স্বামীজির সেই অতুলনীয় ভালবাসা, সেই পূর্ণ ওজস্বিতা, সেই সিংহবলদৃপ্ত অকুতোভয়তা, সেই "ত্বয়িধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ" "তবৈকান্তশুভভাবুকঃ" প্রভৃতি প্রেমব্যঞ্জক বিশেষণ প্রয়োগ স্মরণ করিলে এক মুহূর্ত্ত আর এ সব লোকে থাকিতে ইচ্ছা হয় না ; যে শ্রীপদে মন প্রাণ বিক্রীত, যে শ্রীপদের সংস্পর্শে আমার দেশকাল ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে, যে শ্রীপদে কোটিকল্পবাসও মুহূর্ত্ত বলিয়া অনুমিত হয়, সেই দেবমানবনিষেবিত চরণমূলে চিরকাল অবস্থান লাভই লেখকের চরম মোক্ষ।

স্বামীজি ইং ১৮৯৭ সালের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে এদাসকে সংস্কৃত ভাষায় যে চিঠি খানি লিখিয়াছিলেন, তাহার মূল ও বঙ্গানুবাদ অদ্য পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমান।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরং। অচলগুরোর্হিমনিমণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বং। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগত একান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাং। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্যং শ্রী১০৮ রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুম্ তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্য্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যক্ যতিষ্যসি। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নং। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদং। অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাং। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থিং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন পূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে হয়, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের হিমনিমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যত দিন না সমুদয় কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য দ্বারাই জানা যাইতেছে, তোমার পরমকল্যাণসাধিকা সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃত-কৃতার্থ ও মহাশৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগকেও উদ্ধার করিতে সম্যক্ যত্ন করিবে। চিরদিন তেজস্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে, ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহা, তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি বলিতেছে, "ভয় নাই" "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগবাসিগণের হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হউক।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

সেদিন।

—:*:—

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ;—
যেদিন এ দেহ ছাড়ি,
শোক মোহ পরিহরি,
স্বরূপে মিলিব পুনরায়।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায় ;
যবে হয়ে শ্বাস রোধ
জড় জগতের বোধ
লুপ্ত হবে পড়িয়ে ধরায় ;
জায়া পুত্র সহোদর,
সেদিনে করিবে হায় হায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

যবে কাটি মায়া ডুরী,
গুরুপদ শিরে ধরি,
ব্রহ্মলোক ভেদ করি,
উঠিব সেথায় ;
নাহি যথা দেশকাল,
মৃত্যুভয় বিকরাল,
অস্তি নাস্তি বিলুপ্ত যথায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়,
যবে গুরু অগ্রে করি,
উন্মুক্ত গগনোপরি,
গ্রহতারা লোক ছাড়ি,
উঠিব ত্বরায়।
হোয়ে আরো অগ্রসর,
গুরু শিষ্যে পরস্পর,
যবে ভেদ মিলিবে আত্মায়।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

যবে ছাড়ি ত্রিসীমা মায়ার,
ভবসিন্ধু হয়ে যাব পার।
দেশকাল ব্যবধান,
হবে যবে অন্তর্দ্ধান,
যবে হব ভূমানন্দ কায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়,
যবে বন্ধু পরিজন,
স্কন্ধে করি আরোহণ,
চিতাভূমে শোয়াবে আমায়,
ভস্ম করি নর দেহ,
ফিরিবে আপন গেহ,
নামরূপ ধুইয়ে গঙ্গায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

যবে রোগ শোকের আশ্রয়
দেহ হবে পঞ্চভূতে লয় ;
যবে চিতাপূতিধূমে,
আচ্ছন্ন করিবে ব্যোমে
হাড় মাংস খশিবে চিতায়,
অথবা কুকুর ফেরু
চিবাবে পঞ্জর মেরু
মাঠে ঘাটে কে জানে কোথায় ?
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।

মরণ যে স্বরগের দ্বার,
এ সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সার।
আত্মচক্ষু আছি জেগে,
আহিত সংস্কার বেগে,
সুখ দুঃখ, অতিদুর্নিবার,
যা হবার হোক্‌গে আমার ;
কিন্তু গুরুকৃপাবলে,
কালদণ্ড অবহেলে,
ভেঙ্গেছি,—ভেঙ্গেছি স্বর্গদ্বার ;
ত্রিকাল যে উন্মুক্ত আমার।
এবে শুধু সাবহিত,
জাতবেগ চক্রমত,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিন যায় ;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়,
যবে মুক্ত ব্যোমপ্রায়,
লভি 'অবিনাশী' কায়,
থাকিব জ্যোতিষ্ক স্বপ্রভায়,
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়
যেদিন সকল মত,
হেথাতথা বিরাজিত,
রাজিব—ঘুচিয়ে অন্তরায়,
না থাকিবে একভিন্ন,
আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন,
অহমিদমেকত্ব যথায়
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়॥

শিশুর স্বপ্ন।

সন্ধ্যা দিয়ে, সন্ধ্যা দাসী, এদিক ওদিক দেখে।
নিশার কোলে, ছেলেপুলে, দিয়ে গেল রেখে॥
ঘুমপাড়ানী, মাসীপিসী, ঘুম পাড়িয়ে গেল।
ছেলে ঘুমল, পাড়া যুড়াল, নিশা ঠাণ্ডা হোল॥
এমন সময়, একটী ছেলে, আঁৎকে কেঁদে ওঠে।
ভয় কি বাবা, কি হয়েছে, এল মাতা ছুটে॥
ঠক ঠকিয়ে, কেঁপে শিশু জড়িয়ে মাকে ধরে।
কই মা তুমি, এই যে আমি, তোমায় কোলে কোরে॥
ঘুমের ঘোরে, আমি যেন, গেছনু মা কোন্ দেশে।
সবাই সেথা, আমার বোলে, ধর্‌লে আমায় কোসে॥
ভয় পেয়ে মা, মা মা বোলে, ডাকনু কত জোরে।
শুন্‌তে কি তুই, পাস্‌নি গো মা, রইলি কেমন কোরে॥
তার পরে মা, কত জিনিষ, দিলে ভালবেসে।
কাছে এসে, কতই কথা বল্লে হেসে হেসে।
ভুলে গেলুম, তোমার কথা, তখন আদর পেয়ে।
মনে হোলো, তারাই আমার, বেড়াই নেচে গেয়ে॥
ছেলে ধরা, একটা বুড়, মস্ত গদা হাতে।
তাড়াতাড়ি, এল মাগো, আমায় যেন নিতে॥

রক্ষা কর; বলে আমি, কেঁদে হলুম সারা।
যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল, কি করি বল্ মোরা॥
এই না বোলে আমায় ফেলে, সবাই চলে গেল।
প্রাণের ভিতর, তোমার কথা, তখন মনে হোল॥
কোন্ দেশ মা, কারা তারা, এমন কেন করে?
জুজু বুড়ি, ধর্‌তে এলে, সবাই কেন সরে॥
হোহো কোরে, হেসে মাতা, বল্লেন ও সব জানি।
স্বপ্ন স্বপ্ন, ও কিছুই নয়, ঘুমাও যাদুমণি॥
ভেবনা কো, ওসব কথা, মাথা রাখ কোলে।
শুন্‌তে শুন্‌তে, অমনি খোকা, পড়্‌লো ঘুমে ঢ'লে॥

গীত।

না চাহি কাঞ্চন রমণী রতন।
অতুল বিভব নাহি আকিঞ্চন॥
সুধা কালী নাম, জপি অবিরাম
এই মনস্কাম কর মা পূরণ।
যেন এই হয় ঘুচে রিপুভয়,
অন্তে যেন পাই ও রাঙা চরণ।
দীন চারু কয়, কিছু কিছু নয়,
সার কর মন যুগল চরণ।

রামকৃষ্ণ মিশন।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আগামী ২৫ শে পৌষ ৯ই জানুয়ারি শনিবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠাদি হইবে এবং তৎপরদিন ২৬ শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারি, রবিবার তদুপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজন, সঙ্গীতাদি হইবে।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একসপ্ততিতম জন্মোৎসব

আগামী ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে সর্ব্বদেবদেবীপূজা এবং ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারি মহোৎসব হইবে।

ভেল্লোর (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি)

বিগত ১৯শে জুলাই এখানে স্বামীজির এক উৎসব হয়; তাহাতে এক সহস্রেরও অধিক কাঙ্গালী-ভোজন হইয়াছিল। গত বর্ষে এখানে স্বামীজির স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সভা হয়, তাহার প্রস্তাবানুসারে এখানকার বিদ্যালয়ে ধর্ম্মচর্চ্চায় পারদর্শিতার জন্য ছাত্রগণকে স্বামীজির নামে পুরস্কার দিবার স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই আশ্রমে রাখিয়া ৪ জন সাধুকে চিকিৎসা করা হয় এবং ১০০ জন সাধু ও ২১২ জন গরীব গৃহস্থ ঔষধ লইয়া যান। এই মাসে সহৃদয় মহোদয়গণ নিকট হইতে এক কালীন দান হিসাবে ৪৪৸৵৹ পাওয়া যায়। খরচ হইয়াছে ৪৯৷৶১০। এতদ্ব্যতীত চাল, ডাল, আটা, দুগ্ধ প্রভৃতিও সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। সহৃদয় মহোদয়গণ এই আশ্রমের স্থায়িত্ব কল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন, এই প্রার্থনা।

রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতি (সালিখা)।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার, সাধু সন্ন্যাসী ও অনাথগণের সেবা এই সমিতির উদ্দেশ্য। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ ও স্থানীয় ভদ্রলোকগণের অনুমোদনে ইহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইবে। মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদাসংগ্রহের দ্বারা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। গত ২২শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট চাল জমা ৫।৮॥০ ও নগদ ১২৭॥৶২॥০। খরচ হয় ৫৴।০ চাল ও নগদ ৪৫।২॥০। বলা বাহুল্য, কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নিঃস্বার্থ যুবকের দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রা।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

বাঙ্গালা সন ১৩০৮ সালের ১১ই আশ্বিন প্রাতে ছয়টার সময় আমি নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলযোগে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দরাবাদ হইয়া করাচী পৌছি। রেলষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া আমার কোন পরিচিত ব্যক্তির জানিত একজন বাঙ্গালীর বাটীতে উপস্থিত হই। তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্যের কথা অর্থাৎ আমি বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গু-লাজদেবী দর্শনে যাইব, এই কথা বলি এবং যে পর্য্যন্ত না কোন আখড়া হইতে হিঙ্গুলাজ দর্শনের জমায়েৎ যায়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীতে স্থান পাইব কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আনন্দের সহিত সম্মত হন এবং আমি একলা থাকা প্রযুক্ত তিনি তাঁহার নিকট আহারাদি পর্য্যন্ত করিতে বলেন। আমিও স্বীকার পাই। পরে সেখানে একটী ঘরে আপনার ব্যাগ ও বিছানা রাখিয়া স্নানাহার করিয়া একটু বিশ্রামের পর বেলা প্রায় দুইটার সময় আমি হিঙ্গুলাজের যাত্রী যে সব আখড়া হইতে যায়, সেই সকল আখড়ার সন্ধানে চলিলাম।

এক পোয়া রাস্তা গিয়া সহরের একটু প্রান্তদিকে দুটী আখড়ার নিকট পৌছিলাম। একটী বড় আখড়া ও অপরটী ছোট আখড়া—উভয়টীই পাশাপাশি—উভয়টীই দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রথমেই আমি ছোট আখ-ড়ায় প্রবেশ করিয়া শুনিলাম যে, সে আখড়ায় কতকগুলি হিঙ্গুলাজ যাইবার যাত্রী একত্র হইয়াছে। এবং দুই চারিদিন মধ্যেই জমায়েৎ, দেবী দর্শনে যাত্রা করিবে। ইহা শুনিয়া আমি ছোট আখড়ার মোহন্ত নর্ম্মদা গিরির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম।

মোহন্তজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কয়জন? আমি বলিলাম, আমি একলা মাত্র। তাহাতে তিনি বলিলেন, বেশ, পথের যাতায়াতের ২৩ দিনের আহারীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া শীঘ্র তৈয়ারী হউন। কারণ, ৩৪ দিনের মধ্যে জমায়েৎ যাইবে। তিনি আরও বলিলেন, "বাবু, সে অতি দুর্গম পথ। সে পথে যাত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে

পারে না। বিশেষ, প্রত্যেক যাত্রীকে, সে নিজে আহার করুক না করুক, প্রত্যহ ৩২ খানি রুটি (প্রত্যেক রুটি ৵৹ ছটাক আটার কম না হয়) বাঁটিতে হয়। অতএব আপনি একজন লোক সঙ্গে লইলে ভাল হয়। আর নিঃসম্বল সাধুও এখন আখড়ায় অনেক রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনকে কেবল মাত্র খাই খরচা ও আখড়ার পূজা আদি ব্যয় আন্দাজ ২১৲ টাকা দিয়া লইয়া গেলে তুমিও তৈয়ারি খাদ্য খাইতে পারিবে আর সে সাধুরও হিঙ্গুলাজ দর্শন হইবে। করাচীতে হিঙ্গুলাজ যাত্রার জন্য এত সাধু আসে যে, বাসিন্দারা আর তাহাদের সেবা যোগাইতে পারে না। কেবল জন কতক দোকানদার মিলিয়া একটি পঞ্চায়েৎ সদাব্রত খুলিয়াছে। উক্ত পঞ্চায়েতের ম্যানেজার চেলারাম শেঠ জমায়েৎ যাইবার পূর্ব্বে, আখড়ার মোহন্ত, সেই জমায়েতে যে কয়জন সাধু যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া পত্র লিখিলে প্রত্যেক সাধুকে ৴৭॥৹ সের হিসাবে আটা দেয়; ইহা ছাড়া আর কিছু মাত্র দেয় না। এই সকল কারণে যে সকল সাধুর পাঁচ ছয় টাকা পুঁজি না থাকে, তাহাদের হিঙ্গুলাজ যাওয়ার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়।"

মোহন্তের পরামর্শ আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া রামগিরি নামক একটী ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক সাধুকে সঙ্গে লইলাম এবং তাহার ও মোহন্তজীর সাহায্যে আমাদের দুই জনের ২৩ দিনের খাদ্যদ্রব্য, রসুইয়ের মসলাদি, ঠুঙ্গরার মালা, সিন্দুর, হিঙ্গুলাজদেবীর জন্য চুনরি বা উড়নি ও দেবীর পরণের জন্য আমি গৃহস্থ বলিয়া একখানি নূতন ধুতি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য খরিদ করিয়া লইলাম আর বাসন কোসন আমার কম থাকায় আখড়া হইতে মোহন্তজী আমাকে ব্যবহার করিবার জন্য দেন। এই কার্য্যে দুই দিন সময় গেল। পরে মোহন্তজীর পরামর্শানুসারে আমি উটে চড়িয়া যাইব স্থির হইল। কারণ, এই পথে উট ভিন্ন অপর কোন যান নাই। হয় পায়ে হাঁটিয়া যাও, নচেৎ পয়সা থাকিলে উটে চড়িয়া যাও।

উটের ভাড়াও দুরকম। মালবোঝাই উটের উপর একজন মাত্র লোক যায়, কিন্তু তাহাতে বসিবার কোনরূপ আসন না থাকায় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহার উপর চড়িয়া যাতাযাতের ভাড়া ৪৲ টাকা। দ্বিতীয় প্রকার এই,—একটী উটের উপর একটী খাটুলি বাঁধিয়া দেয়। খাটু-

সিটী ঠিক আমাদের দেশের ছেলেদের বেতের দোলার ন্যায় চারি দিকে আড়াল দেওয়া; তবে তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। প্রায় লম্বে ৩ হাত ও প্রস্থে ১½ হাত। উটের পিঠের কুঁজটা খাটুলির ঠিক মধ্যে থাকে। তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন লোক এমন ভাবে বসে, যাহাতে উটের পৃষ্ঠের উভয় দিকে সমান চাপ পড়ে। এইরূপ উটের প্রত্যেকের ভাড়া ৫।৵০। আর প্রত্যেক যাত্রী পদব্রজেই যাউক বা উটে চড়িয়াই যাউক, তাহাদের ঐ ২০ দিনের খাদ্যদ্রব্য ও বাসন কাপড়াদি উটে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বার আনা হিসাবে উটওয়ালাদের দিতে হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ একখানি করিয়া রুটি (আধ পোয়া আটার কম নহে) ও একটু তরকারি, যাহা রসুই হইবে, উটওয়ালাদের দিতে হয়। এ দেশের উটওয়ালাদের লুঙ্গরিয়া বলে। ইহারা বেলুচি মুসলমান, তবে সিন্ধি ভাষা বেশ জানে এবং হিন্দীও কাজচালান মত জানে। এই সকল উটওয়ালারা প্রায় প্রতি আখড়ায় আসে এবং মোহন্তের নিকট যাত্রীদের সমাচার লয়। আমি মোহন্তজীর দ্বারা উক্ত উটওয়ালাদের নিকট খাটুলিওয়ালা (করাচি ভাষায় কাজিয়াওয়ালা) উট যাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করিলাম। আমার সঙ্গী সাধু রামগিরি পদব্রজে যাইবে, স্থির হইল। এবং আমার ও রামগিরির উভয়ের দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য উটেরও ঠিক হইল। অপরাপর যাত্রীদেরও সমুদয় বন্দোবস্ত হইয়া গেল। এইরূপে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল।

ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ ১৬ই আশ্বিন বুধবার অপর পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বেলা ২৷০ টার সময় সকল যাত্রী আখড়ায় একত্র হইয়া সন্ধ্যার সময় জমায়েৎ হিঙ্গুলাজ যাত্রা করিবে, স্থির হইল। আমাদের এই জমায়েতে সর্ব্বশুদ্ধ যাত্রীর সংখ্যা ৪১ জন হইল। তাহার মধ্যে গৃহস্থ পুরুষ আমি এবং কচ্ছদেশীয় পাঁচজন ব্যক্তি। গৃহস্থ স্ত্রীলোক ৩ জন কচ্ছদেশীয় মহিলা। বাকি ৩২ জন সাধু—অধিকাংশ দশনামী সন্ন্যাসী ও অল্পমাত্র দশনামী সম্প্রদায়ের নাথপন্থীভুক্ত। আমাদের জমায়েতের সঙ্গে হিঙ্গুলাজ দেবীর পূজা করিবার জন্য এবং আখড়া হইতে ছড়ি লইয়া যাইবার জন্য পর্ব্বত গিরি নামে আগুয়া (এদেশে পাণ্ডাকে আগুয়া বলে) যাইবে, স্থির হইল। হিঙ্গুলাজের পাণ্ডা বা আগুয়ারা সকলেই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু অঘোরপন্থী। ইহারা মদ্য মাংসাদি খাইয়া থাকে, এবং জ্যোৎমার্গী।

পাঠকগণের অবগতির জন্য ছড়ির বিষয় একটু বলি। ছাড়—দেবীর প্রতিনিধি স্বরূপ। প্রত্যেক আখড়ায় তিন রকম ছড়ি আছে,—সোণার, রূপার ও কাষ্ঠের। যদি কোন সঙ্গতিপন্ন যাত্রী ৫০৲ টাকা ছড়ির পূজা দেয়, তবে জমায়েতে সোণার ছড়ি যায়, ২০৲ টাকা পূজা দিলে রূপার ছড়ি বাহির হয় ও সাধারণের জমায়েতে কাষ্ঠের ছড়ি যায়। ছড়ির আকার প্রায় ত্রিশূলের স্থায়; তাহাতে দেবীর চাঁদমালা ও জনোয়া (পৈতা) ঝুলান থাকে।

হিঙ্গুলাজ তীর্থের উৎপত্তি ও প্রকট (মাহাত্ম্য প্রচার) সম্বন্ধে সাধু ও পাণ্ডাগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা এখানে বলা আবশ্যক। দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে পর, মহাদেব যখন মৃত সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করেন, তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করায় সেই সকল দেহাংশ স্থানে স্থানে পতিত হয়, তাহাতেই সেই সকল স্থান এক এক পীঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। পীঠমালায় দেখা যায়, হিঙ্গুলায় দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়, এই স্থানের নাম হইতে দেবীর নাম হিঙ্গুলাজ হই-য়াছে। যেখানেই দেবীর কোন পীঠ, তথায়ই বিশেষ বিশেষ আখ্যাধারী ভৈরবের অধিষ্ঠান যথা, কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর। হিঙ্গুলাজ দেবীর ভৈরবের নাম কোটেশ্বর। কোটেশ্বর মহাদেব কিন্তু উক্ত দেবীপীঠের পার্শ্বে বা নিকটে নাই। উহা কচ্ছদেশে আরব সাগরের উপকূলে নারা-য়ণ সরোবরের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানকার পাণ্ডারা বলে, শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিবার জন্য মহামায়ার পূজা করেন, তখন তিনি রাবণ বিজয় হইলে হিঙ্গুলাজ দেবীর শরণ লইব, স্বীকার করেন। রাবণ বিজ-য়ের পর তিনি হিঙ্গুলাজ দেবীর শরণ লন। আগুয়ারা হিঙ্গুলাজ যাত্রার পথে রামচন্দ্রের পাণ্ডাগুরু বা আগুয়াগুরু লালগিরির সমাধি যাত্রিগণকে দেখায়।

আগুয়ারা আরও বলে, এই সকল স্থান মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত থাকায় মুসলমানগণ অতিশয় অত্যাচার করিত। সুতরাং সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন কেহই হিঙ্গুলাজ দেবীর দর্শনে যাইতে পারিত না। তখন করাচি বন্দরও হয় নাই; এমন কি, সিন্ধুর হায়দরাবাদ সহরও তখন হয় নাই। তখন করাচি হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং হায়দরাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে নগরঠেট্টা নামে এক সহর ছিল; তথায় সওয়া লক্ষ মুসলমান

সিয় থাকিত। উক্ত স্থানেকে মুসলমানেরা পূরবিয়া মক্কা বলিত এবং উক্ত স্থানের মুসলমান পিরগণ কোন হিন্দুকেই হিঙ্গুলাজ যাইতে দিত না। তবে যদি কেহ উক্ত পিরগণের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তবে তাহাকেই যাইতে দিত। পরে গুরু গোরক্ষনাথ নিজ যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়া নগরঠৈট্টা হইতে উক্ত পিরগণকে পরাস্ত করিয়া দূরীভূত করেন এবং সাধারণ হিন্দু সাধুর হিঙ্গুলাজ যাইবার পথ সুগম করিয়া দেন। কিন্তু তথাচও মুসলমানেরা সাধুদিগের প্রতি নানা অত্যাচার করিত। মুসলমানেরা পানীয়জল স্পর্শ করিয়া দিত, মুখে জোর করিয়া জল ঢালিয়া দিত, আহারীয় দ্রব্য রুটি আদি ছুঁইয়া দিত, চুটিয়া (টিকি) কাটিয়া লইত। এই জন্য এখনও অনেক সাধু হিঙ্গুলাজ দর্শন করিয়াই কোটেশ্বর যাইয়া নারায়ণ সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয় ও কোটেশ্বর মহাদেবের তপ্ত ছাপ শরীরে দেয়। তাহা না হইলে তাহাদের সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের সহিত আহারাদি করে না। পরে ইংরাজেরা সিন্ধুরাজ্য আমিরের নিকট হইতে লইলে তাহার পর হইতে মুসলমানের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে কম হইয়া গেল এবং এখন একেবারেই নাই। তবে এখনও করাচি হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ বেলুচিস্থান কালবেলা আমিরের অধিকারভুক্ত। তাহার রাজধানী বেলা এবং হিঙ্গুলাজ তীর্থস্থানও উক্ত কালবেলা আমিরের অধিকারভুক্ত। তাঁহার আজ্ঞায় উক্ত দেশের মুসলমানেরা সাধু বা যাত্রীদের উপর কোন অত্যাচার করে না, কিন্তু তাঁহার লোকেরা গৃহস্থযাত্রীদের নিকট হইতে ২৲ টাকা হিসাবে কর লয়। তবে সাধুরা আপনাদের সম্প্রদায়ের ঠিক ঠিক পরিচয় দিতে পারিলে তাহাদিগকে আর কর দিতে হয় না।

করাচি বন্দরে রেল খুলিবার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের উক্ত নগরঠৈট্টা হইতে হিঙ্গুলাজ যাইবার জমায়েৎ ছড়ি সহিত যাত্রা করিত এবং তখন নগরঠৈট্টারই সকল আখড়া ছিল, করাচিতে আখড়া ছিল না। পরে করাচিতে রেল খোলা অবধি উক্ত নগরঠৈট্টার আখড়া সকলের মোহন্তগণ যাত্রিগণের সুবিধার জন্য করাচিতে এক একটী শাখা আখড়া স্থাপন করিয়া করাচি হইতে জমায়েৎ হিঙ্গুলাজ যাত্রা করাইতে লাগিলেন। এখনও নগরঠৈট্টার প্রধান আখড়া সকল আছে এবং সেই সকল আখড়ার প্রত্যহ দেবীর উদ্দেশে পূজা হয়। এইরূপ করাচিরও প্রত্যেক শাখা

আখড়ার প্রত্যহ দেবীর উদ্দেশে পূজা হইয়া থাকে এবং তথায় একটী আলাদা ঘর আছে; সেই ঘরে দেবীর ছড়ি রক্ষিত থাকে।

করাচিতে হিঙ্গুলাজের যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বসমেত ৪টী আখড়া আছে। (১) দশনামী বড় আখড়া বা (কেবল) বড় আখড়া (২) ছোট আখড়া (৩) নাথনাজের আখড়া (৪) কাটিয়ানি মায়ির আখড়া। যখন যে আখড়ায় লোক অধিক হয়, তখন সেই আখড়া হইতে ছড়ি বাহির হয়। কখন কখন এক সঙ্গে দুই তিনটী আখড়ার ছড়ি বাহির হয়। সময়ে সময়ে কোন একটি আখড়া হইতে ছড়ি বাহির হইলে অপরাপর আখড়ায় যদি নিতান্ত কম যাত্রী থাকে, তাহা হইলে সেই যাত্রিগণকে পূর্ব্বোক্ত আখড়াভুক্ত করিয়া দেয়। ২৫।৩০ জন যাত্রী একত্র না হইলে জমায়েৎ বাহির হয় না। কারণ, পথে বড়ই দস্যুভয় আছে। দস্যুরা মধ্যে মধ্যে অসদাদি লুণ্ঠন করিয়া লয়। এই জন্য উটওয়ালাদের নিকট জলওয়ার থাকে। করাচি হইতে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাস এবং ওদিকে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস প্রায়ই কোন না কোন আখড়া হইতে দশ বার দিন অন্তর ছড়ি বাহির হয়। এই সময়েই হিঙ্গুলাজের যাত্রায় যাইবার বিশেষ সুবিধা। সুতরাং এই সময়েই যাত্রীর সংখ্যাও অধিক হয়। যাঁহারা হিঙ্গুলাজ দর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের এই সময়েই যাওয়া উচিত, কারণ, হিঙ্গুলাজের কোনরূপ বাঁধা রাস্তা বা রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেবল মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। তৃণাদি কিছুই নাই, তবে স্থানে স্থানে আগাছা জন্মায়, যেমন রাজপুতনার মরুভূমি। অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্মের সময় মরুভূমির বালুকা অতিশয় শীতল বা উত্তপ্ত হওয়ায় যাইবার বিশেষ কষ্ট হয়। সে সময়ে এক মাস দেড় মাস অন্তর জমায়েৎ যাইয়া থাকে এবং যাত্রীদেরও বিশেষ কষ্ট হয়। দু এক বৎসর অন্তর সিন্ধু ও কাঠিওয়াড়ের ধনী ব্যক্তিগণ মিলিয়া যাত্রা করেন। সে জমায়েতে প্রায় ১৫০০ লোক হয়। ইহাকে সুখযাত্রা কহে। এই সুখযাত্রার সহিত অনেক সাধু বিনা খরচায় ধনী যাত্রীদের নিকট ভিক্ষা করিতে করিতে যায়। ইহাতে তাঁবু পর্য্যন্ত থাকে। আমি যে সময়ে যাই, তখন কাঠিওয়াড়ে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সুখযাত্রা বন্ধ ছিল।

পশ্চিম ভারতের সাধুমাত্রেই, বিশেষ, দশনামী সম্প্রদায়, হিঙ্গুলাজ দর্শনে

যাওয়া তাহাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে যে, 'আসল গোঁসাই হোকে জরুর হিঙ্গুলাজ দর্শন চাহিয়ে, নেই ত ও গোঁসাই কেয়া", আওর গৃহস্থ ভি হিঙ্গুলাজদর্শনসে আধি গোঁসাই হো যায়।"

১৬ই আশ্বিন আমি সেই পূর্ব্বকথিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বাটীতে দুপুর বেলা আহারাদি করিয়া ছোট আখড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। সঙ্গে খালি দুখানি কম্বল ও একটি পট্টুর গরম কাপড়ের কোট, সাদা জামা ও কাপড় দুচারখানি লইয়াছিলাম। আমার রসুইএর বাসনাদি আখড়াওয়ালা দিয়াছিল। আখড়ায় আসিয়া দেখিলাম, আমার মোট আমার সঙ্গী রামগিরি পূর্ব্বেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে বেলা ৩।৪ টার সময় উটওয়ালারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জমায়েতের সাধু বা আওয়া আসিল। দেবীর উদ্দেশে যে ঘরে নিত্য পূজা হয় এবং যেখানে ছড়ি থাকে, সেই ঘর খোলা হইল। আখড়ার মোহন্ত, আমি গৃহস্থযাত্রী বলিয়া আমার নিকট হইতে ভাণ্ডারা অর্থাৎ গেরুয়া বস্ত্র ধারণের জন্য ১।০ দেবীর পূজা লইল এবং একখানি গেরুয়া বস্ত্র দেবীর ঘর হইতে বাহির করিয়া—আমাকে ধারণ করিতে দিল। কারণ, এই জমায়েতে কি সাধু, কি গৃহস্থ, সকলকেই গেরুয়া ব্যবহার করিতে হয়। তবে গৃহস্থেরা করাচিতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দেবীর পূজা ১০ দিয়া গেরুয়া খুলিয়া ফেলে। আমি সেই গেরুয়া কাপড়খানি মাথায় পাগড়ী করিয়া লইলাম। এইরূপ অপরাপর গৃহস্থ যাত্রীদের গেরুয়া ধারণ হইল। জমায়েতে যে ছড়িটি বাহির হইবে, তাহার পূজার জন্য প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে অবস্থানুসারে /৫, ৫/৮, ১।০, ৫৲ হিসাবে আদায় করা হইল। তাহার পরে ছড়ির আরতি ও পূজা হইলে মহাদেব ও পার্ব্বতীর স্তোত্রপাঠ হইল। তখন প্রত্যেক যাত্রী উক্ত ছড়িকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও প্রণাম করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় ৫টা হইয়াছে। আর এক ঘণ্টা দিন আছে। এই-বার উটওয়ালারা সকল মোট উটে বোঝাই দিতে ও উটের পৃষ্ঠে বসি-বার কাঠের কাজিয়া বাঁধিতে প্রস্তুত হইল। এইরূপে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন আমরা 'হিঙ্গুলাজ মাতাকি জয়' বলিয়া উটে উঠিলাম।

আমি ও মৌনী বাবা নামে একজন দুই পা খোঁড়া মৌনব্রত অবলম্বী সাধু একত্রে একটী উটের পৃষ্ঠে বাঁধা কাজিয়ার পাশাপাশি বসিলাম। আর একটী কাজিয়াবাঁধা উটে, আর দুইজন সাধু উঠিলেন। অপর

চারিটী মালবোঝাই উটের উপর আর ৪ জন সাধু চড়িলেন ও আর ৩টী উট খালি মাল লইয়া চলিল। সর্ব্ব প্রথমে আগুয়া ছড়ি হস্তে দাঁড়াইল এবং পরে পদাতিক যাত্রীরা কেহ উটের অগ্রে ছড়ির সঙ্গে, কেহ বা উটের পশ্চাতে একত্র হইল। এমন সময় আখড়ার মোহন্ত নর্ম্মদা গিরি —একখানি কাগজে এই জমায়েতে ৪১ জন লোক যাইতেছে, ইহা লিখিয়া এবং উহা আখড়ার মোহরাঙ্কিত করিয়া একখানি পাশ আমার হাতে দিল এবং বলিয়া দিল যে, পথে কালবেলা আমিরের চৌকিঘরে এই পাশ দিবেন। আমি পাশখানি কোটের পকেটে রাখিয়া দিলাম। এমন সময় ছড়িধারী আগুয়া 'হিঙ্গুলাজ মায়ীকি জয়' বলিয়া যাত্রা করিল। সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে ও উটে চড়িয়া যাত্রিগণ চলিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা সহরের বাহির হইয়া একটী রাস্তা দিয়া পশ্চিম মুখে করাচীর সমুদ্র-কূলের লাইট হাউসের আলো দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ৮।১০ মাইল পরে আর রাস্তা ভাল নাই। এক্ষণে ময়দানের উপর দিয়া যাইতে হইল। পথে মাঝে মাঝে যাত্রীরা তামাক সাজিতেছে এবং উটের উপর আমাদিগকেও এক একবার ছিলাম খাইতে দিতেছে। আমার নিজের কাছে বিঁড়ি চুরুট ছিল, মধ্যে মধ্যে খাইতেছি। এইরূপে রাত্রি প্রায় একটার সময় হাব নদী পড়াওএ (Halting-Place—বিশ্রামস্থান) পৌঁছিলাম। হিঙ্গুলাজের রাস্তায় পড়াও-গুলিতে কোনরূপ দোকান কিম্বা লোকজন কিম্বা চালাদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র একটী কূপ বা নদী থাকিলেই হইল। আশ পাশে দুচারিটী বৃক্ষ পাইলে তাহার ছায়ায় দিনমানে যাত্রিগণ বিশ্রাম করে, এই মাত্র; কারণ, রাত্রিতেই এ পথে যাত্রীরা চলে। দিনে মরুভূমির বালি উত্তপ্ত হয় বলিয়া তখন বিশ্রাম করে। রাত্রটুকু কম্বল বিছাইয়া মাঠে পড়িয়া রহিলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখি, সম্মুখে হাব নদী। খুব অল্পই চওড়া। গভীরতা কোথাও এক হাত, কোথাও তিন পোয়া মাত্র। যাহা হউক, এই নদীতে স্নানাদি করিবার পর পাড়ে রসুইয়ের আয়োজন রামগিরি করিতে লাগিল। ছোট ছোট শুষ্ক আগাছা মাঠে পাওয়া যায়; তাহাতেই জ্বালানি কাঠের কার্য্য চলিয়া যায়। চারিদিকে যাত্রীরা রসুই করিতেছে। মধ্যস্থলে একটী বৃক্ষের নীচে হিঙ্গুলাজের ছড়ির আসন হইয়াছে। আগুয়া আমাদিগকে সেইখানে একত্র হইতে বলিলেন। আমরা অনেকে সেখানে একত্র হইলে আগুয়া আমার সহ-

তীর্থযাত্রী মৌনী বাবাকে এই জমায়েতের মোহন্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মৌনীবাবা অস্বীকৃত হওয়ার এৎবার নাথ নামে একজন দর্শনী অর্থাৎ খুব জটাজুটধারী সাধুকে জমায়েতের সম্মতিক্রমে মোহন্ত করা হইল। আমার সঙ্গী রামগিরিকে জমায়েতের ভাণ্ডারী ও সর্বদাগিরি নামে একজন ছোক্‌রা সাধুকে কোতোয়াল নিযুক্ত করা হইল। এই সকল স্থির হইয়া গেলে আওয়া সকলকে বলিয়া দিলেন; এই জমায়েতের মধ্যে যাহার কোন দোষ হইবে, উক্ত এৎবার নাথ মোহন্ত তাহার দণ্ড দিবেন এবং তাঁহার হুকুম সকলকে মান্য করিতে হইবে ও তাঁহার আজ্ঞামত জমায়েৎ যাত্রা করিবে। যদি কোন যাত্রী ভাণ্ডারা দেন ত, রামগিরি ভাণ্ডারী তাহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং যাত্রীদের মধ্যে কেহ অভুক্ত থাকিলে সে তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আর কোতোয়াল কোতোয়ালী অর্থাৎ যাত্রীদের রক্ষা করিবে। কোন ব্যক্তি ছড়ির সহিত এক সঙ্গে যাত্রা করিয়া ছড়ির অগ্রে চলিতে পারিবে না। প্রত্যেক যাত্রীর রসুই হইলে যাহা রসুই হইয়াছে, তাহার একটু একটু সকল দ্রব্য ছড়ির ভোগ লাগাইয়া তবে আহার করিতে পারিবে। রাত্রে ছড়ির আরতির সময় সকল যাত্রীকে ছড়ির নিকট একত্র হইতে হইবে। আরতির পর সকলে যে যাহার আসনে চলিয়া যাইবে। তাহার পর ক্রমান্বয়ে এক এক জন যাত্রীকে আসন হইতে উঠিয়া সকল যাত্রীর আসনের নিকট যাইয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া আসিতে হইবে। ইহাতে সাধু গৃহস্থ প্রভেদ নাই, সকলের সমান অধিকার। ইহারা বলে, জমায়েতে 'লাখি খাকি বরাবর।'

এই স্থানে উক্ত গাছতলায় একটী পাথর পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে বাটিয়া ভৈরব বলে। রসুইএর সময় প্রত্যেক যাত্রী ৫।৭ টী আটার ছোট বাতাসার ন্যায় বাটী তৈয়ার করিয়া পোড়াইয়া রাখে। আহারীয় প্রস্তুত হইলে সমুদয় দ্রব্যের কিছু কিছু লইয়া রামগিরি ছড়ির ভোগ দিয়া আসিল এবং উক্ত কয়েকটী বাটী ও একটু চিনি লইয়া বাটিয়া ভৈরবের ভোগ দিল। পরে পাণ্ডার বা আগুয়ার একখানা হিসাবে দুই জনের আধপোয়া আটার দুইখানি রুটি ও কিছু ডাল তরকারি আগুয়াকে দিল। এবং উক্ত আগুয়ার কাছে একখানা হিসাবে দুইজনের দুইখানা রুটি ও কিছু তরকারি নিম্পুরী (প্রত্যেক জমায়েতের সঙ্গে ২।৩

জন নিঃসম্বল সাধু যাত্রীদের সঙ্গে থাইয়া যায়; তাহাদিগকে নিস্পুরী কহে) জন্য দিয়া আসিল। এবং ঐরূপ একখানা হিসাবে আধপোয়া আটার দুইখানা রুটি ও তরকারি উটওয়ালা লুন্দরিক্ষাদের দিয়া আসিল। পরে অর্দ্ধখানা হিসাবে দুইজনের একখানা রুটি কুয়াওয়ালাদের (এখানে কুয়াওয়ালা না থাকায় উটওয়ালারা রুটি নেয়।) জন্য দিয়া আসিল। এইরূপে ৩॥॰ খানা হিসাবে রুটি যাত্রীদের বাঁটিতে হয়। পরে রাত্রির জন্য খানকতক রুটি ও তরকারি রাখিয়া দিয়া (কারণ, এই পথে রসুই-এর বিশেষ অসুবিধার জন্য কেহই ছুইবার বসুই করে না) আমরা সমস্ত ভাত ও দুই একখানা রুটি দুপুর বেলা আহার করিয়া উক্ত গাছ-তলার ছায়াতে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া আরাম করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে হাত মুখ ধুইয়া ছড়ির নিকট একত্র হইলাম এবং ছড়ির আরতির পর 'জয় শিব জয় শিব ওঙ্কারা' প্রভৃতি মহাদেবের স্তোত্র ভজনাদি গাহিয়া যে যাহার আসনে আসিলাম এবং পরে পালা ক্রমে পরস্পরের আসনে যাইয়া দণ্ডবৎ করিয়া আসিলাম। তাহার পর সেই সঞ্চিত রুটি খাইয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রে একজন উটওয়ালা জাগিয়া পাহারা দেয় এবং রাত্রের সময় অনুমান করিয়া যাত্রীদের উঠাইয়া দেয়। কারণ, উহারা রাত্রে এমন সময় উট ছাড়ে, যাহাতে উট সকল ঠিক প্রাতে ৭টার মধ্যে পরবর্ত্তী পড়াওয়ে পৌছিতে পারে। সেই দিন অর্থাৎ ১৭ই আশ্বিন রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমাদিগকে জাগাইয়া দিল। এবং পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় জমায়েৎ ও উট ছড়ির সহিত উক্ত হাবনদী পার হইয়া চলিতে লাগিল। পথে মধ্যে মধ্যে জয়কার উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। খানিক পথে সাক্ষী গুরুদেবতা নামক একস্থানে দর্শন করিয়া প্রাতে ৬টার সময় পকোড়াওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ছয় মাইল মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হিঙ্গুলাজের পথে কোন রাস্তা বা রাস্তার চিহ্ন নাই, তবে উট সকল আন্দাজে আন্দাজে ঠিক পরবর্ত্তী পড়াওয়ে লইয়া যায় এবং পাণ্ডা বা আগুয়ারাও আন্দাজে আন্দাজে ঠিক পথ চিনিয়া যায়। এই জন্য হিঙ্গুলাজের রাস্তাকে পাণ্ডারা 'আক্কেলপন্থা' বলে। যদি কদাচিৎ পথ ভুল হইয়া যায় বা পথে পিপাসা পায়, সে কারণ প্রত্যেক যাত্রী (পদাতিক ও উটযাত্রী সকলেই) এক একটী কুঁজো

জল ভরিয়া সঙ্গে রাখে। রাস্তা ভুল হইলে এক আধদিন জল খাইয়া হাঁটিতে থাকিতে পারা যাইবে বলিয়া। কিন্তু পথ প্রায় ভুল হয় না।

১৮ই আশ্বিন প্রাতে পকোড়িওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তথায় একটী মাত্র কুয়া আছে। বড় বৃক্ষাদি একটীও নাই। আমরা সেই কুয়ার জলে স্নান করিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় রসুই করিয়া ছড়ির ভোগ দিয়া ৩৷৷০ খানা হিসাবে ৭ খানা রুটি বাঁটিলাম। এখানে প্রায় ১ মাইল দূর হইতে একজন মুসলমান আসিয়া কুয়ার দরুণ রুটি লইয়া গেল। সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে বালি উঠাইয়া উক্ত কুয়াকে জলপূর্ণ রাখে। পরে আহারাদি করিয়া লাঠির সাহায্যে কাপড়াদি দিয়া একটু ছায়া করিয়া কম্বল বিছাইয়া বিশ্রাম করিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বদিনের মত হাত মুখ ধুইয়া ছড়ির নিকট একত্র হইয়া আরতি দর্শন ও ভজনাদি করিয়া এবং পালাক্রমে সকলকে দণ্ডবৎ করিয়া আসিয়া রাত্রে দুপুর বেলার রাঁধা রুটি খাইয়া শয়ন করিলাম। পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় একজন উটওয়ালা পাহারা দিতে লাগিল।

এই স্থানে উটওয়ালাদের কার্য্যবিবরণ একটু বলি। আমাদের সঙ্গে ৪জন উটওয়ালা ছিল। যে ব্যক্তি রাত্রে জাগিয়া পাহারা দিত, সে জমায়েৎ যাত্রা করিলেই একটী মাল বোঝাই উটের উপর শুইয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইত। এবং অপর তিনজন উট চালাইয়া লইয়া যাইত। প্রাতে পড়াওয়ে পৌঁছিয়াই ঐ তিনজনের মধ্যে একজন উট-ওয়ালা পাঁচ সাত খানা বাসি রুটি সঙ্গে লইয়া এবং মাল খোলসা করিয়া দিয়া উটগুলিকে লইয়া চরাইতে যাইত। ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে কাঁটা গাছ পালা উটেরা খাইত এবং সেই উটওয়ালা কতক গাছপালা কাটিয়া উটের পিঠে বোঝাই দিয়া বৈকালে উট ফিরাইয়া আনিত আর উক্ত বোঝাই গাছপালা উটেরা রাত্রে খাইত। আর দিনমানে অপর তিনজন উটওয়ালা পড়িয়া ঘুমাইত। ফের সন্ধ্যা হইলে যে উট চরাইতে গিয়াছিল, সে ঘুমাইবে। আর যাহারা দিনে ঘুমাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন রাত্রে পাহারা দিবে। উটওয়ালারা যাত্রার সময় কেহ কেহ উটের উপর শুইয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা এমনি দুষ্ট যে, আমরা পয়সা দিয়া উটে চড়িয়াছি, আমাদিগকে উটের উপর একটু শুইতে দিবে না।

সে দিন রাত্রি দশটার সময় জমায়েৎ যাত্রা করিল এবং পথে গুল্ম-

ধনওয়ালা হনুমানজী দর্শন করিয়া ও রামনালা নামে দুইটী বালিয়াড়ির টিলার মধ্যবর্ত্তী পথ পার হইয়া সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় কিছু দূর গিয়া খেজুরীওয়ালী বা চৌকীওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ২০ মাইল।

১৯ শে আশ্বিন এখান হইতে যাত্রা করিয়া ইংরাজরাজের সীমানা শেষ হইয়া কালবেলা আমীরের সীমানায় পড়িলাম। এই সীমানায় আমীরের চৌকী বা পাহারাঘর আছে। তাহার পার্শ্বেই এক কুয়া। রসুইয়ের পর আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। পথে চৌউয়া নামে একরকম বড় ছারপোকার ন্যায় কীট আছে। ইহারা বালির মধ্যে থাকে এবং মনুষ্যের রক্ত খায়। ইহাদের উৎপাত এখানে কিছু বেশী। বৈকালে উঠিয়া চৌকীর জমাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং আগুয়া আমার নিকট হইতে আখড়ার সেই পাশখানি লইয়া জমাদারকে দিলেন। তিনি তাহার পৃষ্ঠে কি নিশানি করিয়া পুনরায় পাশখানি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং একজন চৌকীদারকে বলিয়া রাখিলেন যে, রাত্রে যখন ইহারা যাইবে, তখন ৪১ জন যাত্রী গুণিয়া তবে ছাড়িয়া দিবে। রাত্রে ছড়ির আরতির পর শয়ন করিলাম ও রাত্রি প্রায় ১টার সময় রওনা হইলাম। চৌকীদার রাত্রে সতর্ক ছিল। সে ৪১ জন যাত্রী গুণিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। আমরা প্রাতে আম্বাওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ৮মাইল মাত্র।

২০ শে আশ্বিন—এই স্থানে একটী আমবাগান আছে। এই জন্য ইহার নাম আম্বাওয়ালী। ইহার নিকটেই রামচন্দ্রের আগুয়া গুরু লালগিরির সমাজ। এখানে ২।৩টী কূয়া আছে। আমার শরীরটা দুইদিন যাবৎ ভার ভার হইয়াছে। হিংলাজের পথে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দিনের বেলা খুব গরম, কিন্তু রাত্রে বেশ শীত—গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। রাত্রি ২টায় রওনা হইয়া পথে খাড়ি নদী নামে একটা জলশূন্য খাদ পার হইয়া প্রাতে সোনমেয়ানি সহরের বাহিরে একটী বাগানে পৌঁছিয়া আড্ডা রহিলাম। পথ ছয় মাইল মাত্র।

২১ শে আশ্বিন।—আজ শরীর সুস্থ থাকায় কুয়ার জলে স্নান করিয়া আগুয়ার সহিত সোনমেয়ানি সহর বেড়াইতে গেলাম। এখানে পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, সরকারী ডাক বাঙ্গালা প্রভৃতি সকলই আছে;

কিন্তু আমীরের। সহরে বিস্তর দোকানী পসারী হিন্দু বেনিয়া ও ক্ষত্রিয়ের বাস, প্রায় ৫০।৬০ ঘর হইবে। দশনামী সম্প্রদায়ের একটী ভারতীর ও একটী গিরির দুইটী আখড়া আছে। কালবেলা আমীরের একজন মুন্সী এই স্থানে গৃহস্থ যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। আমরা দুই আখড়ায় দেখাশুনা করিয়া এবং বাজারে হিন্দুর দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন, দধি, তরমুজ, খরমুজাদি খরিদ করিয়া বাগানে ফিরিয়া আসিলাম। এই সহরের প্রায় সকল বাটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত; ছাদ পর্য্যন্ত তাই। কারণ, এ দেশে বৃষ্টি খুব কম হয়। এখানকার হিন্দুদের পরিচ্ছদাদি সমুদয় মুসলমানের ন্যায়। হিন্দুর ঘরে মুসলমান চাকরই কূয়া হইতে জল আনিতেছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে হিন্দুমুসলমান বাছিয়া লওয়া কঠিন। পুরুষ মানুষের উপবীত থাকায় হিন্দু বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু ইহারা হিন্দুদের সব ক্রিয়া কর্ম্ম করে। এই সময় অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধের জন্য এখানে হিন্দুদের মধ্যে খুব ধুম চলিতেছে।

আজ আমাদের জমায়েতের সাধুদের মধ্যে সকলেই মহাব্যস্ত, কারণ, এখানে সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে না পারিলে কর লাগিবে। সেই জন্য প্রবীণ সাধুরা ছোকরাদিগকে শিখাইতেছে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছে। যাহা হউক, বেলা ৪ চার সময় আমীরের মুন্সি, পোষ্টমাষ্টার ও ভারতীর আখড়ার মোহন্তকে সঙ্গে লইয়া আমাদের নিকট আসিল। ভারতীর আখড়ার মোহন্ত, সাধুদের পরিচয় লইতে লাগিল, কেবল ৭।৮ জন দর্শনী সাধু ছিল, তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। সকলকেই রেহাই দিল, কেবল ২ জন সাধু কিছু পরিচয় দিতে না পারায় তাহাদের নিকট হইতে ২ টাকা হিসাবে কর নিল। আমরা কয়জন গৃহস্থ ২ টাকা হিসাবে কর দিলাম। করের টাকা মুন্সিজী খাতায় জমা করিয়া লইল ও টাকা লইয়া চলিয়া গেল। এই সহরে মদের ভাঁটি থাকায় দেবীর পূজার জন্য এক বোতল মদ আওয়া খরিদ করিয়া লইল। এখানে গাঁজা ৫০ পয়সা তোলা হিসাবে পাওয়া যায় বলিয়া প্রত্যেক সাধুই কিছু কিছু গাঁজা খরিদ করিয়া লইল। এখান হইতে রাত্রি ১১ টার সময় রওনা হইয়া সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রের কিনারায় বিস্তর নৌকা রহিয়াছে। এই স্থানে সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া তাহার ঘি বাহির করে। এই ঘি প্রস্তুতের কারখানা সমুদ্রের

ধারে ৪।৫ টী দেখিলাম। রাত্রেও কারখানার কাজ চলিতেছে। পথে গুরু-চেলার সমাজ দেখিয়া প্রাতে আটটার সময় কোয়লেওয়ালী পড়াওয়ে পেঁছি-লাম। পথ ২৪ মাইল। এখানকার কূয়ার জল বড়ই খারী অর্থাৎ নোনতা।

২২ শে আশ্বিন—দুপুর বেলা ভয়ানক বাতাস চলিতে লাগিল। আমরা আহারাদি করিয়া লইয়াছিলাম, তাই রক্ষা, নচেৎ সমুদয় ধূলিতে ভরিয়া যাইত। এমন কি, কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি, কিন্তু কাপড়ের উপর এক আঙ্গুল পুরু ধূলা জমিতেছে। বৈকালে ঝড় থামিয়া গেল এবং এখন হইতে প্রত্যহ বেশী পথ হাঁটিতে হইবে বলিয়া আগুয়া ছড়ি ও পদাতিক যাত্রী লইয়া বেলা ৪ টার সময় যাত্রা করিল। তাহারা কতক পথ হাঁটিয়া পথে বিশ্রাম করিবে এবং ভোর রাত্রে উঠিয়া আমাদের পরের পড়াওয়ে পৌছিবে। আমরা উটের যাত্রী ৮ জন ও উটওয়ালা ৪ জন পড়িয়া রহিলাম। আজ ছড়ি চলিয়া যাওয়ায় ছড়ির আরতি বা দণ্ডবৎ নাই। আমরা সন্ধ্যার পর জল টল খাইয়া শয়ন করিলাম। পরে রাত্রি একটায় আমরা উটে রওনা হইয়া প্রাতে ৭ টার সময়—ভাব্বা-ওয়ালী পড়াওয়ে পৌছিলাম। পথ ১৬ মাইল।

২৩শে আশ্বিন—আজ রামগিরির জ্বরের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু তত্রাচ সে রসুই ও আহারাদি করিল এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় বৈকাল ৪ টার সময় আগুয়ার সঙ্গে হাঁটা যাত্রীদের সহিত চলিয়া গেল। আমরা রাত্রি ২ টায় রওনা হইয়া প্রাতে মঙ্গলওয়ালী পড়াওয়ে পৌছিলাম। পথ ১৪ মাইল।

২৪ শে আশ্বিন। এই স্থানে আজ হিঙ্গুলাজ দর্শন করিয়া ফেরত এক জমায়েতের সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদের দলের লোকসংখ্যা ৬৪ জন ও সঙ্গে ৪টী ছড়ি। অদ্য তাহাদের সঙ্গে একত্রে খুব আনন্দ হইল। আজ রামগিরি বলিল, জ্বর কমিয়াছে ও রসুই করিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করিল। কিন্তু বৈকালে পদাতিক যাত্রী যখন যাত্রা করিল, তখন তাহার খুব জ্বর। সেই জন্য আমি তাহাকে হাঁটিতে নিষেধ করিলাম এবং উটওয়ালাদিগকে আজকার মত তাহাকে উটের উপর বসাইয়া লইতে বলিলাম। তাহারা বলিল, খুজরা উট ভাড়া করিলে, পড়াও প্রতি ।০ আনা এই দস্তর'। আমিও স্বীকার করিলাম। রাত্রি একটায় রওনা হইলাম। রামগিরিকে একটী মালবোঝাই উটের উপর বসাইয়া দিল। প্রাতে আট-টার সময় কাণ্ডেওয়ালী পড়াওয়ে পৌছিলাম। পথ ১৮ মাইল।

২৫শে আশ্বিন।—আজ রামগিরির অত্যন্ত অসুখ থাকায় নর্ম্মদা পুরী নামে একটী সাধু আমার নিজের ও ৭ খানি রুটি বাঁটিবার আটা ও তরকারি লইয়া তৈয়ারি করিয়া দিল। রামগিরির অসুখ হইয়াছে বলিয়া তাহার হিস্যার রুটি বাঁটা বন্ধ হইবে না। আজও রামগিরির জন্য উটের বন্দোবস্ত করিলাম। আগামী কল্য ৺ চন্দ্রকূপ স্বামীর স্থান আসিবে। তজ্জন্য আজ রাত্রে তাঁহার ভোগের রুটি বা রোট তৈয়ারি হইবে। অতএব প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এক পোয়া আটা ও কিছু কিছু গুড় সংগ্রহ করিয়া লইয়া আগুয়া বেলা ৩টার সময় পদাতিক যাত্রী লইয়া চলিয়া গেল। আমরা রাত্রি এগারটার সময় যাত্রা করিয়া প্রায় দশ মাইল গিয়া দেখি, একটী শুষ্ক নদীর ধারে কুয়ার নিকট পদাতিক যাত্রীরা চন্দ্রকূপ স্বামীর রোট বানাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। এই স্থান হইতে সকলে একত্র হইয়া প্রাতে ৬টার সময় ত্রিলোকীপুরী পড়াওয়ে পৌছিলাম। পথ ১৬ মাইল।

২৬শে আশ্বিন।—আজ আমরা এইখানে কুয়ায় স্নান করিয়া এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে চন্দ্রকূপ দেখিতে চলিলাম। কাছে গিয়া দেখি, একটী ৭০।৮০ হাত উচ্চ মাটির পর্ব্বত। উপরে উঠিয়া দেখি, পর্ব্বতের উপর ৩০।৩২ হস্ত পরিধি একটী গর্ত্ত রহিয়াছে; কিন্তু উহা জলে ও বেলে মাটিতে উপরাবধি পরিপূর্ণ এবং মধ্য স্থানে নীচ হইতে যেন একটা শক্তি দ্বারা কখন একটা, কখন পাঁচ সাতটা এইরূপ হিসাবে নানা আকারের গোলা ৮।১০ আঙ্গুল উঠিয়া ফের ভিতরে ডুবিয়া যাইতেছে। এই স্থানে প্রত্যেক যাত্রী একটী একটী নূতন ছিলামে গাঁজা, চরস প্রভৃতি সাজিয়া আগুন চড়াইয়া চন্দ্রকূপ স্বামীকে দিতেছে এবং পয়সা দিতেছে। আগুয়া ঐ পয়সা ও ছিলাম লইয়া নিবেদন করিয়া নিজে একবার টানিয়া যাত্রীদের প্রসাদ দিতেছে এবং বলিতেছে, চন্দ্রকূপ স্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শন যে ব্যক্তি যত গোলায় দর্শন চায়, এই দেখ, চন্দ্রকূপ স্বামী তত গোলায় দর্শন দিতেছেন। যাহা হউক, গাঁজা চড়ানোর পরে সেই পূর্ব্বরাত্রে প্রস্তুত রোট ভোগ দেওয়া হইল এবং আমরা তিন জন যাত্রী নেপালের পশুপতিনাথে এই চন্দ্রকূপ স্বামীর গোলা চড়াইবার জন্য আগুয়ার নিকট গোলা প্রার্থনা করিলাম। কারণ, যেমন গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বর সেতুবন্ধে চড়াইলে বিশেষ ফল, সেইরূপ হিঙ্গু-

লাজের পথস্থ চন্দ্রকূপ স্বামীর গোলা পশুপতিনাথে চড়াইলে বিশেষ ফল হয়। আমাদের প্রার্থনায় আ ওয়া ঐ কূপের ধারের মৃত্তিকা উঠাইয়া তিনটী ছোট ছোট মাটীর মহাদেবের ন্যায় করিয়া আমাদের বলিল, তোমরা কয়দিন মধ্যে নেপালে পশুপতিনাথে গোলা চড়াইবে, তাহা অঙ্গীকার করিয়া লও। আমরা সমস্ত অঙ্গীকার করিলে আওয়া আমাদের হাতে গোলা দিল এবং বলিয়া দিল, এই গোলা যে পর্য্যন্ত না পশুপতিনাথে চড়ান হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ধূপ দিতে হইবে আর প্রতি সোমবারে দুগ্ধে স্নান করাইতে হইবে। চন্দ্রকূপ হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা ত্রিলোকীপুরীতে প্রায় ১১টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। আজও রামগিরির জ্বর থাকায় আমার আহারাদি মৌনী বাবা তৈয়ার করিয়া দিল। আহারাদি করিতে প্রায় ২টা হইল। বেলা ৪টার সময় আওয়ার সহিত রামগিরিও চলিয়া গেল। বলিল, আমি আজ হাঁটিতে পারিব। আমরা রাত্রি ১১টার সময় রওনা হইয়া প্রাতে হিঙ্গুল পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ২২মাইল।

২৭শে আশ্বিন।—এখানে শুনিলাম যে, এই সব উট ও মাল এই স্থানে থাকিবে। কেবল মাত্র যে সকল উটের সওয়ারি আছে, তাহাদিগকে এবং ৩।৪ দিনের আহারীয় দ্রব্য ও সামান্য বাসনাদি আগেকার পড়াও অবধি পৌঁছিয়া দিবে। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালীন এই স্থানে উট পাওয়া যাইবে। আমরা আহারাদি করিয়া ৩।৪ দিনের মত আটা প্রভৃতি বড় মোট হইতে বাহির করিয়া লইয়া এবং রন্ধনের বাসনাদি একত্রে বাঁধিয়া একটা ছোট মোট করিলাম আর সকল যাত্রীর বড় মোট সকল এই স্থানে তালা দিয়া শিল মোহর করা হইল, নচেৎ উটওয়ালারা মোট বাহির করিয়া লইতে পারে। এইরূপে ছোট মোট ও বড় মোট পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া পদাতিক যাত্রীরা ৫টার সময় চলিয়া গেল। কেবল আমরা রহিলাম। আজ রামগিরিও বেশ সুস্থ হইয়াছে। রাত্রি ১টার সময় ছোট মোট গুলি উটে বোঝাই দিয়া এবং উক্ত স্থানে বড় মোট গুলির উপর দুইজন উটওয়ালাকে পাহারায় রাখিয়া আর দুইজন উটওয়ালার সহিত আমরা রওনা হইলাম এবং প্রাতে ৭টার সময় অঘোর নদীর ধারে অঘোর পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ২৪মাইল।

২৮শে আশ্বিন।—এই স্থানে উট হইতে নামিতেই উটওয়ালারা ছোট

মোট সমুদয় আমাদের বুঝাইয়া দিল ও উট লইয়া হিঙ্গুল পড়াভযে ফিরিয়া গেল। আজ সন্ধ্যার সময় হিঙ্গুলাজ পৌঁছিব ও রাত্রে দেবীর গর্ভযোনি প্রবেশ করিয়া শরণ লইব। এখানকার নিয়ম—দুই জন করিয়া লোক আগু পিছু হইয়া গর্ভযোনি প্রবেশ করিবে ও বাহির হইলে, তাহারা পরস্পর শরণ ভাই হইবে। আজ এই অঘোর নদীতে আগুয়া কাহার সহিত কাহাকে শরণ ভাই করিবে, তাহা ঠিক করিয়া দিল। নারায়ণ নাথ নামে একটী ১৭ বৎসরের সাধু আমার শরণ ভাই ঠিক হইল। স্ত্রীলোকদের স্ত্রীলোকদের সহিত শরণ ভাই মিলাইয়া দিল এবং একজন লোক অতিরিক্ত হওয়ায় আগুয়াই তাহার শরণ ভাই হইল। পরে প্রত্যেকে ৫ টী করিয়া দাঁতন ভাঙ্গিয়া হাতে করিয়া লই-লাম। এই স্থানে বিস্তর ছোট ছোট ঝাউগাছ আছে। তাহার মধ্যে একটী দাঁতন লইয়া দাঁতন করিয়া সেই এঁটো দাঁতনটী আমার শরণ ভাইএর এঁটো দাঁতনের সহিত বদল করিয়া লইলাম। এই পাঁচটী দাঁতন কাটি নদীর জলে পুতিয়া দিলাম। পরে স্নানাদি করিলাম। এই স্থানে নদীতে অনেক জল—খুব সাঁতার কাটিলাম। পরে শরণ ভাই ঠিক করিয়া দিবার জন্ম ২।১ পয়সা দক্ষিণা দিলাম ও-আহারাদি করিয়া বেলা ২টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। ইতি মধ্যে অপর উটওয়ালা খুব ক্ষুদ্রকায় উট লইয়া উপস্থিত হইল। এবং এই স্থান হইতে হিঙ্গুলাজ ৮মাইল হইলেও ।৹ আনা ভাড়া চাহিল। সেই জন্ম মৌনীবাবা ভিন্ন আর কেহই উট ভাড়া করিল না। তবে ২।৪ পয়সা দিয়া আপন আপন গাঁটরি উটে দিলাম। প্রায় ৩টার সময় এখান হইতে সকল যাত্রী একত্রে যাত্রা করিলাম এবং পথে মধ্যে মধ্যে খেতি আদি ও দু চার জন লোক দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। এখানে নিকটেই বসতি আছে। পথে ঐসকল লোক ছাগল বা বক্‌রা বিক্রয় করিতে লইয়া আসিল। আমরা একটা বক্‌রা মায়ের পূজার জন্ম খরিদ করিলাম। ক্রমে হিঙ্গুল নদী পার হইয়া ছোট ছোট পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। শেষ দুই মাইল পথ পর্ব্বতের উপর দিয়া এবং জঙ্গলপূর্ণ। এই কারণ, এই পথে পূর্ব্বেকার বড় উট আসিতে পারে না। শেষে আশাপুরী নামক স্থানে আসিয়া এমন ছোট গাছের জঙ্গল পড়িল যে, ছোট উটও আর যাইতে পারিল না। তখন আমরা যে যাহার মোট ঘাড়ে করিলাম।

এ স্থান হইতে দেবী পীঠ অর্দ্ধ পোয়া রাস্তা মাত্র। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দেবীর আস্তানা। উপরেও পর্ব্বত যেন উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে ঝরনার জল চলিতেছে। এই স্থানকে ইহারা কপাট বলে। ইহার নিকটেই কালী কপাটওয়ালীর স্থান, কিন্তু কোন মূর্ত্তি নাই। এ স্থানে পৌছিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। হিঙ্গুলাজ দেবীর আস্তানাটী ত্রিতল। উপরে একটী সিন্দুর মাখান পাথর আছে। তাহাই দেবী পীঠ—কোন মূর্ত্তি নাই। মধ্যমতলে একটী খুব লম্বা সুঁড়ঙ্গ আছে—তাহাকে গর্ভযোনি বা মাতৃযোনি বলে। সর্ব্বনিম্নে একটী ঘর আছে—সেই ঘরে বালাসুন্দরী দেবী আছেন। যাঁহারা বামাচার মতে পূজা বা সাধন করিতে চান, তাঁহারা এই স্থানে করেন।

সন্ধ্যার পরে আলো জ্বালা হইল এবং প্রথমে কালী কপাটওয়ালীর কাছে বক্‌রা কাটা হইল। পরে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আগুয়া সেই স্থানে ঝরনার একটী কুণ্ডে স্নান করিয়া হিঙ্গুলাজের আস্তানার মধ্যে পূজা করিবার ও জ্যোৎ জ্বালাইবার জন্ম প্রবেশ করিল। সঙ্গে ঘৃত, মদ্য, উক্ত বক্‌রার রক্ত একটী খর্পরে করিয়া এবং অপরাপর পূজার মসলা, করাচী হইতে সঙ্গে যাহা আনিয়াছিল এবং যাত্রীদের নিকট দেবীর জন্ম যে সকল চুনরী বা উড়্‌নি ছিল, তাহা চাহিয়া লইল। পরে ভিতরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া পূজায় বসিল। এখন পর্য্যন্ত কোন যাত্রী হিঙ্গুলাজের স্থানে প্রবেশ করিতে পায় নাই। তবে কালী কপাটওয়ালীকে দেখা হইয়াছে মাত্র। যাত্রীরা কেহ আহার প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ বা শয়ন করিল। রাত্রি প্রায় একটার সময় দেবীর পূজা শেষ করিয়া এবং জ্যোৎ জ্বালাইয়া আগুয়া বাহিরে আসিল। এবং দু চার জন যাত্রী, যাহারা জ্যোৎ দেখিব বলিয়াছিল ও সে কারণ আগুয়াকে কিছু দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া চক্ষের কাপড় খুলিয়া জ্যোৎ দেখাইয়া পুনরায় বাহির করিয়া দিল।

এই জ্যোৎ সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু সাধারণে প্রকাশ না করিবার জন্ম দেবীর শপথ করাইয়া নেয়। যাহা হউক, এই সকল হইবার পরে বাহিরের সমুদয় যাত্রীকে জাগান হইল এবং আগুয়া বলিল যে, দেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। অতএব তোমরা সকলে উঠিয়া স্নান করিয়া কেবল মাত্র কৌপীন ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র বা মালা বা অলঙ্কার শরীরে

না রাখিয়া (যেমন অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়,) সকাল বেলা আমি যাহাতে যাহাতে শরণভাই মিলাইয়া দিয়াছি, সেইরূপ ভাবে দুই জন দুই জন করিয়া আসিয়া গর্ভযোনির সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া শরণ লইয়া বাহির হইয়া যাও। তখন ক্রমে ক্রমে যাত্রিগণ অন্ধকারে সেই গর্ভযোনি প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি টাকাকড়ি সমুদয় মৌনী বাবার কাছে রাখিয়া স্নান করিয়া সেই নূতন ধুতি, যাহা করাচি হইতে খরিদ করিয়াছিলাম, তাহা পরিয়া (কারণ, গৃহস্থের নূতন কাপড় পরিবার নিয়ম আছে।) আমার শরণভাই নারায়ণ নাথের সহিত একত্র হইয়া ভিতরে গেলাম। সঙ্গে কেবল মাত্র ঠুঙ্গরার মালা ও সিন্দুর আছে। এই দুই বস্তু সঙ্গে লইয়াই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে হয়। গর্ভযোনির সুড়ঙ্গের নিকট গিয়া দেখি যে, তাহার দুই মুখে দুইটী গর্ত্ত। দুই জন করিয়া যাত্রী প্রবেশ করিতেছে, তাহারা বাহির হইয়া আসিলে অপর দুই জন প্রবেশ করিবে—এই নিয়ম। আমি নারায়ণ নাথের অপেক্ষা বয়সে বড় বলিয়া আমাকে প্রথম হামাগুড়ি দিয়া মাতৃযোনি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে হইল। সঙ্গী নারায়ণ নাথ সাধু বলিয়া প্রবেশের সময় কৌপীন পর্য্যন্ত খুলিয়া আগুয়ার হাতে দিল। আগুয়া বলিয়া দিয়াছিল, দক্ষিণ দিক চাপিয়া পরিক্রমা দিয়া আসিবে—কদাচ বাম দিকে যাইও না। আমরা দুই জনে আগু পাছু হইয়া কোন কোন স্থানে অত্যন্ত নীচু বলিয়া বুকে হাঁটিয়া প্রায় ৫।৭ মিনিট বাদে সুড়ঙ্গের অপর মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবামাত্র আগুয়া আমাদিগকে সেই স্থানের মাটির উপরে নবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ন্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতে বলিলেন। আমরা ঐরূপ শুইলে তিনি মুখে একটু জল দিলেন;—যেন শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে মূর্চ্ছা হওয়ায় ধাত্রী মুখে জল দিতেছে। তাহার পর আগুয়া আমাদিগকে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া কাপড় চোপড় পরিতে বলিলেন। এইরূপে সকল যাত্রীর ক্রমান্বয়ে শরণ লইতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। তখন আগুয়া আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে আধ পোয়া আটা ও কিছু চিনি বা গুড় লইয়া গেল এবং তাহাতে হালুয়া তৈয়ারি করিয়া সকলের মুখে বাল ভোগের ন্যায় একটু একটু পাঁচবার করিয়া দিল এবং সেই ঠুঙ্গরার মালা *

* ঠুঙ্গরার মালা—একরূপ সাদা পাথরের। অনেক সাধু উদাসীর গলায় থাকে। করাচীতে বিস্তর বিক্রয় হয়। দাম প্রত্যেক ছড়ার চার আনা মাত্র।

লইয়া প্রত্যেক যাত্রার নিকট হইতে এক ছড়া করিয়া নিজের জন্য লইয়া বাকি শোধন করিয়া যাত্রীদের ফিরাইয়া দিল। পরে সকল যাত্রীকে হিঙ্গুলাজের আস্তানার ভিতর লইয়া যাইয়া পীঠের আরতি হইল, ধূপাদিও দেওয়া হইল এবং দেবীর স্তোত্র পাঠ হইল। তাহার পর গৃহস্থ সকলকে আস্তানার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে বলিল। সাধুগণ ভিতরে রহিল; আগুয়া তাহাদিগকে পরমহংসমন্ত্র শুনাইয়া দিল। পরে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকেও একটী সিদ্ধ মন্ত্র শুনাইল। এই স্থানের কার্য্য এইবার শেষ হইল। তৎপরে যে সকল যাত্রী ইচ্ছা করিল, তাহাদিগকে আগুয়া মায়ের প্রসাদী মদ এক পাত্র করিয়া দিল। বকরার মাংসও রন্ধন হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

২৯শে আশ্বিন।—পূর্ব্বোক্ত কার্য্য শেষ হইতেই বেলা ৯টা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে দুই তিন জন মুসলমান ও একটী স্ত্রীলোক (তাহাকে চাংগি মাই বলে—তাহারই এই স্থান কালবেলা আমিরের নিকট হইতে বার্ষিক খাজনা দিয়া জমা লওয়া, ইহারা, যখন যাত্রীরা এই স্থানে না থাকে, তখন সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া স্থান ঝাঁট দেয় ও তথায় ধূপ দেয়) আসিল এবং প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এই স্থানের কর /৫ পয়সা হিসাবে আদায় করিল। আগুয়ার শরীর সে দিন অসুস্থ থাকায় সে একজন মুসলমানকে আমাদের উক্ত পীঠের চৌরাশি পরিক্রমার জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং নিজে ও অপর দুই চারি জন, যাহারা পরিক্রমায় যাইবে না, তাহাদিগের সহিত মাংস রসুই করিতে নিযুক্ত হইল। মৌনী বাবা খোঁড়া বলিয়া সেই স্থানে রহিলেন। তাঁহার নিকটেই আমাদের আটা দিয়া আসিলাম। তিনি রুটি তৈয়ার করিয়া রাখিবেন। এইরূপে সমুদয় ঠিক ঠাক করিলাম।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা চৌরাশি পরিক্রমায় বাহির হইলাম। পাহাড়ের উপর উঠিয়া স্থানে স্থানে সেই মুসলমান পথপ্রদর্শক এক একটি গুহায় এক একজন মহাপুরুষ, যথা, গুরু গোরক্ষনাথ, গুরু নানক প্রভৃতি যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া আনিল ও কুণ্ড নামক একটী কুণ্ডে উপস্থিত হইল। এই কুণ্ডটীর ব্যাস প্রায় ৭।৮ হাত হইবে। ইহা অতিশয় গভীর, নীচে হইতে জল উঠিতেছে। জলও খুব পরিষ্কার। যাহারা কোটেশ্বর ভৈরব দেখিতে যায়, তাহারা এই কুণ্ডের

জল শিশি করিয়া লয়। আমরা এই স্থানে স্নান করিয়া শিশি করিয়া জল লইয়া কিছু জলযোগ করিয়া এখান হইতে বাহির হইলাম এবং পরিক্রমা শেষ করিয়া প্রায় ১০ মাইল ঘুরিয়া ৪টার সময় হিঙ্গুলাজ দেবীর স্থানে পৌঁছিলাম। তখন রুটি ও মাংস প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। সকলেই আহারাদি করিয়া ৫ টার সময় ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিলাম। এখন আর পথে জয়কার দেওয়া নিষেধ। এখন যাত্রার সময় আগুয়া বলে, 'বল সিদ্ধ' এবং যাত্রীরা বলে, 'শরণ হিঙ্গুলাজ।' ইহার অর্থ এই— আগুয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোমরা কি করিয়া সিদ্ধ হইলে বল। যাত্রীরা জবাব দিতেছে,—হিঙ্গুলাজ দেবীর শরণ লইয়া। দেবীর স্থানে প্রণাম করিয়া অর্দ্ধ পোয়া রাস্তা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আশাপুরী নামক স্থানে আসিয়া দেখি যে, ছোট ছোট ৪।৫ টী উট উটওয়ালারা আনিয়াছে। আমি একটী উট চার আনা পড়াও হিসাবে ভাড়া করিয়া উটে চড়িয়া সন্ধ্যার মধ্যে পাহাড় অতিক্রম করিয়া রাত্র প্রায় আটটার সময় অঘোর পড়াওয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথ ৮ মাইল।

৩০শে আশ্বিন।—অঘোর পড়াওয়ে স্নান ও আটা যাহা কিছু ছিল, তাহার রুটি করিয়া আহারাদি করিয়া চোলো যাত্রীদের ছাড়িয়া আমরা পাঁচজন উটের যাত্রী সঙ্গে খানকতক করিয়া রুটি ও এক এক কুঁজা জল ভরিয়া লইয়া বেলা বারটার সময় যাত্রা করিলাম। কারণ, উটওয়ালারা সন্ধ্যার মধ্যে হিঙ্গল পড়াওয়ে আমাদের পূর্ব্ব উটওয়ালাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ভাড়া লইয়া বিদায় হইবে। চোলো যাত্রীদের মধ্যে নর্ম্মদা পুরীর আটা ফুরাইয়া যাওয়ায় সে আমাদের সঙ্গে চলিল। এই দিন আমরা দুপুর বেলা যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধেক রাস্তায় যাইতে যাইতে সমুদয় কুঁজার জল ফুরাইয়া গেল এবং পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। তখন সকলে উটওয়ালাকে জলের জন্য বলিলে সে বলিল, রাস্তা হইতে অর্দ্ধক্রোশ ভিতর দিকে যাইলে কূয়া পাইব। আমরা সেই স্থানে উট লইয়া যাইতে বলিলাম। তথায় পৌঁছিয়া কূয়া হইতে জল তুলিয়া সকলে পান করিলাম এবং সেখানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সকলে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় হিঙ্গল পড়াওয়ে পৌঁছিয়া উটওয়ালার দুই পড়াওয়ের ভাড়া।০ আনা হিসাবে ॥০ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। পথ ২৪ মাইল।

৩১ শে আশ্বিন।—প্রত্যূষে চোলো যাত্রীরা সকলে আসিলে আমাদের

বসবের শিল মোহর দেওয়া মোট সকল খুলিয়া আপনাপন দ্রব্য বুঝিয়া লইয়া আহারাদি করিলাম। এবং বৈকালে ৩টার সময় পূর্ব্ব-নিযুক্ত উট ও চোলো যাত্রীসকলে একত্র হইয়া যাত্রা করিলাম। পথে ত্রিলোকীপুরী পড়াও পার হইয়া ফোরনদী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। এস্থানে সেদিন আর একটী জমায়েৎ করাচি হইতে দর্শনে আসিয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং খুব আনন্দ করা হইল। হিঙ্গুলাজ যাইবার কালীন আমরা ১৩ দিনে অল্প অল্প করিয়া চলিয়া মধ্যে ১২টী পড়াওয়ে বিশ্রাম করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আসিবার সময় বেশী বেশী চলিয়া ১০দিনের মধ্যে ৯টী পড়াওয়ে বিশ্রাম করিয়া আসিতে হয়। এই জন্য যাইবার পড়াও আসিবার পড়াওয়ের সহিত মেলে না। এই পথের দূরত্ব ২৮ মাইল।

১লা কার্ত্তিক।—ফোর নদী পড়াওয়ে আহারাদি করিয়া বেলা ৩টার সময় সকল যাত্রী একত্রে যাত্রা করিয়া পথে কাণ্ডেওয়ালী পড়াও অতি-ক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে রাত্রে ছয় ঘণ্টা আন্দাজ বিশ্রাম করিয়া প্রাতে পাঁচটার সময় মঙ্গলওয়ালী পড়াওয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথ ২৮মাইল।

২রা কার্ত্তিক।—মঙ্গলওয়ালী পড়াওয়ে আহারাদি করিয়া চোলো যাত্রীরা বেলা ৩টার সময় যাত্রা করিল। কিন্তু আমরা রাত্রি বারটায় যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে ৭টার সময় ভাব্বাওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ১৪ মাইল।

৩রা কার্ত্তিক।—ভাব্বাওয়ালী পড়াওয়ে আহারাদি করিয়া বৈকালে যাত্রীরা যাত্রা করিল, কিন্তু আমরা রাত্রি এগারটার সময় যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে ৭টার সময় কোয়লাওয়ালী পড়াওএ পৌঁছিলাম। পথ ১৬ মাইল।

৪ঠা কার্ত্তিক।—কোয়লাওয়ালী পড়াওয়ে আহারাদির পর বৈকালে চোলো যাত্রীরা চলিয়া গেল। আমরা কিন্তু রাত্রি দশটায় রওনা হইয়া পথে সোনমেয়ানি সহর ছাড়াইয়া একেবারে পরদিন প্রাতে আঘাওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। পথ ৩০ মাইল।

৫ই কার্ত্তিক।—আঘাওয়ালীতে আহারাদি করিয়া বৈকালে চোলো যাত্রীরা যাইবার পর আমরা রাত্রি দুইটায় রওনা হইয়া পথে ভোরবেলা চৌকীঘরের নিকট চৌকীওয়ালী পড়াওএ আসিয়া দেখি, চোলো যাত্রী

সকল আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পরে চৌকীর জমাদারকে ডাকিয়া আমি সেই পূর্ব্ব পাশখানি দিলাম। তিনি আমাদের ৪১ জন যাত্রী গণিয়া লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। যদি গণনায় যাত্রী কম হয়, তাহা হইলে সেই যাত্রার কি হইল, এ সম্বন্ধে জমাদার সকলের সাক্ষ্য আদি গ্রহণ করেন। যদি যাত্রীর প্রকৃত মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সন্দেহ হইলে সকলকে আটক করে। চৌকী হইতে ছাড় পাইয়া আমরা উক্ত পড়াও ছাড়াইয়া লক্ষ্মণনালা পড়াওয়ে আসিয়া বেলা আটটার সময় পৌঁছিলাম। পথ ১৪ মাইল।

৬ই কার্ত্তিক।—লক্ষ্মণনালায় আহারাদি করিবার পর বৈকালে চোলো যাত্রী সকল চলিয়া গেল। তাহাদের সহিত আমাদের অগ্রবর্ত্তী পড়াওয়ে দেখা হইবে না, সেই জন্য আমি রামগিরিকে কাছে রাখিয়াছিলাম। পরে রাত্রি এগারটার রওনা হইয়া প্রাতে ৪টার সময় পকোড়িওয়ালী পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। কিন্তু চোলো যাত্রিগণ উক্ত পড়াও ছাড়াইয়া একেবারে হাবনদী পড়াওয়ে চলিয়া গেল। আমরা ঐ স্থানে যাইবার জন্য উটওয়ালাদের অনেক বলিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুতেই রাজি হইল না। পথ ১৪ মাইল।

৭ই কার্ত্তিক।—পকোড়িওয়ালী পড়াওয়ে আহারাদি করিয়া বেলা ৩টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় হাবনদী পার হইয়া করাচীর দিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে লাইটহাউস দেখা গেল এবং মধ্যে একটী সদাব্রত্তে আসিয়া উট থামাইল। সেই স্থানে চোলো যাত্রিগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া সদাব্রত হইতে চাল ডাল লইয়া খিচুড়ি করিয়া খাইয়াছে এবং আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। এই স্থানে ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সকল যাত্রী একত্র হইয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম এবং প্রাতে ৫টার সময় করাচির ছোট আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। পথ ২০ মাইল।

৮ই কার্ত্তিক।—জমায়েৎ আখড়ায় পৌঁছিলে মোহন্ত দেবীর ঘর খুলিলেন এবং আমরা সকলে ছড়ির সহিত ঘরে যাইয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আমি ১০ দিয়া গেরুয়া বস্ত্র ত্যাগ করিলাম এবং কিছু হালুয়া বানাইয়া দেবীর ভোগ দিলাম। পরে হিঙ্গুলাজ দেবীর স্থানে পূজার দরুন মদ, পাঁটা ও অপরাপর দ্রব্যের দাম এবং চন্দ্রকূপ স্বামীর পূজার দ্রব্যের দাম, হিসাব করিয়া যাহা হইল, তাহার দুই অংশ (আমার ও রামগিরির)

অর্থাৎ ॥০ মাত্র দিলাম। উটওয়ালাদের ভাড়াও সমুদয় চুকাইয়া দিলাম। মোহন্তজীকেও ৫৲ টাকা ভেট দিলাম। আগুয়াদের কিছুই দিতে হয় না। তাহারা মোহন্তের নিকট যাত্রী হিসাবে কমিশন পায়। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া এবং সকল সাধুর নিকট বিদায় লইয়া আমি আখড়া হইতে নিজ দ্রব্যাদি লইয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই ভদ্রলোকটীর বাসায় গেলাম।

উপসংহারে সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, হিঙ্গুলাজ তীর্থ করাচি হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে প্রায় ৯০।৯১ ক্রোশ দূরে। এই স্থানে এইরূপ উপায়ে যাওয়াতে ২০ দিন সময় লাগে বরং কখন কখন ২।১ দিন বেশী সময় লাগে। তবে বেশী টাকা খরচ করিয়া দ্রুতগামী উট ভাড়া করিয়া নিজে একটী ছড়ির সমুদয় খরচ দিয়া ও আগুয়ার জন্য ঐরূপ একটী উট ভাড়া করিয়া গেলে ৮।১০ দিনে যাতায়াত হয়। কিন্তু ঐরূপ উটে চড়া অভ্যাস থাকা চাই, কারণ, উহারা দিনে ৩০।৪০ ক্রোশ দৌড়িতে পারে।

হিঙ্গুলাজ যাইবার আর এক উপায় আছে। করাচী হইতে বেরী বা লুড়ি (বড় নৌকা) করিয়া যাইলে উডমার নামক বন্দর একদিনে পৌঁছান যায়। তথা হইতে হিঙ্গুলাজ ৩০।৩২ মাইল মাত্র। পথে সমুদ্রের কিনারায় বেরী লাগাইয়া চন্দ্রকূপ দর্শন করিলেই হয়, কারণ, চন্দ্রকূপ সমুদ্রের কিনারায়। ইহাতে ৫।৬ দিনে যাতায়াত হয়। কিন্তু আখড়াওয়ালারা এইরূপ বন্দোবস্ত করেন না। তাহারা বলে, একবার কচ্ছের এক জন মহাজন বেরী করিয়া চন্দ্রকূপ ও হিঙ্গুলাজ যাত্রা করে। কিন্তু দেবী তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়ায় চন্দ্রকূপের নিকট সমুদ্রের ধারে সেই বেরী ও তন্মধ্যস্থিত সমুদয় দ্রব্য মায় মানুষ পর্য্যন্ত পাষাণ হইয়া যায়। এখনও চন্দ্রকূপের উপর উঠিলে আগুয়া একটী প্রস্তর পর্ব্বতকে সেই বেরী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আখড়াওয়ালারা বলে, ঐরূপে যাওয়া দেবীর নিষেধ।

কোন ব্যক্তি যদি এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন, কিম্বা কোন সময় জমায়েৎ যাত্রা করিবে, সেই খবর পূর্ব্ব হইতে চান, তাহা হইলে তিনি মোহন্ত মহারাজ,——আখড়া, করাচি সিটি ঠিকানায় পত্র বা তার করিলে সমাচার পাইতে পারেন।

———

অমরত্ব-স্মৃতি।

[শ্রীঅনাথ নাথ পালিত এম, এ কর্ত্তৃক
ইংরাজী হইতে অনূদিত।]

১।

ছিল একদিন যবে নিকুঞ্জ সরিৎ
ভূতল প্রান্তর আদি দৃশ্য সাধারণ
স্বপ্নজাত দিব্যালোকে হেরিত ভূষিত
যে সুখের শৈশবেতে আমার নয়ন।
দিবস রজনী আঁখি যে দিকে ফিরাই
দেখিয়াছি যাহা, এবে দেখিতে না পাই!

২।

ইন্দ্রধনু কিবা নয়ন-রঞ্জন
এখনো গোলাপ কানন-শোভন
হাসে ত চন্দ্রমা বিমল আকাশে
আবরি ধরায় কৌমুদীর বাসে।
তারকাখচিত গগন-মণ্ডল
এখনো সাজায় সরসীর জল।
নবীন ছটায়——কিবা মনোরম
পূরব গগনে রবির জনম!
যে দিকেতে চাই, যেন মনে হয়—
অনুপম শোভা হয়েছে বিলয়!!

৩।

আনন্দ-সলিলে ভাসিছে অবনী
আনন্দে গাহিছে শাখে পাখিকুল
তালে তালে নাচে মৃগশিশুচয়
শুনি'-যেন সবে ডমরুর ধ্বনি।

——এ হেন সময়ে হায় অন্তর আমার
দুখের ভাবনা আসি করে অধিকার।
দুখের উচ্ছ্বাস করিয়া প্রকাশ
লভিলাম শান্তি পাইলাম বল।
কবে তুবীনাদ ঝরণার জল
তটিনী-আঘাতে ধ্বনিছে অচল
কবে প্রীতিদান উষা-সমীরণ
সাগর ভূতল আনন্দে মগন।
উৎসব-আমোদে উল্লাস-অন্তর
যেন মধুমাসে মত্ত জীবকুল।
হেন কালে মম মনের বিষাদ
সুখ-ঋতু সনে সাধিবে না বাদ।
কৃষাণ বালক হরষে বিভোর
সবে মিলি কর আনন্দ-নিনাদ
মাতুক পরাণ হোক হরষিত
শুনি সবাকার সুললিত গীত।

৪।

আনন্দ-কল্লোলে খেলে জীবগণ,
আনন্দের ভরে হাসিছে গগন,
আমারো অন্তর মাতিছে উল্লাসে
মিশাইতে প্রাণ তাদের হরষে।
সাজাইছে ধরা নবীনা উষারে,
বালক বালিকা খেলিছে প্রান্তরে,
বিকচ কুসুম করিছে চয়ন,
তপ্তলোহসম তাপিছে তপন।
নাচিতেছে শিশু জননীর কোলে,
আনন্দের তান সবাই ত তোলে,
উচিত কি তবে রহি ম্রিয়মাণ
সুখ সনে মোর শত্রুতা-বিধান ?
——কিন্তু হায় ঐ তরু——ঐ সে প্রান্তর
কেন বা নেহারি আজ পূর্বশোভাহীন ?

কাননের শোভাকারী গোলাপ সুন্দরী
কেন হারায়েছে সেই রূপের মাধুরী?
স্বপন-সম্ভূত সেই সুবিমল বিভা
কোথায় গিয়াছে এবে প্রাণমনোলোভা?

৫।

নিদ্রা——বিস্মরণ মাত্র এ জনম,
——জীবাত্মা-তারকা এ ভবে উদিত
সুদূর আকাশে হয়ে অস্তমিত।——
একেবারে কিন্তু যায় না রে ভুলি
ব্রহ্মধাম ছাড়ি যেন মেঘাবলি
আপনা উজলি স্বরগ-বিভায়
আসে যে মানব এ মর ধরায়।
স্বরগের জ্যোতিঃ শৈশবেতে রয়,
ভব-কারাগার-তিমিরের জালে
বাড়ে শিশু যত আবরিয়ে ফেলে।
তবুও নেহারে হরষিত চিতে
সে দিব্য আলোক——আসে কোথা হোতে।
ভাসিয়ে যুবক যায় কাল-স্রোতে
দিব্য বিভা তবু না পারে ভুলিতে।
সে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দিব্যদৃষ্টিজাত
তরুণ নরের উজলয় পথ।
প্রৌঢ় আঁখি হেরে সে জ্যোতিঃ মলিন,
সামান্য আলোকে শেষেতে নিলীন।

৬।

পালেন শিশুরে যথা মাতা দয়াবতী
যতন করেন ধরা মানবের প্রতি;
ভুলান শিশুরে ধরা ধাত্রীর মতন।
ভাতিত যে বিভা তার জনমের আগে,
যে রাজপ্রাসাদ হোতে তার আগমন,
পুরিয়া ভাণ্ডার নিজ নানা উপভোগে।

৭।

পাঁচ বরষের হের সুকুমার,
করে খেলনক কেমন সুন্দর!
জনকের স্নেহে মাতার চুম্বনে
শশিকলাসম বাড়ে দিনে দিনে।
জীবনাঙ্কছবি রয়েছে সুমুখে
নবশিক্ষাবলে এঁকেছে যা সুখে।
—শ্রাদ্ধ যাগ আর বিবাহ উৎসবে
হোয়ে মাতোয়াবা খেলিছে এ ভবে —
বিবাদ প্রণয় বিষয় ব্যাপার
কালে প্রবেশিবে অন্তরে তাহার।
কিন্তু কত দিন—এই, খেলা ত্যজি
ভব-রঙ্গ-ভূমে নব নব সাজি,
নবীন আমোদে গরবিত মনে,
করিবেক লীলা এ মর ভুবনে;
আশৈশববৃদ্ধ অংশ সবাকার
করিবেক অভিনয় চমৎকার।
নশ্বর জীবনে নাহিক করম
অনুকার বিনা—বুঝেছে মরম॥

৮।

ক্ষুদ্র বাহ্যকায় ভুলাইয়া দেয়
আত্মার মহত্ত্ব, হে শিশু সুধীর!
উচ্চতত্ত্বদর্শী এ ভবেতে আসি
অক্ষুণ্ণ রেখেছ অধিকার তব।
অজ্ঞনর মাঝে তুমি বিজ্ঞতম,
বিশ্বের রহস্য বুঝিতে সক্ষম।
অনন্ত সে চিৎ হৃদয় তোমায
নিরন্তর আছে করি অধিকার।
ভূতভবিষ্যৎদর্শী হে মহান্,
ভাগ্যবান্ তুমি যোগীর প্রধান।

সত্যতত্ত্ব সব রয়েছে তোমাতে
আজীবন শ্রমে নারি যা লভিতে।
প্রভুত্ব বিস্তার করে ভবোপরি
অমরত্ব জ্ঞান কেবল তোমারি।
স্বরগপ্রসূত স্বাধীনতাধনে
হয়ে বলীয়ান্, অহে শিশু নর,
আগ্রহেতে কেন আবাহন কর
ভারভূত ভবে ভবিষ্যজীবনে ?
অন্ধ হোয়ে কেন সুখের শৈশবে
বাদ সাধ অহে বুঝিয়া প্রমাদ ?
আসিবে সে দিন বুঝিবে যখন,
নিত্যক্রিয়াভারে জীবাত্মা তোমার,
হইবে আবদ্ধ শারীর-বন্ধনে,
হবে না সমর্থ সে পাশ-মোচনে।

৯।

ইথে কি আনন্দ! জরা-আক্রমণে
শৈশবের সেই স্বরগ-ভবন,
স্মৃতিপথে যাহা ছিল অনুক্ষণ,
আভাস তাহার না হয় বিনাশ॥
শৈশবের হর্ষ, উৎসাহ নবীন,
সরল বিশ্বাস, অন্তর স্বাধীন,
এ সবের তরে আনন্দের তান
জাগে না হৃদয়ে ধন্যবাদগান।
কিন্তু শৈশবেতে যবে চিন্তাবেশে
সন্দিহান হত আমার মানস——
আছে কি না আছে এ বাহ্য জগৎ——
স্বপ্নসম সব হোত অনুভব,
সেই উচ্চ ভাব যাহার সম্মুখে
হোত কম্পমান এ মর হৃদয়
(পাপিজন যথা সাধুর অগ্রেতে

ভয়ে সঙ্কুচিত না পারে দাঁড়াতে)
অমরত্ব আভা যবে চিত্র সম
ফলিত হইত চিত্তপটে মম;
স্মরিলে সে দিন——সে ভাব উদার
হয় যে অন্তর হরষে বিভোর।
স্বরগের কথা অস্ফুট-স্মরণ
হইলেও সদা জ্ঞানের নিদান।
শান্তি বল যাহা করেরে প্রদান।
কুজ্ঝটিকাময় মানবজীবন
বারিবিন্দুপ্রায় কালসিন্ধুমাঝে
শিখায় এ তত্ত্ব যাহা মানবসমাজে।
যেই সত্য তত্ত্ব সদা হৃদে জাগরুক,
যার ভাবনায় রত থাকে গো ভাবুক;
যার ধ্বংসে মানবের বিফল উদ্যম,
সংসার ভাবনা যার বিনাশে অক্ষম।
এই হেতু যবে স্থিরচিন্তাবেশে
ধায় মম মন সংসারের পানে;
যে অনন্ত কাল-সিন্ধু হোতে আগমন,
দূরে থাকি পায় আত্মা তার দরশন।
অমরত্ব সাগরেতে ধায় মুহূর্ত্তেতে
কূলেতে শিশুর খেলা পায় গো দেখিতে॥

১০।

গাও তবে পাখি, আনন্দের গান
নাচ মৃগশিশু জুড়াক পরাণ।
মিশাইব প্রাণ তোদের, হরষে
উল্লাসে উৎফুল্ল যেন মধুমাসে।
সে উজ্জ্বল বিভা যদিও মলিন,
যদিও কুসুম এবে শোভাহীন,
কেন বৃথা আর করি গো বিষাদ?
ভুলি যাই দুখ লভিব প্রসাদ।

এক প্রেমে গাঁথা বিশ্ব চরাচর
চিরতরে রবে এই প্রেমডোর।
সংসারের জ্বালা পরীক্ষামূলক,
অবিমিশ্র সুখ দিবে পরলোক।
বার্দ্ধক্যে মানস তত্ত্বজ্ঞানময়
পাইব গো বল এ সব চিন্তায়॥

১১।

হে উৎস নিকুঞ্জ শৈল প্রান্তর শোভন
ভাবিও [illegible] ছিন মোর প্রণয়-বন্ধন।
সবার প্রভাব বুঝে হৃদয় আমার
ভুলেছি যদিও সেই হরষ অপার——
এবে নিত্য মিশে আছি তোমাদেরি সনে
তোমা সবাকার শক্তি আছে মম মনে।
[illegible] নীর কলকল ধ্বনি

অকস্মাৎ একদিন হোলে অন্তর্দ্ধান
আমাদের অযতনে ওহে ভগবান্!

জনম উৎসব দেব, তব সন্নিহিত
উচিত এ হেন কালে আনন্দের গান,
কিন্তু মূঢ় চিত যবে অপূর্ব্ব সুস্মৃতি
স্মরে—তবে উঠে হৃদে বিষাদের তান।
জেনেছি সকলি মায়া তব উপদেশে,
তবু প্রাণে জাগে শোক তব চিন্তাবেশে।

তোমার করম ব্রতে হইতে দীক্ষিত
আমারে—জননী পাশে করিলে প্রার্থনা;
তাই কি করমস্রোতে ভাসিতেছি আমি—
কিম্বা এ বিশ্বমোহিনী মায়ার ছলনা?